

গল্প সমগ্র

হুমায়ুন আহমেদ

BanglaBook.org



গল্প সমগ্র

হুমায়ুন আহমেদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG



কাকলী প্রকাশনী

©

গুলতেকিন আহমেদ

ষষ্ঠ প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

পঞ্চম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৯৫

চতুর্থ প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

তৃতীয় প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

দ্বিতীয় প্রকাশ
মার্চ ১৯৯২

প্রথম প্রকাশ
বিজয় দিবস ১৯৯১

প্রকাশকালীন
এ কে নাহির আহমেদ সেলিম
কাঙালী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচন্দ
সমর মজিমদার

কলিকাটার প্রকাশন
নূশা কলিকাটারিস্ট
৩৪ আজিমপুর সুপার মাকেটি ঢাকা ১২০৫

মুদ্রণ
এস. আর. প্রিন্টার্স
৭ শ্যামপুর চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০

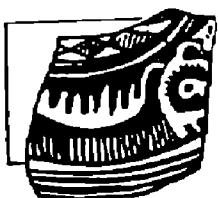
পরিবেশক
সুজনশীল পাবলিশার্স গিল্ড
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

দাম ২০০.০০ টাকা

ISBN 984 437 023 0

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

রূপা ৯	২০৫ বীণার অসুখ
বুড়ি ১৩	২১৩ অয়েময়
একটি নীল বোতাম ১৮	২১৯ সঙ্গনী
পিপড়া ২৩	২২৮ অকে ট্রোক
উনিশ 'শ' একাত্তর ৩২	২৩৩ বান
কুকুর ৩৭	২৩৬ শক্তিমালা
একজন সুখী মানুষ ৪৪	২৩৯ নিউচের স্তুল সূত্র
জুয়া ৫০	২৫৬ মন্ত্রীর হেলিকপ্টার
জীবন যাপন ৫৫	২৬০ ডয়
সে ৬১	২৭৪ অচিন বৃক্ষ
খেলা ৭১	২৮০ নিশিকার্য
কল্যাণীয়াসু ৭৪	২৮৬ কৃষ্ণপক্ষ
নিমধ্যমা ৮৪	২৯১ ছায়াসঙ্গী
শিকার ৯৬	২৯৯ জলিল সাহেবের পিটিশন
অসুখ ১০২	৩০৬ শব্দাত্মা
খদক ১০৫	৩১৬ আনন্দ-বেদনার কার্য
ফেরা ১১০	৩২০ অপেক্ষা
তুচ্ছ ১১৩	৩২৪ শীত
দ্বিতীয় জন ১১৭	৩৩০ ওইজা বোর্ড
সাদা গাঢ়ী ১২৫	৩৪২ শ্যামল ছায়া
অসময় ১৩১	৩৪৮ বেয়ারিং চিঠি
পাখির পালক ১৩৪	৩৫৪ ভালবাসার গচ্ছ
বেবি রুথ ১৪২	৩৬০ সৌরভ
চোখ ১৪৬	৩৬৪ জলছবি
অকজন ক্রীতদাস ১৬২	৩৬৮ নন্দিনী
অপরাহ্ন ১৬৫	৩৭২ সুখ অসুখ
ছীন-কফিল ১৬৯	৩৭৭ গোপন কথা
কবি ১৯৮	৩৮২ ফজলুল করিম সাহেবের আশকার্য
রহস্য ২০১	৩৮৮ সুলেখার বাবা
৩১১ যন্ত্র	



The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK .ORG

রূপা

'ভাই, আপনি কি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে চান ?'

আমি ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। কিছুক্ষণ আগে সঙ্গে আলাপ হয়েছে — তাও এমন কোনো আলাপ না। আমি টেনের জন্যে অপেক্ষা করছি কি-না জানতে চাইলেন। আমি বললাম 'ইহ্যা' এবং ভদ্রতা করে জানতে চাইলাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি আমার স্তৰীকে রিসিভ করতে এসেছি। ও চিটাগাং থেকে আসছে। টেন দৃঘন্টা লেট। ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। বাসায় যাবো আবার আসবো, ভাবলাম অপেক্ষা করি।

তাঁর সঙ্গে এইটুকুই আমার আলাপ। এই আলাপের সূত্র ধরে কেউ যখন বলে, ভাই আপনি কি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে চান, তখন খানিকটা হলেও বিশ্বিত হতে হয়। অপরিচিত লোকের কাছ থেকে গল্প শোনার আগ্রহ আমার কম। তাছাড়া আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি — ইন্টারেস্টিং গল্প বলে যে গল্প শুরু হয় সে গল্প কখনোই ইন্টারেস্টিং হয় না।

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক বুক্সিমান হলে আমার চুপ করে থাকার অর্থ বুঝতে পারবেন। বুক্সিমান না হলে এই গল্প আমার শুনতেই হবে।

দেখা গেলো ভদ্রলোক মোটেই বুক্সিমান নন। পকেট থেকে পানের কোটা বের করে জ্বাল সাজাতে সাজাতে গল্প শুরু করলেন —

'আপনি নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হয়ে আমার কথা শুনছেন। নিতান্তই অপরিচিত একজন মানুষ হড়বড় করে গল্প বলা শুরু করেছে। বিরক্ত হবারই কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ কি জানেন ? আমি আমার জন্যে একটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনে আমার মন্তব্য গল্পটা কাউকে না কাউকে বলতে ইচ্ছা করে। যদি অনুমতি দেন — গল্পটা বলি।'

'বলুন !'

'আপনি কি পান খান ?'

'স্বি - না !'

'একটা খেয়ে দেখুন মিষ্টি পান। খারাপ লাগবে না।'

'আপনি কি বিশেষ দিনে গল্পের সঙ্গে সঙ্গে স্বাইকে পানও খাওয়ান ?'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। আন্তরিক ভঙ্গিতেই হাসলেন। ভদ্রলোকের বয়স চালিশের মতো হবে। অত্যন্ত সুপুরুষ। ধৰ্মবে সাধা পার্যজ্ঞামা-পাঞ্জাবীতে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছে।

মনে হচ্ছে তিনি স্ত্রীর জন্যে খুব সেজেগুঞ্জেই এসেছেন।

'প্রায় কৃতি বছর আগের কথা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করছি — পদার্থ বিদ্যায়। এখানে অঙ্গকার বলে আপনি সম্মত আমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন না। আলো থাকলে বুঝতেন আমি বেশ সুপুরুষ। কৃতি বছর আগে দেখতে বাজপুত্রের মতে' ছিলাম। ছাত্রমহলে আমার নাম ছিলো — 'দ্যা প্রিস।' মজার ব্যপার হচ্ছে, মেয়ে মহলে আমার ক্ষেত্রে পাতা ছিলো না। আপনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন কি-না জানি না — পুরুষদের রূপের প্রতি মেরেরা কখনো আকৃষ্ট হয় না। পুরুষদের সব কিছুই তাদের চোখে পড়ে — কৃপ চোখে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয় জোবনে কোনো মেয়ে আমার সঙ্গে ভাব করার জন্য কিংবা কথা বলার জন্যে এগিয়ে আসেনি। আমি ও নিজে থেকে এগিয়ে যাইনি। কারণ আমার তোতলামি আছে। কথা আটকে যায়।'

আমি উদলোককে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমি তো কোনো তোতলামি দেখছি না। আপনি চমৎকার কথা বলে যাচ্ছেন।

'বিয়ের পর আমার তোতলামি সেরে যায়। বিয়ের আগে প্রচণ্ড রকম ছিলো। অনেক চিকিৎসাও করেছি। মার্কেল মুখে নিয়ে কথা বলা থেকে শুরু করে হোমিওপ্যাথি অমৃত, পীর সাহেবের তাবিজ কিছুই বাদ দেইনি। যাই হোক — গল্পে ফিরে যাই, আমার সাবসিডিয়ারী ছিলো ম্যাথ এবং কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রি সাবসিডিয়ারীতে একটি মেয়েকে দেখে আমার প্রায় দম বক্ষ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হলো। কি মিটি চেহারা! দীর্ঘ পল্লব, ছয়াময় চোখ। সেই চোখ সব সময় হাসছে। ভাই, আপনি কি কখনো প্রেমে পড়েছেন?"

'জ্ঞি - না।'

'প্রেমে না পড়লে আমার সেই সময়কার মানসিকতা আপনাকে বুঝাতে পারবো না। আমি প্রথমদিন মেয়েটিকে দেখেই পূরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সারাবাত ঘুম হলো না। প্রচণ্ড পানির পিপাসায় একটু পরপর গলা শুকিয়ে যায়। পানি খাই আর মহসিন হলের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করি।

সপ্তাহে আমাদের দুটা মাত্র সাবসিডিয়ারী ক্লাস। রাগে-দৃঢ়ৈ আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে। প্রতিদিন একটা করে সাবসিডিয়ারী ক্লাস থাকলে কি ক্ষতি হতো? সপ্তাহের দুটা ক্লাস মানে পঞ্চাশ মিনিট করে একশ' মিনিট। এই একশ' মিনিট চোখের পলকে শেষ হয়ে (যাব্য) তাছাড়া মেয়েটা খুব ক্লাস ফাঁকি দেয়। এমনও হয়েছে সে পর পর দুসপ্তাহ কোনো ক্লাস করলো না। তখন আমার ইচ্ছা করতো লাফ দিয়ে মহসিন হলের ছাদ থেকে নীচে পড়ে সমস্ত জলাযন্ত্রণার অবসান ঘটাই। সে যে কি তয়াবহ কষ্ট আপনি বুঝবেন না। কারণ আপনি কখনো প্রেমে পড়েননি।'

'মেয়েটার নাম তো বললেন না, তার নাম কি?' ॥

'তার নাম কৃপা। সেই সময় আমি অবশ্য তার নাম জানতাম না। নাম কেন — কিছুই জানতাম না। কোন ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী তার নাম জানতাম না। শুধু জানতাম তার সাবসিডিয়ারীতে ম্যাথ আছে এবং সে কালো রঙের একটা মরিস মাইনর গাড়িতে করে আসে। গাড়ির নাম্বার — ভ ৮৭৮১।'

'আপনি তার সম্পর্কে কোনো রকম খোজ নেননি?' ॥

‘না। খেঁজ নেইনি। কারণ আমার সব সমস্য ভয় হতো খেঁজ নিতে পেলেই জানবো — মেয়েটির হস্ততো বা কারো সঙ্গে ভাব আছে। একদিনের একটা ঘটনা কলনেই আপনি বুঝতে পারবেন — সারসিডিয়ারী ক্লাসের শেষে আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মেয়েটা হেসে হেসে একটা ছেলের সঙ্গে গল্প করছে। আমার সমস্ত শরীর কাপতে লাগলো। মনে হলো আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো। সব ক্লাস বাদ দিয়ে হলো চলে এলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত শরীর কাপিয়ে আমার জ্বর এসে গেলো।’

‘আশ্র্য তো ?

‘আশ্র্য তো বটেই। পুরো দু'বছর আমার এই ভাবেই কাটলো। পড়াশোনা মাথায় উঠলো। তারপর একদিন অসীম সাহসের কাজ করে ফেললাম। মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভারের কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা জেনে নিলাম। তারপর মেয়েটিকে সম্বোধনহীন একটা চিঠি লিখলাম। কি লিখেছিলাম এখন আর মনে নেই। তবে চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে — আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। তাকে রাজি হতেই হবে। রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বাড়ির সামনে না থেয়ে পড়ে থাকবো। যাকে পত্রিকার ভাষায় বলে ‘আমরণ অনশন’ গল্পটা কি আপনার কাছে ইন্টারেন্সিং মনে হচ্ছে ?’

‘হ্যাঁ হচ্ছে। তারপর কি হলো কলুন। চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দিলেন ?’

‘না। নিজেই হাতে করে নিয়ে গেলাম। ওদের বাড়ির দারোয়ানের হাতে দিয়ে বললাম, এ বাড়ির একজন আপা আছেন না — ইউনিভার্সিটিতে পড়েন — তাঁর হাতে দিয়ে এসো। দারোয়ান লক্ষ্য ছেলের মতো চিঠি নিয়ে চলে গেলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বললো, আপা বলেছেন তিনি আপনেরে চিনেন না। আমি বললাম, তিনি ঠিকই বলেছেন, তবে আমি তাঁকে চিনি। এটাই যথেষ্ট।

এই বলে আমি গেটের বাইরে খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বুঝতেই পারছেন — নিতান্তই পাগলের কাণ। সেই সময় মাথা আসলেই বেঠিক ছিলো। লজ্জিক নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। যাই হোক, সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কোনো রকম ঘটনা ছাড়াই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। লক্ষ্য করলাম দোতলার জানালা থেকে মাঝে, মধ্যে কিছু কৌতুহলী চোখ আমাকে দেখছে। বিকেল চারটায় এক ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বের হয়ে কঠিন গলায় বলেছেন, যথেষ্ট পাগলামি করা হয়েছে। এখন বাড়ি যাও।

আমি তাঁর চেয়েও কঠিন গলায় বললাম, যাবো না।

‘পুলিশে খবর দিছি। পুলিশ এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।’

‘কোনো অসুবিধা নেই খবর দিন।’

‘হ্যাঁ রাম্বেকল মাতলামি করার জ্বায়গা পাও না ?’

‘গালাগালি করছেন কেন? আমি তো আপনাকে গালিবাইছি না।’

ভদ্রলোক রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ির ভেতর চুলে পোলেন। তার পরপরই শুরু হলো শৃষ্টি। ঢালাও বর্ষণ। আমি ভিজছি নির্বিকার ভঙ্গিতে। সঙ্গে সঙ্গে বুবাহি যে জ্বর এসে যাচ্ছে। সারাদিন রোদে পোড়ার পর এই ঠাণ্ডা বৃষ্টি সম্ম হবে না। তখন একটা বেপরোয়া ভাব চলে এসেছে — যা হবার হবে। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে শরীর অবসর। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে এই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে আমি অশেপাশের মানুষদের কৌতৃহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছি। বেশ কয়েকজন আমাকে ডিজ্জেস করলেন, কি হয়েছে? এখনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিজ্জহেন কেন? আমি তাঁদের সবাইকে বলেছি, আমাকে নিয়ে মাথা ঘাঘাবেন না। আমি একজন পাগল মানুষ।

মেয়েটির বাড়ি থেকেও হয়তো টেলিফোনে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা কাউকে কাউকে জানানো হয়েছে। তিনটি গাড়ি তাদের বাড়িতে এলো। গাড়ির আরোহীরা রাগী ভঙ্গিতে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন।

রাত নটা বাজলো। বৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্মাও থামলো না। ঝুরে তখন আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। দারোয়ান এসে আমাকে ফিসফিস করে বললো, সাহেব পুলিশ আনতে চাইতেছে, বড় আফা রাজি না। বড় আফা আপনের অবস্থা দেইখ্যা খুব কানতাছে। টাইট হইয়া বইয়া থাকেন।

আমি টাইট হয়ে বসে রইলাম।

রাত এগারোটা বাজলো। ওদের বাড়ির বারান্দায় বাতি জ্বলে উঠলো। বসাব ঘরের দরজা খুলে মেয়েটি বের হয়ে এলো। মেয়েটির পেছনে পেছনে ওদের বাড়ির সব কংজন মানুষ। ওরা কেউ বারান্দা থেকে নামলো না। মেয়েটি একা এগিয়ে এলো। আমার সামনে এসে দাঁড়ালো এবং অসম্ভব কোমল গলায় বললো, কেন এমন পাগলামি করছেন?

আমি হতভস্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কারণ এই মেয়ে সেই মেয়ে নয়। অন্য একটি মেয়ে। একে আমি কোনোদিন দেখিনি। মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভার আমাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে। হয়তো ইচ্ছা করেই দিয়েছে।

মেয়েটি নরম গলায় বললো, আসুন, ভেতরে আসুন। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। আসুন তো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বলতে চেষ্টা করলাম, কিছু মনে করবেন না। আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনি সেই মেয়ে নন। আপনি অন্য একজন। মেয়েটির মমতায় ঝুঁকানো চোখের দিকে তাকিয়ে এই কথা বলা সন্তুষ্ট হলো না। এতো মমতা নিয়ে কোনো নারী আমার দিকে তাকায়নি।

জ্বরের ঘোরে আমি ঠিকমতো পা ফেলতে পারছিলাম না। মেয়েটি বললো, আপনার বোধহয় শরীর ধারাপ। আপনি আমার হাত ধরে হাঁটুন। কোনো অসুবিধা নেই।

বাসার সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কঠিন চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সবার কঠিন দৃষ্টি উপক্ষে করে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিলো। মেয়েটির ভালোবাসায় হাত বাড়ালো সে ভালোবাসাকে উপক্ষে করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেননি। আমি তার হাত ধরলাম। এই কূড়ি বছর ধরেই ধরে আছি। মাঝে মাঝে এক ধরনের অহিংসা বোধ করি। ভ্রান্তির এই গল্প আমার স্ত্রীকে বলতে ইচ্ছা করে। বলতে পারি না। তখন আপনার মতো অপরিচিত একজন কাউকে খুঁজে বের করি। গল্পটা বলি। কারণ আমি জানি — এই গল্প কোনোদিন আমার স্ত্রীর কানে পৌছাবে না। আচ্ছা ভাই, উঠি। আমার টেন এসে গেলো।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। দূরে টেনের আলো দেখা যাচ্ছে। রেল লাইনে ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে। টেন সত্ত্ব সত্ত্ব এসে গেলো।



বুড়ি

রাত দুপুরে কু-কু পো-পো শব্দ।

সবে শুয়েছি, ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে — বিচিত্র শব্দে উঠে বসলাম, ব্যাপারটা কি? আমেরিকায় নতুন এসেছি। এদের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে এখনো তেমন পরিচয় হয়নি। কখনে কখনে চমকে উঠতে হয়।

এখন যেখানে আছি তার আমেরিকান নাম কুমিং হাউস। পায়রার খোপের মত ছেটু একটা ঘর। সেই ঘরে সোফা-কাম-বেড, পড়ার টেবিল। টেবিলের একপাশে একটা এফ.এম. রেডিও। এই হল আমার ঘরের সাঞ্জসজ্জা। ভাড়া পঞ্চাশ ডলার — জলের দাম বলা চলে। আমেরিকান এক দম্পত্তি তাদের বসতবাড়ি মোতলার সব কটা ঘর ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। দরিদ্র বিদেশী ছাত্ররা এইসব ঘরে থাকে। কমন বাথরুম। রাঙ্গাঘর নেই। খেতে হয় বাইরে। সিগারেট খাওয়া যায় না, ল্যান্ড লেডি ঘর ভাড়া দেয়ার সময় কঠিন গলায় এই তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। উচু ভল্যুমে স্টেরিও শোনাও নিষিদ্ধ। নানান বায়নাঙ্ক। তবুও এখানে উঠে এসেছি। কারণ — সন্তা ঘর ভাড়া, তাছাড়া জায়গাটা ইউনিভার্সিটির খুব কাছে। ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিচ। নর্থ ডেকোটার এই প্রচণ্ড শীতে দূর থেকে ফ্লাস করতে আসা সন্তব নয়। একটা গাড়ি কিনে নেব সেও দূরাশ। দুপুরে ইউনিভার্সিটি মেমোরিয়েল ইউনিয়নে খেয়ে নেই। সংজ্ঞায় যখন ঘরে ফিরি সঙ্গে থাকে একটা হ্যামবার্গার। এই খেয়ে রাত পার করি।

কুমিং হাউসে উঠে এসেছি পনেরো দিন হল। কারো সঙ্গে তেমন পরিচয় হয়নি। আমার পাশের রুমে আছে ভাবতীয় ছাত্র অনন্ত নাগ। সে আমাকে দেখলেই ‘আবে ইয়ার’ বলে একটা চিৎকার দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। কথাবার্তা এই পর্যন্ত। কোণার দিকের ঘরে থাকে কোরিয়ান ছাত্র ‘হান’। সে ইংরেজী একেবারেই জানে না। আমাকে একদিন এসে বলল — ‘হেড পেইন মার্ডার, মার্ডার’। অনেকক্ষণ পরে বুঝলাম — সে বলার চেষ্টা করছে মাঝার যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছি। তার সঙ্গে ভাষার কারণেই ভাব হবার কথা নয়। আমার ঠিক শুধোমূল্য ঘরে থাকে ফিলিপিনো মেয়ে তোহা। তেইশ-চক্রিশ বছর বয়স, অত্যন্ত কৃপ্যবৃত্তি। এই মেয়েটির ভাবভঙ্গি বিচিত্র। সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। প্রায়ই গভীর রাতে ফুপিয়ে কাঁদে। পঞ্চম বোর্ডার এক আমেরিকান বুড়ি নাম এলিজাবেথ। শুক্রতেই আমাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল — আমেরিকান বুড়িদের কাছ থেকে যেন শত হস্ত দুর্ঘটনাক। আমেরিকান সমাজে বুড়োবুড়ির কোন স্থান নেই। তারা খুবই নিঃসন্ত্র। কাজেই কথা বলার কাউকে পেলে বুড়োবুড়িরা তার জীবন অঙ্গিষ্ঠ করে দেয়। অনন্ত নাগ আমাকে বলে দিয়েছে — এই বুড়িকে পাঞ্চ দেবে না। পাঞ্চ দিয়েছ কি মরেছ। সিস্টেমেও ভূতের মত কাঁধে চেপে বসবে, আর নামাতে পারবে না।

বুড়ি কয়েকবাবই আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে, আমি অনন্ত নাগের উপদেশ মনে রেখে শুকনো গলায় বলেছি — এখন তো কথা বলতে পারব না, পড়াশোনা করছি। বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, ‘আচ্ছা আচ্ছা, পরে কথা হবে। এক জাহাজের যাত্রী, দেখা তো হবেই . . . হা—হা—হা। বরং এক কাজ করো, তোমার লেখাপড়ার চাপ যখন কম থাকবে আমার ঘরে চলে এসো। গল্প করব?’

আমি এখনো তাব ঘরে যাইনি। ঘাবার উৎসাহ বোধ করিনি।

এখন এই মধ্যরাতে বিছানায় ষেগে বসে আছি — শুনছি বিচিত্র কো-কো শব্দ। যেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। পরদিন ভোরে মিডটার্ম পরীক্ষা। ভাল ঘূর দরকার। এ-কি যত্নণা। শব্দের উৎসের সংজ্ঞানে দরজা খুলে বাইরে বের হলাম। দেখা হল অনন্ত নাগের সঙ্গে। দেও বিরক্ত মুখে বের হৰেছে। আমি বললাম, কিসের শব্দ?

অনন্ত শুকনো গলায় বলল, ‘ব্যাগ পাইপ।’

‘ব্যাগ পাইপটা কি?’

‘এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। আইরিশরা বাজায়। ফুসফুসের মারাত্মক জ্বর লাগে।’

‘বাজাছে কে?’

‘এলিজাবেথ। কি যত্নণা বল তো দেখি। তুমি কি বুড়িকে বলে আসবে — এখন মিডনাইট। বুড়ির কোন রাইট নেই মিডনাইটে আমাদের বিরক্ত করার।’

আমি এলিজাবেথের ঘরের দিকে এগুলাম। দরজা হাটি করে খোলা। বুড়ি বিছানায় পা তুলে ব্যাগ পাইপ নিয়ে বসে আছে। এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতে ফুসফুসের প্রচণ্ড জ্বর লাগার কথা। আশি বছরের বুড়ি এই জ্বর কোথায় পেল কে জানে?

আমাকে দেখেই বুড়ি হাসিমুখে উঠে এল — আহমাদ, ওয়েলকাম।

প্রথমেই অভ্যন্তর হওয়া যায় না। আমি বললাম, কেমন আছ?

‘ভাল। খুব ভাল। গ্যারাঞ্জ সেল থেকে একটা ব্যাগ পাইপ কিনে ফেললাম। একেবারে ব্রাণ্ড নিউ। মাত্র কুড়ি ডলারে দিয়ে দিল। চমৎকার না জিনিসটা?’

‘ইঠা, চমৎকার।’

‘অনেকদিন থেকেই শখ ছিল একটা বাদ্যযন্ত্র বাজান শিখব তাই . . .’

‘ব্যাগ পাইপ বাজান তো খুব কঠিন। শুনেছি ফুসফুসের খুব জ্বর লাগে।’

‘তা লাগে। প্রথমে বাতাস ভরাটাই কষ। একবার ভরা হয়ে গেলে মেরোঝাটি সহজ বলা চলে। তুমি বস না — দাঁড়িয়ে আছ কেন?’

‘আমি অন্য একদিন এসে বসব। কাল আমার একটা পরীক্ষা মিডটার্ম। আমার ঘূর দরকার।’

‘অফকোর্স। আমার বাদ্যযন্ত্রে তোমার ঘূমের অসুবিধা করলাম কি?’

‘কিছুটা করেছে।’

‘স্যারি। এক্সট্ৰিমলি সরি। আৱ বাজাৰ না। আমি সিচ্ছিস্ত হয়ে মুমাও। জাস্ট এ মিনিট, তোমাকে এক যগ হট কোকা বানিয়ে দিছি। হট কোকাৰ মত ঘূমের অমুখ হয় না।’

‘তোমাকে ধন্যবাদ, হট কোকা খেতে ইচ্ছা কৰছে মা।’

‘না বললে হবে না। আমার কথা শোন, খেয়ে দেখ। যৰার মত ঘূমুবে। হাসবেশের মৃত্যুৰ

পর আমার অনিদ্রা রোগ হল। সারারাত জেগে থাকি, ঘুম আসে না। তখন এই অশুধটা আবিষ্কার করলাম।'

আমি লক্ষ্য করলাম কথা বলতে বলতে বুড়ি হিটিং কয়েল দিয়ে পানি গরম করে ফেলেছে। কোকা প্রস্তুত।

আমাকে খেতে হল। খেতে খেতে বুড়ির গল্প শুনতে হল। তার চার ছেলে-মেয়ে। একেক জন একেক জ্ঞান্যায়। গত দশ বছর ধরে কারো সঙ্গে দেখা নেই। তবে যোগাযোগ আছে। ওরা চিঠি লেখে, ছবি পাঠায়।

'আহমাদ, তুমি আমার নাতী-নাতনিদের ছবি দেখবে ?'

'আজ থাক, অন্য একদিন দেখব।'

'আচ্ছা থাক। তুমি আরাম করে ঘুমাও। গরম কোকা খেয়েছ — চমৎকার ঘুম হবে। দেখবে এক ঘূর্মে রাত কাভার।'

গরম কোকা খাওয়ার কারণেই হয়ত সেই রাতে এক ফোঁটা ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কটিলাম। ভোরবেলা বাথরুমে যাইছি, এলিঙ্গাবেথের সঙ্গে দেখা। সে হাসিমুখে বলল, কেমন ঘুম হল বল তো? আমি বিরক্তি চেপে রেখে বললাম, ভালই।

বুড়ি উন্নসিত গলায় কলল, বলেছি না চমৎকার ঘুম হবে। কি, কথা ঠিক হল?

কুমিং হাউসের বুড়ি আমাদের খুব বিরক্ত করতে লাগল।

জানা গেল সে ডাকযোগে ব্যাগ পাইপ বাজান শিখছে। ডাকযোগে বাইবেল শেখা যায় জানি, কিন্তু বাদ্যযন্ত্র বাজানও যে শেখা যায় জানতাম না। এই বিচির দেশে সবই সম্ভব।

কিছুদিন পরপরই শাবরাতে কোঁ-কোঁ পো-পো শব্দ হতে থাকে। তিক্ক-বিরক্তি অবস্থা। একদিন অনন্ত নাগ খুব চিৎকার-চোমেচি করে এল —

'তুমি বাজনা শিখছ ভাল কথা। দুপুর রাতে কেন? দিনে শিখতে পার না? দিনে আমরা কেউ থাকি না — ঘর থাকে ফাঁকা।'

'দিনে আমার নানান কাজকর্ম থাকে।'

'তোমার আবার কিসের কাজকর্ম? তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াও।'

'এটাই আমার কাজ।'

'খুব ভাল কথা। রাতে যখন তোমার ঐ যন্ত্র বাজাও — দরজাটা বন্ধ করে রাখতে পার না?'

'এই বাদ্যযন্ত্র ফাঁকা জ্ঞান্যায় বাজাতে হয়। ইনস্ট্রুকশানে লেখা আছে। বিশ্বাস না করলে পড়ে দেখতে পার।'

'তোমার নামে বাড়িওয়ালার কাছে আমরা নালিশ করব।'

'করতে চাইলে কর। তাতে লাভ হবে না। বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমার যে লীজ এগ্রিমেন্ট হয়েছে সেখানে লেখা নেই যে, ব্যাগ পাইপ বাজান যাবে না।'

'তুমি অতি নিম্নশ্রেণীর একটি প্রশা!'

'চিঃ ছিঃ এমন কথা বলবে না। আচ্ছা যাও, আর বাজাব না।'

কয়েকদিন সভিয় সভিয় বাজনা বন্ধ থাকে, আবার শুরু হয়। রাগে দাত কিড়মিড় করি। কিন্তু বুড়ি সদাহাস্যময়ী। দেখা হলে একগাদা কথা বলবেই —

‘আমার নাতনি এ্যানীর দাত উঠেছে। ছবি পাঠিয়েছে। দেখবে? কি যে সুন্দর। এঝেলের মত লাগে। আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে তার মত সুন্দর বাচ্চা জন্মায়নি। সামাবে তাকে দেখতে যাব। ছেলেকে লিখেছি টিকিট পাঠাতে। ও টিকিট না পাঠালে যেতে পাবব না। ও লিখেছে পাঠাবে।

ছেলে টিকিট পাঠায় না। বুড়ির ঘাওয়া হয় না। আমেরিকার অসংখ্য হতদিন বুড়িদের মে একজন। সোস্যাল সিকিউরিটির টাকায় কোনজৰু বেঁচে আছে। বাড়ি ভাড়া, খাবার খবচ এবং মেডিকেল ইন্সুয়ারেন্স দিয়ে বুড়ির কাছে কিছুই থাকে না। এর মধ্যে তার আবার পাঠি বাতিক আছে। সন্তা ধরনেব কয়েক বোতল মদ কিনে সে প্রায়ই পাঠি লাগিয়ে দেয় ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে দেখি দরজাব গায়ে নোট খুলছে। নোটে প্র্যাচান হরফে লেখা—

প্রিয় বন্ধু,

আজকের দিনটি আমার জীবনের বিশেষ দিন। এই দিনে আমার স্বামী ববের সঙ্গে প্রথম দেখা। এই দিনেই আমরা প্রথম একসঙ্গে ডিনার করি এবং বব আমাকে বলে — I love you. বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করে রাখার জন্যে ছোট্ট একটা পাঠির আয়োজন করেছি। আয়োজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তুমি আসবে।

পাঠিতে যেতে ইচ্ছ করে না। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। বুড়ি দশ মিনিট পরপর এসে বলবে, কই এখনো এলে না। সবাই এসে গেছে শুধু তোমার জন্য অপেক্ষা। আমি যাবার পর দেখি — আমিই শুধু এসেছি আর কেউ আসেনি। বুড়ি এক কথা সবাইকে বলে বলে আসছে।

ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। টেবিলে কিছু পটেটো চিপস, চিনাবাদাম, কাঞ্চুবাদাম এবং দু'বোতল রেড ওয়াইন—যার দাম বড়জোর ছ’ থেকে সাত ডলার।

ঠোটে টকটকে লাল রঙ মেখে বুড়ি হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার আনন্দের সীমা নেই। পাঠিতে লোক বলতে আমরা কঞ্জন। বাড়িওয়ালা-বাড়িওয়ালী কখনো আসে না। বুড়ির বাইরের কোন বক্ষ্যাঙ্গবও নেই। আমাদেরই সে বোধহয় ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ ঘরে নিয়েছে।

পাঠির মধ্যমণি হয়ে লাল মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বুড়ি এবং তার কাছে যায়। উজ্জ্বল চোখে বলে, জীবন বড় আনন্দময়, কি বল?

আমরা বিবস মুখে বলি, হ্যাঁ।

‘বড় সুন্দর পাঠি হল। অসাধারণ।’

‘হ্যাঁ — অসাধারণ।’

‘আমার মনে হচ্ছে, আমি আমার ইয়ুথে ফিরে গেছি।’

‘শুবই ভাল কথা — ফিরে যাও।’

এলিজাবেথ তার ঘোবনে ফিরে যাবার ব্যবস্থা এত ঘনঘন করতে লাগল যে, আমরা তিক্ত-বিবর্ত হয়ে গেলাম। পাঠিতে ঘাওয়া বক্ষ। সে এসে করুণ গলায় বলে, আজ আমার এমন একটা বিশেষ দিন আর তোমরা কেউ আসবে না?

'পড়াশোনার খুব চাপ।'

'আজ দিনটি আমার জন্য খুবই স্পেশাল। আজ বব আমাকে প্রপোজ করবেছিল। ষাট বছব আগের কথা অখচ মনে হয় সোদিন . . . '

'পীজ, আজ যেতে পারব না। এ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে।'

'ঘণ্টাধানিকের জন্যে এসো।'

'অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব।'

বুড়ি একা একাই পার্টি করে এবং এক সময় ভয়াবহ ব্যাগ পাইপ বেজে উঠে। আমাদের কাউকে—না—কাউকে ছুটে যেতে হয়। আমাদের কাছে অসহ্য বোধ হয়।। একি যন্ত্রণা !

যাই হোক, শীতের শুরুতে যন্ত্রণার অবসান হল। জানা গেল, টাকা-পয়সার অভাবে এলিজাবেথ তার ব্যাগ পাইপ বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা স্বত্ত্বির নিঃশ্বাস ফেললাম। বাঁচা গেল, এখন আর মাঝবাতে ঘূম ভেঙে ছুটে যেতে হবে না।

এক বিকেলের কথা। অনন্তের কাছে শুনলাম বুড়ি হঠাতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। অবস্থা খুব ভাল নয়। মনটা একটু খারাপই হল। সেন্ট জোসেফ হাসপাতালে বুড়িকে দেখতে গেলাম। বুড়ি মহাশুশি। উজ্জ্বল চোখে বলল, কার্ড, কার্ড এনেছে?

অসুস্থ কাউকে দেখতে হলে কার্ড নিয়ে যাওয়ার নিয়ম আছে। আমি গেট ওয়েল কার্ড নিতে ভুলে গেছি।

এলিজাবেথ বলল, আমি কার্ডগুলি জমাছি। তুমি পরেরবার আসার সময় কার্ড নিয়ে এসো।

'আচ্ছা, আনব।'

'এই দেখ হান কি সুন্দর কার্ড দিয়েছে। এই কাউটা দিয়েছে 'তোহা', আহা মেয়েটা বড় ভাল। অনন্ত কি করছে দেখ — শুধু যে কার্ড দিয়েছে তাই না, ফুলও নিয়ে এসেছে। বেচারার টাকা-পয়সা নেই — এর মধ্যে এত ব্রচ। আমি খুব রাগ করেছি।'

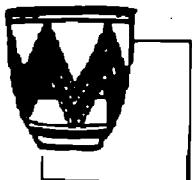
বুড়ির আনন্দ দেখে বড় ভাল লাগল। ভিজিটিং আওয়ারের শেষে বের হচ্ছি — বুড়ি গলার স্বর নামিয়ে বলল, তোমাদের কাছে আমার একটা কমা প্রার্থনা করার ব্যাপার আছে।

আমি আগ্রহ নিয়ে তাকালাম। বুড়ি লাঞ্জুক গলায় বলল, ব্যাগ পাইপ কেন বজায়াম জান? একা একা থাকতে এত খারাপ লাগত। কুৎসিত বাজনাটা বাজালেই তেমরা কেউ না কেউ আসতে — খানিকক্ষণ কথা বলতে পারতাম। স্যরি, তোমাদের কষ্ট বিদ্যুচ্ছি।

আমার মনটা অসম্ভব খারাপ হল। কোন কথা বলতে পারলাম না।

বুড়ি দুর্মাস রোগ ভোগ করে সুস্থ হল। তার বাড়ি ফেরা উপলক্ষ্যে আমরা ছেট্ট একটা পার্টির ব্যবস্থা করলাম। শুধু পাটিই না — বুড়ির জন্যে সামন্য উপহারও আছে — নতুন একটা ব্যাগ পাইপ। আমরা সবাই চাঁদা করে কিনেছি।

আমেরিকানরা কাঁদতে পারে না—এই কথা যে বলে সে (মাস্টার) অনন্ত নাগ যখন ব্যাগ পাইপ বুড়ির হাতে ভুলে দিল — বুড়ি অবাক হয়ে আমাদের স্বার দিকে খনিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর শিশুদের ঘত চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। কান্নার এমন ঘন্থুর দৃশ্য আমি আমার জীবনে খুব বেশি দেখিনি।



একটি নীল বোতাম

বারান্দায় এশার বাবা বসেছিলেন।

হাঁটু পর্যন্ত তেলা লুঙ্গি, গায়ে নীল রঞ্জের গেঁজী। এই জিনিস কোথায় পাওয়া যায় কে জানে? কি সুন্দর মানিশেছে তাকে। ভদ্রলোকের গায়ের রঙ ধৰণবে শাদা। আকাশী রঞ্জের গেঁজীতে তাঁর গায়ের রঙ ফুটে বেকচে। সব মিলিয়ে সুখী-সুখী একটা ছবি। নীল রঞ্জটাই বোধহয় সুখের। কিন্তু কে জানে ভদ্রলোকের চেহারাটাই বোধহয় সুখী-সুখী। কালো রঞ্জের গেঁজীতেও তাকে হয়ত সুখী দেখাবে।

তিনি আমাকে দেখতে পাননি। আমি ইচ্ছা করেই গেটে একটু শব্দ করলাম। তিনি আমাকে দেখলেন। সুন্দর করে হাসলেন। ভরাটি গলায় বললেন, আরে রঞ্জ, তুমি? কি খবর? ভাল আছ?

হ্বি ভাল।

গরম কি রকম পড়ছে বল দেবি?

শুধু গরম।

আমার তো ইচ্ছা করছে চৌবাচ্চায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকি।

তিনি তাঁর পাশের চেয়ারে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। হাসি-হাসি মুখে বললেন, বসো। তোমার কাছ থেকে দেশের খবরা-খবর কিছু শুনি।

আমার কাছে কোন খবরা-খবর নেই চাচা।

না থাকলে বানিয়ে বানিয়ে বল। বর্তমানে চালু গুজ্জব কি?

আমি বসলায় তাঁর পাশে। এশার বাবার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। মাঝে মাঝে এ-বাড়িতে এসে শুনি এশা নেই — মামার বাড়ি গেছে। রাতে ফিরবে না। তাঁর মামার বাড়ি ধানমন্ডিতে। প্রায়ই সে সেখানে যায়। আমার খানিকটা ঘন খারাপ হয়। কিন্তু এশার বাবার সঙ্গে কথা বললে আমার ঘন-খারাপ ভাবটা কেটে যায়।

এই যে এখন বসলায় উনার পাশে — এখন যদি শুনি এশা বাসায় নেই মামার বাড়ি গিয়েছে — অমার শুধু খারাপ লাগবে না।

তারপর রঞ্জ নতুন কোন গুজ্জবের কথা তাহলে জান না?

হ্বি না।

বল কি তুমি? শহর ভর্তি গুজ্জব। আমি তো ঘরে বসে কৃতি কি শুনি। চা খাবে?

হ্বি না।

খাও এক কাপ। তোমার সঙ্গে আমিও খাব। সুধি আরাম করে বস। আমি চায়ের কথা বলে আসি।

আপনাকে বলতে হবে না, আমি বলে আসছি। এশা কি বাসায় নেই?

আছে। বাসাতেই আছে।

বলেই তিনি চায়ের কথা বলতে উঠে গেলেন। কি চমৎকার তঁর এই ভূজ্ঞ। আমি কে? কেউ না। অতি সামান্য একজন। একটা অ্যাড ফার্মে কাজ করি। অল্প যে কটা টাকা পাই তাব প্রতিটিব হিসাব আমাব আছে। আৱ তঁৰা? আমাৰ ধাৰণা, এদেৱ গেটে দাঁড়িয়ে থাকা দারোঝান আমাৰ চেয়ে বেশি টাকা পায়। নিতান্ত ভাগ্যক্রমে এন্দেৱ এক আত্মীয়েৰ সঙ্গে এ-বাড়িতে এসেছিলাম। প্ৰথমদিনেই এশাৰ কি সহজ সুন্দৰ ব্যবহাৰ যেন সে অনেকদিন থেকেই আমাকে চেনে। সেদিন কেমন হাসিমুখে বলল, আপনি তো বেশ লম্বা। আসুন একটা কাজ কৰে দিন। চেয়াৱে দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে খুব উচুতে একটা পেৰেক লাগিয়ে দিন।

আমি বললাম, এত উচুতে পেৰেক দিয়ে কি কৰবেন?

আজ বলব না। আৱেকদিন এসে দেখে যাবেন।

দ্বিতীয়বাৰ এ বাড়িতে আসাৰ কি চমৎকার অভূহাত তৈৱী হল। অথচ অভূহাতেৰ কোন প্ৰয়োজন ছিল না। এদেৱ বাড়ি — দূয়াৰখোলা বাড়ি। যে কেউ যে কোন সময় আসতে পাৱে। কোন বাখা নেই। অথচ মনে আছে দ্বিতীয়বাৰ কত ভয়ে ভয়ে এসেছি। শেষ খুলে ভেতৱে ঢোকাৰ সাহস হয়নি। যদি আমাকে কেউ চিনতে না পাৱে। যদি এশা বিশ্বিত হয়ে বলে, আপনি কাকে চান?

সে রকম কিছুই হল না। এশাৰ বাবা আমাকে দেখে হাসি মুখে বললেন, কি ব্যাপার রঞ্জ, গেটেৰ পাশে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আস, ভেতৱে আস।

আমি খানিকটা বিৰুত ভঙ্গিতেই তুকলাম। তিনি হাসিমুখে বললেন, দেশেৰ অবৰা-অবৰ বল। নতুন কি গুজ্বব শুনলে?

এশা বোধহয় বাইৱে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, বেছে বেছে আজকেৰ দিনতিতেই আপনি এলেন? এখন বেৰুচি। আপনাৰ সঙ্গে কথা বলতে পাৰব না। চট কৰে আসুন তো, পেৰেকটা কি কাজে লাগছে দেখে যান।

আমি ইতস্ততঃ কৰছি। এশাৰ বাবাৰ সামনে থেকে উঠে যাব, উনি কি মনে কৰেন কে জানে। উনি কিছুই মনে কৰলেন না। সুখী-সুখী গলায় বললেন, যাও দেখে আস। জিনিসটা ইটাৱেষ্টিৎ।

পেৰেক থেকে হলুদ দড়িৰ মত একটা জিনিস মেঘে পৰ্যন্ত নেমে এসেছে। এশা যাতি নিভিষে একটা সুইচ টিপতেই অভূত ব্যাপার হল। হলুদ দড়ি আলোয় বিকৰিমুক্ত কৰতে লাগল। সেই আলো স্থিৰ নয়। যেন গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নামছে। আলোৰ অৰপ্প।

অপূৰ্ব!

কি, অবাক হয়েছেন তো?

ইয়া হয়েছি।

এ রকম অভূত জিনিস এৱ আগে কখনো দেখেছেন?

ছি না।

আমাৰ বড় বোন পাঠিয়েছেন। নেদাৱল্যাণ্ড থার্মিয়াল মিলি, তিমি। এখন যান। বসে বসে বাবাৰ গল্প শুনুন। বাবা কি অপনাকে তাৱ কঢ়স্পেৰ গল্পটি বলেছে?

ছি না।

তাহলে হয়ত আজ বলবে। বাবাৰ গল্প কলাৰ একটা প্যাটার্ন আছে। কোনটিৰ পৰ

কোন গল্প আসবে আমি সব জানি ।

এশা হাসল। কি সুন্দর হাসি। আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম — না জানি কোন ভাগ্যবান পুরুষ এই ঘেঁষেটিকে সাবা জীবন তাৰ পাশে পাৰে।

এশাৰ বাবা সেদিন কচ্ছপের গল্প বললেন না। পৱেৰ বাৰ ষেদিন পেলাম সেদিন বললেন।

কচ্ছপ কোৰায় ডিম পাড়ে জান তো রঞ্জু? ডাঙ্গায়। সে নিজে থাকে কিন্তু পানিতে। চলাফেৱা, জীবনযাত্ৰা সবই পানিতে অথচ তাৰ মন পড়ে থাকে তাৰ ডিমেৰ কাছে ডাঙ্গায়। ঠিক না?

ছি ঠিক।

বুড়ো বয়সে মানুষৰও এই অবস্থা হয়। সে বাস কৱে পৃথিবীতে কিন্তু তাৰ মন পড়ে থাকে পৱকালে। আমাৰ হয়েছে এই দশা।

এই পরিবাৰটিব সঙ্গে পৱিচয় হবাৰ পৰ আমাৰ মধ্যে বড় ধৰনেৰ কিছু পৱিবৰ্তন হল। আগে বক্ষুদেৱ সঙ্গে চাষৰে দোকানে ষণ্টাৰ পৰ ষণ্টা আজ্জা দিতে চমৎকাৰ লাগতো। এখন আৱ লাগে না। এক সময় ঘেঁয়েদেৱ নিয়ে কেউ কোন কুঁসিত কথা বললে বেশ মজ্জা পেতাম। এখন ভয়ৎকৰ রাগ লাগে। মনে হয় এই কুঁসিত কথাটি কোন না কোন ভাবে এশাকে স্পৰ্শ কৱছে। যে খুপড়ি ঘৱটায় থাকি সেই ঘৱ আমাৰ আৱ এখন ভাল লাগেনা। দম বক্ষ হয়ে আসে। নোনাধাৰা বিশ্বী দেয়াল। একটি ছোট জানলা যা দিয়ে আলো—বাতাস আসে না রাতেৰ বেলা শুধু মশা ঢুকে। চৈত্ৰ মাসেৰ গৱমে অনেক রাত পৰ্যন্ত জেগে থাকি। নানান রকম কল্পনা মাথায় আসে। কল্পনায় আমাৰ এই ঘৱ হয়ে যায় পদ্মানন্দীৰ নৌকায় একটা ঘৱ। জ্বানালা খুললেই নদী দেখা যায়। সেই নদীতে জোছনা হয়েছে। চাঁদেৰ আলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। ঘৱেৰ দৱজ্জায় টোকা পড়ে। আমি জ্বানি কে টোকা দিচ্ছে। তবু কঁপা গলায় বলি, কে? এশা বলে, কে আবাৰ? আমি। এৱকম চমৎকাৰ রাতে আপনি ঘৱটোৱ বক্ষ কৱে বসে আছেন। পাগল নাকি? আসুন তো।

কোথায় যাব?

কোথায় আবাৰ, নৌকাৰ ছাদে বসে থাকব।

আমোৱা নৌকাৰ ছাদে গিয়ে বসি। মাঝি লোকা ছেড়ে দেয়। এশা শুনগুল কল্পনায়, যদি আমায় পড়ে তাহাৰ মনে, বসন্তেৰ এই মাতাল সৰীৱণে। আজ জোছনাৰ্বাতে স্বাই গেছে বনে।

সবই খুব সুন্দৰ সুখেৰ কল্পনা। তবু এক এক রাতে কটে জোছে ঝল আসে। সারারাত জেগে বেসে থাকি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবি, আমাৰ এই জীৱনটা আমি কি কিছুতেই বদলাতে পাৰি না?

বক্ষ—বাক্ষৰ স্বাইকে অবাক কৱে এক সক্ষায় জীৱনটা কলেজেৰ নাইট সেকশানেৰ এম.এ ক্লাসে ভৱি হয়ে যাই। ধাৰ—টাৰ কৱে আমাটো ঘৱেৰ জন্মে নতুন পৰ্দা, বিছানাৰ নতুন চাদৰ, নেটেৰ মশাবী কিনে ফেলি। অনেক ঘোৰণায় কৱে একটা ফুলদানী কিনি। একশ' টাকা লেগে যায় ফুলদানীতে। তা লাগুক, তবু তো একটা সুন্দৰ জিনিস। একশুচ রঞ্জীনগঞ্জা যখন এখনে রাখব তখন হয়ত এই ঘৱেৰ চেহাৰাও পাল্লে যাবে। আমাৰ এক আটিষ্ট বক্ষৰ কাছ

থেকে একদিন প্রায় জ্বর করে জলবসা একটা ছবিও নিয়ে আসি। নোনাধরা দেয়ালে সেই
ছবি মানায় না। নিজেই চুন এনে দেয়ালে চুক্তাম কবি।

চুন দেয়ালে আটকায় না, ঘরে ঘরে পড়ে। তবু আমার ঘর দেখে বস্তুরা চোখ কপালে
ঢূলে।

করছিস কি তুই? ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছিস দেখি। আবার দেখি খুশবুও আসছে।
বিছনায় আতর ঢেলে দিয়েছিস নাকি?

মাই গড়। মেয়ে মানুষ ছড়া এই ঘর মানায় না। এক কাজ কর একশ টাকা দিয়ে একটা
মেয়ে মানুষ এক রাতের জন্যে নিয়ে আয়। ফুর্তি কর। আমরা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি।

রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। কিছু বলি না। কি হবে বলে। আমার বস্তুরা গভীর
মাত পর্যন্ত আজ্ঞা দেয়। সিগারেটের টুকরা দিয়ে মেঝে প্রায় ঢেকে ফেলে। একজন আমার
মতুন কেনা বিছনায় চায়ের কাপ উল্টে দিয়ে বলে, যা শালা, চাঁদে ক্লক্ক লেগে গেল।

আমি কিছু বলি না। দাঁতে দাঁত চেপে থাকি। আর মনে মনে ভাবি — এই মৃৎদের সঙ্গে
কি করে এতদিন কাটিয়েছি। কি করে এদের সহ্য করেছি?

ইরফান বলল, প্রেম ক্ষেম করেছিস কিনা বল। তোর হাবভাব যেন কেমন রঙিলা।

আমি জবাব দেই না। ইরফান পান-খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে,
জিনিস কেমন বল। টিপে-টুপে দেখেছিস তো?

সবাই হো হো করে হাসে। কোন অঙ্ককার-নরকে এরা পড়ে আছে? এদের কি কোনদিন
মৃত্তি ঘটবে না? আমার ইচ্ছা করে এশাকে একদিন ওদের সামনে উপস্থিত করি। সেটা
নিশ্চয়ই খুব অসম্ভব নয়। বললেই সে আসবে। তবে আমার বলতে সাহস করে না।

প্রথম যেদিন তাকে তুমি বললাম কি প্রচণ্ড ভয়ে ভয়েই না বললাম। সে গোলাপ গাছের
ডাল ছেঁটে দিচ্ছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ কি হল নিজের অঙ্গাণ্ডেই বলে
ফেললাম, কাঁচিটা আমার হাতে দাও, আমি ছেঁটে দি। বলেই মনে হল — এ কি করলাম
আমি? আমার মাথা যিম যিম করতে লাগল। আমার মনে হল সে এবার চোখে চোখে
তাকিয়ে শীতল গলায় বলবে, আমাকে তুমি করে বলবেন না। এত ঘনিষ্ঠতা তো আপনার
সঙ্গে আমার নেই।

এশা সে রকম কিছুই বলল না। কাঁচি আমার হাতে দিয়ে বলল, তিনি কেমন করে
কাটবেন। এর বেশী না। আর আপনি কি চা খাবেন?

ইয়া খাব।

চা নিয়ে আসছি। শুনুন, এ রকম কচকচ করে কাটবেন না, ওয়া যথা পায়। গাছেরও
জীবন আছে। জগদীশ চন্দ্র বসুর কথা।

এশা ঘরে ঢুকে গেল। চৈত্র ঘাসের বিকেলে আমি গোলাপ ছাঁচতে লাগলাম। আমার ত্রিশ
বছর জীবনের সেটা ছিল শ্রেষ্ঠতম দিন। বিকালটাই মেন কেন্দ্রে অন্যরকম হয়ে গেল। শেষ
বিকেলের বেদকে মনে হল লক্ষ লক্ষ গোলাপ, গুল্ম কি মধুর। এশার বাবা যখন বাইরে
এসে বললেন, তারপর রঞ্জ দেশের খবর কি বল? মতুন কি গুজুব শুনলে?

কি যে ভাল লাগল সেই কথাগুলি! মনে হল এরকম সুন্দর কথা এর আগে আমাকে
কেউ বলে নি।

গোলাপের ভাল ছাঁচি মনে হচ্ছে।

ছি চাচ।

এর একটা ফিলসফিক আসপেক্ট আছে। সেটা লক্ষ্য কবেছ? ফুল ফোটাবাব জন্যে গাছকে কষ্ট দিতে হচ্ছে। হ্য হা হা।

তাঁর সঙ্গে প্রলা ঘিনিয়ে আমিও হাসলাম। এশা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল, এত হাসাহাসি হচ্ছে কেন? আমি কি যোগ দিতে পারি?

ওদের বাড়ি থেকে ফিরলাম সন্ধ্যার পর। এশা প্রেট পর্যন্ত এল। হাসিমুর্খে বলল, আবার আসবেন।

এই কথাটি কি পৃথিবীর মধ্যরত্ন কথার একটি নয়? আমি আবার আসতে পারি এ বাড়িতে। যতবার ইচ্ছা আসতে পারি। আমাকে কোন অভ্যহাত তৈরী করতে হবে না। তবুও ছেটখাট কিছু অভ্যহাত আমি তৈরী করেই রাখি। যেমন একবার আমার একটা হ্যাণ্ড ব্যাগ ফেলে এলাম যাতে পরদিন শিয়ে বলতে পারি, জরুরী কিছু কাগজপত্র ছিল। যাক পাওয়া গেল। সবচে' বেশী যা করি তা হচ্ছে — গল্পের বই নিয়ে আসি। তারপর সেই বই ফেরত দিতে যাই।

গল্পের বই আমি পড়ি না। ভাল লাগে না। কোন কালেও ভাল লাগেনি। তবু রাতে শুয়ে শুয়ে বইয়ের দ্রাঘ নেই, পাতা ওল্টাই। এশার স্পৰ্শ এই বইগুলির পাতায় পাতায় লেগে আছে ভাবহে আমার রোমাঞ্চ বোধহয়। গা শিরশির করে। গভীর আনন্দে চোখ ভিজে উঠে। বই ওল্টাতে ওল্টাতে একবাতে অস্তুত এক কাণ্ড হল। টুক করে বইয়ের ভেতর থেকে কি যেন পড়ল। তাকিয়ে দেখি ছেট একটা নীল বঙ্গের বোতাম। যেন একটা নীল অপরাজিত। নাকের কাছে নিয়ে দেখি সত্যি গন্ধ আসছে। আমি গভীর যমতায় বোতামটা বালিশের নীচে রেখে দিলাম। সারাবাত দূম হল না। কেবলি মনে হল একদিন না একদিন এশা আসবে এ বাড়িতে। আমি তাকে বলব, দূমি যে ফুলটি আমাকে দিয়েছিলে সেটা এখনো ভাল আছে। কি সুন্দর গন্ধ। সে আবাক হয়ে বলবে, আমি আবার ফুল দিলাম কবে?

এব মধ্যে ভুলে গেলে? একটা নীল ফুল দিয়েছিলে না?

বলেন কি! নীল ফুল আমি কোথায় পাব?

আমি বালিশ সরিয়ে বোতামটা বের করে আনব। এশা বিশ্বিত হয়ে বলবে আটা দুবি আপনার নীল ফুল? আমি বলব, বিশ্বাস না হলে গন্ধ শুরু দেখো।

এশার বাবা নিজেই দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকলেন। আমার বড় লজ্জা লাগল। আমি বললাম, ছিঃ ছিঃ, আপনি কেন? তিনি হেসে বললেন, তাতে কি হয়েছে? শাশু, চা খাও। চিনি হয়েছে কি-না বল।

হয়েছে।

গুড়। চিনি আমি নিজেই দিয়ে এনেছি। কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই ব্যস্ত।

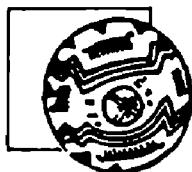
কোন উৎসব নাকি?

না, উৎসব কিছু না। যেয়েলী ব্যাপার। এশাৰ বিয়ে ঠিক হল। ওৱা দিন পাকা করতে আসবে। রাত আটটায় আসবে। এখনো তিনি ষষ্ঠী দেৱী অথচ ভাব দেখে মনে হচ্ছে . . . ।

আমি নিঃশব্দে চাহে চূমুক দিতে লাগলাম। এশার বাবা বললেন, ব্যারিস্টার ইমতিয়াজ সাহেবের ছেলে। তুমি চিনবে নিশ্চয়ই। ইমতিয়াজ চৌধুরী, জ্বিয়ার আমলে হেলথ মিনিস্টার ছিলেন। ছেলেটা খুব ভাল পেয়েছি। জ্বার্মানী থেকে পি-এইচডি করেছে ক্যামিকেল ইণ্ডিনীয়ারিং-এ। এখন দেশে কি সব ইণ্ডাস্ট্রি নিবে, রঙ তৈরী করবে। আমি ঠিক বুঝিও মা।

চা শেষ করবার পরও আমি খানিকক্ষণ বসে রইলাম। যাবার আগে এশা বেরিয়ে এল। কি চয়েকার করেই না আজ তাকে সাজিয়েছে। তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হয়। এশা হাসিমুখে কলল, বেছে বেছে আপনি খাফেলার দিনগুলিতে আসেন কেন বলুন তো?

আমি ফিরে যাচ্ছি আমার খুপড়ি ঘরে। অন্যসব রাতের যত আজ রাতেও হয়ত ঘূম হবে না। বালিশের নীচ থেকে নীল বোতাম বের করে আজ্ঞা নিশ্চয়ই দেখব। এই পরিবারটির কাছ থেকে একটা নীল বোতামের বেশী পাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। এই সহজ সত্যটি আজ রাতেও আমার যাথায় ঢুকবে না। আজ রাতেও বোতামটিকে ঘনে হবে একটি অপরাজিত ফুল।



পিপাড়া

আপনার অসুখটা কী বলুন?

কুণ্ডী কিছু বলল না, পাশে বসে—থাকা সঙ্গীর দিকে তাকাল।

ডাঙ্কার নূরে আফসার, এমআরসিপি, ডিপিএস, অভ্যন্তর বিবর্ণ হলেন। তাঁর বিবর্ণের শিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, আটটা বেজে গেছে — কুণ্ডী দেখা বন্ধ করে বাসায় যেতে হবে। আজ তাঁর শ্যালিকার জন্মদিন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, গাম থেকে আসা কুণ্ডী তিনি পছন্দ করেন না — এরা হয় বেশি কথা বলে, নয় একেবারেই কথা বলে না। ভিজিটের সময় হলে দর-দাম করার চেষ্টা করে। হাত কচলে মুখে তেলতেলে ভাব ফুটিয়ে বলে, কিছু কুম করা যায় না ডাঙ্কার সাব। গরীব মানুষ।

আজকের এই কুণ্ডীকে অপছন্দ করার তত্ত্বায় কারণটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু নূরে আফসার সাহেবের কাছে এই কারণটিই প্রধান বলে বোধ হচ্ছে। লোকটির চেহারা নির্বাচনের যত। এই ধরনের লোক নিজের অসুখটাও ঠিকমত বলতে পারে না। অন্য একজনের সাহায্য লাগে।

বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার অন্য কাজ আছে।

লোকটি কিছু বলল না। গলা খাকারি দিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল। ভাবখানা এরকম যে অসুখের কথাবাত্তি সঙ্গীটিই কলবে। সে-ও কিছু বললেন না। ডাঙ্কার নূরে আফসার হাতবড়ির দিকে একবালক তাকিয়ে বললেন, গরু—ছাগল তার কী অসুখ বলতে পারে না। তাদের অসুখ অনুমানে ধরতে হয়। আপনি তো আর গুরু ছাগল না। চুপ করে আছেন কেন? নাম কি আপনার?

কুণ্ডি কিছু বলল না। তার সঙ্গী বলল, উনার নাম যকবুল। মোহস্মদ যকবুল হোসেন ভূইয়া।

মাঘটাও অনা আরেকজনকে বলল দিতে হচ্ছে। আপনি কি কথা বলতে পাবেন, না—
পাবেন না?

পারি।

কী নাম আপনার?

মোহস্মদ যকবুল হোসেন ভূইয়া।

বয়স কত?

বায়াম।

আপনার সমস্যাটা কি?

কুণ্ডি মাথা নিচু করে ফেলল। নৃকুল আফসার সাহেবের ধারণ হল অস্বাক্ষর কোন
অসুখ, যার বিবরণ সরাসরি দেয়া মুশকিল।

আব তো সময় দিতে পারব না। আমাকে এক জ্ঞায়গায় যেতে হবে। যদি কিছু বলার
থাকে এক্ষণি বলবেন। বলার না থাকলে চলে যান।

কুণ্ডি আবার গলা ধাকাবি দিল।

তার সঙ্গী বলল, উনার অসুখ কিছু নাই।

অসুখ কিছু নেই, তা এসেছেন কেন?

উনারে পিপড়ায় কামড়ায়।

কী বললেন?

পিপড়ায় কামড়ায়। পিপিলিকা।

ডাক্তারী করতে গেলে অধৈর্য হওয়া চলে না। কুণ্ডীদের সঙ্গে বাগারাগিও করা চলে না।
এতে পশার কয়ে যায়। রোগের বিবরণ শুনে বিস্মিত হওয়াও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রোগের
ধরন-ধারণ যতই অস্তুত হোক ভান করতে হয় যে, এ জাতীয় রোগের কথা তিনি শুনেছেন
এবং চিকিৎসা করে আরাম করেছেন। নৃকুল আফসার সাহেব ডাক্তারীর এই সব সহজ
নিয়ম-কানুন নিষ্ঠার সঙ্গে মানেন। আজ মানতে পারলেন না। ধরকের স্বরে বললেন, পিপড়ায়
কামড়ায় মানে?

কুণ্ডি পকেটে হাত দিয়ে একটুকুরা কাগজ বের করে বলল, চিঠিটা পঁত্তেন ১০ চিঠির মধ্যে
সব লেখা আছে।

কার চিঠি?

কাশেম সাহেব।

কাশেম সাহেব কে?

এম্বিবিএস ডাক্তার। আমাদের অঞ্জলেব। খুব ভাল ডাক্তার। উনি আপনার কাছে
আমারে পাঠাইছেন। বলছেন নাম বললে আপনি তিস্তেন। উনি আপনের ছাত্র।

নৃকুল আফসার সাহেব কাশেম নামের কোন ছাত্রের নাম মনে করতে পারলেন না।
কাশেম বশল প্রচলিত নামের একটি। কুসে প্রতি বছৰই দু'একজন কাশেম থাকে। এ কোন
কাশেম কে জানে।

স্যার চিনেছেন?

চিনি না বলাটা ঠিক হবে না। প্রানো ছাত্ররা কষ্টী পাঠায়। এদেরকে খুশি রাখা দরকার। কাজেই আফসার সাহেব শুকনো হাসি হেসে বললেন, ইয়া চিনেছি। কি লিখেছে দেখি।

উনি স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন।

আজ্ঞা, ঠিক আছে। দেখি চিঠিটা দেখি।

চিঠি দেখে ডাক্তার সাহেবের জু কৃক্ষিত হল। বাঙালী জাতির সবচে' সোধ হল — এরা কোন জিনিস সংক্ষেপে করতে পারে না। দুই পাতার এক চিঠি ফেঁদে বসেছে। তিনি পড়লেন।

পরম শুভ্রেষ্ণ স্যার,

আমার সালাম জানবেন। আমি সেভেটি শ্রি ব্যাচের ছাত্র। আপনি আমাদের ফার্মাকোলজী পড়াতেন। আপনার বিষয়ে আমি সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছিলাম। সেই উপলক্ষে আপনি আপনার বাসায় আমাকে চায়ের দাওয়াত করেছিলেন।

আশা করি আপনার মনে পড়েছে। যাই হোক, আমি মকবুল সাহেবকে আপনার কাছে পাঠাই। মকবুল এই অঞ্চলের একজন অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি। সে বছর চারেক ধরে অস্তুত এক ব্যাধিতে ভুগছে। একে ব্যাধি বলা যাবে না কিন্তু অন্য কোন নামও আমি পাই না। ব্যাপারটা হচ্ছে তাকে সব সময় পিপড়ায় কামড়ায়।

বুরতে পারছি বিষয়টা আপনার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হচ্ছে। শুরুতে আমার কাছেও মনে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম এটা এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। বর্তমানে আমার সেই ধারণা পুরোপুরি ভেঙে গেছে। আমি নিজে লক্ষ করেছি মকবুল সাহেব কোথাও বসলেই সারি খেঁধে পিপড়া তার কাছে আসতে থাকে।

শীর-ফকির, তাবিজ, ঝাড়-ফুক জাতীয় আধি ভৌতিক চিকিৎসা সবই করানো হয়েছে। কোন লাভ হয়নি। আমি কোন উপায় না দেখে আপনার কাছে পাঠালাম। আপনি দয়া করে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না।

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

আবুল ক্ষেত্রম।

ব্রু. স্টার ফামেসী। নালাইল। কেন্দ্ৰ্যা।

ডাক্তার সাহেব কৃগীর দিকে তাকালেন। কৃগী পাথরের মত মুখ করে বসে আছে। গাঁথে ফতুয়া ধরনের জামা। পরনে লুসি। অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তির পোশাক নয়।

ডাক্তার সাহেব কি বলবেন বুরতে পারলেন না। কিছু-একটা জলতে হয়। মকবুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। এই জাতীয় উষ্ণত মন্ত্রপার কোন মানে হয়ে উঠে নি।

পিপড়া কামড়ায় আপনাকে?

ছি স্যার। কোন এক জ্বায়গায় বসে থাকলেই পিপড়া এসে ধরে।

মূরুল আফসার সাহেব একবার ভাবলেন ক্ষমতা, আপনি কি রসোগোল্লা না-কি যে পিপড়া ছেকে ধরবে? শেষ পর্যন্ত বললেন না।

বড় কটে আছি স্যার। যদি ভাল করে দেন সারাজীবন কেনা গোলাম হইয়া থাকব। টাকা-পয়সা কোন ব্যাপার না, স্যার। টাকা যা লাগে লাগুক।

আপনার কি অনেক টাকা ।

ছি স্যার।

কী পরিমাণ টাকা আছে?

কুণ্ডি কোন জবাব দিল না। কুণ্ডির সঙ্গী বলল, মকবুল ভাইয়ের কাছে টাকা-পথসা কোন ব্যাপার না। লাখ দুই লাখ উন্নার হাতের ময়লা।

নূরুল আফসার সাহেব এই প্রথম খানিকটা কৌতুহলী হলেন। লাখ টাকা ফত্যা-গায়ে মুসী-পরা এই লোকটির হাতের ময়লা — এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তিনি নিজেও ধনবান ব্যক্তি। ফিল্ড ডিপোজিটে তাঁর এগারো লাখ টাকার মত আছে। এই টাকা সঞ্চয় করতে গিয়ে জীবন পানি করে দিতে হয়েছে। ভোর ছাটা থেকে রাত বারোটা — এক মুহূর্তের বিশ্বাস নেই।

একমাত্র ছাটির দিন শুক্রবারটাও তিনি কাছে লাগান। সকালের ফ্লাইটে চিটাগাং ঘান, লাস্ট ফ্লাইটে ফিরে আসেন। ওখনকার একটা ক্লিনিকে বসেন। ঐ ক্লিনিকের তিনি কনসালটিং ফিজিসিয়ান। আর এই লোককে দেখে তো মনে হয় না সে কোন কাজকর্ম করে। নির্বামের মত এই লোক এত টাকা করে কী করে? নূরুল আফসার সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে পেল।

মকবুল কীণ স্বরে বলল, রোগটা যদি সারায়ে দেন।

এটা কোন রোগ না। আমি এমন কোন রোগের কথা জানি না — যে রোগে দুনিয়ার পিপড়া এসে কামড়ায়। অসুস্থিটা আপনার মনে। আমি সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি — তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। আপনার যে সমস্যা এই সমস্বার সমাধান আমার কাছে নেই।

নূরুল আফসার সাহেব বাক্যটা পূরোপুরি শেষ করলেন না। কারণ একটা অস্তুত দৃশ্য তাঁর চোখ আঁচিকে গেল। তিনি দেখলেন, টেবিলের উপর রাখা মকবুলের ডান হাতের দিকে এক সারি লাল পিপড়া এগছে। পিপড়ারা সচরাচর এক লাইনে চলে, এরা তিনটি লাইন করে এগছে।

ডাক্তার সাহেবের দ্বিতীয় করে মকবুলও তাকাল পিপড়ার সারির দিকে। সে কিছু বলল না বা হাতও সরিয়ে নিল না।

নূরুল আফসার সাহেব বললেন, এই পিপড়াগুলি কি আপনার দিকে আসছে?

ছি স্যার।

বলেন কী?

পায়েও পিপড়া থরেছে। এক জ্যায়গায় বেশিক্ষণ বসতে পারিল্লা স্যার।

নূরুল আফসার সাহেব কাছে এগিয়ে এলেন। উচু হয়ে বসলেন। সত্যি সত্যি দুসারি পিপড়া লোকটির পার দিকে এগছে।

মকবুল সাহেব।

ছি স্যার।

আমার একটা জরুরী কাজ আছে, চল্লম্বেতে হচ্ছে। আপনি কি কাল একবার আসবেন?

অবশ্যই আসব। যাব কাছে যাইতে বলেন যাব। বড় কষ্টে আছি স্যার। রাত্রে শুমাইতে পারি না। নাকের ভিতর দিয়ে পিপড়া তুকে যায়।

আপনি কল আসুন। কল কথা বলব।
ছি আচ্ছ।

মকবুল উঠে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্যে নৃকল আফসার সাহেব মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। তার কাছে মনে হল মকবুল কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বন্ধ উদ্বাদ হয়ে গেছে। চিন্তা ও বিচার শক্তি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে। তিনি দেখলেন মকবুল হিংস্র ভঙিতে লাফিয়ে লাফিয়ে, পা ঘসে ঘসে পিপড়া মারাব চেষ্টা করছে। এক পর্যায়ে সে শ্রমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলে, দুঃখাতে পিষে ফেলল পিপড়ার সারি। মকবুলের মুখ ঘামে চটচট করছে। চোখের তারা ঝোঁঁৎ লালাভ। মুখে হিসহিস শব্দ করছে এবং নিচু গলায় বলছে, হারামজাদ, হারামজাদ।

তার সঙ্গী কিছুই বলছে না। যাথা নিচু করে দেয়াশলাইর কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচছে। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ জাতীয় ঘটনার সঙ্গে সে পরিচিত। এই ঘটনায় সে অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না।

নৃকল আফসার সাহেব শালীব জন্মদিনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। কৃগীর দিকে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দৃঢ়জন অ্যাসিস্টেন্টও ছুটে এসেছে। তারা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়ের চেয়ে ভয় বেশি।

মকবুল হঠাতে শাস্তি হয়ে গেল। নিচু গলায় বলল, স্যার মনে কিছু নিবেন না। এই পিপড়ার ঝাঁক আমার জ্বেলন শেষ কইবা দিছে। হারামজাদা পিপড়া। এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি দিবেন?

ডাক্তার সাহেবের অ্যাসিস্টেন্ট অতি দ্রুত ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করে নিয়ে এল। একজন ভয়ংকর পাগলের পাগলামি হঠাতে থেমে গেছে এই আনন্দেই সে আনন্দিত।

মকবুল পানির গ্লাস হাতে নিয়ে ঘসে রইল। পানি মুখে দিল না। মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল, যেখানে যাই সেইখানে পিপড়া, কি করব কল। যে খাটে শুমাই সেই খাটের পায়ার নিচে বিরাট বিরাট মাটির সরা। সরা ভক্তি পানি। তাতেও লাভ হয় না।

লাভ হয় না?

ছি না। ক্যামনে ক্যামনে জানি বিছানায় পিপড়া উঠে। ঘটায় ঘটায় বিছানার চাদর বদলাইতে হয়।

বলেন কি?

সত্ত্ব কথা বলতেছি জ্ঞান। একবর্ষ মিথ্যা না। যদি মিথ্যা হয় তা হইলে যেন আমার শরীরে কুঠ হয়। আমি জ্ঞান এক জ্ঞানগায় বেশিক্ষণ মার্কেটেও পারি না। জ্ঞানগা বদল করতে হয়। আমার জীবন শেষ।

ডাক্তার সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মেলোকটিকে শুক্রতে মনে হয়েছিল কথা বলতে পারে না, এখন দেখা যাচ্ছে সে প্রচুর শক্তি কলতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। গ্রামের লোকজনের প্রাথমিক ইনহিবিশন কেটে গেলে প্রচুর কথা বলে। প্রয়োজনের কথা বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনের কথাই বেশি বলে।

চিকিৎসায় কোন ক্রটি করি নাই জনাব। কেরোসিন তেলে কর্পুর দিয়ে সেই তেল শরীরে মাঝে যদি গক্ষে পিপড়া না আসে। প্রথম দুই-একদিন লাভ হয়, তাবপর হয় না। পিপড়া আসে। এমন জিনিস নাই যে শরীরে মাঝে নাই। যে যা বলেছে মাঝে। একজন কলল, বাদুরের গুণ শরীরে মাখলে আরাম হইব। সেই বাদুরের গুণ মাখলাম। এর চেয়ে জনাব আমার মরগ ভাল।

ডাক্তার সাহেব তার অ্যাসিস্টেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাসায় টেলিফোন করে দাও যে আমি একটা ঝামেলায় অটিকে পড়েছি। আসতে দেরি হবে। আর আমাদের চা দাও।

আপনি চা খান তো?

জ্ঞি চা খাই।

চা খেতে খেতে বলুন কী ভাবে এটা শুরু হল, প্রথম কখন পিপড়া আপনার দিকে আকৃষ্ণ হল।

একটু গোপনে বলতে চাই জনাব।

গোপনে বলার ব্যাপার আছে কি?

জ্ঞি আছে।

বেশ। গোপনেই বলবেন। আগে চা খান।

লোকটি চা খেল নিঃশব্দে। চা খাবার সময় একটি কথাও কলল না। তার কথা বলার ইচ্ছা সম্ভবত ঢেউয়ের মত আসে। ঢেউ যখন আসে তখন প্রচুর বকবক করে, ঢেউ থেমে গেলে চূপচাপ হয়ে যায়। তখন কথা বলে তার সঙ্গী। এখন সঙ্গীই কথা বলছে —

ডাক্তার সাব, সবচে' বেশি ফল হয়েছে যে চিকিৎসায় সেইটাই তো বলা হয় নাই। মকবুল ভাই, ঐ চিকিৎসার কথা বলেন।

তুমি বল।

এই চিকিৎসা মকবুল ভাই নিজেই বাইর করছে। বিষে বিষক্ষয় চিকিৎসা। গুড়ের গক্ষে পিপড়া সবচে' বেশি আসে। যকব্ল ভাই করলেন কি, সারা শহিলে গুড় মাখলেন। এতে লাভ হইছিল। সাতদিন কোন পিপড়া আসে নাই।

মকবুল গজীর গলায় বলল, সাতদিন না পাঁচদিন।

ডাক্তার সাহেব বললেন, পাঁচদিন পরে আবার পিপড়া আসা শুরু হল।

জ্ঞি।

পিপড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঘনে হয় অনেক কিছু করেছেন।

জ্ঞি। নদীর মাঝখানে নৌকা নিয়া কয়েকদিন ছিলাম। তিনি দিন আরামে ছিলাম। চাইর দিনের দিন পিপড়া ধরল।

সেখানে পিপড়া গেল কিভাবে?

জ্ঞানি না জনাব। অভিশাপ।

কিসের অভিশাপ?

আপনারে গোপনে বলতে চাই।

ডাক্তার সাহেব গোপনে বলাব ব্যবস্থা করলেন। পুরো ব্যাপারটায় তিনি এখন উৎসাহ পেতে শুরু করেছেন। শালীর জন্মদিনের কথা যাবে যাবে যনে হচ্ছে। খানিকটা অস্বস্তি বোধ করেছেন। এই পর্যন্তই। কোন কগীর ব্যাপারে এ জাতীয় কোতৃহল তিনি এর আগে বোধ করেননি। অবশ্যি এই লোকটিকে কুগী বলতেও বাধছে। কাউকে পিপড়া ছেঁকে ধরে এটা নিশ্চয়ই কোন রোগ-ব্যাধির পর্যায়ে ফেলা যাবে না।

ঘর থেকে সবাইকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। মকবুলের সঙ্গীও নেই। দরজা ভেজানো। মকবুল নিচু গলায় কথা শুরু করল —

জনাব, আপনেরে আমি আগেই কলছি আমি টাকা-পয়সাওয়ালা লোক। আমাদের টাকা-পয়সা আইজ্জ-কাইলের না। বিটিল আমলে আমার দাদাজান পাকা দালান দেন। দাদাজানের দুইটা হাতী ছিল। একটার নাম যয়না, অন্যটার নাম সুরভি। দুইটাই যদি হাতী।

ঐ প্রসঙ্গ থাক, আপনার পিপড়ার প্রসঙ্গে আসুন।

আসতেছি। আমি পিতা মাতাব একমাত্র সন্তান। বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। টাকা-পয়সা, ক্ষমতা এইসব জিনিস বেশি থাকলে মানুষের স্বভাব-চরিত্র ঠিক থাকে না। আমারো ঠিক ছিল না। আপনারা যারে চরিত্র-দোষ বলেন তাই হইল। পনের-ঘোল বছর বয়সেই। বিরাট বাড়ি — সুন্দরী মেয়েছেলের অভাব ছিল না। দাসী-বাঁদি ছিল। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের মেয়ে-বউরা ছিল।

আমারে একটা কঠিন কথা বলার বা শাসন করার কেউ ছিল না। আমার মা অবশ্য জীবিত ছিলেন। কেউ কেউ তাঁর কাছে বিচার নিয়ে গেছে। লাভ হয় নাই। উল্টা আমার ধমক থাইছে।

আপনি বিয়ে করেননি?

হ্যাঁ বিবাহ করেছি। বিবাহ করব না কেন? দুটি বিবাহ করেছি। সন্তানাদি আছে। স্বভাব নষ্ট হইলে বিয়ে-সাদী করলেও ফায়দা হয় না। মেয়েছেলে দেখলেই . . .

আপনি আসল জ্ঞানগায় আসুন। আজেবাজে কথা বলে বেশি সময় নষ্ট করছেন।

হ্যাঁ আসতেছি। বছর পাঁচেক আগে আমার দূর-সম্পর্কীয় এক বোনের মেয়ের উপর আমার চোখ পড়ল। চইদ্দ পনের বছর বয়স। গায়ের রঞ্জ একটু যয়লা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল। আমার চরিত্র তো কারো অজ্ঞান না। মেয়ের মা মেয়েকে আগলায়ে রাখে। খুবই বজ্জ্বাত মা, মেয়েকে নিয়ে আমার মাঝে ঘরে মেঝেতে ঘূমায়। এত কিছু কইরাও লাভ হইলো নাই এক রাতে ঘটনা ঘটে গেল।

কি বললেন, ঘটনা ঘটে গেল?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য ব্যাপার। আপনি যেভাবে কলছেন তাতে যনে হচ্ছে দুই তুচ্ছ একটা ব্যাপার।

জিনিসটা তুচ্ছই। কিছুই না। হে হে হে।

হাসবেন না। হাসির কোন ব্যাপার না।

হ্যাঁ আচ্ছা। তারপর কি হল — ঐ বজ্জ্বাত মেই রাইতেই মেয়েটারে ইসুর-মারা বিষ খাওয়াইয়া দিল। আর নিজে একটা দড়ি নিয়ে বাড়ির পিছনে একটা আমগাছে ফাঁস মিল। আমারে বিপদে ফেলার চেষ্টা, আর কিছু না। শাগী চূড়ান্ত বজ্জ্বাত। আমি চিন্তায় পড়লাম।

দুইটা খিত্তা সোজা কথা না। থানা-পুলিশ হবে। পুলিশ তো এই জিনিসটাই চায়। এরা কলাবে খুন করা হয়েছে।

আপনি খুন কবেননি?

আরে না। খুন করব কি জন্মে। আর যদি খুনের দরকারও হয় নিজের ঘরে খুন করব? কাউরে খুন করতে হইলে জ্ঞানগার অভাব আছে? খুন করতে হয় নদীর উপরে। রাঙ্গ পুইয়ে ফেলা যায়। তারপর লাশ বস্তার ভিতর বইবা চূন মাখায়ে চার-পাঁচটা ইট বস্তার ভিতর দিয়ে বিলে ফালাস্বে দিতে হব। এই জন্মের জন্মে নিশ্চিন্ত। কোনো সম্মুক্ষির পুত কিছু জ্ঞান না।

আপনি খুনও করেছেন?

জ্ঞি না। দরকার হয় নাই। যেটা কলতেছিলাম সেইটা শুনেন, ঘরে দুইটা লাশ। আমি বললাম, খবরদার লাশের গায়ে কেউ হাত দিবা না। ষে রকম আছে সে রকম থাক, আমি নিজে নিয়ে থানার ওসি সাহেবের আনতেছি, ওসি সাহেব আইয়া যা করবার করব।

থানা আমার বাড়ি থাইক্যা পনের যাইল দূর। পানসি নৌকা নিয়া গোলাম। দারোগা সাহেব আর থানা স্টাফের জন্মে পাঁচ হাজার টাকা নজরানা নিয়া গোলাম। গিয়া দেখি রিয়াট সমস্যা। দারোগা সাব নিয়েছেন বোয়ালখালী ডাকাতি যাবলার তদন্তে। ফিরলেন পরের দিন। তারে নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে লাগল তিন দিন।

বর্ধাকাল। গরমের দিন। তিন দিনেই লাশ গেছে পচে। বিকট গঞ্জ। দারোগা সাবরে নিয়া কাঠাল গাছের কাছে গিয়া দেখি অজুত দশ্য। লাখ লাখ লাল পিপড়া লাশের শরীরে। মনে হইতেছে মাণীর সারা শহীলে লাল চাদর।

মেয়েটারও একই অবস্থা। মুখ হাত পা কিছুই দেখার উপায় নাই। পিপড়ায় সব ঢাকা। মাঝে মাঝে সবগুলি পিপড়া যখন একসঙ্গে নড়ে, তখন মনে হয় লাল চাদর কেউ যেন ঝাড় দিল।

ডাক্তার সাহেব তিক্ত গলায় কলমেন, আপনি তো দেখি খুবই বদলোক।

জ্ঞি না, আমার মত টেকাপয়সা যারার থাকে তারা আরো বদ হয়। আমি বদ না। তারপর কি ঘটনা সেইটাই শুনেন — আমি একটা সিগারেট ধরাইলাম। সিগারেটের আগুন ফেলার সাথে সাথে মেয়েটার শরীরের সবগুলি পিপড়া নড়ল। মনে হল যেন একটা বড় চেউ উঠল। তারপর সবগুলি পিপড়া একসঙ্গে মেয়েটারে ছাইড় মাটিতে নামল। মেয়েটার চোখ মুখ সব থাইয়া ফেলেছে — জ্ঞানগায় জ্ঞানগায় হাজিড় বের হয়ে গেছে। দারোগা সাহেব কুমাল দিয়ে নাক চেপে থরে বললেন, মারুদে এলাহী। তারপর অবাক হয়ে দেখি সবগুলি পিপড়া একসঙ্গে আমার দিকে আসতেছে। ভয়ংকর অবস্থা। আমি দেমুঢ় দেয়ে বাইরে আসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পিপড়াগুলি বাইরে আসল। মনে হইল আমারে খুজতেছে। সেই থাইক্যা শুরু। বেখানে থাই পিপড়া। জনাব, আপনার এই ঘরে কি সিগারেট খাওয়া যায়? খাওয়া গোলে একটা সিগারেট থাইতে চাই।

খান।

শুক্র আলহুমদুল্লাহ।

মকবুল সিগারেট ধরাল। তার মুখ বিশঙ্গ। সে আলাড়িদের মত ধূয়া ছাড়ছে। খুক

খুক করে কাশছে। খানিকটা দম নিয়ে বলল, আমার কাশি ছিল ন। এখন কাশি হচ্ছে নকের ডিতর দিয়া পিপড়া ঢুকে গেছে ফুসফুসে। ওরা ঐখানেই বসবাস করে। কর্তৃপক্ষে বুঝলাম জানেন? কাশির সাথে বক্ত আসে। আর আসে যরা পিপড়া।

ডাঙ্কার সাহেব এক দ্যুতি তাকিয়ে রাইলেন।

মকবুল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, সিগারেট খাইতেছি যাতে ভল মত কাশি উঠে। কাশি উঠলে কাশির সাথে পিপড়া আর পিপড়ার ডিম বাইর হবে। আপনি দেখবেন নিজের চোখে। আমি ঘোষণা দিছি, যে আমারে পিপড়ার হাত খাইক্যা বাঁচাইব তারে আমি নগদ দুই লাখ দিব। আমি বদ লোক হইতে পারি কিন্তু আমি কথার খেলাপ করি না। আমি টাকা সাথে নিয়া আসছি। আপনে আমারে বাঁচান।

ডাঙ্কার সাহেব কিছু বললেন না। তিনি তার বিশাল সেক্রেটারিপ্রেস্ট টেবিলের উপরের কাচের দিকে তাকিয়ে আছেন। মকবুলের বাম হাত টেবিলের উপর। দুই সারি পিপড়া টেবিলের দুপারে থেকে সেই হাতের দিকে এগুচ্ছে। মকবুলেরও সেই দিকে চোখ পড়ল। সে ছেট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনের কিছু করা সম্ভব না। ঠিক না ডাঙ্কার সাব?

হ্যাঁ ঠিক।

আমি জানতাম। আমার মরণ পিপড়ার হাতে।

মকবুল যত্নমুগ্ধের মত এগিয়ে আসা পিপড়ার সারি দুটির দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ চকচক করছে। সে তার বাঁ-হাত আরেকটু এগিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বলল,—নে থা।

পিপড়ারা মনে হল একটু থমকে গেল। গা বেঞ্চে উঠল না — কিছুক্ষণ অনিচ্ছয়তায় ঝুঁগল।

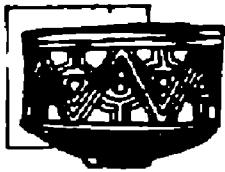
মকবুল বলল, নিজ খাইক্যা খাইতে দিলে এরা কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে উঠে না। শলা-পরামর্শ করে। এই দেহেন ডাঙ্কার সাব — উঠতেছে না।

তাই তো দেখছি।

দুই এক মিনিটের ব্যাপার। দুই এক মিনিট শলা-পরামর্শ শেষ হইব, তখন শইলে উঠা শুরু হইব।

হলও তাই। ডাঙ্কার সাহেব লক্ষ্য করলেন, পিপড়ার দল মকবুলের বাঁ হাতের উপরে উঠতে শুরু করেছে। দুটি সারি ছাড়াও নতুন এক সারি পিপড়া রওনা হয়েছে। এই পিপড়াগুলির মুখে ডিম। ডাঙ্কার সাহেব ভেবে পেলেন না, মুখে ডিম নিয়ে পিপড়াগুলি যাচ্ছে কেন? এরা চায় কী? কে তাদের পরিচালিত করেছে। কে সেই সূত্রধর?

BanglaBook



উনিশ শ' একাত্তর

তারা এসে পড়ল সন্ধ্যার আগে আগে।

বিরাট একটা দল। মার্ট টার্চ কিছু না। এলোমেলোভাবে হেঁটে আসা। সন্ধবত, বহু দূর থেকে আসছে। ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ছে একেক জন। ঘামে মুখ ভেজা। ধূলি ধূসরিত খাকি পোশাক।

গ্রামের লোকজন প্রায় সবাই লুকিয়ে পড়ল। শুধু বদি পাগলা হাসিমুখে এগিয়ে গেল। মহানদী চেঁচিয়ে উঠল, বিস্য কি গো?

পূরো দল থমকে দাঁড়াল মুহূর্তে। বদি পাগলার হাতে একটা লাল গামছা। সে গামছা নিশানের মত উড়িয়ে চেঁচাল, কই ধান গো আপনেরা? এমন অসুস্থ ব্যাপার সে আগে কখনো দেখেনি।

মেজর সাহেবের চোখে সানগ্রাম। তিনি সানগ্রাম খুলে ফেলে ইংরেজীতে বললেন, লোকটা কি বলছে? রফিকউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে বলল, লোকটা মনে হচ্ছে পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে পাগল থাকে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ স্যার।

বুঝলে কি করে এ পাগল?

রফিকউদ্দীন চুপ করে গেল। মেজর সাহেবের খুব পেঁচানো স্বভাব। একটি কথার দশটি অর্থ করেন। বদি পাগলাকে দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে। তার মুখ ভর্তি হাসি। রফিক থমকে উঠল, ‘ওয়াই, কি চাস তুই?’ বদি পাগলার হাসি আরো বিস্তৃত হল। রফিক কপালের ঘায় মুছল। সরু গলায় বলল, লোকটা স্যার পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে তুমি।

এই কথা তুমি আগে একবার বলেছ। একই কথা দুতিনবার বলার প্রয়োজন নেই।

রফিক ঢোক গিলল। মেজর সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এ জায়গাটা আমার পছন্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক। সবাই টায়ার্ড।

মাইল পাঁচেক গেলেই স্যার নবীনগর। খুব বড় বাজার, পুলিস ফাঁড়ি আছে। সন্ধ্যা নামার আগে আগে স্যার নবীনগর চলে যাওয়া ভাল।

কেন? তুমি কি ভৱ পাছ?

হ্যাঁ না স্যার, ভয় পাব কেন?

মেজর সাহেব দলটির দিকে তাকিয়ে কিছু একস্তু বললেন। শব্দ সাড়া ছাগল। নিয়েবের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়ল সবাই। যাথা থেকে তারী হ্যালমেট খুলে ফেলতে লাগল।

মেজর সাহেব নীচু সূরে বললেন, পাগলটাকে বেঁধে ফেলতে হবে। তিনি কাঠের একটি বাজ্রের উপর বসে পাইপ ধরালেন। খাকী পোশাক পরা কারো মুখে পাইপ মানায় না। কিন্তু এই মেজর সাহেব অসম্ভব সুপুরুষ। তাঁর মুখে সবকিছুই মানায়।

পাগলটাকে আম গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হল। তাব কোন আপত্তি দেখা গেল না। দুরং কাছকাছি থাকতে পারার সৌভাগ্য তাকে আনন্দিত মনে হল। কেউ তাব দিকে তেমন নজর দিল না। এবা অসম্ভব দ্রুত। এদের দৃষ্টি নিরাসক ও তাবলেশহীন।

মেজর সাহেব পানির বোতল থেকে কয়েক চুমুক পানি খেলেন। বুঝুতা জোড়া খুলে ফেললেন। তাঁর বী পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়েছে। রফিক বলল, তাব খাবেন স্যার? মেজর সাহেব সে কথার জবাব না দিয়ে শাস্তি স্বরে বললেন, আগে আমরা কোন গ্রামে গেলেই ছেটখাট একটা দল পাকস্তানী পতাকা হাতে নিয়ে আসত। এখন আব আসে না। এব কারণ কি জান?

জ্বানি না স্যার।

ভয়ে আসে না। এই গ্রামের সব ক'র্তি লোক এখন জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। ঠিক না?

রফিক জবাব দিল না। বদি পাগলা বলল, এটু বোতলের পানি খাইতে মন চায়।

ও কি চায়?

ওয়াটার বটল থেকে পানি খেতে চায় স্যার।

গ্রামের সবাই পালিয়ে গেলেও আজীজ মাস্টার যেতে পারেনি। কারণ সোনাপোতা থেকে তার ছেট বোন এসেছিল। আংজ সকাল থেকেই তার প্রসবব্যৰ্থা শুরু হয়েছে। এরকম একজন মানুষকে নিয়ে টানাটানি করা যায় না। তবু আজীজ মাস্টার দু'বার বলল, ধরাধরি কইয়া নাওডাত নিয়া তুললে শ্যামগঞ্জ লইয়া যাওন যায়। তার জবাবে আজীজ মাস্টারের মাত্র কাপুরুষতা নিয়ে কৃৎসিত একটা গাল দিয়েছেন। পা ভাঙা বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আজীজ মাস্টার প্রতিবাদ করেনি। কারণ কথাটি সত্য। সে বড়ই ভীতু। গ্রামে মিলিটারী দুকেছে শোনার পর থেকে তার ঘনঘন প্রস্তাবের বেগ হচ্ছে। সে বসে আছে উঠোনে। এবং সামান্য শব্দেও দারুণভাবে চমকে উঠছে।

মাস্টার বাড়িত আছ?

কেড়া?

আমরা। খবর শনছ? বদি পাগলারে বাইজ্ঞা রাখছে আম গাছে।

হ্যান্টি।

নীলগঞ্জের মুকুকীদের কয়েকজন শৎকিত ভঙ্গিতে উঠে এল উচ্চালে।

তোমার তো একটু যাওন লাগে মাস্টার।

কই যাওন লাগে?

দৌরির মিয়া তাব উন্তুর না দিয়ে নীচু পলায় বলল, তুমি জোড়া কে যাইব? তুমি ইংরেজি জান। শুন্দি ভাষা জান।

মিলিটারীর কাছে যাইতে কল?

হ।

আমি গিয়া কি করতাম?

BanglaBook.org

গিয়া কইবা এই গেৰামে কোন অস্বিষ্ণা নাই। পাকিস্তানের নিশানটা হাতে লইয়া যাইবা।
ভয়ের কিছু নাই।

মাস্টার অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। দৰীৰ মিয়া বিৱৰণ হয়ে বলল, কথা কখন
যে?

আমি যাই ক্যামনে? বাড়িত জত বড় বিপদ। পুতিৰ বাচা অইব।

তোমার তো কিছু কৰশেৰ নাই মাস্টার। তুমি ডাঙ্কারও না, কবিৱাঙ্গও না।

মাস্টার ক্ষীণস্বরে বলল, পাকিস্তানের পতাকা পাইয়াম কই?

ক্যান ইস্কুলেৰ পতাকা কি কৰলা?

ফালাইয়া দিছি।

ফালাইয়া দিছ? ক্যান?

মাস্টার জ্বাব দেৱ না। দৰীৰ মিয়া রাণী গলায় বলে, আইএ পাশ কৱলে কি হইব
মাস্টার, তোমার আন-বুদ্ধি অয় নাই। পতাকাটি তুমি ফালাইলা কোন আক্ৰমে? অখন কি
আৰ কৰবা। ঘাও খালি হাতে।

আমাৰ ডৰ লাগে চাচজী।

ডৰেৰ কিছু নাই। এৱা বাঘও না, ভল্লুকও না। তুমি গিয়া খাতিৰ-যত্ন কইৱা দুইটা কথা
কইবা। এক মিনিটেৰ মামলা। কি কও আসমত?

নেয় কথা।

দেৱী কইৱো না। আজ্ঞাইৰ হওনেৰ আগেই যাও।

একলা?

একলা যাওলই বালা। একলাই যাও। তিনবাৰ কুলছ আল্লাহ কইয়া ডাইন পাওড়া আগে
ফেলবা। পাঁচবাৰ মনে মনে কইবা, “ইয়া মুকাদ্দেমু।” ভয়-ডৱেৰ কিছুই নাই মাস্টার।
আল্লাহৰ পাক কালাম। এৱ মৱতবাই অন্য রকম।

আজীজ মাস্টার মাথা নীচু কৰে বসে রইল। তাৰ আবাৰ প্ৰস্তাৱেৰ বেগ হয়েছে। ঘৱেৱ
ভেতৱ থেকে পুতি কুঁ কুঁ কৰহে। প্ৰথম পোয়াতী খূব ভোগাবে।

ভইন্টাৰে এমূল অবস্থায় ফালাইয়া ক্যামনে যাই?

এইটা কি কথা? তুমি ঘৱে থাক্যা কৰিবাটা কি? বেকুবেৰ মত কথা কও খালি। উঠ
দেহি।

আজীজ মাস্টার উঠল।

মেজৰ সাহেব দীৰ্ঘ সময় তাৰ দিকে সৰু চোখে তাৰিয়ে যাইলেন। অঙ্ককাৰ হয়ে
আসছে। তাৰ মুখেৰ ভাব ঠিক বোৰা যাচ্ছে না। তিনি বসে আজ্ঞেন কাঠেৰ একটি বড় বালোৱ
উপৱ। পা দুঃটি ছড়ানো। মেজৰ সাহেব পৰিষ্কাৰ বালায় বালালেন, কি চাও?

আজীজ মাস্টার ধৰমত খেয়ে গৈল। এ বালা কৰনে নোকি? কি আশ্চৰ্য!

কি চাও তুমি?

হ্বি, কিছু চাই না।

মেজৰ সাহেব এবাৰ ইংৰেজীতে বললেন, কিছু না চাইলে এসেছ কেন? তামশা

দেখতে ? সার্কাস হচ্ছে ? আজীজ মাস্টার ঘায়তে শুরু করল। মেজর সাহেবের পৰবর্তী সমস্ত কথোপকথন হল ইংরেজীতে। আজীজ মাস্টার বেশীরভাগ জ্বাবই দিল বাংলায়। তাতে অসুবিধা হল না। মেজর সাহেব বাংলা বুঝতে পারেন।

তুমি কি কর ?

আমি এখানকার প্রাইমারী স্কুলের ঢিচার।

এখানে আবার স্কুলও আছে নাকি ?

জ্বি স্যার।

আর কি আছে ?

একটা মসজিদ আছে।

গুরু মসজিদ ? মন্দির মেই ? পূজা হয় যেখানে ?

জ্বি না স্যার।

ঠিক করে বল মন্দির আছে কিনা।

নাই স্যার।

মেজর সাহেব পাইপ ধরালেন। ঠাণ্ডা গলায় কাকে যেন পাঞ্জাবী বা অন্য কোন ভাষায় কি বললেন। সেই লোকটি উঠে এসে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল আজীজ মাস্টারের গালে। আজীজ মাস্টার চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আম গাছের সঙ্গে বাঁধা বদি পাগলা দারুণ অবাক হয়ে বলল, ও মাস্টার উঠ উঠ। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে মেজর সাহেব বললেন, তোমার নাম কি ?

আজীজ্বুর রহমান।

আজীজ্বুর রহমান, তোমাদের এদিকে মুক্তি বাহিনী আছে ?

জ্বি না।

সবাই পাকিস্তানী ?

জ্বি।

বাহু খুব ভাল। তুমি নিজেও একজন খাঁটি পাকিস্তানী ঠিক ?

জ্বি স্যার।

সবাই পাকিস্তানী হলে এত ভয় কিসের ? আমার তো মনে হয় এ গ্রামের স্বাই ভয়ে পালিয়েছে। যেয়েগুলি লুকিয়ে আছে জঙ্গলে, ঠিক না ?

আজীজ মাস্টার জ্বাব দিল না। তার মাথা ঘূরছে। বমি আসছে। বমি কষে সে বমির বেগ সামলাতে লাগল।

তোমাদের কি ধারণা আমরা তোমাদের যেয়েদের ধরে নিয়ে আস ?

আজীজ মাস্টার চুপ করে রইল।

কি, কথা বলছ না যে ? তোমার স্ত্রীও কি জঙ্গলে লুকিয়েছে ?

স্যার আমি বিয়ে করিনি।

বিয়ে করনি ? বয়স কত তোমার ?

চালিশ।

চালিশ, এখনো বিয়ে করনি ? তাহলে চালাও কিভাবে ? মাস্টারবেট কর ?

আজীজ মাস্টার কপালের ঘাম মুছল। মেঝের সাহেব শৃঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কথার অবব দাও। রফিকাউদ্দীন ক্ষীণ সুরে বলল, স্যাব জানতে চাচ্ছেন অপনি হস্তযৈথুন কবেন কিম। বলে ফেলেন ভাই। স্যাব বেগে যাচ্ছেন।

কবি না।

কল কি? তোমার যত্নপাতি ঠিক আছে? দেখি পায়জ্ঞামা খুলে সবাইকে দেখাও তো।

স্যাব কি বললেন?

পায়জ্ঞামা খুলে তোমার যত্নটা সবাইকে দেখাতে বললাম। ঝটপট কর। দেরী করবে না। আমার হাতে সময় বেশি নেই।

আজীজ মাস্টার অবাক হয়ে তাকাল রফিকের দিকে। রফিকাউদ্দীন অস্পষ্ট স্বরে বলল, খুলে ফেলেন ভাই। ব্যাটা ছেলেদের মধ্যে আবার লজ্জা কি? খুলে ফেলেন, স্যাব রাগ করছেন। মেঝের সাহেব নীচু গলায় কি একটা বললেন। একজন এসে ঝ্যাচকা টানে আজীজ মাস্টারের পায়জ্ঞামা নামিয়ে ফেলল। মেঝের সাহেব বললেন, জামাটাও খুলে নাও।

আজীজ মাস্টার দুঃহাতে তার লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করতে লাগল। একটা মদু হাসির শুঙ্গন উঠল চারদিকে। একজন কে যেন কাগজের দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারল আজীজ মাস্টারের পায়জ্ঞামা। মেঝের সাহেব বললেন, তুমি পাকিস্তানীদের ভালবাস?

ছি স্যাব।

ভেরী গুড়। আমাকেও নিশ্চয়ই ভালবাস। বাস না? বল, বলে ফেল।

বাসি স্যাব।

যে তোমাকে নেংটা করে দাঁড়া করিয়ে রেখেছে তাকেও তুমি ভালবাসছ। তুমি তো বিশ্বপ্রেমিক দেখছি।

মেঝের সাহেব অমুচ স্বরে কি একটা বলতেই চারদিকে হাসির বান ডেকে গেল। বদি পাগলা চোখ বড় করে বলল, মাস্টার, তোমার কাপড় কই? এয়াই মাস্টার।

আজীজ মাস্টার ঘোলা চোখে তাকাল তার দিকে। তার বমি-বমি ভাবটা কেটে গেছে। শুধু মাথার পিছন দিকটায় তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটি যত্নণা। মেঝের সাহেব বললেন, আজীজুর রহমান তুমি ভয়ে মিথ্যা কথা বলছ প্রাণে বাঁচবার জন্যে। সত্যি কথা বল তোমাকে রাজড়ে দেব, তুমি কি আমাকে পছন্দ কর?

না।

এইভো আসল কথা বেকচে। তুমি কি চাও এটা বাংলাদেশ হোক?

ছি স্যাব।

তুমি তাহলে একজন দেশপ্রেরী। দেশপ্রেরীর মতৃদণ্ড হওয়া উচিত। আমি সেই ব্যবস্থাই করতে চাই। নাকি তুমি বাঁচতে চাও?

অজীজ মাস্টার জবাব দিল না।

দেরী করবে না। বলে ফেল বাঁচতে চাও কি জুন্যু।

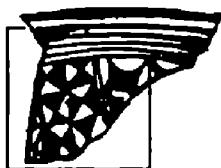
রফিকাউদ্দীন ভয়-পাওয়া গলায় বলল, বলেন ভাই, বাঁচতে চাই। এ রকম করছেন কেন? শুধু শুধু নিজের বিপদ ডেকে আনছেন।

বদি পাগলা আবার কথা বলে উঠল, ও মাস্টার কাপড় পিস। তুমি নেংটা।

আজীজ মাস্টার নড়ল না। মেজের সাহেব বললেন, কাপড় পৰ। কাপড় পৰে আমার সামনে থেকে বিদেয় হয়ে যাও। ক্রিয়ার আউট।

আজীজ মাস্টার কাপড় পৰল না। হঠাৎ এক দলা খুবু ফেলল। সেই খুবু মেজের সাহেবের ডান প্যান্টের হাঁটুর কাছে এসে পড়ল। মেজের সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। চারদিকে কোন শব্দ নেই। আজীজ মাস্টার এগিয়ে এসে আরেক দলা খুবু ফেলল। সেই খুবু মেজের সাহেবের সাটে এসে পড়ল। তিনি শাস্তি স্বরে বললেন, যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। এবার আমরা রওনা হব।

সৈন্যদল ঘার্চ করে এগুচ্ছে। মেজের সাহেবের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। পেছনে মাথা উঠ করে দাঢ়িয়ে আছে একজন নগু মানুষ।



কুকুর

‘কেমন আছেন প্রফেসর সাহেব?’

আমি মনের বিরক্তি গোপন করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললাম, ছি ভাল আছি।

ভদ্রলোক হাসি মুখে বুললেন, বসব ধানিকক্ষণ ?

‘বসুন। আমি অবশ্যি কিছুক্ষণের মধ্যেই বেকুব।’

‘আমাকে কি চিনতে পারছেন?’

‘ছি না।’

‘ও যে ঘোড়ের সিগারেটের দোকানের সামনে আলাপ হল। আপনি সিগারেট কিনছিলেন, আমি পান।’

আমি ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম না। ঘোড়ের পানের দোকানে সামান্য স্মার্টপের পর সারাজীবন কিনে রাখব আমার স্মতিশক্তি এত ভাল নয়। ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, ‘আমার নাম আলমুজ্জামান। পোস্টাল সার্ভিসে ছিলাম। তিনি বছর আগে মিঠায়ার করেছি। এইটথ যে, মঙ্গলবার। এখন ঘরেই থাকি। একটা বাগান করেছি।’

‘ভাল, খুবই ভাল।’

ভদ্রলোক সোফায় বসেছেন। কৌতূহলী চোখে চুম্বিবল দেখছেন। বারবার আমার বইয়ের আলমীরায় তাঁর চোখ আঁচিকে যাচ্ছে। আমি প্রতিত বোধ করছি। এখনি হয়ত বলবেন, আপনার তো অনেক বই। কয়েকটা নিয়ে যাব। পড়ে ফেরত দেব।

আমি এখন পর্যন্ত কাউকে দেখিনি যে বই পড়ে ফেরত দেয়। ইনিও দেবেন তা মনে হয় না। বই নেয়ার ছুতায় রোজ এসে বিরক্ত করবেন। আমি এখন কোন মিশ্রক লোক না যে এই বুড়ো মানুষটির সঙ্গ পছন্দ করব।

‘প্রফেসর সাহেব আপনি কি ভূত-প্রেত এই সব বিশ্বাস করেন?’

‘ছি না করি না।’

‘শুনে ভাল লাগল। আজকাল শিক্ষিত লোক দেখি এইসব বিশ্বাস করে। মনটা খাবাপ হয়। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে সেটা বিশ্বাস করছে আবার ভূতও বিশ্বাস করছে। ফিল্ডিঙ্গের এক প্রফেসরের হাতে দেখেছি চারটা পাথরের আঁশটি।’

আমি চূপ করে রহিলাম। আমার কাছ থেকে উন্নত না পেলে ভদ্রলোকের আলাপের উৎসাহ হয়ত কমে যাবে। তিনি বিদায় হবেন।

‘প্রফেসার সাহেব।’

‘ছি।’

‘আপনি কি কোইনসিডেন্সে বিশ্বাস করেন?’

‘আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।’

‘কাকতালীয় ঘটনা।’

‘আমি এখনো আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।’

‘আরেকদিন আপনাকে বলব। আজ মনে হচ্ছে আপনি একটু বিরক্ত। তক্তে ঘটেমাটা কলা শুরু করলে আপনার বিরক্তি কেটে যেত।’

আমি ভদ্রলোকের কথায় সত্যিকার ‘অথেই লজ্জিত বোধ করলাম। আমি বিরক্ত নিচয়ই হয়েছি কিন্তু সেই বিরক্তি উনি ধরে ফেলবেন তা বুঝতে পারিনি। রিটায়ার্ড মানুষ। একা একা থাকেন। কথা বলার সঙ্গী তো তাঁদেরই দরকার।

‘প্রফেসার সাহেব, উঠি।’

‘উঠবেন?’

‘ছি। আজকাল কোথাও বেশিক্ষণ বসি না। রিটায়ার্ড মানুষদের কেউ পছন্দ করে না। সবাই ভাবে সময় নষ্ট করার জন্যে গিয়েছি। তাছাড়া মানুষদের সঙ্গ আমি নিজেও যে খুব পছন্দ করি তা না।’

‘আপনি আসবেন, আপনার সঙ্গে গল্প করব। কোন অসুবিধা নেই। আজ অবশ্যি একটু ব্যস্ত।’

‘গল্পগুজব আমি তেমন পারি না। কোইনসিডেন্সের একটা ব্যাপার আমার জীবনে আছে — ঐ গল্পটা ছাড়া আমি কোন গল্প জানি না। গল্পটা খুবই ব্যক্তিগত। এই জীবনে অল্প কয়েকজনকে বলেছি। আপনাকে কেন জানি বলার ইচ্ছা করছিলুম।’

‘অবশ্যই বলবেন।’

‘আপনি যদি দয়া করে একটু বাবান্দায় আসেন তাহলে আমার বাসাটা আপনাকে দেখাতাম। হঠাৎ কোন একদিন চলে এলে ভাল লাগত।’

আমি বাবান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক হাতে উচ্চাত্তরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একতলা একটি বাড়ি দেখালেন। পুরানো বাড়ি। দোতলার অক্ষয় শুরু করা হয়েছিল। শেষ হয়নি। বাড়ির সামনে দুটা জড়াজড়ি কাঁঠাল গাছ।

‘একদিন যদি আসেন আপনার ভাল লাগবে। আমার জীবনের কোইনসিডেন্সের ঘটনাটাও শনবেন।’

‘জি আছা, একদিন যাব।’

‘আমার নামটা আপনার মনে আছে তো?’

‘জি আছে।’

‘নামটা বলুন তো?’

আমি দ্বিতীয়বার লজ্জা পেলাম। কারণ, ভদ্রলোকের নাম কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ভদ্রলোকের স্বভাবও এমন বিচ্ছিন্ন যে, আমার লজ্জা বুঝতে পেরেও জ্বাবের জন্যে যাথা নিচু করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

‘নামটা বোধ হয়ে আপনার মনে পড়ছে না, তাই না?’

‘জি—না।’

‘মনে থাকার কথাও না। আন-কমন নাম মানুষের মনে থাকে। আমার নাম খুবই কমন, আলীমুজ্জামান। একদিন আসবেন আমার বাসায় দয়া করে। ঘটনাটা বলব। শুনতে আপনার খারাপ লাগবে না।’

‘জি আছা, আমি যাব। খুব শিগগিরই একদিন যাব।’

এক বহুস্পতিবার বিকেলে ভদ্রলোকের বাসায় উপস্থিত হলাম। গল্প শোনার আগ্রহে নয়। লজ্জা কাটানোর জন্যে। ভদ্রলোক ঐদিন আমাকে খুব লজ্জায় ফেলে ছিলেন।

বাসায় চুক্তে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সাধারণ একটা বসার ঘর। বেতের কয়েকটা চেয়ার। দেয়ালজোড়া বইয়ের আলমীরা। খুব কম করে হলেও হাজার পনেরো বই ভদ্রলোকের সংগ্রহে আছে। কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত বই থাকে আমার জানা ছিল না। নিজের অজ্ঞানেই আমি বললাম — অপূর্ব!

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, বলেছিলাম না, আমার বাসায় এলে আপনার ভাল লাগবে।

‘আপনার বইয়ের সংখ্যা কত?’

‘মোল হাজারের কিছু বেশি। আমার শোবার ঘরেও বেশকিছু বই আছে। আপনাকে দেখাব।’

‘সব আপনার নিজের সংগ্রহ?’

‘আমার বাবার সংগ্রহ অনেক আছে। বই কেনার বাতিক বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। বই—পাগল লোক ছিলেন। খুব বই পড়তেন। আমি তাঁর মত পড়তে পারিনাক অনেক বই আছে আমি কিনে রেখেছি, এখনো পড়িনি।’

‘এখন তো প্রচুর অবসর। এখন নিষ্কয় পড়ছেন।’

‘আমার চোখের সমস্যা আছে। বেশিক্ষণ এক নাগাড়ে পড়তে পারি না। আমি খুব খুশ হব যদি আমার লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে আপনি পড়েন। বই তো পড়ার জন্যেই। আলমীরায় সাজিস্বে রাখার জন্যে না।’

‘আপনি কি সবাইকেই বই পড়তে দেন?’

‘জি দেই।’

‘তারা বই ফেরত দেয়?’

‘অনেকেই দেয় না। সেই সব পরে কিনে ফেলি। আমার সংসার ছেট। একটা মাত্র

মেয়ে, স্ত্রী মাবা গেছেন। সংসারের তুলনায় টাকা-পয়সা ভালই আছে। বই কেনায় একটা অংশ ব্যয় করি। আপনি ঘুরে ঘুরে বই দেখুন। আমি চা নিষে আসছি।'

'চা লাগবে না।'

'কেন লাগবে না? চা খেতে খেতে গল্প করব। আমাব ঘটনাট আপনাকে বলব। আপনাকে বলার জন্যে আমি এক ধরনের আগ্রহ অনুভব করছি।'

'কেন বলুন তো?

'আপনি বিজ্ঞানের মানুষ। আপনি শুনলে একটা ব্যাখ্যা হয়ত দাঁড় করতে পারবেন। অবশ্যি ব্যাখ্যার জন্যে আমি খুব ব্যস্তও না। প্রতিটি বিষয়ের পেছনে একটা কার্যকারণ যে ধাকতেই হবে এমন তো কোন কথা না। আমরা কোথেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি — এই বিষয়গুলির তো এখনো মীমাংসা হয়নি, কি বলেন প্রফেসর সাহেব . . .'

অন্য সময় হলে এই ভদ্রলোকের কথায় আমি তেমন কোন শুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু যার বাড়িতে বইয়ের সংখ্যা ষোল হাজার তার কথা মন দিয়ে শুনতে হয়। তার তুচ্ছতম কথাও অগ্রহ করা যায় না।

ভদ্রলোকের গল্প সেই কারণেই অতি আগ্রহ নিয়ে শুনেছি ঠিক সেইভাবে বলার চেষ্টা করছি। ভদ্রলোক গল্পের মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে ইংরেজীতে বলা শুরু করেছেন। আমি তা করছি না। কোন রকম ব্যাখ্যা বা টীকা তিনিও দিচ্ছি না। পুরোটা পাঠকদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

ভাই, ঘটনাটা তাহলে বলা শুরু করি।

কিছু কিছু মানুষ আছে পশ্চ-প্রেমিক। কুকুর-বেড়াল, গরু-ভেড়া এই সব জন্মের প্রতি তাদের অসাধারণ শ্রদ্ধা। রাস্তায় একজন ভিথুরি চিংকার কাব কুঁঁচলে শে ভিথুরির কাছে এগিয়ে যাবে না কিন্তু একটা বিড়াল কুঁইকুঁই করে কাঁদলে ছুটে যাবে, বিড়ালটাকে পানি খাওয়াবে।

আপনাকে শুরুতেই বলে রাখি — আমি এ রকম কোন পশ্চ-প্রেমিক না। কুকুর-বেড়াল এইসব আমার অপছন্দের প্রাণী। একটা গরু বা ভেড়ার গায়ে আমি হাত দিতে পারি কিন্তু কুকুর বা বেড়ালের গায়ে হাত দিতে আমার দেশ্মা লাগে। তাছাড়া ডিপথেরিয়া, স্মোকিংকে এইসব অসুখ এদের মাধ্যমে ছড়ায় — এটাও আমি সব সময় মনে রাখি।

যাই হোক, মূল গল্পে ফিরে যাই। আমি তখন ইটারমিডিয়েট ফ্লাইট ইয়ারে পড়ি। শীতকাল। কলেজে প্রাকটিক্যাল শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সঙ্গী হয়ে যায়। তখন পড়ি কুমিল্লা ভিস্টোরিয়া কলেজে। আমাদের বাসা ঠাকুরপাড়ায়।

একদিন বাসায় ফিরছি। দিনটা মনে আছে — বৃথাবার। সঙ্গী মিলিয়ে গেছে। গায়ে গরম কাপড় ছিল না। প্রচণ্ড শীত লাগছে। বাসার কাছকাছি এসে দেখি পাড়ার তিন-চারটা ছেলে কাগজ, শুকনো কাঠ এইসব জড় করে আগুন করছে। আমাদের সামনের বাসার নান্টুকেও দেখা গেল। যথা ত্যাদড় ছেলে। তার হাতে একটা কন্ট্রুয়েশন। ছান্টার গায়ে কাপড় জড়ান। শুধু মুখ বের হয়ে আছে। কুকুরছানা আরামে কুঁইকুঁই করছে।

আমি বললাম, কি হচ্ছে রে নাটু?

নান্টু দাঁত বের করে হাসল। অন্য একজন বলল, নান্টু কুকুরকে ক্ষব্ল পরিয়েছে। শীত

লাগে তো এই জন্মে। দলের বাকি সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। ছেলেগুলির বয়স দশ থেকে এগারোৰ মধ্যে। এই বয়সের বালকরা সব সময় খুব আনন্দে থাকে। নানা জায়গা থেকে আনন্দের উপকৰণ সংগ্রহ করে। কুকুরকে কাপড় দিয়ে মোড়া হয়েছে এতেই তাদের আনন্দের সীমা নেই।

মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হচ্ছে আনন্দে অংশগ্রহণ করা। আমি ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমার এগিয়ে যাওয়াটা কেউ তেমন পছন্দ করছে না। মুখ চাওয়া-চাওয়া করছে। হয়ত তারা চারু না ছেটদের খেলায় বড়ো অংশগ্রহণ করুক। নান্টুকে খুবই বিরক্ত মনে হল।

ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ান মাত্র কেরোসিনের গন্ধ পেলাম। হয়ত বাসা থেকে কেরোসিন এনে কেরোসিন ঢেলে আগুন করেছে। বালকরা কায়দা-কানুন করতে খুব ভালবাসে।

‘কেরোসিন দিয়েছিস না-কি?’

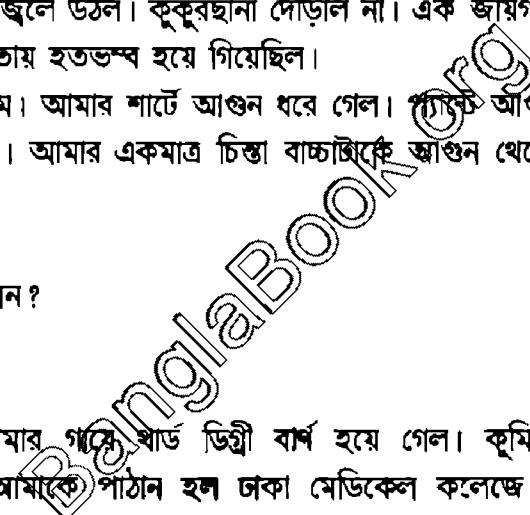
কেউ কোন জবাব দিল না। নান্টুর মুখ কঠিন হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। নান্টু বলল, আপনি ঢেলে যান। তার গলা কঠিন। চেখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাকিয়ে দেখি নান্টুর কোলের কুকুরছানা ভিজে চুপচুপ করছে। বুকটা খুক করে উঠল। এরা কুকুর ঘনাটার গায়ের কাপড় কেরোসিন দিয়ে চুবিয়েছে না-কি? নতুন কোন খেলা? একে আগুনে ছেড়ে দেবে না তো? শিশুরা মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর খেলায় মেঠে উঠে। আমি কড়া গলায় বললাম, এই নান্টু, তুই কুকুরটার গায়ে কেরোসিন ঢেলেছিস?

নান্টু কঠিন মুখে বলল, তাতে আপনার কি?

‘কেন কেরোসিন ঢাললি?’

নান্টু কিছু বলল না। অন্য একজন বলল, কুকুরটাকে আগুনের মধ্যে ছাড়বে। এর গলায় ঘূংঘূর বাঁধা আছে। আগুনে ছাড়লে এর গায়ে আগুন লাগবে আর সে দৌড়াবে। ঘূংঘূর বাজবে। যত তাড়াতাড়ি দৌড়াবে তত তাড়াতাড়ি ঘূংঘূর বাজবে। এইটাই ঘজা।

আমি হতভম্ব। এবা বলে কি? ছেলেটার কথা শেষ হবার আগেই নান্টু কুকুরছানাটা আগুনে ফেলে দিল। দাউডাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। কুকুরছানা দোড়াল না। এক জ্বায়া দাঙিয়ে রইল। হয়ত বা সে মানুষের নিষ্ঠুরতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

আমি আগুনের উপর লাফিয়ে পড়লাম। আমার শাঠে আগুন ধরে গেল।  আগুন ধরে গেল। এইসব কিছুই গ্রাহ্য করলাম না। আমার একমাত্র চিন্তা বাচ্চাজীকে আগুন থেকে বের করতে হবে।

আলিমুজ্জামান সাহেব থামলেন।

আমি বললাম, বের করতে পেরেছিলেন?

‘হ্যাঁ।’

‘বাচ্চাটা বেঁচেছিল?’

‘না বাঁচেনি। বাঁচার কথা না। আমার গায়ে খাউড় ডিহী বার্ষ হয়ে গেল। কুমিল্লা মেডিকেল কিছুদিন থাকলাম। তারপর আমাকে পাঠান হল জকা মেডিকেল কলেজে। দু'মাসের উপর হাসপাতালে থাকতে হল। এক পর্যায়ে ডাক্তাররা আমাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। সেই সময় বার্গ-এর চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। স্ক্রিন গ্রাফেটিং

হত না। অল্পতেই শৰীরে ইনফেকশন হয়ে যেত। যাই হোক, বেঁচে গেলাম তবে সেই বছর পরীক্ষা দিতে পারলাম না।'

আলীমুজ্জামান সাহেব নিষ্ঠুস নেবাব জন্যে আয়ামাত্ আমি কলাম, আপনি একজন অসাধারণ মানুষ

'বেঁচেই না। আমাকে বোকা কলতে পারেন। সামান্য একটা কৃকুবছনার জন্যে নিজের জীবন যেতে বসেছিল। তখন সবাই আমার বোকামির কথাটা আলোচনা করত। আমার নিজেরো মাঝে মাঝে ঘনে হয়েছে হয়ত বোকামির করেছি। একজন মানুষের জীবন কৃকুবের জীবনের চেয়ে অবশ্যই মূল্যবান।'

'আপনার গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছি।'

'এটা কিন্তু গল্প না। এটা গল্পের ভূমিকা — মূল গল্প এখন বলব।'

ঢাকা থেকে সুন্দর হয়ে বাসায় ফিরেছি। শৰীর তখনো খুব দুর্বল। ডাঙ্কার বলে দিয়েছে প্রচুর রেস্ট নিতে। শুয়ে-বসেই দিন কাটছে। আয়াব ঘর দোতলায়। মাথার কাছে বিরাট জানালা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগে না।

এক রাতের কথা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ফকফকে জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নায় অস্তুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। রাজ্যের কৃকুব এসে জড় হয়েছে বাসার সামনে। কেউ কোন সাড়েশব করছে না বা ছোটছুটি করছে না। সব কটা মৃত্তির মত বসে আছে। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা কি?

এক সঙ্গে এতগুলি কৃকুব আমি এর আগে কখনো দেখিনি। এদের এই জাতীয় আচরণের কথাও শুনিনি। আমাকে দেখে এবা সবাই মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি — দেখি, হঠাৎ তাদের মধ্যে এক ধরনের চাপ্পল্য দেখা গেল। এবা একে একে চলে গেল। যেন ওদের কোন গোপন অনুষ্ঠান ছিল, অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে — এখন চলে যাচ্ছে।

এই ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটতে লাগল। নিদিষ্ট কোন সময় না। মাসে একবার কিংবা দুমাসে একবার এবকম হয়।

এবকম একটা ঘটনা চাপা থাকার কথা নয়। সবাই জেনে গেল। অনেকেই দৃশ্য স্মরণে কৃকুবের দল দেখতে আসত। খবরের কাগজেও ঘটনাটা উঠেছিল। দৈনিক আজাদে। ক্যাপশন ছিল — কৃকুবের কাণ।

আমার ছোটবোন আমাকে খুব ক্ষেপাত। সে বলত কৃকুবের জন্মে তুমি জীবন দিতে যাচ্ছিলে, কাজেই তারা তোমাকে তাদের রাজা বানিয়েছে। তুমি হচ্ছ “কৃকুব-রাজা”।

আমার বাবা পরের বছর বদলি হয়ে পাবনা চলে গেলেন। আমিও বাবার সাথে গেলাম। সেখানেও একই কাণ। এক মাস দুমাস পরপর হঠাৎ রাজ্যের কৃকুব বাসার সামনে এসে জড় হয়। মৃত্তির মত চুপচাপ বসে থাকে। এক সময় মাথা নিচু করে চলে যায়। যেখানে গিয়েছি এই কাণ ঘটেছে। যেন কোন-এক অস্তুত উপায়ে ক্ষেত্রব্য আমার খবর পৌছে দিয়েছে। শুধু তই না, আমার মনে হয় কৃকুবরা আমাকে শহীদ দেয়। আমি যখন রাস্তায় হাঁটি, একটা দুটা-কৃকুব সবসময় আমার সঙ্গে থাকে।

আজ আমার বয়স সাতষটি। আজো এই ব্যাপার ঘটেছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, বলেন কি ?

‘যা কলছি তার মধ্যে এক বর্ণ মিথ্যা নেই। তবে কুকুরের সভা আগের যত ঘনঘন হয় না। ছ’ যাসে এক বছবে একবার হয়। তবে হয়। কুকুরের ভাষা আমি জানি না। জানলে জিজ্ঞেস করতাম, তোমরা কি চাও? এইসব কেন তোমরা কর?’

‘ব্যাপারটা কি আপনার পছন্দ হ্ব না ?’

‘না, পছন্দ হয় না। একদিন দু’দিনের ব্যাপার হলে হয়ত পছন্দ হত। একদিন দু’দিনের ব্যাপরে তো নয়। দিনের পর দিন ঘটছে।’

‘ভবিষ্যতে আবারো হবে বলে কি আপনার ধারণা ?’

‘হ্যাঁ হবে। আজ রাতেও হতে পারে। আপনি কি দেখতে চান?’

বলতে বলতে অলীমুজ্জামান সাহেবের চোখ-মূখ বিকৃত হয়ে গেল। যেন তিনি প্রচণ্ড রাগ করছেন। যেন এই মুহূর্তে টেঁচিয়ে উঠবেন। আমি বললাম, আপনি মনে হয় পুরো ব্যাপারটায় শুধু আপসেট। এতে আপসেট হবার কিছু নেই। পক্ষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে – – এতে রাগ হবার কি আছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অধিকার নিশ্চয়ই পশুদেরও আছে।

‘এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন ব্যাপার নয়। এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার। সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার।’

‘এর মধ্যে সুপার ন্যাচারালের অংশ কোনটি?’

‘পুরো ব্যাপারটিই সুপার ন্যাচারাল। এই অংশটি আপনাকে বলিনি বলে আপনি বুঝতে পারছেন না।’

‘বলুন শুনি।’

‘যে কুকুরছনাটিকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম সেই কুকুরছনাটি দলটার মধ্যে সব সময় থাকে। পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া একটা কুকুর। গলায় ঘৃঘৰু বাঁধা। কুকুরছনাটা মাথা দুলায় আর ঘৃঘৰুরের শব্দ হয়।’

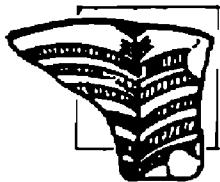
‘আপনি ছাড়া অন্যাও কি এই কুকুরছনাটা দেখে?’

‘না, আর কেউ দেখতে পায় না। শুধু আমি দেখতে পাই। দেখুন ভাই, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র না। আমার বিষয় ইতিহাস। তবু অবৈজ্ঞানিক কোন কিছুই আমি আমার জীবনে প্রচলণ করিনি। ভূত-প্রেত, ঝাড়-ফুক, পীর-ফকির কিছুই না। অথচ সেই আমাকেই কিনা সারাজীবন একটি অতিপ্রাকৃত বিষয় হজম করে যেতে হচ্ছে।’

আমি বললাম, আবার কখনো এরকম কিছু হলে আপনি দয়া করে আমাকে খবর দেবেন। তিনি জ্বাব দিলেন না।

আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তার পাঁচ মাস পর রাত দশমিম টেলিফোন বেজে উঠল। অলীমুজ্জামান সাহেব টেলিফোন করেছেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ওরা এসেছে। আপনি কি আসবেন?

শ্বাগণ মাসের রাত। বাইরে ঝূঁম বষ্টি হচ্ছে। মেজের বাইরে পা দিলেই এক হাঁটু পানি। এমন দূর্ঘাগ্রের রাতে কোথাও যাবার প্রশ্নই থাকে না। আমি টেলিফোন নামিয়ে বিছানায় চাপবের নিচে ঢুকে পড়লাম।



একজন সুখী মানুষ

জাকের সাহেবের বয়স ছাঞ্চাম।

কিছুদিন আগেও তাঁর বয়স ছাঞ্চামই মনে হত। এখন হঠাৎ যেন তাঁর বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে। আয়নার দিকে তাকালেই মনে হয় সক্তর বছরের এক অচেনা বুড়ো। অর্থাৎ তিনি একজন সুখী মানুষ। অসম্ভব সুখী। সুখী মানুষের বয়স বাড়ে না। কিন্তু তাঁর বেলায় এরকম হচ্ছে কেন?

তিনি দাঢ়ি কামাতে কামাতে এইসব ভাবতে লাগলেন। সম্ভবত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ঘ্যাস করে তাঁর গাল কেটে গেল। বড় বড় কয়েকটা ফেঁটা রক্ত পড়ল বেসিনে। অনেকখানি কেটেছে কিন্তু আশ্চর্ষের ব্যাপার হচ্ছে ব্যথা লাগছে না। বয়সের লক্ষণ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্নায় অসাড় হয়ে আসে। ব্যথাবোধের তীব্রতা কমে আসে।

জাকের সাহেব ডান হাতের আঙুলে গাল চেপে ধরে অভ্যাসের বসেই বলেন, ‘উহ’। বলে তিনি নিজে খুবই অবাক হয়ে গেলেন। ‘উহ’ বলার কোন দরকারই ছিল না। কেন বললেন?

নাস্তার টেবিলে মিলির সঙ্গে দেখা হল। মিলি তাঁর বড় মেয়ে। নাস্তার সময়টাতে সে বাবার সামনে বসে পরপর দু'কাপ চা খায়। অল্প কিছু কথাবার্তা হয়। আজ মিলি অস্বাভাবিক গভীর। অনেকক্ষণ সে বাবার দিকে তাকালেই না।

জাকের সাহেব এক চুমুকে কমলার রসটা খেয়ে ফেললেন। সিরিয়েলের বাটিতে দুধ ঢাললেন। চিনি মেশালেন। শুকনো চোখে তাকালেন ঝুঁটি মাখনের প্লেটের দিকে। আরেকটি বাটিতে গাঢ় লাল রঞ্জের কি একটা তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে। টিমেটোর স্যুপ নাকি? স্যুপ আগে খাওয়া দরকার ছিল। কোন কিছুই মুখে নিতে ইচ্ছা করছে না। ঝুঁটি নষ্ট হয়ে গেছে। বয়সের লক্ষণ। একটা বয়সে ভাল কিছু আর খেতে ইচ্ছা করে না।

বাবা, তোমার গালে কি হয়েছে?

কিছু না।

কিছু না মানে? গাল তো অনেকখানি কেটেছে।

হঠাৎ করে শেভ করতে গিয়ে . . .।

ইলেক্ট্রিক শেভার ব্যবহার করনি?

জাকের সাহেব চুপ করে রইলেন। এই যত্নটি তাঁর পছন্দ নয়। চালু করলেই বিজ্বিজ
শব্দ হয়। গালে ছোঁয়ালেই সমস্ত শরীর শিরশির করতে থাকে।

বাবা, কাটা জায়গায় কিছু দিয়েছ?

না।

স্যান্ডলন-ট্যাভলন কিছুই না?

না।

মিলির মুখ আরো গঞ্জীর হয়ে গেল। জাকের সাহেব শুধু ব্রিত বোধ করতে লাগলেন।
একি বাবা, তুমি ডিমটা খাচ্ছ না কেন?

ইচ্ছা করছে না।

ইচ্ছা না করলে তো হবে না। দুদিন পরপর তোমাকে একটা ডিম খেতে হবে। এই বয়সে
তোমার ডায়েট ঠিক রাখা খুবই জরুরী।

তাত্ত্ব ঠিকই।

আজ ভাস্তুর সাহেব আসবেন না?

ই আসবেন।

গালটা তাঁকে দেখাবে।

ঠিক আছে।

কোন জিনিস অবহেলা করতে নেই।

তা তো ঠিকই।

তিনি সিঙ্ক ডিমে গোলমরিচের গুড়া ঢালতে ঢালতে সেটাকে কালো বানিয়ে ফেললেন।
ডিমটা শেষ করতে তাঁর অনেক সময় লাগল। কিছুতেই গলা দিয়ে নামতে চাচ্ছ না।
দুএকবার বমির ঘত হল। চমৎকার সব সুখাদ্য কিন্তু খাওয়া যাচ্ছে না। বয়স দ্রুত বাড়ছে।
আজকাল অল্প ইঁটলেই বুকে হাঁপ ধরে। সিডি বেয়ে উঠবার সময় রেলিং ধরে ধরে উঠতে
হয়। অথচ তাঁর বয়স মাত্র ছাপ্পাম।

জাকের সাহেব ইঁটিতে বেকলেন। গালের কাটায় চিন্চিমে একটা ব্যথা হচ্ছে। কেন
হচ্ছে কে জানে। বেকবার সময় তাঁর জামাই তাঁকে খানিকটা ভয় পাইয়ে দিয়েছে। চিন্তিত
মুখে বলেছে, গাল হচ্ছে শরীরের সবচেয়ে সেনসেটিভ পার্ট, একে মোটেই অবহেলা করা উচিত
না। সামান্য ক্ষতেই সেপটিক হয়ে সিরিয়াস ব্যাপার হতে পারে।

জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা বিশেষ হয় না। শরীর খারাপ হলে বা অসুখ বিসুখ
হলেই সে শুধু খোঞ্জ নিতে আসে। আজ যেমন নিয়েছে। রাতেও একবার খোঞ্জ নেবে।

জাকের সাহেব রাস্তার মোড়ের এক পানওয়ালার দোকান থেকে একটা ফাইভ ফাইভ
কিনলেন। তখন মিহির বাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। মিহির বাবু পাশের বাড়িতে থাকেন।
অল্পদিন হল রিটায়ার করেছেন। মিহির বাবু অবাক হয়ে বললেন, সিগারেট কিনলেন নাকি?

ছি।

আপনি সিগারেট খান জ্বানতাম না তো।

থাই না। এই আজ একটা কিনলাম।

কোন উপলক্ষ্য নাকি?

না, না উপলক্ষ্য কিছু না, এমনি।

জাকের সাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন। মিহির বাবু বললেন, কোথাও যাচ্ছেন না কি?

ছি না, একটু ইঁটাছি। মনিং ওয়াক।

সকাল দশটায় মনিং ওয়াক?

না মানে এই ইঁটা আর কি?

আপনার ছেলেরা কাল আছে?

ক্ষি ভাল।

তাবা যেন কোথায় আছে?

জাকের সাহেব অস্ট্রেল গলায় বললেন, দুঃজনেই আমেরিকাতে। একজন নর্থ ডাকোটায়, অন্যজন সিয়াটলে।

আবেক মেস্টেজাই জাপান না কোথায় আছে বলেছিলেন যেন।

হনলুলু।

আপনি তো ভাই সুখী মানুষ।

তা ঠিক।

চিন্তা-ভাবনা কিছু নাই। এখন শুধু দেশে বিদেশে ঘূরে বেড়ানো। আজ জাপান, কাল আমেরিকা, পরশু হনলুলু।

জাকের সাহেব লঙ্ঘিতে হাসলেন। সিগারেট টানাব জন্মেই বোধ হয় তাঁর মাথা হাল্কা হাল্কা লাগছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। একটা পান খেতে পারলে হত। যিহির বাবু বিষর্ঘ ভঙ্গিতে বললেন, আমার অবস্থাটা দেখুন, দুটা মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নাই। এর মধ্যে রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেল। যাই কোথায় এখন বলুন? জীবনে একটা বাড়ি-টাড়ি করতে পারলাম না। এখন যাচ্ছি গোরান। পাঁচটা টাকা নিয়ে বের হয়েছি কারণ কি জ্ঞানেন?

না।

বেশী নিলে যদি খরচ হয়ে যায় সেই ভয়ে। আচ্ছা ভাই গেলাম। বাস ধরতে হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে জাকের সাহেবও পাঁচটা টাকা নিয়ে বের হয়েছেন। নগদ টাকা তাঁর কাছে থাকে না। অবশ্যি থাকার প্রয়োজনও তেমন নেই। নগদ টাকা দিয়ে তিনি কি করবেন? প্রতিদিন বাজারে যাবার আগে তোতা মিয়া এসে জিজ্ঞেস করে, আপনার কিছু লাগবে? লাগলে কন।

মিলি সব সময়ই বলে, বাবা তোমার প্রচুর টাকা আছে। তোমার দ্বাই ছেলে প্রতিয়াসে যত টাকা পাঠায় সেটা তুমি এই জীবনে খরচ করে শেষ করতে পারবে না। সব আলাদা করা আছে, যখন যা লাগবে বলবে।

তা তো বলবই।

কোন লজ্জা করবে না।

না লজ্জা কি জন্মে?

যদি কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যেতে ইচ্ছা করে বলবে।

নিশ্চয়ই বলব।

যখন যত টাকা লাগে চাইবে আমার কাছে। ক্যাশ দ্বিতীয় তোমার ঘরে আখতে চাই না। পাঁচ ছক্ষন কাজের লোক। নগদ টাকা দেখলে লোভ সম্ভাব্য পারবে না। শেষে স্বত্বাব নষ্ট হবে।

তা ঠিক।

তোমার যখন যা ইচ্ছা করে আমাকে বলবে।

ই বলব।

জাকের সাহেব বলার মত তেমন কিছু কথনো খুঁজে পাননি। ষে ঘবে তিনি থাকেন সে ঘবে লাল রঙের ছেট এটা ফ্রীজ আছে। বার ইঞ্জি একটা রঙিন টি.ভি আছে। যে খাটে তিনি ঘূমান তার গদিটি আট ইঞ্জি ফোরে।

বিছানার পাশেই বেতের একটা ইঞ্জি চেয়ার। হাতের কাছে বইয়ের শেলফ। নিউজ উইক এবং টাইম এই দুটি পত্রিকা শুধু তাঁর জন্যেই রাখা হয়। একজন ডাক্তার আছেন যিনি সপ্তাহে একবার (বুধবার সক্ষ্য) এসে তাঁর ব্লাড প্রেসার মেপে যান। মিলি ঘড়ির কাটা ধরে প্রতি রাত দশটায় এসে বাতি নিভিয়ে যায়। রাত জাগলে তাঁর শরীর খারাপ করবে, তাই। তাঁর খাটের পাশে একটা সুইচ আছে যা টিপলেই রান্না ঘরে কলিং বেল বেজে উঠে। তোতা মিলা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে কিছু লাগবে কিনা।

গত সপ্তাহেই ছেট ঘেয়ের চিঠি পেলেন। সে লিখেছে,

বাবা, তুমি কি হনলুলু বেড়াতে আসতে চাও? তিনি মাসের ডিজিটার্স ভিসা নিয়ে চলে এসো না। তোমার খারাপ লাগবে না। বড় আপার চিঠিতে দেখলাম তুমি সারাঙ্কণ বিষণ্ণ হয়ে থাক। এর কারণ কি? তোমার কি কোন কিছুর অভাব আছে? মিলি কি তোমার যত্ন-টত্ত্ব ঠিকমত করছে না? কোন রকম সংকোচ না করে লিখবে।

তাঁর কোন অসুবিধা নেই। মিলি তাঁর খুব ভাল যত্ন করছে। তিনি যথেষ্ট সুধে আছেন। তাঁর এখন মনেই পড়ে না এক কালে তিনি দরিদ্র ছিলেন। চারটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে গিয়ে যাথা খারাপের জেগাড় হয়েছিল। এক সময় এও ভেবেছিলেন ফয়সল আই.এস.সি পাশ করামাত্র তাকে কোন একটা চাকরিতে দুর্বিয়ে দেবেন। ভাগিয়স সেরকম কিছু করেননি। অমানুষিক কষ্ট করেছেন ছেলেদের জন্য। তারাও মনে রেখেছে সে সব।

যেবার তাঁর রক্ত আমাশা হল কি ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। প্রতিরাতে টেলিফোন। এতদূর থেকে টেলিফোন নিচয়ই ছসাত শ' টাকা করে লাগত। বড় ছেলে মাসিক বরাদ্দের টাকা ছাড়াও বাড়তি এক হাজার ডলার পাঠিয়েছিল চিকিৎসা খরচের জন্যে। মিলিকে লিখেছে — বাবার সেবা—যত্নের জন্যে চক্রিশ ঘণ্টার একজন নার্স রেখে দেবে। খরচের জন্য চিক্ষা করবে না।

তাঁর দু' ছেলেরই হাত খুব দরাজ। তাদের কথা মনে হলেই একটা তৃণির ভাব আসে, মন ভাল হয়ে যায়। তারা অনেক কিছু করেছে তাঁর জন্যে কিন্তু তিনি নিজে কোথা-মার জন্যে কিছুই করতে পারেননি। তাঁর বাবা শেষ বয়সে বড় ভায়ের সঙ্গে থাকতেন। বড় ভাই ঘন ঘন চিঠি লিখতেন।

“বাবাকে আমার ঘাড়ে ফেলিয়া তোমরা সকলে কি প্রকারে নিষ্কাশ আছ তাহা আমি বুঝতে পারি না। বুদ্ধ পিতা-মাতাকে পালন করিবার দায়িত্ব কি আমার একার? তোমার কি কিছুই করিবার নাই? এই পত্র পাওয়ামাত্র বাবার খরচ হিসাবে অতি অবশ্যই পর্যাপ্ত টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইব। আমি বিশেষ অসুবিধাও আছি।”

এ জাতীয় চিঠি তিনি সব সময় উপেক্ষা করেছিলেন সে জন্যে অবশ্যি তার মনে কোন অপরাধবোধ নেই। তিনি দরিদ্র ছিলেন। খুবই দরিদ্র। বাবাকে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

জাকের সাহেব দুপুর এগারোটার দিকে বাসায় ফিরলেন। মিলি বিকল্প হয়ে বলল,

কেৰাব কেৰাব পুৱছিলে বোনেৰ মধ্যে ? তিনি অপ্রতিভ ভঙ্গিতে হাসলেন।

কিছু খাবে এখন ?

না।

ঠাণ্ডা কিছু খাও। বেলেৰ সৱকত কৱে দিক ?

ঠিক আছে দিতে বল।

তুমি ঘৰ থেকে বেৱবাৰ পৱপৰ ফয়সল টেলিফোন কৱেছিল। গাল কাটাৰ খবৰ বললাম। সে খুব বিৱক্ষ হয়েছে। বাৱবাৰ বলছিল, বাবা এত অসাৰধান কেন ?

তিনি লজ্জিত বোধ কৱতে লাগলেন। মিলি বলল, এখন থেকে তোতা মিয়া তোমাৰ শেভ কৱে দেবে বুঝলে ?

আচ্ছা।

জাকেৰ সাহেব বৰফ-দেয়া ঠাণ্ডা বেলেৰ সৱকত খুব তঃপৰি কৱে থেলেন। জিনিসটা ভালই। মিলি বলল, সিদ্ধিক আজ আবাৰ এসেছিল।

তিনি শংকিত বোধ কৱলেন। সিদ্ধিক তঁৰ বড় ভায়েৰ ছেলে। কিছুদিন পৱপৰই সাহায্যেৰ জন্যে আসে। মিলি বিৱক্ষ হয়।

আজ এসেই সে একটা মিথ্যা কথা ফেঁদেছে। বলেছে, তুমি নাকি তাকে আসতে বলেছ। তুমি নাকি সেলাই মেশিন কেনবাৰ টাকা দেবে। বলেছ নাকি ?

জাকেৰ সাহেব যাথা নাড়লেন, তিনি কিছু বলেননি। মিলি কঠিন স্বরে বলল, ভিক্ষাবৃষ্টিকে প্ৰশ্ৰয় দেয়া ঠিক না।

তাতো বটেই।

আমি আজ কড়া এক ধৰক দিয়েছি।

ধৰক দেয়াৰ কি দৱকাৰ ছিল ?

ধৰক দেব না ? আমাৰ সামনে এসেট্ৰে মধ্যে কাশ ফেলল। রাগে আমাৰ গা জ্বলে গেছে। তুমি যাও, গৱম পানি কৰা হচ্ছে। গোসল সাৰ। গালে পানি লাগিও না।

ৱাত আটটায় বড় ছেলে সিয়াটেল থেকে টেলিফোন কৱল।

বাবা তোমাৰ গাল কেমন ?

ভাল।

মিলি বলল, তুমি নাকি ইলেকট্ৰিক শেভাৰ ব্যবহাৰ কৰ না ?

এখন থেকে কৱব।

আমৰা খুব চিন্তিত, বুঝলে বাবা ?

বুঝেছি।

নাও, টুকুনেৰ সঙ্গে কথা বল।

টুকুন বাঁলা বলতে পাৱে না। সে একগাদা কথা কলে গৈল। জাকেৰ সাহেব শুধু ঘন ঘন যাথা নাড়লেন এবং ফাঁকে ফাঁকে বললেন, ইয়েস হেন্টেস্ট।

ৱাত দশটাৰ কিছু পৰে ছোট মেয়েৰ টেলিফোন এল ইনলুক থেকে। কানেকশন ভাল নম্ব। কিছুই প্ৰায় শোনা যায় না।

বাবা, তুমি এত অসাৰধান কেন ?

এখন থেকে সাবধান হব।

ভাইয়া টেলিফোন করে আমাকে জানাল। আমি চিন্তায় অশ্রি। খুব বেশী কেটেছে?
না, খুব বেশী না।

বিদেশে থাকি। সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কখন কি ব্যবর এসে পড়ে।
ভয় নাই। আমি অনেকদিন বাঁচব।

কথাটা হয়ত ঠিক। তাদের দীর্ঘজীবী বৎস। তাঁর বাবা প্রায় অমর হয়ে গিয়েছিলেন
চোখে দেখেন না, কানে শুনেন না, উঠে বসতে পর্যন্ত পারেন না, তবু বেঁচে আছেন। তাঁর এত
দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকায় কেন প্রয়োজন ছিল না। বেঁচে থেকে তিনি বড় ভাইকে প্রায় পাগল
করে দিলেন। আর কিছুদিন বাঁচলে বড় ভাই সত্যি সত্যিই হয়ত পাগল হয়ে যেতেন।

তিনিও কি ভাই করবেন? দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে সবাইকে পাগল করে ভুলবেন?

জ্ঞাকের সাহেব বাতি নিভিয়ে ঘূমুতে গেলেন। বাতি বারোটায় তাঁকে ডেকে তোলা হল।
ছেট ছেলে কায়সার টেলিফোন করেছে নর্থডাকোটা থেকে। জ্ঞাকের সাহেব ঘূম-ঘূম চোখে
ওঠে বসলেন। মিলি চমকে ওঠে বলল, কি সর্বনাশ! তোমার গালের এ অবস্থা কেন? সমস্ত
মুখ ফুলে উঠেছে, বাম গাল এমন ফুলেছে যে একটা চোখ প্রায় বক্ষ হয়ে যাবার মত অবস্থা।
মিলি এসে বাবার হাত ধরল।

ইস, এ তো অসম্ভব জ্বর। বাবা তৃষ্ণি শয়ে থাক।

জ্ঞাকের সাহেব শয়ে থাকলেন না। টেলিফোন ধরতে নিচে নেমে গেলেন।

হ্যালো কায়সার?

হ্যাঁ। বাবা তৃষ্ণি কেমন আছ?

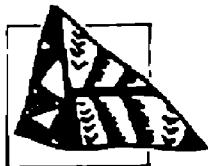
ভাল, খুব ভাল। খুব চমৎকার আছি।

এ পর্যন্ত বলে তিনি হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, এত সহজে আমি
মরছি না। বুঝলি? আমি দীর্ঘদিন বাঁচব। এক সময় চোখে-চোখে দেখব না। কানে শুনব না।
বিছানায় উঠে বসতেও পারব না। তবু বেঁচে থাকব।

এইসব তৃষ্ণি কি বলছ বাবা?

জ্ঞাকের সাহেব হাসতে লাগলেন। একজন সুখী যানুষের হাসি। আনন্দ ও তপ্তির হাসি।

BanglaBook.org



জুয়া

থার্ড পিরিয়ডে প্রণব বাবুর কোন ফ্লাস নেই।

তিনি কমনকমে এসে পত্রিকা খুঁজতে লাগলেন। একটিমাত্র পত্রিকা রাখা হয়। পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেটি হেড মাস্টার সাহেবের ঘরে থাকে। আজ হেড মাস্টার সাহেব আসেননি। তাঁর মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। ছেলের বড় ফুপা এসেছেন। সেই উপলক্ষে তিনি বড় সাইজের কৈ মাছের ধোঁজে গিয়েছেন:

কাজেই কমনকমের টেবিলে পত্রিকাটি পাওয়া গেল। স্তোজ পর্যন্ত খোলা হয়নি। এরকম একটা কড়কড়ে নতুন পত্রিকা পড়ার আনন্দই অন্য রকম। প্রণব বাবু কোণার দিকে ইঞ্জি চেয়ারে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরই তাঁর কপাল দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়তে লাগল। তিনি ভাঙা গলায় ডাকলেন, ‘বশীর মিয়া ও বশীর মিয়া।’

বশীর মিয়া স্কুলের দপুরী। সেও হেড মাস্টার সাহেবের সঙ্গে কৈ মাছের ধোঁজে গিয়েছে। কেউ এল না। ফোর্ম পিরিয়ডে আজিজুন্দীন সাহেব কমনকমে পানি খেতে এসে দেখেন প্রণব বাবু মরার মতো পড়ে আছেন।

প্রণব বাবু, কি হয়েছে?

প্রণব বাবু বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। তাঁর কথা জড়িয়ে গেল। আজিজুন্দীন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, শরীর খারাপ না—কি? এয়াই প্রণব বাবু।

শরীর ঠিক আছে।

আজিজুন্দীন সাহেব কপালে হাত রাখলেন। না কপাল ঠাণ্ডা। ভুব-ভুরি কিছু নেই। প্রণব বাবু দুর্বল কষ্টে বললেন, পানি খাবো। একটু পানি দেন।

মাথা ঘূরছে নাকি? এয়াই প্রণব বাবু?

প্রণব বাবু ফিসফিস করে বললেন, ‘লটারীর রেজাল্ট দিয়েছে।’ আজিজুন্দীন সাহেবের ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সময় লাগল। বেড় ক্রস লটারীর দুটাকা দামের টিকিট সবাইকে একটি করে কিনতে হয়েছে। হেড মাস্টার সাহেব পঞ্চাশটা টিকিট ময়মনসিংহ থেকে নিয়ে এসে গাঁথীর গলায় বলেছিলেন, সবাইকে কিনতে হবে। দেশের কাজ আয়রা শিক্ষকরা যদি না করি কারা করবে? সবার জন্য একটা এগজাম্পল সেট করতে হবে। পাঁচটা করে কিনবেন সবাই:

থার্ড মাস্টার জলিল সাহেব মুখ কালো করে বললেন, ফ্লুমাস ধরে বেতন নাই, এর মধ্যে এই সব আবার কি ঝামেলা স্যার?

দেশের কাজের মধ্যে আবার ঝামেলার কি দেশলেন? পাঁচটা করে কিনবেন সবাই। আর স্কুলেটদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটরের ব্যবস্থা করবেন দেশের কাজ।

পাঁচটা করে টিকিটি কিনতে হল সবাইকে। হেড মাস্টার সাহেব দেশের কাছের জন্য হঠাৎ এতো ব্যস্ত হবার রহস্যও উদ্ধার হল। প্রতি দশটি টিকিটে তাঁর দুটাকা করে লাভ থাকে।

সেই লটারীর রেজাল্ট দেখে প্রণব বাবুর কপাল ঘমজে, কথা জড়িয়ে থাচ্ছে — এব অর্থ কি? আজিজুন্দীন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কি ব্যাপার তাই, কিছু পেয়ে গেলেন নাকি? অ্যাঁ?

প্রণব বাবু জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, প্রেরেছি।

আজিজুন্দীন সাহেব স্তুষিত হয়ে গেলেন। ফ্লাস নাইনে তাঁর ইংরেজী গদ্য পড়াবার কথা, তিনি আর সেখানে গেলেন না। প্রণব বাবুর পাশের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলেন। দুনিয়তে কত অসম্ভব ব্যাপারই না ঘটে। প্রণব বাবু পরশু দিন তাঁর কাছে পঞ্চাশটা টাকা চেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন — হাত একেবারে খালি, কোথায় টাকা পাব? গত মাসেও হাফ বেতন হয়েছে।

আজিজুন্দীন সাহেব ফ্লাস্ট স্বরে বললেন, এরকম ভ্যাবদার মতো বসে আছেন কেন? ফুর্তি-টুর্তি করেন।

কি ফুর্তি করব?

তাও ঠিক। লোকজন এ-রকম হঠাৎ লক্ষপতি হলে কি করে ফুর্তি করে কে জানে। রেজাল্টটা কোথায় দিয়েছে? দেখি পত্রিকাটা?

ফ্লাস নাইনের ছেলেগুলো বড় গুণগোল করছে। একজন এসে কমনরুমে উঁকি দিয়ে দেখে গেল। আজিজুন্দীন সাহেব জ্ঞ কুঁচকে লটারীর খবর দৃশ্যন্বার পড়লেন। তাঁর কাছে কোন টিকিট নেই। তিনি সবগুলো নেজামের চায়ের স্টলে বিক্রি করে ফেলেছেন।

টিফিন পিরিয়ডে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। মাস্টারদের কারো আর ফ্লাস নেবার উৎসাহ রইল না। সবাই কমনরুমে শুকনো মুখে বসে রইলেন। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় ছেলেদের জন্য আনা টিফিন বেঁচে গেছে। লুটি আর বুনিয়া। অন্য সময় হলে টিফিনের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে উৎসাহী আলোচনা চলতো। আজ আর কিছুই জমছে না। ফ্লাস টেনের ছেলেগুলো কমনরুমের দরজার কাছে ঝটলা পাকাচ্ছিল। আজিজুন্দীন সাহেব প্রচণ্ড প্রকৃতি দিলেন, নাটশালা নাকি, অ্যাঁ? যা বাঢ়ি যা। দু'দিন পরে পরীক্ষা, কোনো হিঁশ নাই। গুরুব দলন

হেড মাস্টার সাহেব খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। এবং খুব হৈ-চৈ শুরু করলেন,

স্কুল ছুটি দিয়েছে কে? স্কুল ছুটি দিয়ার মতো কি হয়েছে শুলেন তো? একজন লটারীতে কটা টাকা পেয়েছে আর ওম্বি স্কুল ছুটি? পেয়েছেন কোনো কিছু?

হেড মাস্টার সাহেবের কথায় কারো কোনো ভাবান্তর হল না। এ্যাসিস্টেন্ট হেড মাস্টার সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, কি ভ্যাজব ভ্যাজব করছেন? কে গিয়ে এখন ফ্লাস নেবে?

অসুবিধাটা কি? আমি তো এর মধ্যে অসুবিধার কিছু দেখলাম না।

তিনি ফ্লাস বেতন নাই। এর মধ্যে একজন সুলভ টাকা পেলে মেজাজ ঠিক থাকে?

তিনি ফ্লাস বেতন নাই — কথাটা জেনে টেক্স বললেন না। হাফ বেতন হয়েছে গত মাসে। এস.এস.সি. পরীক্ষার কালেকশন হলে বাকিটা পাবেন। ভালো কালেকশন হবে এইবার।

বশীর মিয়া হেড মাস্টারের সঙ্গে ফিরে প্রসেছে। সে একটি বড় গামলায় তেল-মরিচ

দিয়ে মুড়ি যাখছিল। দুপূরে এটাই স্যাবদের টিফিন। কেরোসিন কুকারে চায়ের পানি ফুটেছে। হেড মাস্টার সাহেব বিরস মুখে বললেন, আজও মুড়ি? আজ একটা ভালো তিফিনের দরকার ছিল।

কেউ কোনো সাড়া দিল না। টিফিন পর্ব শেষ হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। তিচাররা সবাই বাড়ি চলে গেলেন। প্রথম বাবু নড়লেন না। হেড মাস্টার সাহেব এক সময় বললেন, বাড়ি গিয়ে আমোদ-ফুর্তি করেন। চুপচাপ বসে আছেন কি জন্মে?

ভালো লাগছে না, স্যার।

ভালো লাগবে না কেন? আজ তো আপনার ভালো লাগারই দিন।

হেড মাস্টার সাহেব শুকনো গলায় টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন,

জ্ঞান-অবরদণ্টি করে কিনিয়েছি বলেই পেলেন। মনে রাখবেন সেটা। হা-হা-হা। উপকারেব কথা কাবো মনে থাকে না — এইটাই দুনিয়ার নিয়ম।

প্রথম বাবু বিড়বিড় করে কি যেন বললেন, পরিষ্কার বোঝা গেল না। হেড মাস্টার সাহেব শুকনো গলায় বললেন, যে টিকিটে পেয়েছেন সেটা আছে তো? অনেক সময় দেখা যায় টিকিটাই মিসিং। তখন সবই গেল।

প্রথম বাবু মানিব্যাগ থেকে টিকিট বের করে হেড মাস্টার সাহেবের হাতে দিলেন। হেড মাস্টার সাহেব জু কৃক্ষিত করে দোর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন টিকিটের দিকে। তাঁর মেয়ের এই বিয়ের প্রস্তাবটাও হয়তো ভেঙে যাবে। ছেলের ফুপা বলেছে ছেলের নাকি মোটর সাইকেলের খুব শৰ্ক। অজপাড়াগাঁও পোস্ট মাস্টারের ছেলে মোটর সাইকেল দিয়ে করবেটা কি? তেরো টাকার কৈ মাছ জলে গেছে বলাই বাস্তল্য। হেড মাস্টার সাহেব ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, প্রথম বাবু, আপনি এইবার একটা মোটর সাইকেল কিনে ফেলেন।

মোটর সাইকেল দিয়ে আমি কি করব?

চড়বেন, চড়বেন। আপনারই তো দিন-কাল।

হেড মাস্টার সাহেব আবার টেনে টেনে হাসতে লাগলেন।

প্রথম বাবু স্কুল থেকে বেরুলেন সক্ষ্যার পর। তাঁর ধারণা ছিল, বাজারের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অসংখ্যবার লটারীর টাকা পাওয়ার খবর তাঁকে বলতে হবে। কিন্তু সে স্কুল কিছুই হল না। কেউ কি জানে না খবরটা? আশ্চর্য!

তাঁর ছেলে সুবল যেবার যয়মনসিংহে চুরি কেইসে গ্রেফতার হল মেরুক প্রথম বাবুকে অসংখ্যবার ব্যাপারটা বলতে হয়েছে।

ফলস কেইস বোধহয়। কি বলেন প্রথম বাবু? হাজর হলেও আপনার ছেলে। উদ্বলোকের সন্তান।

ফলস কেইস না। চুরি সত্যি সত্যি করেছে।

বলেন কি! ব্যাপারটা ঠিকমতো বলেন তো শুনি বলেন না। এই বাবুকে চা দে।

আজ প্রথম বাবু নীলগঞ্জ বাজারের প্রায় দুর্ঘাস্তে চলে এলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। বাজার থেকে বেরুবার সময় করিম মিয়া চিকন গলায় ডাকল, বাবু একটু শুনে যান তো।

কি ব্যাপার ?

মেট' দুইশ' এপারো টাকা পাওনা । আমরা গরীব ব্যবসায়ী । এতো টাকা আটকা পড়লে চলে ?

দিয়ে দিবো ।

এই কথা তো বাবু দুর্ভিন মাস ধরেই শুনতেছি । নিবারণ সাহার কাছে এই রকম চারশ' টাকা পাওনা । হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে চলে গেল ইশিয়া ।

আমি ইশিয়া যাবো না । ইশিয়াতে আমার কেউ নেই ।

প্রথম বাবুর খুব ইচ্ছা হল লটারীর কথাটা বলেন । কিন্তু বলতে পারলেন না ।

তিনি বাড়ি পৌছলেন রাত আটটার দিকে ! কোনো সাড়া-শব্দ নেই । সাড়া-শব্দ করার লোকও অবশ্যি নেই । চারদিকে ঘৃটঘৃটে অঙ্ককার । তিনি হাতড়ে-হাতড়ে তালা খুললেন । হারিকেন জ্বালালেন । টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা আছে । খান কতক রুটি, একটা ভাজি, এক বাটি তেজুলের টিক । তাঁর রামা হয় জ্যাঠার বাড়িতে । রামা হয়ে গেলে তালা ধূলে খাবার রেখে যায় । সেই বাবদ জ্যাঠার হাতে যখন যা পারেন দেন ।

প্রথম বাবু ফেরোসিন কুকার স্থালিয়ে রুটি গরম করতে বসলেন । তখনই হঠাৎ করে সুবল এসে উপস্থিত । সুবলের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না বললেই হয় । গত ছয়সৱে একবার মাত্র এসেছিল দু'দিনের জন্যে । তিনি কোনো কথা বলেননি । আজ নিজে থেকেই কথা বললেন, আছিস কেমন সুবল ?

আছি কোনো মতো ? তুমি আছে কেমন বাবা ?

খেয়ে এসেছিস নাকি ?

ই মাটন বিবিয়ানী খেয়েছি ইস্টিশনে । জানি তো এতো রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার কোনো আয়োজন তোমার নাই । খাচ্ছা কি তুমি, রুটি নাকি ?

ই । খাবি একটা ?

না ।

প্রথম বাবু খেতে বসলেন । সুবল বাইরের বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরাল । প্রথম বাবু লক্ষ্য করলেন সুবলের গায়ে চকচকে একটা শার্ট থাকলেও তার পায়ের চাষড়া^{জ্বালা} জোড়াতে তালি পড়েছে । যে মোটর সপে মেকানিকের কাজ শিখতো সেখানে প্রয়োজন কড়ি বোধহয় কিছুই দেয় না ।

তাঁর মনে পড়ল দুশ্মাস আগে আড়াই শ' টাকা চেয়ে ভুল বানানে^{ভুল} পাতার একটা চিঠি লিখেছিল সুবল । তিনি জবাব দেননি । এবারো টাকার জন্যেই ক্লেষ্ট্য এসেছে ।

বাবা ঘরে চায়ের পাতা আছে ?

আছে বোধহয় । দেখ তো হুলিঙ্গের বোতলটার মধ্যে ।

সুবল চায়ের পানি চাপিয়ে ঘুস্বরে বলল, তোমার কাছে তিনশ' টাকা হবে বাবা ? আমার খুবই দরকাব ।

প্রথম বাবু অনেকক্ষণ ছেলের দিকে তাকিছে^{মাইলেন} ।

বাবা খুব ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি । একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে বাবা ।

তাঁর ইচ্ছা হল জিজ্ঞেস করেন, কি ঝামেলা ? কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন । তাঁর যে

মেয়ে কলকাতার শিবপুর ছিল সেও কি-একটা ঝামেলায় পড়েছিল। এক হাজার টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। ছেট্ট চিঠি কিন্তু সেই ছেট্ট চিঠি পড়ে তিনি সারারাত ঘুমাতে পারেননি। মেয়েটি অনেক বখন পর্যন্ত তার সঙ্গে ঘুমাতো। কি বিশ্বী ঘূম। পা দু'টি বুকেব কাছে এনে মাথা বাঁকা করে। কতো বকাবকা কতো কি। লাভ হয়নি কিছুই। অঙ্গুর সেই চিঠির জ্বাব তিনি দেননি। লজ্জাতেই দিতে পারেননি। দীর্ঘ এক বছর সেই চিঠি পকেটে নিয়ে তিনি ঘূরে বেড়িয়েছেন। ঝাসে গিয়েছেন। পাটিগণিতের কঠিন সব অংক জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্রণব বাবু বাবান্দায় এসে বসলেন। কি চমৎকার জ্যোৎস্না!

অঙ্ককার হাঙ্কা হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। লেবু ফুলের প্রাণ আসছে। গাছটাতে লেবু হয় না। শুধুই ফুল ফুটে। পাছ-গাছালির কোনো ষষ্ঠ নেই আর। কে ষষ্ঠ করবে?

সুবল চায়ের কাপ নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বাবা খুব বড় একটা ঝামেলার মধ্যে পড়েছি।

সবাই বড় ঝামেলায় পড়ে। তিনিও মেয়েকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছিলেন। বিয়ে দেবেন এমন ছেলে পাওয়া যায় না। শ্রেষ্ঠায় কেদারনাথ বাবু কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিলেন। বিহেটা কেমন হয়েছিল কে জানে? বর পছন্দ হয়েছিল পাগলীটার? আজ্ঞ আর তা জানবার কোনো উপায় নেই। বাবাকে কি আর এইসব কথা কোনো মেয়ে লেখে? বাবাকে লিখতে হয় দারুণ সমস্যার সময়।

সুবল ঘৃনুস্বরে বলল, বাবা চা খাবে, চা দেই?

দে।

চিনি নাই। চিনি ছাড়া চা।

দে একটু।

সুবল তাকিয়ে দেখল তার বাবার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ব্যাপারটা কি? সে আড়চোধে তাকাতে লাগল। মিনিমিন করে বলল, 'তিনশ' টাকা না পেলে বেইজ্জত হব।

সুবল কথাটা বলেই মাথা নিচু করে ফেলল। এবং লক্ষ্য করল তার নিজের চোখও ভিজে উঠছে। সে হঠাতে বলে ফেলল, বড় কষ্ট বাবা।

কষ্ট! হ্যাঁ; কষ্ট তো বটেই। প্রণব বাবু ছেট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

টাকাটাৰ কি জোগাড় হবে?

প্রণব বাবু জ্বাব দিলেন না। চোখ ঘুঁটলেন। সুবল বাবার কাছে সরে গুল। প্রণব বাবু হঠাতে কি মনে করে সুবলের একটি হাত চেপে ধরে সশঙ্কে ফুঁপিয়ে উঠলোম।

সুবল বলল, কাঁদবেন না বাবা। দেখি একটা ব্যবস্থা আয়ি নিষ্কার্ত করব। কাঁদবেন না।

মেয়েটারে বড় দেখতে ইচ্ছা হয় সুবল।

তিনি দু'লক্ষ টাকার একটি টিকিট পকেটে নিয়ে, একজন নিঃশ্বাস মানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। সুবল বাবাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল। তিনশ' টাকার তার সত্ত্ব খুব প্রয়োজন। তার নিজেরো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু সে কাঁদল না। নিচু গলায় বলল, চিনার কিছু নাই বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রণব বাবু ধরা গলায় বললেন, কিছুই ঠিক হয় না।

ত'র কথাকে সমর্থন করবেই যেন ঘরের ভেতর থেকে তক্ষক তেকে উঠল বাইবে মাছের চোখের মত যবা জ্যেৎস্না।



জীবন যাপন

আমার দুলাভাই লোকটি খবিস ধরনের।

খবিস শব্দটির মানে আমি টিক জানি না। মনে হয় এব মানে খুব খারাপ ধরনের জানোয়ার। অন্য কিছুও হতে পারে। এই গালিটি আমি শিখি আমার দাদীর কাছে। তিনি কারো উপর খুব রেগে গেলে তাকে খবিস বলেন। তার বলার ধরন থেকেই বোধা যায় এটা খুবই খারাপ গালাগাল।

যাই হোক, আমার দুলাভাই যে খবিস ধরনের এটা আমি বা বিনু (বিনু আমার বড় বোন। ওর সঙ্গেই খবিসটির বিয়ে হয়েছে) প্রথমে বুঝতে পাবিনি। বিনুর বুঝতে পাবার কথা নয়। সে কিছুই বুঝে না। খুবই বোকা, বিয়ে হওয়াতে সে আনন্দে গদগদ। বিয়ে হওয়ায় কোন মেয়ের এত খুশি হয় আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, প্রথম কিছুদিন মেয়েগুলির খুব মন খারাপ থাকে। আর না থাকলেও ভান করে যে মন খারাপ। বিনুর এসব কিছু নেই। এই সকালবেলাতেই সে সেজেগুজে বসে আছে। ঠোটে আবার বদরঙের কি-একটা লিপস্টিক দিয়েছে। বিনু মহানন্দে তার ঘর-সংসার দেখাতে লাগল এবং নিচু গলায় ক্রমাগত কথা বলতে লাগল। নিচু গলায় কথা বলার কারণ হচ্ছে দুলাভাই এখনো ঘূম থেকে ওঠেন নি। আমি শুকনো মুখে বিনুর কথা শুনতে লাগলাম।

‘তিনটা ঘর এই বাড়িটাতে। আর বারান্দাটা কত বড় দেখেছিস? বসার ঘৰটা আমরা তালা দিয়ে রাখি। ধূলাবালি যাতে না যায়। মেহমান-টেহমান আসলে তালা খুল দেই। রান্নাঘরে আয় একটা জিনিস তোকে দেখাই, যয়লা ফেলবার জন্যে আমাদের একটা চিনের ঢামের মত আছে। ঢামের মুখটা হাত না দিয়ে খোলা যায়।’

বিনু এমনভাবে কথা বলছে যেন সে দীর্ঘ দিন ধরে এই বাড়িতে আছে। অশ্চিত্তার বিয়ে হয়েছে মাত্র পরশ্ব। বিনুটা গাধার গাধা। ভ্যাঙ্গ ভ্যাঙ্গ করছেই। লজ্জা-শৰ্ম নেই।

“দুটো ফ্যান আমাদের। বসাব ঘরে আর শোবার ঘরে। আরেকটা কিনব। আর শোন, আমার এক ফুফা শাশুড়ি আমাকে গলার হার দিয়েছে। বিরাট ব্যক্তিগোক। আয় তোকে হারটা দেখাই। স্টিলের আলমিরায় রেখে দিয়েছি। আমাদের একটা স্টিলের আলমিরা আছে।”

দুলাভাই ঘূম থেকে উঠলেন দশটার দিকে। আমার দিকে তাকালেন কিন্তু মনে হল চিনতে পারলেন না। গঞ্জীর মুখে দাঢ়ি কামাতে বসলেক সেই সময়টায় বিনু তার সামনে দাঢ়িয়ে থাকল এবং ক্রমাগত বলতে লাগল। আমি গোলে এখনো কয়েকটা আছে। খুত্নিটা ভালমত হয় নাই। ইশ রক্ত বের হয়ে গেছে।

রক্ত বের হবার কথাটা সে এমনভাবে বলল যেন রক্তপাতের ফলে দুলাভাই

খানিকক্ষণের মধ্যেই মারা থাবেন। বাগে আমার মুখ তেতো হয়ে গেল। সব মেঘেগুলিই এরকম দেহায়া হয় না — শুধু কিন্টাই হয়েছে? কে বলবে এই মেঘে বিয়ের দুদিন আগে পর্যন্ত জ্বালান ভাইয়ের সঙ্গে চিঠি চালাচালি কবেছে। কি সব ভাষা সেই সব চিঠিব — ‘ওগো, তোমার ভালবাসার চূম্বনটি আমি গ্রহণ করিলাম’ চিঠিপত্রের চালাচালি বেশিরভাগই আমার মারফত হয়েছে। কাজেই কে কি লিখছে আমার জ্বালা।

দুলাভাই নাশতা খেতে বসলেন এপারোটার সময়। ইতিমধ্যে তাঁর শোসল হয়েছে। তিনি ইস্ত্রী করা একটা পাঞ্জাবী পরেছেন। মুখে ঝুম দেয়ায় তাঁর চারদিকে ঘিটি একটা গুঁজ। নাশতার টেবিলে বসেই তিনি আমার সঙ্গে প্রথম কথা কললেন। আমার দিকে না তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তারপর কি ব্যাপার, ভাল ?

আমি বললাম, ছু ভাল। আপনি ভাল ?

তিনি তাঁর জ্বাব দিলেন না। গভীর মনোযোগে ডিমের পোচ থেকে সাদা অংশটি আলাদা করতে লাগলেন। বিনু হাসিমুখে বলল, ও কুসুম খায় না। কুসুম খেলে হাতের অসুখ হয়। তুই কুসুমটা খেয়ে ফেল।

আমি চূপ করে রইলাম। একজনের খাওয়া জিনিস আমি খাব কেন ? কিন্তু বিনুটা এমন গাধা যে ক্রমাগতই বলতে লাগল, এই খেয়ে ফেল না। শোলমরিচ আছে। একটু শোলমরিচ দিয়ে খা মজা লাগবে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তোর ইচ্ছা হলে তুই খা।

বিনু টিপ করে কুসুমটা মুখে দিয়ে ফেলল। খাবার-দাবারের ব্যাপারে ওর লজ্জা-শরম একটু কম। দুলাভাই চায়ের কাপে চুম্বক দিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললেন (আমার দিকে না তাকিয়ে), ‘বিনু তো তোমার দু'বছরের বড়। তাকে তুই তুই করে বলছ কেন ? এটা অসভ্যতা। এখন থেকে আর তুই তুই করবে না। নাম ধরেও ডাকবে না। আপামণি বলবে, বুঝতে পারছ ?’

আমি কঠিন মুখ করে বসে রইলাম। দুলাভাই মিহি গলায় বললেন — তুমি এক কাজ কর, চলে আস এ বাড়িতে। বিনু একা থাকে, সঙ্গী পাবে। মেট্রিকের রেজাল্ট হোক, পাস করতে পারলে তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দেব।

দুলাভাইয়ের কথায় বিনু এতই আনন্দিত হল যে, হা করে হাসতে গিয়ে ডিমের কুসুমের দু'ফোটা তাঁর শাড়িতে ফেলে দিল।

দুলাভাইয়ের এই আহবানে আপনি থাকার কোনই কারণ নেই। খালি হয়ের মতন একটা ঘটনা। কেন তা একটু শুছিয়ে বলি। বাবার মৃত্যুর পর আমরা চার ভাইয়ের এবং মা গভীর গাড়ভায় পড়ে যাই (গাড়ভা শব্দটার মানেও আমি জানি না—সম্ভবত সমুদ্র)। আমাদের সবাইকে ভাগভাগি করে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের ঘাড়ে ফেলে দেয়া হয়। সবাই প্রাণপন্থ চেষ্টা করে আমাদের ঘেড়ে ফেলে দিতে। পারে না। ক্ষমতা আমরা আঠার মত লেগে থাকি। আমি যার সঙ্গে লেগে আছি তিনি আমার বড় মামা। ক্ষেত্র ইদানীং আমাকে আর সহজেই করতে পারছেন না। কয়েক দিন আগে বড় মামার পাঞ্জাবীর পক্ষে থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট চুরি গেল। সম্ভাব্য চোরদের যে তালিকা তিনি প্রস্তুত করলেন তাঁর মধ্যে আছেন আমার মামী, আমি স্বয়ং এবং এ বাড়ির কাজের ছেলে। মামী কোরান শৰীফ ছুঁয়ে বললেন টাকার কথা তিনি

কিছুই জানেন না। মাঝা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন কি—না বলা ভ্রক্ষিল (কারণ যামী যে কোন বড় মিথ্যা সাধারণতও কোরান শরীফ ছুয়ে বলেন)। তবে আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করলেন না। একগাদা লোকের সামনে আমকে এবং কাজের ছেলেটাকে (কাজের ছেলেটার নাম মুনির) কান ধরে একশ' বার ওঠ-বোস করতে বললেন। বিরট কেলেংকারি ব্যাপার। মুনির অবশ্য যহু ইলেক্ট্রিজেল্ট ছেকরা। পরদিনই মাঘাব ফিলিপস বেডিও (টু বাস্ড) নিয়ে হাওয়া। আমার এরকম কিছু করার উপায় ছিল না। কারণ আমার যাবার জায়গা নেই।

আমি এক শুক্রবারে আমার ইহজাগতিক বিষয়—সম্পত্তি নিয়ে দুলাভাইয়ের বাসায় উঠে এলাম। বিনু আনন্দে আত্মহারা। আমার থাকার জায়গা হল স্টোর রুমে। বিনু ছোটাছুটি করে ঘর গুছিয়ে দিতে লাগল। নানা জায়গায় ছেড়া মশারি যত্ন করে সারিয়ে দিল এবং নিচু গলায় বলল, তোর দুলাভাইকে বলে তোকে একটা মেটের মশারি কিনে দেব। কয়েকটা দিন যাক।

এখানে আসার কিছুদিনের ভেতরই কিছু নতুন জিনিস জানলাম, যেমন — দুলাভাই লোকটির অনেক বয়স। তিনি সপ্তাহে একদিন (বৃহস্পতিবার, গোসলের সময়) যাথায় কলপ দেন। আগে তাঁর একবার বিয়ে হয়েছিল। লোকটি অসম্ভব ক্ষণ।

এসব নিয়ে বিনুর কেন মাথাব্যথা দেখলাম না। মাথার কলপ প্রসঙ্গে বলল, জুলপির দুই একটা মাত্র চুল পেকেছে, বুঁধলি? বেশি না। ওদের বংশের ধারা এরকম, অল্প বয়সে চুল পেকে যায়। ওর এক চাচা আছে পচিশ বছর বয়সে মাথার চুল সাদা।

দুলাভাইয়ের প্রথম বিয়ে প্রসঙ্গে তাঁর মত হচ্ছে, বউটা ছিল যহু হারামজাদী। মানুষটাকে জ্বালিয়ে—পুড়িয়ে মেরেছে। আপদ বিদায় হয়েছে, বাঁচা গেছে।

আমি বললাম, বিয়ের আগে এইসব কথা বলা দরকার ছিল। বিনু বিরক্ত হয়ে বলল, এইসব কি আগ বাড়িয়ে বলার জিনিস? লজ্জাতেই বলতে পারেনি।

বুড়ো ধাঢ়ি।

আহ এসব কি? একটু বয়স না হলে বরদের আমার ভাল লাগে না। চেংড়া জামাই আমার কাছে অসহ্য।

বিনু এমনভাবে কথাগুলি বলল যেন চেংড়া জামাই তাঁর আগে কয়েকটি ছিল। বিনুটা এমন বোকা।

আমাকে এত আগ্রহ করে এখানে রাখার রহস্যটা আমি দ্বিতীয় দিনেই জুন্মাম। এ বাড়িতে কাজের কোন লোক নেই। সকাল বেলায় একটি ঘি (ময়নাব যী, এর কথা পরে বলব) এসে বাসন ধুয়ে দিয়ে যায়, ঘর বাঁট দেয় এবং বাজার করে। বাজার করার দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়ল। আমার দ্বিতীয় দায়িত্ব দুলাভাইয়ের জন্মে সিগারেট আনা। তিনি এক সঙ্গে বেশি সিগারেট কিনেন না, তাতে বেশি খাওয়া হয়। তাঁর জন্য একটি করে সিপারেট কিনতে হয়। এবং সেটা কিনতে হয় অস্তুত অস্তুত সময়ে। যেখন একবার রাত দুটোর সময় সিগারেট কিনতে পাঠালেন। বিনু ক্ষীণস্বরে বলল, এত রাতে দোকান তো সব বন্ধ।

দুলাভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, কটা পর্যন্ত দেখান খোলা থাকে তুমি জান? না জ্ঞেন কথা বলবে না। এই শহরে বেশিরভাগ দোকান সুরারাত খোলা থাকে।

আমি সিগারেট নিয়ে এসে দেৰি বিনু বাৰান্দায় বসে কাঁদছে এবং দুলাভাই এ-মাথা ও-মাথা কৰছেন। আমাকে দেখেই পঞ্চার গলায় বললেন, আবাৰ যাও, আৰো দুটা সিগারেট নিয়ে এসে।

এটা বললেন বিনুকে শান্তি দেবাৰ জন্যে। বিনু আৰো শব্দ কৰে কাঁদতে লাগল। আমি আবাৰ সিগারেট আনতে শোলাম এবং নিয়ে এসে দেৰি তাৰে ঘিটমাট হয়ে গেছে। বিনুৰ মুখ খুব হাসি-হসি। সে রাঙ্গা ঘৰে চা বানাছে। দুলাভাইয়ের মাৰে মাৰে দুপুৰৱাতে চা খেতে ইচ্ছে কৰে। বিনু আমাকে বলল, চা খাবি? বাবাৰ তোৱ জন্যে এক কাপ?

না।

খা একটু। তোৱ দুলাভাই লোকটা কিষ্ট খারাপ না, ভালই।

ভাল হলেই ভাল।

ৱেগে গেলে মাথাৰ ঠিক থাকে না। রোগা মানুষ তো, রাগ সামলাতে পাৰে না। বাবাৰ কথা ঘনে নাই? ৱেগে গেলে কেমন মাৰধোৰ কৰত ?

দুলাভাই তোমাকে মাৰে নাকি?

আৰে না। মাৰবে কেন? আৱ ধৰ, যদি এক-আধটা চড় দিয়েই বসে তাতে এফন কোন ক্ষতি তো হয় না। বাবা আমাদেৰ মাৰতো না? আমোৰা কি কোন দিন রাগ কৰেছি বাবাৰ ওপৰ?

‘ রাগে আমাৰ গা জুলে যায়। কাৱ সঙ্গে কাৱ তুলনা। কোথায় বাবা আৱ কোথায় এই বুড়ো ভাম (ভাম শব্দটাৰ মানেও আমি জানি না। দাদীজান সব সময় দাদাজানেৰ প্ৰসঙ্গে বলত্বেন)।

বাবা আমাদেৰ মাৰতেন ঠিকই। হঠাৎ মেঝাজ চড়ে গেলে একটা কঞ্চি হাতে নিয়ে মেঘগঞ্জন কৰতে কৰতে কৰতে কাঁপিয়ে পড়তেন। কয়েক ঘা দেবাৰ পৰি রাগ পড়ে যেত। তিনি কঞ্চি ছুড়ে ফেলে নিজেই কাঁদতে বসতেন এবং বিড়বিড় কৰে বলতেন — মহাপাষণ আমি, মহাপাষণ। আমাৰ মত পাষণ খোদাৰ আলমে নাই। কিছুক্ষণ এইভাবে বিলাপ কৰাৰ পৰি গঙ্গীৰ মুখে শাট গায়ে দিয়ে বেৰ হয়ে যেতেন। যে মাৰ খেয়েছে তাৰ মুখে তখন হাসি ফুটতো। কাৱণ বাবা তাৰ জন্য কিছু-একটা কিনতে গিয়েছেন। যহীৰ্ষ কোন বস্তু নন একটা কাঠ পেনসিল, একটা দু' নমুৰী খাতা কিংবা চাৰটা আচাৰ (পঁচিশ পয়সা কৰে শ্যাকেট)। অনুত্পন্ন পিতা সেই উপহাৰ নিজেৰ হাতে দিতেন না। মাকে দিয়ে পাণ্ডাত্তন রাতে ভাত খাবাৰ সময় আৱেক নাটক অভিনীত হত। বাবা উচু গলায় বলতেন — তিনি মহাপাষণ। তিনি জল্লাদ। কাজেই নিজেকে শান্তি দেবাৰ জন্যে রাতে তিনি কিছুই খাবেন না। উপবাস দেবেন। তাকে খাওয়াৰ জন্যে বহু সাখাসাধি কৰতে হত। যে শান্তি পেয়েছে সে এক সময় কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে জড়িয়ে ধৰবাৰ পৰি বাবা খেতে বুলতেন।

এই বাবাৰ সঙ্গে বুড়ো ভামেৰ তুলনা? বিনুটাৰ স্বাধীন আলাহ কি এক ফোটা বুদ্ধিও দেন নি? রাগে আমাৰ কাঙ্গা পোয়ে যায়। কি ক্ষতি কৰে তাৰ আৱেকটু বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলে? চেহারাটা না হয় আৱেকটু খারাপই হতো?

বিনুৰ যে বুদ্ধিশুদ্ধি একেবাৱেই নেই তাৰ সবচে বড় প্ৰমাণ হচ্ছে — ময়নাৰ মাৰ ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পাৱছে না অখণ্ট আমি পৱিষ্ঠাৰ বুঝতে পাৱছি। ময়নাৰ মাৰ

বয়স পঁচিশ থেকে ব্রিশের ভেতর। স্বাস্থ্য বেশ ভাল। শ্যামলা রঙ। চেহরা ভাল। কথায় কথায় গা দুলিয়ে হাসে। আমি বেশ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, সে বিনুর সঙ্গে খারাপ ধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করে। যেমন একদিন বলল, সায়েব এখনও ঘূমে? রাইতে ঘূমায় না? বুড়া বয়সে রস থাকে বেশি। হি হি হি।

বলাই বাহ্য্য, বিনু এই রসিকতার কিছুই বুঝল না। বিরক্ত হয়ে বলল, শুধু শুধু হাস কেন?

রসের কথায় হাসি।

হাসি বঙ্গ করে ঘরের কাজ শেষ কর।

সায়েবের ঘুম ভাঙলে কইয়েন যয়নার মা একখানা ভাল শাড়ি চাইছে। চিকন সুতার টাঙ্গাইলের শাড়ি।

শাড়ি কি জন্মে?

বুড়ো বয়সে সুন্দর বউ পাইছে হেই কারণে। কইয়েন কইলেই দিব। হি হি হি।

আবার কেন হাসছ?

আমার হাসি-রোগ আছে। আপনের সায়েব এই রোগের কথা জানে। এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই। হি হি হি।

আমি বিনুকে বললাম, মেঝেটা খারাপ। দুলাভাইকে বলে মেঝেটাকে ছাড়িয়ে দে।

বিনু অবাক হয়ে বলল, খারাপ যানে? কি খারাপ?

তুই বুঝবি না। মেঝেটাকে ছাড়িয়ে দে।

দুলাভাই বিনুর কথা কানেই তুললেন না। গঙ্গীর গলায় বললেন — ফালতু কথা আমার সঙ্গে একেবারেই বলবে না। কাজের লোক কি পাওয়া যায়? ভাল কাজকর্ম করছে। ছাড়িয়ে দেব কেন শুধু শুধু? শাড়ি চেয়েছে, একটা শাড়ি দিলেই হয়। বিয়ে-শাদী উপলক্ষে এরা তো দু'একটা শাড়ি আশা করতেই পারে। এর মধ্যে অন্যায় তো কিছু নেই।

পরদিনই যয়নার মাঝ জন্মে শাড়ি চলে এল। টাঙ্গাইলের চিকন পাড় শাড়ি। বিনু গঙ্গীর গলায় বলল, কত দাম নিল?

তা দিয়ে তোমার দরকাব কি? টাকা-পয়সার কোন ব্যাপারে তুমি থাকবে না, বিনু? মেঝেছেলেদের টাকা-পয়সা নিয়ে কথাবার্তা আমি পছন্দ করি না। মেঝেছেলে থাকবে মেঝেছেলের মত।

যয়নার মা শাড়ি পেয়ে খুশি হল কি-না বোঝা গেল না। সে খুব গা দুলিয়ে হাসতে লাগল।

বিনু বলল, হাস কেন?

খুশি হইয়া হাসি। শাড়ি পাইছি এই জন্মে হাসি। হি হি হি।

এই রকম হাসলে আমার বাসায় কাজ করতে পারবে না।

ওমা এইটা কেমন কথা? হি হি হি।

যয়নার মাঝ তীক্ষ্ণ হাসি আবাদের বেশি সিল সহ্য করতে হল না। এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা নতুন একটা বাড়িতে গেলাম। বাড়ি বদলের পর্বতি সমাধা হল খুব গোপনে। দুলাভাই বললেন, বাড়ি বদলের ব্যাপারটা যয়নার মাঝে জানিয়ে কাজ নেই।

বিনু অবাক হয়ে বলল, জ্ঞানালে অসুবিধা কি ?
বেটি মহাশাবামী। অনলে ক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হবে।
উপস্থিত হলে অসুবিধা কি ?

আরে কি শুধু মুখের উপর কথা ? বললাম জ্ঞানাবে না। ফুরিয়ে গেল। হেনতেন একশ' কথার দরকার কি ?

এক রাতে ময়নার মাঝে কিছু না জানিয়ে এবং বাড়িওয়ালার দুশ্মাসের বাড়ি ভাড়া না দিয়ে আমরা নতুন বাসায় চলে গেলাম। নতুন বাসাটি আগেরটির চেয়ে বড়। দুটি বাথরুম। সামনে-পেছনে বারান্দা। বিনুর আনন্দের কোন সীমা রইল না। তার অবশ্যি স্বাস্থ্য খারাপ হতে শুরু করেছে। চোখের কোথে কালি পড়ছে। মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু। পেট বড় হওয়া শুরু হয়েছে। তবু এই অবস্থাতেও সে বাড়ি শুচিয়ে রাখার জন্যে সারদিন পরিশুমি করে। সাবান পানি দিয়ে মেঝে ধোয়। রাম্ভাবান্না করে। কারণ এখন আমাদের কোন কাজের লোক নেই। যে কোন কারণেই হোক দুলাভাইয়ের মেজাজ এখন খুব খারাপ। রোজ রাতে কর্কশ পলায় ঘণ্টা করেন।

সেই সব ঘণ্টার কোন আগামাথা নেই। দুলাভাই নিজেই একতরফা চেঁচিয়ে যান। বিনুর একটি কথাও শোনা যায় না। এক সময় সে ফোস ফোস করে কাঁদে। তখন একটি চড়ের শব্দ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে দুলাভাইয়ের ঝুক গলা, কতবার বলেছি কাঁদবি না।

তুই করে বলছ কেন ?

শাট আপ। বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।

তুই তুই করে বলছ কেন ?

যা বেরিয়ে যা। ছোটলোকের দল। বিদেয় হ।

আমার ঘরটা দুলাভাইয়ের ঘরের পাশেই। সবকিছু শুনেও না শোনার ভান কবে থাকি। রাত বাড়তে থাকে। এক সময় পাশের ঘর থেকে আব কোন সাড়া-শব্দ আসে না। ঘণ্টার মিট্যাটি হয়ে যায় বোধ হয়। গভীর রাতে বিনু এসে দরজা ধাক্কা দেয়। ফিসফিস করে বলে, ঘুমিয়ে পড়েছিস ?

না। কেন ?

তোর দুলাভাইকে একটা সিগারেট এনে দে না।

আমি দরজা খুলি, বিনু আলোতে আসে না। ঘোমটা দিয়ে তার বাঁশগালি আড়াল করে রাখতে চায়। আমি হালকা গলায় বলি, আবার মেরেছে ?

বিনু সহজ স্বরে বলে, না। যারবে কেন শুধু শুধু ?

গাল ঢেকে রেখেছিস কেন ?

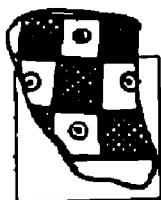
এমি।

শ্রাবণ মাসের আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। টিপটিপ কালো বৃষ্টি পড়ে। আমি সিগারেট আনতে যাই। কোন কোন রাতে ঘরে ফিরে আমাতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে ইঁটতেই থাকি, ইঁটতেই থাকি। কিন্তু তখন মনে হয় আমি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। তার কোথাও শাবার জ্বায়গা নেই।

আমি ফিরে আসি। বিনু উদ্ধিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, সিগারেট ভিজে যায়নি তো ? আমি

গাঢ় স্বরে বলি, আমি ভিজেছি, সিগারেট ভিজেনি। বিনু হাসে।

বড় ভাল লাগে এই বোকা মেয়েটির হাসি।



সে

আমার ছেট মেয়ের গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছিল।

মাছের কাঁটা যে এমন যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার তা জানা ছিল না। বেচারি ঝুঁমাগত কাঁদছে। কিছুক্ষণ পরপর বমি করছে, হেঁচকি উঠছে। চোখ-মুখ ফুলে একাকার। আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম।

অনেক ধরনের লৌকিক চিকিৎসা করানো হল। শুকনো ভাতের দলা গেলানো, মশু খাওয়ানো, গলায় দেঁক। এক পর্যায়ে আমাদের কাজের মেয়েটি বলল, একটা বিড়াল এনে তার পায়ে ধরলে কাঁটা চলে যাবে। গ্রাম দেশে না-কি এইভাবে গলার কাঁটা দূর করা হয়।

বিপদে মানুষের থাথার ঠিক থাকে না। হাতের কাছে বেড়াল থাকলে হয়তো বেড়াল-চিকিৎসাও করাতাম। ডাক্তারের কথা একবারও মনে হয়নি। কারণ, মনে হলেও লাভ হত না। আটচল্লিশ ঘণ্টার হরতাল চলছে। ঢাকা শহর অচল। পুলিশের সঙ্গে জনতার কিছু কিছু খণ্ড সংঘর্ষ হচ্ছে বলেও খবর আসছে। দু'টি পেট্রোল পাস্পে না-কি আগুন লাগান হয়েছে। কয়েকজন মারাও গেছে। শহর ভর্তি গুজব। শোনা যাচ্ছে, এরশাদ সরকারের পতন হয়েছে। তিনি তাঁর প্রিয় গলফ সেট বিক্রি করে দিয়েছেন। একটা হেলিকপ্টার নাকি বঙ্গভবনে বেড়ি অবস্থায় আছে।

এই অবস্থায় মেয়ে কোলে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। মেয়ে একটু পরপর কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে — বাবা, আমি কি মরে যাচ্ছি?

সাত বছরের মেয়ে এই জাতীয় প্রশ্ন করলে বুক ভেঙে যায়। আমার নিজেরে কোথে পানি এসে গেল।

যখন প্রয়োজন থাকে না তখন মোড়ে মোড়ে ফামেসী দেখা যায়। মেঝে সবু ফামেসীতে গন্তব্য মুখে ডাক্তার বসে থাকেন। আজ্ঞ কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কোন ফামেসী খোলা নেই। দুজন ডাক্তারের বাসায় গেলাম — একজন বাসায় ছিলেন না। অন্যজন মেয়েকে না দেখেই বললেন, মেডিকেলে নিয়ে যান।

মেডিকেলেই নিয়ে যেতাম তবু কেন জানি সাইনরোড দেখে দেখে ভূতীর একজন ডাক্তার খুঁজে বের করলাম। ইনি তিনতলায় থাকেন। সাইনরোড লেখা ‘স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ’। গলায় কাঁটা ফুটা নিশ্চয়ই স্ত্রীরোগ নয়, তবু গেলাম শুক কিছু করতে পারেন।

ডাক্তারের নাম হাসনা বানু। ছেটখাট মনুষ। বয়স চালিশের কাছকাছি। অসমহিলার মধ্যে মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। একদল মানুষ আছে স্বদের দেখলেই আপনজন মনে হয়। প্রথম দর্শনেই তাঁকে এরকম মনে হল। তিনি আমার মেয়েকে চেয়ারে বসিয়ে হা করালেন।

গলায় উচ্চের আলো ফেলে চিমটা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক ইঞ্জি লম্বা একটা কাঁটা বের করে ফেললেন। অতি কোমল গলায় বললেন, যা মণি ব্যথা করছে?

আমার মেয়ে চুপ করে বইল। সে বোধহয় তখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ডাক্তার হাসনা বানু বললেন, কি মেয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

আমার মেয়ে হেসে ফেলল।

‘এখন বল তুমি কি খাবে? আইসক্রিম খাবে? দেব একটু আইসক্রিম?’

‘ভ্যানিলা আইসক্রিম খাকলে থাব’।

‘আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ভ্যানিলা আইসক্রিম আছে।’

ডুমহিলার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। আমি তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকা দিতে গেলাম। তিনি শাস্ত গলায় বললেন, ডাক্তারী যখন করি তখন চিকিৎসার টাকা তো নেবেই কিন্তু তাই বলে বাচ্চা একটা মেয়ের গলার কাঁটা বের করারও ফি দাবী করব-এটা কি করে ভাবলেন? কাঁটাটা বের করার পর আপনার মেয়ের হাসি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। এই হাসির দাম লক্ষ টাকা। তাই না?

মিসেস হাসনা বেগমের সঙ্গে এই হচ্ছে আমার পরিচয়ের সূত্র। পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিনি নিউজিল্যান্ডের মেডিসিনে গবেষণায় একটি বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় জন হপকিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে থাবার পর যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে যায়। এখন যে গল্পটি বলব সেটি তাঁর কাছ থেকে শোনা। যেভাবে শুনেছি অবিকল সেই ভাবে গল্পটি বলার চেষ্টা করছি।

মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে বেরুবার পরপর আমি একটা ক্লিনিকে চাকরি নেই। এখন যেমন চারদিকে ক্লিনিকের ছড়াছড়ি, তখন তেমন ছিল না। অল্প কয়েকটা ক্লিনিক ছিল — সবই যাত্সদন। আমি যে ক্লিনিকে চাকরি নেই সেটা সেই সময়ের খুব নামী ক্লিনিক। ধৰ্মী পরিবারের মাঝাই শুধু আসতেন। সুযোগ-সুবিধা ভাল ছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম ক্লিনিক। সর্বসাক্ষ্যে পনেরোটি বেড ছিল। দশটি ‘এ’ ক্যাটাগরির, পাঁচটি ‘বি’ ক্যাটাগরির। ‘এ’ ক্যাটাগরির ঘরগুলিতে এয়ারকুলার বসান ছিল। আমবা ডাক্তার ছিলাম তিনজন। অধিন ডাক্তার মেডিকেল কলেজের একজন অধ্যাপক। আমি এবং নাসিমা — আমবা দুজনই সদ্য পাস করা ডাক্তার। অবশ্যি সব কাজ আমরা দুজনই দেখতাম। যেহেতু ছোট ক্লিনিক। আমাদের কোন অসুবিধা হত না। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের ক্লিনিকে আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে ভর্তি হল। প্রথম যা হতে যাচ্ছে ভয়ে অস্থির। আমি প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেখলাম এখনো অনেক দেরি। একেকটা কম্পট্রিকসানের ভেতর গ্যাপ অনেক বেশি। আমি তাঁকে আশৃত্তি করলাম। বললাম, ভয়ের মুক্ত নেই।

মেয়েটি করুণ গলায় বলল, তুমি তো বাচ্চা মেয়ে নন পারবে? তুমি জান সব কিছু?

আমি হেসে ফেললাম। হাসতে হাসতে তুম্ভায়, আমি বাচ্চা নই। তাছাড়া আমি একজন খুব ভাল ডাক্তার। আপনার কোন তরফেই নেই। আমি জাঙ্গও এখানে ডাক্তার আছেন। একজন প্রফেসর আছেন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে দেখবেন।

রুগ্নিনী বললেন, ভাই তোমাকে তুমি করে বলেছি বলে রাগ করনি তো?

‘না।’

‘আমাৰ এমন বদ্যভাস থাকে পচল্দ হয় তাকেই তুমি বলে ফেলি।’

আমি কাগজপত্র চিকঠাক কৰবাৰ জন্য ভদ্ৰহিলাৰ স্বামীকে নিয়ে অফিসে চলে এলাম। দেখা গেল শুধুই ক্ষমতাবান পৰিবারেৰ বউ। সাত-আটটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হোমড়া-চোমড়া ধৰনেৰ কিছু মানুষ বিৱৰণ মুখে হাঁটাহাঁটি কৰছে। একজন অতি বিৱৰণ গলায় বলছে, আপনাদেৱ ব্যবস্থা তো মোটেই ভাল না। ইমার্জেন্সী হলে পেশেন্টকে আপনারা কি কৰবেন? এখানে কি অপাৱেট কৰাৰ ব্যবস্থা আছে?

‘হ্বি আছে।’

‘আপনাদেৱ নিজস্ব জেনারেটৱ আছে? ধৰন, হঠাৎ যদি ইলেকট্ৰিসিটি চলে যায় তখন? তখন কি কৰবেন? মোমবাতি জ্বালিয়ে তো নিশ্চয়ই অপাৱেশন হবে না?’

লোকগুলি আমাদেৱ বিৱৰণ কৰে মাৰল। দাঙিওয়ালা এক ভদ্ৰলোক বললেন, আপনাদেৱ এখান থেকে আমৰা বেশকিছু টেলিফোন কৰৰ। দয়া কৰে বিৱৰণ হবেন না। সব পেমেন্ট কৰা। “মানি উইল নট বি এ প্ৰবলেম।”

রুগনী ভৱি হয়েছেন বিকেলে। রাত নটা বাজাৰ আগেই স্বোতেৰ মত মানুষ আসতে লাগল। অনেকেৰ হাতে ফুলেৰ গুছ। অনেকেৰ হাতে উপহাৰেৰ প্যাকেট। বিশ্বী অবস্থা।

আমি সহজে ধৈৰ্য হারাই না। আমাৰও শেষ পৰ্যন্ত মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি বললাম, আপনারা কি শুন কৰেছেন? এটাকে একটা বাজাৰ বানিয়ে ফেলেছেন। দয়া কৰে ভীড় পাতলা কৰুন। একজন শুধু থাকুন। ডেলিভাৰী হোক, তখন আসবেন।

আমাৰ কথায় একজন ভদ্ৰহিলা, সন্তুষ্ট মেয়েৰ শাশ্বতি হবেন, চোখ-মুখ লাল কৰে বললেন, আপনি কি জানেন এই মেয়ে কোন বাড়িৰ বউ?

আমি বললাম, আমি জানি না। আমি জানতেও চাই না। সে আমাৰ পেশেন্ট — এইটুকু শুধু জানি। আৱ দশটা পেশেন্টকে আমি যেভাবে দেখিৰ তাকেও একইভাবে দেখা হবে।

‘আৱ দশটা বউ এবং আমাৰ ঘৰেৰ বউ এক?’

‘আমাৰ কাছে এক।’

‘জান আমি এই মুহূৰ্তে তোমাৰ চাকৰি খেতে পাৰি।’

আমি শীতল গলায় বললাম, আপনি আমাৰ চাকৰি খেতে পাৱেন না। চিকিৎসক হিসেবে আমাৰ কোন ব্যৰ্থতা পাওয়া গেলে তবেই চাকৰি যেতে পাৰে। তাৰ আগে নয়। আপনি শুধু শুধুই চেচামেচি কৰছেন।

ভদ্ৰহিলা রেগে গিয়ে — স্কাউন্ডেল, লোফাৰ এইসব বুলতো লাগলেন। একজন ভদ্ৰহিলা এমন কৃৎসিত ভাষায় কথা বলতে পাৱেন আমাৰ জাবা ছিল না। বিনাট হৈ- চৈ বিশে গেল। আমাদেৱ প্ৰফেসৰ এলেন। ভেবেছিলাম তিনি আজ্ঞাৰ পক্ষে কথা কলাবেন। তা বললেন না। আমাৰ উপৰ অসম্ভব রেগে গেলেন। অসম্ভব অবাক কৰে দিক্ষে সবাৰ সামনে উচু গলায় বললেন — হাসনা, তোমাকে এখানে চালুন কৰতে হবে না। ইউ ক্যান লিভ।

আমি আমাৰ নিজেৰ কানকে বিশ্বাস কৰতে পাৱলাম না। আমাৰ প্ৰফেসৰ জানেন কত আগ্ৰহ, কত যত্ন নিয়ে আমি এখানে কাজ কৰি অৰ্থচ তিনি . . .

আমি রিক্ষা নিয়ে বাসায় চলে এলাম। সহজে আমার চোখে পানি আসে না কিন্তু রিক্ষায় হিসেবার পথে খুব কাঁদলাম। তখন বয়স অল্প। মন ছিল খুব স্পর্শকান্তর।

বাড় এগাটোখ প্রফেসর আমাকে নিতে এলেন। করুণ গলায় বললেন, হাসনা খুব কেলেংকারি হয়ে গেছে। তুমি চলে আসাব পর ক্লিনিকের কেউ কোন কাজ করছে না। অসহযোগ আন্দোলন। এ বক্য যে দাঁড়াবে কল্পনা করিনি। এখন তুমি চল।

আমি বললাম, সার, আমার যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি রুগ্নীর আত্মীয়দের কলুন তাকে অন্য কোন ক্লিনিকে নিয়ে যেতে।

‘বলেছিলাম। পেশেট যাবে না। সে এখানেই থাকবে।’

‘এখানেই থাকবে?’

‘হ্যা, এখানেই থাকবে। এবং সে বলে দিয়েছে, ডেলিভারীর সময় তুমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতে পারবে না। এখন তুমি যদি না যাও আমার খুব মুশকিল হবে। আমি খুব বিপদে পড়ব। তুমি তো বাইরের জগতের কোন র্ণেজখবর রাখ না। যদি রাখতে তাহলে বুঝতে এই মেয়ে কোন পরিবারের মেয়ে। বাংলাদেশের মত দেশে এরা যা ইচ্ছা করতে পারে। তুমি চল।’

‘স্যার, আমি যাব না। ওরা যা ইচ্ছে করুক।’

‘হাসনা, অন্য সব কিছু বাদ দাও। তুমি পেশেন্টের দিকে তাকাও। সে তোমার উপর নির্ভর করে আছে। আমার উপর তোমার রাগটা বড়, না পেশেন্টের প্রতি তোমার দায়িত্ব বড়?’

আমি শাল গায়ে বের হয়ে এলাম। ক্লিনিকে তখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ওয়েটিং রুমে তিনজন শুধু বসে আছেন। কৃগিনীর কাছে দুজন। দুজনের একজন কৃগিনীর শাশুড়ি। তিনি আমাকে দেখেই শীতল গলায় বললেন, রাগের মাথায় কি সব বলেছি কিছু মনে রেখে না মা। বাগ উঠলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।

আমি বললাম, আমি কিছু মনে রাখিনি।

‘বৌমা তখন থেকে বলছিল সে তোমাকে যেন কি বলতে চায়। তুমি ওর কথাটা শোন। ও খুব ভয় পেয়েছে।’

আমি মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়ালাম।

মেয়েটি কীগ স্বরে বলল, আপনারা ঘর থেকে যান মা। আমি ওর সঙ্গে একা কথী বলব। আর কেউ যেন না থাকে।

ভদ্রমহিলা দুজন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঘৰ ছেড়ে গেলেন। মেয়েটা বলল, ভাই তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও।

‘তার কি দরকার আছে?’

‘আছে, তুমি লক কর। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কিছু আছে। দরজা বন্ধ করে তুমি আমার পাশে এসে বস।’

আমি তাই করলাম। কন্ট্রোলসনের সময় কঢ়ে এসেছে। বাথুর থকল সামলাতে মেয়েটির খুবই কষ্ট হচ্ছে। তার গলার স্বর পাশ্চাত্য গোছে। মনে হচ্ছে সে অনেক দূর থেকে কথা বলছে। সে আমার হাত ধরে বলল, তাই তোমার কি রাখ করেছে?

‘হ্যা করেছে।’

‘তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বল যে তোমার রাগ কমেছে।’

আমি তার কপালে হাত রেখে কলাম, আমার রাগ কমেছে।

‘আমি তোমাকে তুমি তুমি কবে বলছি বলে রাগ করছ না তো? তুমি নিশ্চয়ই বয়সে আমার বড়।’

‘আমি মোটেই রাগ করিনি।’

‘আমি সবাইকেই তুমি তুমি বলি না। যাদের আমার খুব প্রিয় মনে হয়, খুব আপন মনে হয় তাদেরকে আমি তুমি বলি। তোমাকে প্রথম দেখেই আমার ভাল লেগেছে। তুমিও কিন্তু আমাকে তুমি বলবে।’

‘কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি ববৎ চূপ করে থাক। বড় বড় করে নিষ্পাস নাও। আমার মনে হয় তোমার প্লাসেন্টা ভাঙ্গতে শুরু করেছে।’

‘আর কত দেরি?’

‘এখনো দেরি আছে। রাত তিনটার আগে কিছু হবে না। রাত তিনটা পর্যন্ত তোমাকে কষ্ট করতে হবে।’

‘এখন কটা বাজে?’

‘বাবোটা একুশ।’

‘মনে হচ্ছে ঘড়ি চলছেই না।’

আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিছু রুটিন কাজ আছে। এগুলি সারতে হবে। নরম্যাল ডেলিভারী হবে, বাচ্চার পজিশন ঠিক আছে। তবু ইমাজেন্সির জন্যে তৈরি থাকা ভাল।

মেয়েটি বলল, যে জন্যে তোমাকে বসিয়েছিলাম তা এখনো বলিনি। তুমি বস। উঠে দাঁড়ালে কেন? আসল কথা তো বলিনি।

আমি বসলাম।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, ওরা আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে।

আমি চমকে উঠলাম। এই মেয়ে এসব কি বলছে! প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আবোল-আবোল বকছে না তো?

‘আমি জানি ওরা আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে।’

‘কারা?’

‘আমার শুশুর বাড়ির লোকরা। ডাক্তার, নার্স সবাইকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে। তোমাকেও কিনবে। তারপর বাচ্চাটাকে মারবে।’

‘তুমি এসব কি বলছ?’

‘যা সত্যি আমি তাই বলছি।’

‘ওরা বাচ্চাটাকে মারবে কেন?’

মেয়েটি জবাব দিল না। ব্যাথার প্রবল ঝাপ্টা সেন্টারের চেষ্টা করল। আমি তাকে সময় দিলাম। আমার মনে হল মেয়েটা সম্ভবত পুরোপুরি সুস্থ নয়। হয়ত কিছু অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে আছে।

‘তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। তাই না?’

‘মা।’

‘যা সত্যি তাই আমি বললাম।’

‘তুমি ভানলে কি করে — ওবা বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চায়?’

‘আমাকে বলেছে।’

‘কে বলেছে?’

‘আমার বাচ্চটা আমাকে বলেছে।’

আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম মেয়েটার মাথা খারাপ। সন্তুষ্ট সে পারিবারিক জীবনে শূর অসুখী। শুশ্রবাড়ির কাউকে তার পছন্দ না। সবাইকেই সে শক্রপক্ষ ধরে নিয়েছে। মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি আমার কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করনি, তাই না?

‘তুমি ঠিকই ধরেছ। বিশ্বাস করার কথা না। তোমার বাচ্চা তোমাকে কি করে বলবে?’

‘ও আমাকে স্বপ্নে বলেছে। একবার না অস্বীক্ষ্যবার বলেছে।’

‘স্বপ্নে বলেছে?’

‘হ্যা, স্বপ্নে। গতকাল শেষ রাতেও স্বপ্নে দেখেছি।’

‘কি দেখেছে?’

‘দেখলাম আমার বাচ্চাটা আমাকে বলছে — মা, সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলবে। সবাই যুক্তি করে আমাকে মারবে। মা, আমি কি করি?’

বলতে বলতে মেয়েটি থরথর করে কাপতে লাগল।

আমি তাকে বললাম, প্রথমবার যে সব মেয়েরা কনসিভ করে তাদের প্রায় সবাই ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে। যেমন — তারা যারা যাচ্ছে, মৃত বাচ্চা হচ্ছে — এইসব। এর কোন মানে নেই। মেয়েরা সেই সময় শূর আতঙ্কগ্রস্ত থাকে বলেই এ রকম স্বপ্ন দেখে।

‘আমি জানি আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তাই হবে। আমার স্বপ্ন অন্য মেয়েদের স্বপ্নের মত নয়। সবাই যুক্তি করে আমার ছেলেটাকে মারবে।’

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তোমার কোলে যখন ফুটফুটে একটা বাচ্চা দিয়ে দেব তখন তুমি বুঝবে যে কত মিথ্যা সন্দেহ তোমার মধ্যে ছিল।

মেয়েটার চোখ চিকচিক করতে লাগল। সে গাঢ় স্বরে বলল, সত্যি তুমি তাই মারবে?

‘অবশ্যই।’

‘তাহলে তুমি প্রতিজ্ঞা কর। কোরান শরীফ ছুঁয়ে বল, তুমি বাচ্চাটাকে মারবে না। ওরা যখন মারতে চাইবে তুমি মারতে দেবে না। তুমি ফেরাবে।’

‘একটা শিশুকে আমি খুন করব এটা তুমি কি বলছ?’

‘তুমি কোরান শরীফ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।’

‘প্রতিজ্ঞার কোন দরকার নেই।’

‘দরকার থাকুক বা না থাকুক তুমি প্রতিজ্ঞা কর।’

‘কোরান শরীফ এখানে পাবো কোথায়?’

‘আমার সঙ্গে আছে। আমার ঐ কালো ব্যাগটার ডেক্সে। আমি নিয়ে এসেছি।’

রুগ্নিকে শাস্তি করবার জন্যেই প্রতিজ্ঞা করতে হল। রুগ্নি শাস্তি হল না। তার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। সে চাপা গলায় বলল, আমি জানি তুমি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। যদি না রাখ তাহলে আমার অভিশাপ লাগবে। আমি তোমাকে একটা কঠিন অভিশাপ দিছি।

মেয়েটি সত্ত্ব সত্ত্ব একটা কঠিন অভিশাপ দিয়ে বসল। মেয়েটার মাথার যে ঠিক নেই, সে যে অসুস্থ একটি মেয়ে তার আরেকটি প্রমাণ পেলাম। তবে তার এই অসুস্থতা, এই মানসিক যত্নণা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। একটি হাসি-খুশি শিশু তার সমস্ত কষ্ট ভূলিয়ে দেবে।

সব কিছুই ঠিকঠাক মত চলছিল।

রাত দুটায় বাইরের দুজন পুরুষ ডাক্তার এলেন। ডেলিভারীর সময় এরা থাকবেন। অন্দের মধ্যে একজন আমার পরিচিত। ডাক্তার সেন। বড় ডাক্তার এবং ভাল ডাক্তার।

আমাদের কৃগিনী নতুন ডাক্তার দুজন দেখেই আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমার হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, এরা কারা? এরা আমার বাচ্চাকে খুন করবে।

আমি বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাক — আমি সারাক্ষণ এখানে থাকব। এক সেকেন্ডের জন্যে নড়ব না। তাছাড়া ডাক্তার সেনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তার মত ডাক্তার কম আছে।

‘মনে থাকে যেন তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ।’

‘আমার মনে আছে।’

‘প্রতিজ্ঞা ভাঙলে আমার অভিশাপ লাগবে।’

‘আমার মনে আছে।’

তার কিছুক্ষণ পরই ভদ্রমহিলার স্বামী আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। খুবই অল্প বয়স্ক একজন যুবক। তাকে বেশ ভদ্র ও বিনয়ী মনে হল। তবে যে কোন কারণেই হোক তাকে বেশ ভীত বলে মনে হচ্ছিল। ভদ্রলোক নরম স্বরে বললেন, আপা আমার স্ত্রী সন্তুষ্ট আপনাকে কিছু বলেছে। আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। ও এসব কেন যে বলছে কিছু বুঝতে পারছি না। আমাদের বাচ্চাটা সংসারের প্রথম সন্তান। আমি আমাদের পরিবারের বড় ছেলে। অথচ ওর ধারণা . . .

আমি ভদ্রলোককে আশ্চর্ষ করবার জন্যে বললাম, আপনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

‘সব ঠিকঠাক আছে তো আপা?’

‘সব ঠিক আছে।’

‘সিজ্জারিয়ান লাগবে না?’

‘না — নরম্যাল ডেলিভারী হবে। তাছাড়া ডাক্তার সেন এসেছেন। উনি খুবই বড় ডাক্তার এবং হাইলি স্কিলড।’

‘তাহলে আপনি বলছেন সব ঠিকঠাক হবে?’

‘হ্যা।’

রাত তিস্টার পর থেকে দেখা গেল সব কেমন বেঁচি চলছে। বাচ্চা নেমে এসেছে বার্ষ চ্যানেলের মুখে। এই সময় ডাক্তার সেন বললেন, বাচ্চার পজিসন তো ঠিক নেই। মাথা উপরের দিকে। এক্ষণ্ণ তোমবা কি মনিটিব কবছ?

আমিশ দেখলাম — তাই। এরকম হওয়ার কথা নয়। কিছুক্ষণ আগেই সব পরীক্ষা করা হয়েছে। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে লাগল। এই সময় এত রক্তপাতের কোনই করণ নেই। টিকটকে লাল রঞ্জের রক্ত — যা ধূমনা থেকে আসছে। সমস্যাটা কোথায়?

ব্লাড ক্রস ম্যাটিং করা ছিল — রক্ত দেয়া শুরু হল কিন্তু এটা সমস্যার কোন সমাধান নয়। মনে হল কৃগিনী বাইরের রক্ত ঠিক গ্রহণ করতে পারছে না।

ডাক্তার সেন গঞ্জীর গলায় বললেন, সামর্থিং ইঞ্জ ভেরী রং। আমাদের সবার গা দিয়ে শীতল স্নোত বয়ে গেল। ডাক্তার এসব কি বলছেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় সমস্য দেখা দিল — হঠাত করে কনট্রোক্সান বক্স হয়ে গেল। অথচ এই সময়ই কনট্রোক্সান সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। শিশুটি কি বার্ষ চ্যানেলে মারা গেছে?

কৃগিনী ফিসফিস করে বলল, আমার ঘূম পাচ্ছে। ঘূমে আমার চোখ বক্স হয়ে আসছে।

ডাক্তার সেন ফোরসেপ ডেলিভারীর প্রস্তুতি নিলেন। আব তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আজকাল বাতি চলে গেলেই ইয়াজেন্সি বাতি স্ক্রেলে উঠে — তখনকার অবস্থা তা ছিল না। তবে আমাদের কাছে টর্চ, হ্যাঙ্গাক, মোমবাতি সব সময় থাকে। সমস্যার সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়া কোন নতুন ঘটনা নয় — কাজেই প্রস্তুতি থাকবেই। ক্রুত হ্যাঙ্গাক ঝালান হল।

প্রায় পঁয়তাঙ্গিশ মিনিট পরিশ্রম করে ডাক্তার সেন ডেলিভারী করালেন — যে জিনিসটি বেরিয়ে এল আমরা চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কৃৎসিত কদাকার একটা কিছু যার দিকে তাকান যায় না। এ আব যাই হোক মানবশিশু নয়। চেনা-জ্ঞান পৃথিবীর সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। ঘন কঢ়ওবর্ণের একতাল মাংসপিণি। এর থেকে হাতীর শুঁড়ের যত আট-দশটি শুঁড় বেরিয়ে এসেছে। শুঁড়গুলি বড় হচ্ছে এবং ছোট হচ্ছে। তালে তালে মাংসপিণিটিও বড়-ছোট হচ্ছে। মানবশিশুর সঙ্গে এর একটিমাত্র জীবন — এই জিনিসটিরও দুটি বড় বড় চোখ আছে। চোখ ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে সে দেখছে জীবনকের পথিবীকে। চোখ দুটি সুন্দর। কাজল টান।

ডাক্তার সেন হতভন্ন গলায় বললেন, হোয়াট ইঞ্জ দিস? হোয়াই ইঞ্জ দিস? ফোরসেপ দিয়ে ধরা জন্মটাকে তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন। মেঝেতে সে কিলার্লা করতে লাগল। মনে হচ্ছে শুঁড়গুলিকে পায়ের যত ব্যবহার করে সে এগুতে চাচ্ছে। আমার সঙ্গের সহকর্মী হঠাতে পেটে হাত দিয়ে বমি করতে শুরু করল।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে কৃগিনীর জ্ঞান নেই। আর আকলে এই ভয়াবহ দৃশ্য তাকে দেখতে হত।

ডাক্তার সেন বললেন, কিল ইট। এক্ষণ্ণ প্রটাকে মেঝে ফেলা দরকার।

জন্মটি কি মানুষের কথা বুঝতে পারে? ডাক্তার সেনের কথা শ্রেষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দ বের হলে এল। অত্যন্ত হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউণ্ড যা মানুষের মস্তুকে প্রচণ্ড ঝাঁকি দেয়।

ডাক্তার সেন বললেন, অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।

জন্মটি এগুতে শুরু করেছে। স্টেডগুলি বড় হচ্ছে, ছেট হচ্ছে, আর সে এগুচ্ছে তার মাঝে দিকে। আমরা দেখছি সে মেঝে বেয়ে বেয়ে তার মাঝে খাটের দিকে যাচ্ছে — খাট বেয়ে উপরে উঠচ্ছে। আশুয় ঝুঁজছে মাঝে কাছে। যেন সে জেনে গেছে এই অকরুণ পৃথিবীতে একজনই শুধু তাকে পরিত্যাগ করবে না।

ডাক্তার সেন বললেন, আপনারা অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।

আবার আগের মত শব্দ হল। জন্মটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাক্তার সেনের দিকে। তার চোখ দুটি মানুষের চোখ। সেই চোখের ভাষা আমরা জানি। সেই চোখ করুণা এবং দয়া ভিক্ষা করছে। কিন্তু করুণা সে আমাদের কাছ থেকে পাবে না। আমরা মানুষ। আমরা আমাদের মাঝে তাকে গ্রহণ করব না। এই ভয়ংকর অসুন্দর ও কৃৎসিতকে আমরা আশুয় দেব না। সে পশু হয়ে এলে ভিন্ন কথা ছিল। সে পশু হয়ে আসেনি। মানুষের সিড়ি বেয়ে এসেছে।

ডাক্তার সেন বললেন, এই জন্মটিকে যে মেরে ফেলতে হবে এ বিষয়ে কি আপনাদের কারো মনে কোন দ্বিধা আছে?

আমরা সবাই বললাম — না, আমাদের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই।

ডাক্তার সেন বললেন, আপনারা কি মনে করেন এই জন্মটি হত্যার আগে তার আত্মীয়-স্বজ্ঞনদের মত নেয়া উচিত?

আমরা বললাম — না, আমরা তাও মনে কবি না।

যে লোহার দণ্ডটি থেকে স্যালাইন ওয়াটারের ব্যাগ ঝুলছিল আমি তা খুলে হাতে নিলাম। জন্মটি এখন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কি সুন্দর বড় বড় শাস্তি চোখ। কি আছে এই চোখে? ঘৃণা, দৃঢ়ত্ব, হতাশা? জন্মটি খাটের পা বেয়ে অর্ধেক উঠে গিয়েছিল। সেখানেই সে থেকে গেল। বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আর উঠে লাভ নেই।

প্রথম আঘাতটি করলাম আমি।

সে অবিকল মানুষের মত গলায় ডাকল — মা, মা।

তার মা সাড়া দিল না।

আমরা দেখছি একটি দানবকে। সেও তার করুণ চোখে একমুল দানবকেই দেখছে।

আমার হাত থেকে লোহার রড়টি পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সেন তা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। হত্যাকাণ্ডে বেশি সময় লাগল না।

ডাক্তার হাসনা বেগমকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই ঘটনার কি কোন ব্যাখ্যা আপনি দাঁড় করাতে পারেন?

ডাক্তার হাসনা ঝুঁতি গলায় বলেছিলেন — আমার কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই। তবে এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পর আমেরিকান জার্নাল অব মেডিক্যাল সোসাইটিতে এরকম একটি

শিশুর জন্ম বৃদ্ধান্তের কথা পাই। শিশুটির জন্ম হয়েছিল বলিভিয়ার এক গ্রামে। শিশুটির কর্ণার সঙ্গে আমাদের জন্মস্থানের বর্ণনা হ্রস্ব মিলে যায়। এই শিশুটিকেও জন্মের কূড়ি মিনিটের মাথায় হত্তা করা হয়। এবং রিপোর্ট অনুসারে সেও মতুর আগে ব্যাকুল হয়ে বলিভিয়ান ভাষায় মাকে কয়েকবার ডাকে।

‘আপনার কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই?’

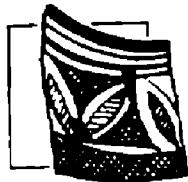
‘মা। তবে আমার একটা হাইপোথিসিস আছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় প্রকৃতি ইভোলিউশন প্রক্রিয়ায় হয়ত নতুন কোন প্রাণ সৃষ্টির কথা ভাবছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। আমরা প্রাপ্তপূর্ণ সেই প্রক্রিয়াকে বাধা দিচ্ছি।’

‘আপনার ধারণা এ রকম ঘটনা আরো ঘটবে?’

‘হ্যা। প্রকৃতি সহজে হল ছাড়ে না। সে চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং সে লক্ষ্য রাখবে যাতে ভবিষ্যতে আমরা বাধা দিতে না পারি। এই যে মা আগে স্বপ্ন দেখলেন — তার একটিই ব্যাখ্যা — প্রকৃতি শিশুটি রক্তার চেষ্টা করছে। এক ধরনের প্রোকেটোশান দেবার চেষ্টা করছে। এখন সে পারছে না, তবে ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরো কোন ভাল প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করবে।’

‘আপনি কি আপনার হাইপোথিসিস বিশ্বাস করেন?’

ডাক্তার হাসনা বানু জবাব দিলেন না। তাঁর কাছে এই প্রশ্নের জবাব নেই। জবাব থাকার কথাও নয়। কিছু কিছু সময় আসে যখন আমরা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সীমারেখায় বাস করি। তখন একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই ও দেখতে পাই না। বুঝতে পারি ও বুঝতে পারি না। অনুভব করি এবং অনুভব করি না। সে বড় রহস্যময় সময়।



খেলা

খায়াকন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের থার্ড স্যার, বাবু নলিনি রঞ্জন একদিন দুপুরবেলা দাবা খেলা শিখে ফেললেন। এই খেলাটি তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। দুঃজ্বন লোক ঘটার পর ঘটা একটা বোর্ডের দিকে বিরক্তিকর ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকবে — মানে হয় কেন? তবু তাকে খেলাটা শিখতে হল। জালাল সাহেব জিওগ্রাফী স্যার, তার দীর্ঘদিনের বন্ধু। জালাল সাহেবের কথা ফেলত পারলেন না। টিফিন টাইমে তিনি শিখলেন বড়ে কিভাবে চলে, ঘোড়া কি করে আড়াই ঘরের লাফ দেয়, গজ শুড় উচু করে কোণাকুণি দাঁড়িয়ে থাকে। জালাল সাহেব গভীর হয়ে বললেন, ত্রেইনের খেলা, বুঝলে পশ্চিত? বুদ্ধির চর্চা হয়।

বুদ্ধির চর্চা কি করে হয় নলিনি বাবু সেটা ঠিক বুঝতে পারলেন না কিন্তু প্রথম খেলাতেই জালাল সাহেবকে হারিয়ে দিলেন। জালাল সাহেব ফ্যাকাশেভাবে হাসতে হাসতে বললেন, হেলাফেলা করে খেলেছি বলে এই অবস্থা। হবে নাকি আরেক দান?

আরেক দানের সময় ছিল না। ফের্থ পিরিয়ডে ইংলিশ কম্পজিশন। নলিনি বাবু উঠে পড়লেন। ক্লাসে ভাল পড়াতে পারলেন না। মাথার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে দাবা খেলাটা ঘূরতে লাগল। এ রকম তাঁর কখনো হয় না।

ছুটির পর দুহাত খেলা হল। জালাল সাহেব শুকনো হাসি হেসে বললেন, তোমার সঙ্গে দেখি চিন্তা-ভাবনা করে ডিফেনসিভ খেলা দরকার।

তৃতীয় খেলাটিতে জালাল সাহেব প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। তাঁর আছবের নামাজ কুঁজা হয়ে গেল। খেলা চলল সক্ষ্য পর্যন্ত। দফতরী বাচ্চু মিয়া ঘর বরষ করতে না পেরে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। খেলার শেষে জালাল সাহেব ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। নলিনি বাবু বললেন, তুমি দেখি মনমরা হয়ে গেছ।

জালাল সাহেব বললেন, আরেক হাত খেল। লাস্ট দান। এই বাবু আর পারবে না — খুব ডিফেনসিভ খেলব।

আজ থাক। ট্যুইশনি আছে।

করক্ষণ আর লাগবে, খেল দেখি।

শেষ খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। জালাল সাহেব ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। নলিনি বাবু বললেন, চল যাওয়া যাব।

আরেক হাত খেল।

আর না, রাত হয়েছে।

খেল তো, রাত বেশী হয় নাই।

নলিনি বাবু আবার বসলেন। তাঁর জয়যাত্রা শুরু হল। নিয়ামতপুরের লোকজন

কিছুদিনের মধ্যেই জেনে গেল এ শহরে অসম্ভব ভালো একজন দাবাদু আছেন। তাকে কেউ হারাতে পায়ে না। তার সেই খাতি পৰের পনেরো বছর পর্যন্ত অক্ষম রহিল।

পনেরো বছর দীর্ঘ সময়। এই সময়ে তার দুটি দাত পড়ল, বা চোখে ছানি পড়ল। এবং তিনি এ্যাসিস্টেন্ট হেড মাস্টার হিসেবে শ্রাবণ মাসের এক মেঘলা দুপুরে বিঠাওয়ার করলেন। তার বিদায় উপলক্ষে লেখা মানপত্রে বলা হল।

“বাবু নলিনি রঞ্জন দাবার জগতের একজন মুকুটহীন সন্তান। তিনি বাংলাদেশ দাবার চ্যাম্পিয়ন জ্ঞাব আসাদ থাকে পর পর তিনি বার পরাজিত করে দাবার জগতে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।”

কথাটা সত্য। আসাদ থার শালীর বাড়ি নিয়ামতপুর। তিনি কোন এক অন্তর্ভুক্ত ক্ষণে শালীর বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন এবং কৌতুহলী হয়ে খেলতে বসেছিলেন। তার ধারণা ছিল মফস্বলে যা হয়ে থাকে মোটামুটি ধরনের একজন খেলোয়াড়কে নিয়ে সবাই মাতামাতি করে — এও সে বক্য। খেলতে বসেও তার সে ভূল ভাঙল না। তিনি দেখলেন রোগা এবং বেঁটে এই লোকটি ওপেনিং সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। যারা সাধারণ দু' একটা বইটাই পড়েছে তারাও যেসব জানে, এ লোকটি স্বাভাবিক কারণেই সেসব কিছু জানে না। যার ফলে পক্ষম চালেব মাথায় আসাদ থা নলিনি বাবুর রাজ্ঞার সামনের বড়েটি নিয়ে নিলেন। তিনি অবহেলার একটা হাসিও হাসলেন। কিন্তু সে হাসি তার ঠোটে ঝুলে পড়ল যখন দেখলেন কশকায় এই লোকটি তার দুটি ঘোড়া নিয়ে হঠাতে ঝাপিয়ে পড়েছে। আসাদ থা খুবই অবাক হলেন, কিন্তু নিয়ামতপুরের লোকজন এমন ভাব করতে লাগল যে নলিনি বাবুর কাছে হারাব মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই।

আসাদ থার সে বছর শালীর বাড়ি বেড়াতে আসার সমন্ত আনন্দ ধূঘে-ধূঘে গেল। নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত একটি পার্কিং পত্রিকায় লেখা হল — নিয়ামতপুর নিবাসী প্রবীণ দাবাদু খায়রুমেছা গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষক বাবু নলিনি রঞ্জন বাংলাদেশ দাবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, নিয়ামতপুরের গৌরব এই কীর্তিমান দাবাদু বিগত দশ বৎসরে কাহারো নিকট পরাজিত হন নাই...।

ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। নলিনি বাবু শুধু জিতেই গেছেন। অনেক দূর থেকে লোকজন খেলতে আসতো তার সঙ্গে। একবার দাবা ফেডারেশনের সেক্রেটারী এক বিদেশীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। এতবড় ঘটনা নিয়ামতপুরে আর ঘটেনি। ধারাদাবা খেলার কিছুই বুঝে না, তারাও এসে ভিড় করল। টিফিনের পর খায়রুমেছা গার্লস হাই স্কুল ছুটি হয়ে গেল। ফেডারেশনের সেক্রেটারী দুবার বললেন, আপনি খুব সাবধানে খেলবেন। যাকে নিয়ে এসেছি তিনি বেলজিয়ামের লোক। খুব উচুদরের খেলোয়াড়।

আমি সাবধানেই খেলি।

তাড়ামড়া করে চাল দেবার দরবার নেই, বুঝলেন?

নলিনি বাবু মাথা নাড়লেন, বুঝেছেন।

ঠিক সঙ্গে গিয়াকো পিয়ানো ডিফেন্স খেলাই চাল। সেই ডিফেন্স জানেন তো?

জিনি না। জানি না।

সেক্রেটারী সাহেবের জো কুক্ষিত হল। সেই কুক্ষন আরো গাঢ় হল যখন দেখলেন, নলিনি

বাবু পিকে ফোর-এর উত্তরে আর ফোর দিয়ে বসে আছেন।

কি করছেন আপনি? এর সঙ্গে এক্সপ্রিমেন্ট করছেন নাকি? এটা কি দিলেন?

সাহেবটিও ইংরেজীতে কি যেন বলল। বাবু নলিনি বশ্বন ইংরেজীর শিক্ষক, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না। সেক্রেটারী সাহেব মুখ কালে করে বললেন, প্রশিক্ষণহীন প্রতিভা দেখাতে নিয়ে এসে বড় বেইজ্জতীর মধ্যে পড়লাম দেখি।

খেলা হল তিনটি। একটি ড্র হল, দু'টিতে নলিনি বাবু জিতে গেলেন। সেক্রেটারী সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আপনি ঢাকায় খেলতে আসেন না কেন?

চুইশনি আছে। তাছাড়া শরীরটা ভাল না। ইংগানি।

আবে না না। আপনি আসবেন ভাই।

দরিদ্র যানুষ, টাকা-পয়সা নাই।

আবে আপনি আবার কিসের দরিদ্র?

সেক্রেটারী সাহেব জড়িয়ে ধরলেন নলিনি বাবুকে।

কাজেই শ্বাবগ মাসের মেঘলা দুপরে বাবু নলিনি রঞ্জনের বিদায় সংবর্ধনায় বারবার ঘুবে-ফিবে দাবার কথা এল। এবং সভার শেষে সভাপতি, স্কুল কমিটির সেক্রেটারী ও পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরক্ষ মিয়া অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন যে, নিয়ামতপুরের গৌরব দাবার অপরাজিত মক্ষ বাবু নলিনি রঞ্জনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তিনি একটি ব্যবস্থা করেছেন। পনেরো হাজার টাকার একটি চেক দিচ্ছেন স্কুল ফান্ডকে। যদি কেউ নলিনি বাবুকে হারাতে পারে তাহলে তাকে এই টাকাটি দেয়া হবে। আর যদি কেউ হারাতে না পারে, তাহলে স্কুল ফান্ড নলিনি বাবুর মৃত্যুর পর এই টাকাটি পাবে।

সভায় তুমুল করতালি হয়। হেড মাস্টার সাহেবকে পনেরো হাজার টাকার চেকটি উচু করে সবাইকে দেখাতে হল। সুরক্ষ মিয়া যে এমন একটি নাটকীয় ব্যাপ্তির করতে পারেন তা কারোব কল্পনাতেও আসেনি।

আশ্বিন মাসের এক সন্ধিয়া নলিনি বাবুর ইংগানির টান খুব প্রবল হল। বাতাস তার কাছে ক্ষীণ মনে হল। ফুসফুস ভৱাবার জন্যে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর জ্বালার কাছে একটি রং বাববার ফুলে উঠতে লাগল। এই অবস্থাতেও তিনি তাঁর জ্বালার শেষ খেলাটি খেলতে বসলেন। এই খেলাটি তিনি খেলবেন হারবার জন্যে। তিনি আজহোরবেন তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু জালাল সাহেবের কাছে। জালাল সাহেব পনেরো হাজার টাকা জিতে নেবেন। সেই টাকায় নলিনি বাবুর চিকিৎসা হবে। শীতের জন্যে গরম কিছু মুল্পান্ত কিনবেন, শীতে বড় কষ্ট হয় তাঁর। বহু কষ্টে জালাল সাহেব নলিনি বাবুকে এই প্রস্তাৱে রাজি কৰিয়েছেন। একটি পরাজয়ে কিছুই যায় আসে না।

খেলা হচ্ছে স্কুল ঘরে। জালাল সাহেব চ্যালেঞ্জে খেলা খেলছেন। অনেকেই এসেছে কৌতুহলী হয়ে। নলিনী বাবুর অবস্থা থারাপ হতে লাগল। একটা স্কুল চালে তাঁর গজ দ্বোয়া গেল। তাঁর কিছুক্ষণ পর একটা নোকা পিনড় হয়ে গেল। অশ্বট গুপ্তন উঠল চারদিকে। নলিনি বাবু দেখলেন জালাল সাহেবের চোখ দিয়ে পালি পড়ছে। পনেরো বছরের অপবাজেয়

দাবা চাম্পিয়ন আজ পৰাজিত হতে থাচ্ছেন। জালাল সাহেবের মুখ অস্থাভাবিক বিৰ্বণ। চল দেবাৰ সময় তাৰ হ্যাত কাঁপতে লাগল।

হেমিওপ্যাথ ডাক্তাৰ সেবহন সাহেব বিশ্বিত হয়ে বললেন, নলিনি বাবুৰ অবস্থা তে শুধু ধাৰাপ।

জালাল সাহেব ধৰা গলায় বললেন, সব আমাদেৱ নলিনিৰ ভান। দেখবেন এখনি সব ঠিক কৰে ফেলবে।

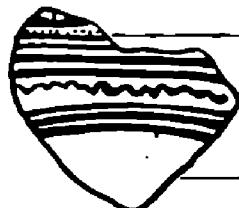
নলিনি বাবু কীগ স্বৰে বললেন, তুমি কাঁদছ নাকি জালাল?

না। চোখে কি যেন পড়ল।

জালাল সাহেব চোখেৰ সেই অদৃশ্য জিনিসটি বেৱ কৰবাব জন্মে চোখ কচলাতে লাগলেন।

কীৰ্তি একটি হাসিৰ রেখা কি দেখা গেল নলিনি বাবুৰ ঠোঁটে? তিনি ঘোড়াৰ একটি কিস্তি দিলেন। রাজা সবে এল এক ঘৰ। দ্বিতীয় কিস্তি দিলেন বড়ে দিয়ে। রাজা আৱো এক ঘৰ সৱল। নলিনি বাবু যেন অদৃশ্য কোন নগৰী থেকে তাৰ কালো গজটি বেৱ কৰে অনলেন। সোৰহান সাহেব বিশ্বিত হয়ে বলেন, কী সৰ্বনাশ। নলিনি বাবু গজটা বড়েৰ মুখে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কিস্তি।

জীৱনেৰ শেষ খেলাটিতে বহু চেষ্টা কৰেও তিনি হারাতে পাৱলেন না। সহায়-সফলহীন অবস্থায় প্ৰায় বিনা চিকিৎসায় নিয়ামতপূৰেৰ গৌৰবেৰ মত্যু হল ১২ই নভেম্বৰ ১৯৭৫ সন। রোজ মকলবাৰ। খায়কন্মেছা গার্লস স্কুল সে উপলক্ষে দু'দিন ছুটি থাকল।



কল্যাণীয়াসু

ট্ৰেইঝাকভ আট গ্যালারীতে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। পুৱানো দিনেৰ মহান সব সিঙ্গুলার আৰাকা ছবি। দেখতে দেখতে এগুচ্ছি। হঠাৎ থমকে দাঢ়াতে হল। সকৈৰ রাশিয়ান গাইড বলল, কি হয়েছে?

আমি হাত উঠিয়ে একটি পেইনটিং দেখালাম। প্ৰিসেস তাৰাকনোভাৰ পেইনটিং। অপূৰ্ব ছবি!

জৱী, ছবিটি দেখে তোমাৰ কথা মনে পড়ল। গাইড কুল সেন্ট পিটার্সবাৰ্গ জেলে প্ৰিসেসেৰ শেষ দিনগুলি কেটেছে। ঐ দেখ সেল-এৰ অক্ষয়কুমাৰ কি কৰে বন্যাৰ পানি ঢুকছে। দেখ, প্ৰিসেসেৰ চোখে-মুখে কি গভীৰ বিষাদ। প্ৰগাঢ় বেসন্ত।

আমি কথা বললাম না। অভিভূত হয়ে তাৰিখে রইলাম। গাইড বলল, এসো পাশেৰ কামৰায় যাই।

আমি নড়লাম না। মৃদু পলায় বললাম, মিঃ যোৰ্কল আজ আৱ কিছু দেখব না। চল, কোথায়ও বসে চা খাওয়া যাক।

দুঃখনে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। ভীষণ শীত বাইরে। রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া ঘোটা ওভারকেট লেদ করে শরীরে বিথছে। আমার সঙ্গী হঠাতে জাইল, তেমার কি শরীর খারাপ করছে?

না।

আর্ট গ্যালারী কেফল দেখলে?

চমৎকার ! অপূর্ব !

আমি চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বললাম, তোমাদের প্রিসেস তারাকনোভাকে দেখে আমার এক পরিচিতা যাহিলার কথা খুব মনে পড়ছে।

গাইড কৌতুহলী হয়ে বলল, কে সে ? নাম জানতে পারি ?

জরী তার নাম।

যোথুব বিস্মিত হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি মনে মনে বললাম, “প্রিসেস জরী। প্রিসেস জরী।”

জরী, রাজকুমারীর ছবি দেখে আজ বড় অভিভূত হয়েছি। হঠাতে করে তোমাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছা করছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মন সং্যাতসং্যাতে হয়ে গেছে। ক্রমাগতই নস্টালজিক হয়ে পড়ছি। ঘূম কমে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। ঘনঘন কফি খাই। চুক্টের গক্ষে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠে। শেষ রাতের দিকে ঘুমুতে গিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। পরশু রাতে কি স্বপ্ন দেখলাম জান ? দেখলাম, আমাদের নীলগঞ্জে যেন খুব বড় একটা মেলা বসেছে। বাবার হাত ধরে মেলা দেখতে নিয়েছি (ইশ ! কত দিন পর বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম)। বাবা বললেন, “খোকা নাগরদোলায় ঢড়বি ?” আমি যতই না করি তিনি ততই জোর করেন। তারপর দেখলাম, ভয়ে আমি থরথুব করে কাঁপছি আর শাঁস্তা শব্দে নাগরদোলা উড়ে চলছে। চন্ত্র সূর্য গ্রহ তারকা ছাড়িয়ে দূরে দূরে আরো দূরে। ঘূম ভেঙে দেখি চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে। চালিশ বছর বয়সে কেউ কি এমন করে কাঁদে ?

আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি জরী। আজকাল খুব নীলগঞ্জে চলে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে আগের মত সঙ্ঘায়েলা পুকুরঘাটে বসে জোনাকি পোকার আলো জ্বালা দেখি।

মস্কেতে আজ আমার শেষ রাত। আগামীকাল তোর চারটায় রওনা হব কমারিয়াম। খুব কষ্ট করে এক মাসের ভিসা জোগাড় করেছি। এই এক মাস খুব ঘূরে (বেজাৰ) ভাবপর ফিরে যাব মন্ত্রিলে নিজ আস্তানায়। বেশ একটা গভীর জীবন বেছে নিয়েছি। তাই না ? অথচ ছেটবেলায় এই আমিই হোস্টেলে যাবার সময় হলে কি মন খারাপ করতাম। হাসু চাচা আমাকে টেনে তুলে দিতে এসে লাল গামছায় ঘনঘন চোখ মুছত। যারা গলায় বলত, বড় মিয়া চিঠি দিয়েন গো।

আমার মনে হত — দূর ছাই, কি হবে পড়াশুনা করে যাবা, হাসু চাচা এদের ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না।

প্রবল ঘরঘুঁধো টান ছিল বলেই আজ হয়ে যাবার বৃত্তি বেছে নিতে হয়েছে। তাই হয়, তোমার জন্য প্রবল ত্রুণি পুষেছিলাম বলেই কি তোমাকে পাইনি ? টেনটেলাসের গল্প জান তো ? তার চারদিকে পানির ফৈ-ফৈ সমুদ্র অথচ তাকেই কিনা আজীবন ত্রুণি থাকতে হল।

জৰী, তোমাৰ কি মনে আছে বিষেৱ পৰদিন তোমাকে নিয়ে যখন নীলগঞ্জে আসি তুমি ট্ৰেনেৰ জ্ঞানলায় মুখ রেখে খুব কেঁদেছিলে। তখন কাৰ্তিকেৰ শুক। ধনীবংশেৰ বোদে ঝলমল কৰছে চাবদিক। হালকা হিমেল বাতাস। মনে আছে সে সব কথা? আৰ্য বলেছিলাম, মাথাটা ভেতৱে ঠেনে নাও জৰী। কফলার গুড়ো এসে চোখে পড়বে। তুমি বললে, পড়ুক।

কামৰায় আমৰা দুটি মাত্ৰ প্ৰাণী। বৰষাত্ৰীৰা আমাদেৱ একা থাকবাৰ সুযোগ দিষ্টে অন্য কামৰায় উঠেছে। ট্ৰেন ছুটে চলেছে বিকালিক কৰে। বাতাসে তোমাৰ লালচে চূল উড়েছে।

কি-একটা সেট ঘেৰেছে। চারপাশে তাৰ চাপা সৌৱত। আমি গাঢ় স্বৰে বলেছিলাম, ছিঃ, জৰী এত কাঁদছ কেন? কথা বল। আমাৰ কথায় তুমি কি মনে কৰেছিলে কে জানে। অনেককষণ আমাৰ চোখে চোখে তাকিয়ে কি মনে কৰে যেন হেসে ফেললে। হেসে ফেলেই লজ্জা পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললে। সেইদিন কি গভীৰ আনন্দ আমাকে অভিভূত কৰেছিল। মনে হয়েছিল বহস্যমণ্ডিত এই বয়লীটিকে পেয়েছি!

গৌৰীপুৰে গাড়ী অনেককষণ হল্ট কৰল। একজন অস্তি ভিখাৰী একতাৰা বাজিয়ে আমাদেৱ কামৰায় সামনে খুব গান গাইতে লাগল, “ও মনা এই কথাটি না জ্ঞানলে প্ৰাণে বাঁচতাম না।”

তুমি অবাক হয়ে বললে, কি সুন্দৰ গায়। তাৱপৰ দুঃটি টাকা বেৱ কৰে দিলে। ট্ৰেন ছাড়তেই জ্ঞানলা দিয়ে অনেকখানি মাথা বেৱ কৰে বললে, দেখুন দেখুন, কতগুলি বক একসঙ্গে উড়ে যাচ্ছে।

বক নয়। শীতেৰ শুকতে ঝাঁক বেঁধে বালিহাস উড়ে আসছিল। আগে দেখনি কখনো, তাই খুব অবাক হয়েছিলে। আমি বলেছিলাম, বক নয় জৰী। ওগুলি বালিহাস। আৱ শোন, আপনি আপনি কৰছ কেন? আমাকে তুমি কৰে বলবে।

ঐ হাঁসগুলি কোথায় যাচ্ছে?

বিলেব দিকে।

আপনাদেৱ নীলগঞ্জে বিল আছে?

আবাৰ আপনি?

তুমি হেসে বললে, নীলগঞ্জে বিল আছে?

আমি বললাম, বল, তোমাদেৱ নীলগঞ্জে বিল আছে?

তুমি মুখ ফিরিয়ে হাসতে শুক কৰলে। আমাৰ মনে হল সুখ কোন অলীক কল্পনা নয়। এৱ জন্মে জীবনব্যাপী কোন সাধনারও প্ৰয়োজন নেই। প্ৰভাতেৰ সূৰ্যকিৰণ বা সাতেৰ জ্যোৎস্নাৰ মতই এও আপনাতেই আসে।

কিন্তু প্ৰিসেস তাৱাকনোভাৰ ছবি দেখতে গিয়ে উল্টো কথা মনে হল। মনে হল সুখটুখ বলে কিছু নেই। নিবৰছিম দৃঢ়খ নিয়ে আমাদেৱ কাৱলৰ চোখেৰ সামনে যেন দেখতে পেলাম হতাশ রাজকুমাৰী পিটাৰ্সবাৰ্গেৰ নির্জন সেলে বসুন্নি প্ৰতীক্ষা কৰছেন। হ-হ কৰে বন্যাৰ জল ঢুকছে ঘৰে। রাজকুমাৰীৰ ঠোঁটেৰ কেঁগুলি কোমাৰ মত অসুস্থ এক হাসি ফুটে বয়েছে।

ছবিব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মনে হল রাজকুমাৰীকে খুব পৱিচিত মনে হচ্ছে। জৰীৰ মুখেৰ আদল আসছে নাকি? পৱিমৃহৃতেই ভূল ভাখল। না জৰীৰ সঙ্গে এ

মুখের কোন মিল নাই। জরীব মুখ গোলগাল। একটু আদুবে ভাব আছে। আর রাষ্ট্রকূমারীর মুখটি লম্বাটে ও বিষণ্ণ। যনে আছে জরীব, একবার তোমার একটি পোত্তে করেছিলাম। কিছুতেই মন ভরে না : ব্রহ্ম হচি অবার চক্ৰ দিয়ে চেছে বঙ্গ ভুলে ফেলি। দুয়াসের মত সমষ্টি লাগল ছবি শেষ হতে। পোত্তে দেখে তুমি হতভুং। অবাক হয়ে বললে, ও আঘা চোখে সবুজ রঙ দিয়েছ কেন? আমার চোখ বৃক্ষি সবুজ? আমি বললাম, একটু দূর থেকে দেখ।

তুমি অনেকটা দূবে সবে গেলে এবং চেঁচিয়ে বললে, কি সুন্দর! কি সুন্দর!

ছবি আঁকিয়ে হিসেবে জীবনে বহু পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু সেদিনকার সেই মুহূর্ত কঠ এখনো কানে বাজে।

সেই পোত্তেটি অনেকদিন আমার কাছে ছিল। তারপর বিক্রি করে দিলাম। ছবি দিয়ে কি হয় বল? তার উপর সেবাব খুব টাকার প্রয়োজন হল। মিলনে শিয়েছি বন্ধুর নিয়ন্ত্রণে। শিয়ে দেখি বন্ধুর কোন হাদিস নেই। ক'দিন আগেই নাকি বিছানাপত্র নিয়ে কোথায় চলে শিয়েছে। কি করি, কি করি! সঙ্গে সয়লের মধ্যে আছে ত্রিশাতি আমেরিকান ডলার আর মন্ট্রিলে ফিরে যাবার একটি টুরিস্ট টিকিট। এর মধ্যে আবার আমার পুরানো অসুখ বুকে ব্যথা শুরু হল। সন্তা দরের এক হোটেলে উঠলাম। তবুও দুদিন যেতেই টাকা-পয়সা সব শেষ। ছবি বিক্রি ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

এক সক্ষ্যায় বড় রাস্তার মোড়ে ছবি টাঙ্গিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম। কারোর যদি পছন্দ হয় কিনবে। ছবির মধ্যে আছে দুটি ওয়াটার কালার আর তেল রঞ্জে আঁকা তোমার পোত্তে। ছবিগুলির মধ্যে “নীলগঞ্জের জ্যোৎস্না” নামের অপূর্ব একটি ওয়াটার কালার ছিল। আমাদের বাড়ীর পেছনে চার-পাঁচটা নারকেল গাছ। দেখনি তুমি? এই যে পুকুরপাড়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়েছিল। এক জ্যোৎস্না বাতিতে পুকুরের কালো ঝলে তাদের ছায়া পড়েছিল — তারই ছবি। চোখ ফেরানো যায় না এমন। অথচ বিক্রি হল শুধু তোমার পোত্তেটি। এক বৃক্ষ ভদ্রমহিলা কিনলেন। তিনি হাঁটচিস্তে বললেন, কেন এই পোত্তেটা কিনলাম জান?

না য্যাডাম।

আমি যখন কিশোবী ছিলাম তখন এই ছবিটিতে যে মেয়েটিকে তুমি এঁকেছ তাৰ সুন্দর ছিলাম, তাই কিনলাম।

আমি হেসে বললাম, আপনি এখনো সুন্দর।

ভদ্রমহিলা বললেন, এসো না আমার ঘরে। কফি করে খাওয়াব। এমন কফি সারা মিলান শহরে খুঁজেও পাবে না।

ভদ্রমহিলা আশাতীত দাম দিলেন ছবির। শুধু কফি নয়, মাঝে খাবার খাওয়ালেন। তাঁর অল্পবয়েসী নানান ছবি দেখালেন। সব শেষে পিয়ানো বাঙ্গিয়ে খুব করুণ একটি গান গাইলেন যার ভাব হচ্ছে — “হে প্রিয়তম, বসন্তের দিন শেষ হয়েছে। ভালবাসাবাসি দিয়ে সে দিনকে দূরে রাখা গেল না।”

নিজের হাতে তোমার ছবি টানলাম। কোঝাকার ইটালীর মিলান শহরের এক বৃক্ষ মহিলা, তার ঘরে তোমার হাসিমুখের ছবি ঝুলতে লাগল। কেমন অবাক লাগে ভাবতে।

একশ' বছর পৰ এই ছবিটি হয়ত অবিকৃতই থকবে। বৃদ্ধার নাতি-নাতনীরা ভববে, এইটি কার পোত্তে ? এখানে কিভাবে এসেছে ?

ফেবৰ পথে বৃদ্ধার হতে চুমু খেলাম। যনে ঘনে বললাম, আমাৰ জৰী যেন তোমাৰ কাছে সুখে থাকে।

আমৰা সব সময় সুখে থাকাৰ কথা বলি। যতবাৰ নীলগঞ্জ থেকে ঢাকাৰ হোষ্টেলে যেতাম — বাবা কলতেন, 'সুখে থাক'। তুমি ষখন লাল বেনাবসীতে মুখ জেকে টেনে উঠলে তোমাৰ মা কাদতে কাদতে বললেন, সুখে থাক।

জৰী, আমৰা কাছে তুমি সুখে ছিল না ? কিসে একটি মানুষ সুখী হয় ? নীলগঞ্জে আমাদেৱ প্ৰকাণ বাড়ী দেখে তোমাৰ কি যন ভৱে উঠেনি ? তুমি কি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠেনি, ওমা এ যে রাজপ্রাসাদ ! জ্যোৎস্না বাত্ৰিতে হাত ধৰাধৰি কৰে ষখন আমৰা পুকুৰপাড়ে বেড়াতে যেতাম তখন কি গভীৰ আবেগ তোমাকে এতটুকু আছম কৰেনি ? তোমাকে আমি কি দেইনি জৰী ? নিৱৰচিষ্ম ভালবাসাৰ দেয়ালে তোমাকে বিৱে রেখেছিলাম। বাৰ্ষিনি ?

তবু এক রাত্ৰিতে তুমি বিছানা ছেড়ে চুপিচুপি ছাদে উঠে গেলে। আমি দেখলাম, তুমি পাথৰেৱ মৃত্তিৰ যত কানিস বেঁমে দাঁড়িয়ে আছ। বুকে ধৰক কৰে একটা ধাক্কা লাগল। বিস্মিত হয়ে বললাম, কি হয়েছে জৰী ?

তুমি খুব স্বাভাৱিক গলায় বললে, কই কিছু হয়নি তো। তাৱপৰ নিঃশব্দে নীচে নেমে এলে।

তোমাৰ মধ্যে গভীৰ একটি শূন্যতা ছিল। আমি তা ধৰতে পাৰিনি। শুধু বুঝতে পাৱছিলাম তোমাৰ কেৱল কিছুতেই যন লাগছে না। সে সময় "এসো নীপবনে" নাম দিয়ে আমি চমৎকাৰ একটি পেইনটিং কৰছিলাম। আকাশে আঘাতেৰ ঘন কালো মেৰ। একটি ভাঙা বাড়ীৰ পাশে একটি প্ৰকাণ ছায়াময় কদম গাছ। এই নিয়ে আঁকা। আমাৰ শিল্পী জীবনেৰ ভাল ক'টি ছবিৰ একটি। ভেবেছিলাম বিয়েৰ বছৱতি ঘূৰে এলে তোমাকে এই ছবি দিয়ে মুঝু কৰব। কিন্তু ছবি তোমাকে এতটুকুও মুঝু কৰল না। তুমি ক্লান্ত গলায় বললে, এক বছৱ হয়ে গেছে বিয়েৰ ? ইল কত তাড়াতাড়ি সময় যায়।

তোমাৰ কষ্টে কি সেদিন একটি চাপা বিষাদ ধৰনিত হয়ে উঠেছিল ? ক্রমে ক্রমে তুমি বিশ্ব হয়ে উঠতে লাগলে। প্ৰায়ই মাৰুৱাতে ঘূম ভাঙলে দেখতাম তুমি জেগে বেসে আছ। অবাক হয়ে বলেছি, কি হয়েছে জৰো ?

কই ? কিছু হয়নি তো।

ঘূম আসছে না ?

আসছে।

বলেই তুমি আবাৰ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লে। কিন্তু তুমি জেগে রইলে। অথচ ভান কৰতে লাগলে যেন ঘূমিয়ে আছ। আমি বললাম, জৰী সংজ্ঞ কৰে বল তো তোমাৰ কি হয়েছে ?

কিছু হয়নি।

কোথাও বেড়াতে যাবে ?

কোথাও ?

কল্পবিজ্ঞার ঘাবে ? হ্যেটেল ভাড়া করে থাকব ?

উন্ন, ভাস্তাগে না ।

তারও অনেকদিন পর এক সন্ধিয় ঘন ঘোব হয়ে দেব করল । রাত বাড়াব সঙ্গে সঙ্গে
শুরু হল বড় । দরাম শব্দে একেকবার আছড়ে পড়ছে জানালাব পাট । বাজ পড়ছে ঘনহন ।
ঘরের লাগোয়া জ্বাম গাছে শৌ-শৌ শব্দ উঠছে । দুঃজনে বসে আছি চুপচাপ । তুমি হঠাতে এক
সময় বললে, তোমাকে একটা কথা বলি, রাখবে ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কি কথা ?

আগে বল রাখবে ?

নিচয়ই রাখব ।

তুমি তখন আমাকে তোমার আনিস স্যারের গল্প বললে । যিনি কলেজে তোমাদের
অংকের প্রফেসর ছিলেন । খামখেয়ালীর জন্যে যার কলেজের চাকরিটি গোছে । এখন শুব
ধারাপ অবস্থায় আছেন । কোন রকমে দিন চলে । তুমি আমাকে অনুরোধ করলে নীলগঞ্জে
নতুন যে কলেজ হচ্ছে সেখানে তাকে একটি চাকরি জোগাড় করে দিতে ।

তুমি উচ্চবুদ্ধি চোখে বললে, আনিস স্যার মানুষ নন । সত্ত্ব বলছি ফেরেশতা । তুমি
আলাপ করলেই বুঝবে ।

আমি বললাম, নীলগঞ্জের কলেজের এখনো তো অনেক দেরী । মত্রে জমি নেয়া হয়েছে ।

হোক দেরী । আনিস স্যার ততদিন থাকবে আমাদের এখানে । নীচের ঘর তো খালিই
থাকে । একা মানুষ কোন অসুবিধা হবে না ।

একা মানুষ ?

হ্যাঁ । মেয়ে আর বউ দুঃজনের কেউই বেঁচে নেই । একদিনে দুঃজন মারা গোছে কলেরায় ।
আর মজা কি জান ? তার পরদিনই আনিস স্যার এসেছেন ফ্লাস নিতে । প্রিসিপ্যাল স্যার
বললেন, আজ্জ বাড়ী যান । ফ্লাস নিতে হবে না । আনিস স্যার বললেন, বাড়িতে গিয়ে করবটা
কি ? কে আছে বাড়িতে ?

আমি বললাম, চিঠি লিখলেই কি তোমাদের স্যার আসবেন এখানে ?

হ্যা, আসবেন । আমি লিখলেই আসবেন । লিখব স্যারকে ?

বেশ, লেখ ।

তুমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখতে উঠে গেলে । সে চিঠি শেষ হতে অনেক সময় লাগল । বসে
বসে দেখলাম অনেক কাটাকুটি করলে । অনেক কাগজ ছিঁড়ে ফেললে । এবং এক সময় চিঠি
শেষ করে হাসিমুখে উঠে এলে । তোমাকে সে রাতে ভীষণ উৎফুল কাষাণিল ।

আহ, লিখতে লিখতে কেমন যেন লাগছে । এখন প্রায় মধ্যবাত্রি তবু ইচ্ছে হচ্ছে রাস্তায়
একটু হেঁটে বেড়াই । নিশি রাতে নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে আমার বেশ লাগল । তুমি কি
দস্তযোগস্থির “রূপালী রাত্রি” পড়েছ ? রূপালী রাত্রিতে আমার মত একজন নিশি-পাওয়া
লোকের গল্প আছে ।

জরী, তোমাদের স্যার কবে যেন উঠলেন তোমাদের বাড়িতে ? দিন-তারিখ এখন আর
মনে পড়ছে না । শুধু মনে পড়ছে মাঝবয়েসী একজন ছেটখাট মানুষ ভোরবেলা এসে শুব হৈ
চৈ শুরু করেছিলেন । চেঁচিয়ে রাগী ভঙ্গিতে ডাকছিলেন, সুলতানা, সুলতানা । তুমি ধড়মড়

কবে জ্বেপে উঠলে। “ও আম্মা, কি কাণ্ড, স্যার এসে পড়ছেন” — এই বলে খালি পায়েই ছুটতে ছুটতে নীচে নেয়ে গেলে। আমি জানালা দিয়ে শুধু বাড়িয়ে দেখলাম তুমি পা ছুঁষে সালাম কবছ, আব তোমাদের স্যার বিবিক্তিতে ক্র কুচকে বিড়বিড় কবে কি যেন বলছেন। খানিক পরে দেখলাম তিনি শুব হাসছেন। সেই সঙ্গে লাঞ্জুক ভঙ্গিতে তুমিও হাসছ।

তুমি শুশী হয়েছিলে তো? নিশ্চয়ই হয়েছিলে। আমি স্টুডিওতে বসে তোমার গভীর আনন্দ অনুভব করতে পারছিলাম। একটি তীব্র ব্যথা আমাকে আচম্ভ করে ফেলেছিল। সেদিন আমার আনন্দহস্ত্যার কথা মনে হয়েছিল।

অথচ তোমার স্যার খণ্ডিত্য ব্যক্তি ছিলেন। এমন সহজ, এমন নির্লেভ লোক আমি শুব কমই দেখেছি। কোন কিছুব জন্যেই কোন মোহ নেই। এমন নিলিপ্ততা কল্পনাও করা যায় না। জরী, তুমি ঠিক লোকের প্রেমেই পড়েছিল। এমন মানুষকে ভালবেসে দৃঢ় পাওয়াতেও আনন্দ। তোমার স্যার ফেরেশতা ছিলেন কিন্তু জরী আমি তো ফেরেশতা নই। আমার হৃদয়ে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে গুণি ও ঘণি আছে। আমি সত্যি একজন সাধারণ মানুষ।

সময় কাটতে লাগল। আমি শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। অনেকগুলি ছবি আঁকলাম সে সময়। তোমার পোট্টেটিও সে সময়ই করা। পোট্টেটে সিটিং দেবার জন্যে ঘটাখানিক বসতে হত তোমাকে। তুমি হাসিমুখে এসে বসতে কিন্তু অল্পক্ষণ পরই ছটফট করে উঠতে, “এই বে, স্যারকে চা দেয়া হয়নি। একটু দেখে আসি। এক মিনিট, পীজি।” আমি তুলি হাতে তোমার ফেরার প্রতীক্ষা করতাম। এক কাপ চা তৈরী করতে প্রচুর সময় লাগত তোমার।

যাকে যাকে আসতেন তোমার স্যার। অর্ধ সমাপ্ত ছবিগুলি দেখতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং বলতেন, ছবি আমি ভাল বুঝি না। কিন্তু আপনি যে সত্যিই ভাল আঁকেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁর প্রশংসা আমার সহজ হত না।

আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতাম। তিনি বলতেন, আপনি আঁকুন। আমি দেখি কি করে ছবি আঁকা হয়।

আমি কারো সামনে ছবি আঁকতে পারি না।

তবু তোমার স্যার বসে থাকতেন। তীব্র ঘণায় আমি কতবার তাঁকে বলেছি, এখানে সে আছেন কেন? বাইরে যান।

কোথায় যাব?

নদীর ধারে যান। জরীকে সঙ্গে নিয়ে যান। কাজের সময় বিরক্ত করতেন কেন আপনি?

অপমানে তোমার মুখ কালো হয়ে উঠত। থমথমে স্বরে বলতে, চলুন স্যার আমরা যাই।

ক্রমে ক্রমেই তুমি সরে পড়তে শুরু করলে। পরিবর্তনটুকু শ্বেষীরে হচ্ছিল। সে জন্যেই ঠিক বলতে পারব না কখন থেকে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলে। ব্যক্তিগত হতাশা ও বক্ষনা — এই দুই মিলিয়ে মানসিক দিক দিয়ে অনেক আঁকাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সে অসুস্থ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। একনাগাড়ে জরু চলে গৈরিদিন। শুম হয় না, বুকের মধ্যে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করি। তীব্র যন্ত্রণা।

অসুস্থ-বিসুখে মানুষ শুব অসহায় হয়ে পড়ে। সে সময় একটি সুরক্ষার স্পর্শের জন্যে মন

কাদে। কিন্তু তুমি আগের মতই দরে দূরে রইলে। যেন ভয়ানক একটি ছেঁয়াচে রোগে আমি শ্যাশামী। ছেঁয়াচ বাঁচিয়ে না চললে সমৃহ বিপদ।

তেমর স্যার আসতেন প্রায়ই। আমি তাঁর চাঁখে গভীর মমতা টের পেতাম। তিনি আমার কপালে হাত রেখে নরম পলায় বলতেন, একটি গল্প পড়ে শনাই আপনাকে? আপনার ভাল লাগবে।

আমি রেপে গিয়ে কলতাম, একা থাকতেই আমার ভাল লাগবে। আপনি নীচে যান। কেন বিরক্ত করছেন?

এত অস্ত্রির হচ্ছেন কেন? আমি একটু বসি এখানে। কথা বলি আপনার সঙ্গে?

না, না অসহ্য। আপনি জরীর সঙ্গে কথা বলুন।

আমার অসুখ সারে না কিছুতেই। বাবার বক্ষ শশধর ডাঙ্কার রোজ দু'বেলা আসেন আর গভীর হয়ে মাথা নাড়েন। বারবার জিজ্ঞেস করেন, হাঁপানির টান উঠে না-কি বাবা? হাঁপানি তোমাদের বৎশের অসুখ। তোমার দাদার ছিল, তোমার বাবারও ছিল। শ্বাস নিতে কোন কষ্ট টের পাও?

একটু যেন পাই।

ডাঙ্কার চাচা একটি মালিশের শিশি দিলেন। “শ্বাসের কষ্ট হলে অল্প অল্প মালিশ করবে। সাবধান, মুখে যেন না যায়। তীব্র বিষ।” ছোট্ট একটি শিশিতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ তরল বিষ। আমি যত্নমুণ্ডের মত সেই শিশিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডাঙ্কার চাচা চলে যেতেই তোমাকে ডেকে বললাম, জরী এই শিশিটিতে কি আছে জান?

জানি না কি আছে?

তীব্র বিষ! সাবধানে তুলে রাখ।

তোমাকে কেন বললাম এ কথা কে জানে। কিন্তু বলবার পর দারুন আত্মপ্রসাদ হল। দেখলাম তুমি সরু চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলে আমার দিকে। কি ভাবছিলে?

অসুখ সারল না। ক্রমেই বাড়তে থাকল। চোখের নীচে গাঢ় হয়ে কালি পড়ল। জগ্নিসের রুগ্নীর মত গায়ের চামড়া হলুদ হয়ে গেল। দিনরাত শুয়ে শুয়ে থাকি। কত কি মনেহসে। কৃত সুখ-স্মৃতি, কৃত দৃঢ়-জ্ঞানিয়া ব্যথা। শ্লথ সময় কাটে। এক এক রাতে ঘন শোয়া হয়ে বৃষ্টি নামে। বন্ধুবাদ শব্দে গাছের পাতায় অপূর্ব সঙ্গীত শব্দনিত হয়। শুয়ে শুয়ে শুনি তুমি নীচের ঘরে বৃষ্টির সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান করছো। আহ, কিসব দিন কেমেজ!

একটি প্রশংস্ত ঘব। তার এক প্রান্তে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড একটি পালঞ্চ। সেখানে শয়া পেতে রাতদিন খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে থাকা। কি বিশ্ব জীবন। ডাঙ্কার চাচা কৃতবার আমার মুখের উপর ঘুঁকে পড়ে বলেছেন, কেন তোমার অসুখ সারে না? বল, কেন?

আমি কি করে বলব?

যাও হাওয়া বদল করে আস। বৌমাকে নিয়ে সুনে আস কঞ্জবাজার থেকে।

আচ্ছা যাব।

আচ্ছা নয়, কালই যাও। সঞ্জ্যায় হয়মনসিংহ একপ্রেসে।

এত তাড়া কিসের?

তাড়া আছে, আমি বলছি বৌমাকে সব ব্যবস্থা করতে।

ডাঙ্গোর চাচা সেদিন অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, ও বৌমা, বৌমা।

তুমি তো প্রায় সময়ই থাকতে ন, সেদিনও ছিলে না।

ডাঙ্গোর চাচা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন সেদিন।

শুনু কি তিনি? এ বাড়ীর সব কপি লোক কৌতূহলী হয়ে দেখত আমাকে। আবুর মা গরম পানির বোতল আমার বিছানায় রাখতে রাখতে নেহায়েত যেন কথার কথা এমন ভঙ্গিতে বলত, বিবি সাহেব নদীর পাড়ে বেড়াইতে গেছেন।

আমি বলতাম না কিছুই। অসহ্য বোধ হলে বিষের শিশিটির দিকে তাকাতাম। যেন সেখানে প্রচুর সান্ত্বনা আছে।

জরী, আমাদের এ ধৰ্মে অনেক অভিশাপ আছে। আমার দাদা তাঁর অবাধ্য প্রজাদের হাতে শুন হয়েছিলেন। আমার মা'র মতৃও রহস্যাময়। লোকে বলে তাঁকে নাকি বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল। আমার সারাক্ষণ মনে হত পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শিক্ষা আমাকেও করতে হবে।

জরী, আমার জরী, আহ! কতদিন তোমাকে দেখি না। তোমার গোলগাল আদুরে মুখ কি এখনো আগের মত আছে? না, তা কি আব থাকে? জীবন তো বহতা নদী। মাঝে মাঝে তোমার জন্যে শুব কষ্ট হয়। ইচ্ছে হয় আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে। টেনে করে তুমি প্রথমবারের মত মীলগাঞ্জে আসছ সেখান থেকে। এ যে গৌরিপুরে টেন থেমে থাকল অনেকক্ষণ। একজন অঙ্গ ভিখিরি একতারা ধাজিয়ে করণ সুরে গাইল,

ও মনা

এই কথাটি না জানলে

প্রাণে বাঁচতাম না।

ও মনা। ও মনা।

তুমি ভিখিরিকে দুঃটি টাকা দিলে।

তোমার কথা মনে হলেই কষ্ট হয়। ভালবাসার কষ্ট আমার চেয়ে বেশি কে আর জানবে বল? তোমার ব্যথা আমি সত্ত্ব সত্ত্ব অনুভব করেছিলাম।

তোমার স্যার যেদিন নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, “সুলতানা, আমার সুটকেসটা শুছিয়ে দাও। আমি ভোরে যাচ্ছি।” তখন তোমার চোখে জল টুকুমুকু করে উঠল। তোমার স্যার সেদিকে লক্ষ্যও করলেন না। সহজ ভঙ্গিতে এসে বসলেন আমার বিছানার পাশে। গাঢ়স্বরে বললেন, আপনি জরীকে নিয়ে সমুদ্রের তীব্র বিছুড়ন থাকুন। ভাল হয়ে যাবেন।

আমি বললাম, না — না আমি যাব না। সমুদ্র আমার জীবনে লাগে না। আপনারা দুঃখনে যান। সমুদ্রভীরে সব সময় দুঃখন করে যেতে হয়। এর বেশীও নয়, এর কমও নয়।

তোমার স্যার তঃপুর হাসি হাসতে লাগলেন। তেন্তু মাথা নীচু করে দাঢ়িয়ে রইলে। একটি কথাও বললে না। আমি দেখলাম, শুব শাস্ত ভঙ্গিতে তুমি তোমার স্যারের সুটকেস শুছিয়ে দিলে। রাস্তায় কিদে পেলে খাবার জন্যে একগাদা কি-সব তৈরী করে দিলে। তিনি বিদায়

নিলেন শুব সহজভাবেই। ঘর থেকে বেরিয়ে একবারও পিছনে ক্ষিরে তাকানেন না। তুমি মৃত্তির ফত গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বইলে।

জরী, তুমি ভুল লোকটিকে বেছে নিয়েছিলে। এইসব লোকের কোন পিছুটান থাকে না। নিজ স্তৰী-কন্যার মৃত্যুর পরদিন যে ঝুঁস নিতে আসে তাকে কি আর ভালবাসার শিকলে বাধা যায়?

তোমার স্যার চলে যাবার দিন আমি তোমাকে তীব্র অপমান করলাম। বিশ্বাস কর, ইচ্ছে করে করিনি। তোমার স্যার যখন বললেন, আপনার কাছে আমার একটি জিনিস চাইবার আছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কি জিনিস?

আপনার আঁকা একটি ছবি আমি নিতে চাই। হাত জোড় করে প্রার্থনা করছি।

নিশ্চয়ই। অপনার পছন্দযত ছবি আপনি উঠিয়ে নিন। যে কোন ছবি। ষেটা আপনার ভাল লাগে।

তিনি ব্যস্ত হয়ে আমার স্টুডিওর দিকে চলে গেলেন। আমি তোমার চোখে চোখ রেখে বললাম, স্যার কোন ছবিটি নেবেন জ্ঞান তুমি?

না।

স্যার নেবেন তোমার পোর্টেট।

তিনি কিন্তু নিলেন অন্য ছবি। জলরঙে আঁকা ‘এসো নীপবনে’। তাকিয়ে দেখি অপমানে তোমার মুখ নীল হয়ে গেছে। তীব্র ঘণা নিয়ে তুমি আমার দিকে তাকালে।

সেই সব পূর্বানো কথা তোমার কি মনে পড়ে? বয়স হলে সবাই তো নষ্টালজিক হয়, তুমি হওনি? কুটিল সাপের মত যে ঘণা তোমার বুকে কিলবিল করে উঠেছিল তার জন্যে তোমার কি কখনো কাঁদতে ইচ্ছা হয় না? তুমি কাঁদছ এই ছবিটি বড় দেখতে ইচ্ছে করে। তোমার স্যার চলে যাবার পর তুমি কি করবে তা কিন্তু আমি জানতাম জরী। তোমার তো এ ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। মিছিমিছি তুমি সারা জীবন লজ্জিত হয়ে রইলে।

আমি তোমাকে চল্লনাথ পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছি। তুমি বলেছ, “না”। তোমাকে কিছুদিন তোমার বাবা-মা’র কাছে রেখে আসতে চেয়েছি। তুমি কঠিন স্বরে বালেজ, “না।” কতবার বলেছি, বাইরে থেকে ঘুরে এলে তোমার মন ভালো থাকবে। তুমি শাস্ত স্বরে বলেছ, আমার মন ভালই আছে।

আমি জানতাম ঘণার দেয়ালে বন্দী হয়ে একজন মানুষ বেশীদিম আকতে পারে না। তোমার সামনে দৃঢ়ি যাত্র পথ। এক — মরে যাওয়া, আর দুই — কিন্তু মরে যাওয়ার মত সাহস তোমার ছিল না। কাজেই দ্বিতীয় পথ যা তুমি বেছে নেবে তার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। এও এক ধরনের খেলা। আমি জানতাম তুমি একবারও পরাজিত হবে। পরাজয়ের মধ্যেই আসবে জয়ের মালা। উৎকষ্টয় দিন কাটতে নিষ্ঠ। কখন আসবে সেই মুহূর্তটি? সেই সময় আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারব তো?

সেই মুহূর্তটির কথা তোমার কি মনে পড়ে কখনো? ঘন হয়ে শীত পড়ছে। শরীর খানিক সূख বোধ হওয়ায় আমি কয়ল মৃড়ি দিয়ে বসে আছি।

সন্ধ্যা মিলাতেই ঘরে আলো দিয়ে গেল। তারও কিছু পর তুমি এলে চা নিয়ে। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে শিয়ে চা ছলকে পড়ল মেঝেতে। বিড়বিড় করে তুমি কি যেন বললে। অমি তাকিলাম টেবিলের দিকে। বিমের সেই শিশি নেই। তুমি অপজ্ঞকে তাকিয়েছিলে আমার দিকে। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলাম চায়ের পেয়ালার জন্যে। তুমি জ্ঞান হাবিয়ে এলিয়ে পড়লে মেঝেতে। হেসে গেলে জ্বরী।

তোমাকে এরপর খুব সহজেই জ্য করা ষেত। কিন্তু আমি তা চাইনি, সব ছেড়েছুড়ে চলে এলাম। অল্প কদিন আমরা বাঢ়ি। তবু এই সমষ্টে কত সুখ-দুঃখ আমাদের আছম করে রাখে। কত গ্লানি, কত অনন্দ আমাদের চারপাশে নেচে বেড়ায়। কত শূন্যতা বুকের ষেতবে হা হা করে।

জ্বরী, এখন গভীর রাত্রি। আব কিছুক্ষণের মধ্যেই পেটার এসে দরজায় নক করবে। বিমান কোম্পানীর মিনিবাস এসে দাঁড়াবে দোরগোড়ায়। আবার যাত্রা শুরু।

আমার হয়তো কোন এক পেইন্টিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কথা মনে পড়বে। আবার এবকম লম্বা চিঠি লিখবো। কিন্তু সেসব চিঠি কখনো পাঠাবো না তোমাকে। যৌবনে হৃদয়ের যে উত্তাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি, আজ কি আব তা পারবে? কেন আব মিছে চেষ্টা।



নিমধ্যমা

মতিনউদ্দিন সাহেবকে কেন জানি কেউ পছন্দ করে না। অফিসের লোকজন করে না, বাড়ির লোকজনও না। এর যে কি কারণ মতিন সাহেব জানেন না। প্রায়ই তাঁর ইচ্ছা করে পরিচিত কাউকে জিজ্ঞেস করেন — ‘আচ্ছা আপনি আমাকে পছন্দ করেন না কেন?’ জিজ্ঞেস করা হয় না। তাঁর লক্ষ্য লাগে। মনে মনে দীর্ঘ নিষ্প্রস ফেলে বলেন — থাক, কি হবে জিজ্ঞেস করে?

তাঁর স্ত্রীকে অবশ্য একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করবলেন। নাশতা ষেতে ষেতে অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা, তুমি আমাকে পছন্দ কর না কেন?

‘না — কিছু বলিনি।’

‘পছন্দের কথা কি যেন বললে?’

‘মানে জানতে চাচ্ছিলাম — তুমি আমাকে পছন্দ কর কি-না।’

‘তোমার কি ভীমরতি হয়ে গেল না-কি, জানেওয়াজে কথা জিজ্ঞেস করছ।’

‘আব করব না।’

ত'র শ্রী যে তাকে দুঃখে দেখতে পাবেন না তা মতিন সাহেব জানেন। তিনি থাকেন একা একটা ঘরে। সেই ঘরটাও বাড়ির সবচেয়ে খরাপ ঘর। আলো-বাতস তুকে না বনাইয়ে হয়। দিনের বেলায় বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয় হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে কোন মেহমান চলে এলে এই ঘরও তাকে ছেড়ে দিতে হয়। তখন কোথায় শোবেন তাই সমস্যা হয়ে দাঢ়ায়। বড় ছেলের ঘরটাও বড়। অনাধিকার দুর্জন শোয়া যায়। কিন্তু শোয়া সম্ভব না — বড় ছেলে বিরক্ত হয়। ছেট দুই মেয়ে এক ঘরে শোয়া, সেখানে জ্বায়গা নেই। তিনি খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত বসার ঘরের সোফায় শূমুতে যান। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

গত পূজাৰ ছুটিতে বাসার সবাই ঠিক কৱল দল বেঁধে কঞ্চবাজার যাবে। তাকে অবশ্য কেউ বলল না। তিনি খাবার টেবিলে আলোচনা শুনলেন। সব খৰচ দিছে তাঁৰ বড় ছেলে। ব্যবসায় তাৰ ভাল লাভ হয়েছে। কিছু টাকা খৰচ কৱতে চায়। সে হাসি মুখে বলল, “এখান থেকে একটা মাইক্রোবাস ভাড়া কৱে, মাইক্রোবাসে যাব। নিজেদেৱ কনট্ৰোলে একটা গাড়ি থাকাব খুব সুবিধা। ধৰ, কঞ্চবাজার থেকে টেকনাফ যেতে ইচ্ছা কৱল, হট কৱে চলে গেলাম।”

মেজো যেয়ে নীতু বলল, কিন্তু ভাইয়া টেল জার্নিৰ আলাদা মজা। একটা পুৰো কামড়া বিজৰ্ণ কৱে যদি যাই . . . গাড়ি তুমি কঞ্চবাজারে ভাড়া কৱ। ওখানে ভাড়া পাওয়া যাব না?

ছেট যেয়ে বলল, আমাৰ প্ৰেমে যেতে ইচ্ছা কৱছে ভাইয়া। ঢাকা থেকে চিটাগাং পৰ্যন্ত ট্ৰেনে, সেখান থেকে প্ৰেমে কঞ্চবাজার।

এই সব আলোচনা শুনতে তাঁৰ খুব আনন্দ হচ্ছিল। অবশ্য তিনি আলোচনায় অংশগ্ৰহণ কৱলেন না। কাৰণ তিনি জ্বানেন কিছু বলতে গেলাই রাহেলা বলবেন, চূপ কৱ তো, তুমি জ্বান কি?

মতিন সাহেব কিছু বললেন না ঠিকই কিন্তু জোগাড়-যন্ত্ৰ কৱে রাখলেন। কাপড়-চোপড় ধূয়ে ইস্ত্রী কৱিয়ে রাখলেন। অফিসে বড় সাহেবকে বললেন, আমাৰ কয়েকদিন ছুটি লাগবে স্যার। পৰিবারেৰ সবাই কঞ্চবাজার যাচ্ছি।

বড় সাহেব বললেন, হঠাৎ কঞ্চবাজার। ব্যাপার কি?

‘বাচ্চাৰা ধৰল — বেড়াতে যাবে। আমি বললাম, ঠিক আছে চল। ওদেৱ আমিৰেৰ জন্য যাওয়া। অবশ্যি আমি নিজেও কোনদিন সমুদ্র দেখিনি। ভাবলাম দেখেই আমি . . .’

বলতে বলতে আনন্দে তাঁৰ চোখে পানি এসে গেল। বড় সাহেব সাতদিনেৰ ছুটি যত্নেৰ কৱলেন।

কঞ্চবাজার বওনা হবাৰ আগেৰ দিন রাহেলা এসে বললেন, আমাৰ সবাই কঞ্চবাজার যাচ্ছি জ্বান তো? তোমাৰ তো আবাৰ কোন হঁশ থাকে না, যেকে কি আলোচনা হয় তাৰ জ্বান না। কাল রওনা হচ্ছি। মাইক্রোবাসে যাচ্ছি। বাস চলে আসকৈ ভোৱ ছাঁটায়।

মতিন সাহেব হাসি মুখে বললেন, জ্বানি আগ্রি-ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি। অফিস থেকে সাতদিনেৰ ছুটি নিয়েছি। আৰ্নেড লিভ।

বাহলা আবাক হয়ে বললেন, তোমাকে ছুটি নিতে কে বলল? আগ বাড়িয়ে যে এক একটা কাজ কর রাগে গা জ্বলে যায়। আমি কি বাসা খালি রেখে যাব ন-কি? বোজ ছুরি হচ্ছ। তুম থাকবে এখানে।

‘আচ্ছা।’

‘ফৌজে এক সপ্তাহের মত গোশত বাসা করে রাখা হয়েছে। চারটা চাল ফুটিয়ে খেয়ে নেবে। পারবে না?’

‘পারব।’

‘শোবার আগে সব ঘর বঙ্গ হয়েছে কি-না ভাল করে দেখবে। তোমার উপর কোন দায়িত্ব দিয়েও তো নিশ্চিন্ত হতে পারি না।’

এ জাতীয় ব্যাপার যে শুধু বাড়িতে ঘটে তাই না। অফিসেও নিয়মিত ঘটে। ঠাঁদের অফিসের এক সহকর্মী কোন-এক সিনেমায় ডাঙ্কারের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। নায়িকার খুব ঝুর। ডাঙ্কাৰ ঝুর দেখে বললেন — “হ্রস্ব, ঝুর একশ তিন। পেশেন্টিকে এক্ষণ্মি হাসপাতালে নিতে হবে।” নায়িকা তখন কাতর গলায় বলে, আমি বাঁচতে চাই না ডাঙ্কাৰ। মতৃহই আমাৰ জন্যে ভাল। পৃথিবীৰ এ আলো হাওয়া, এ আনন্দ আমি সহ্য কৰতে পাৱছি না। ডাঙ্কাৰ তখন বলেন, ছিঃ এমন কথা বলবেন না।

এইটুকুই পার্ট। তবু তো সিনেমার পার্ট। পরিচিত একজন সিনেমায় পার্ট কৰছে এটা দেখায়ও আনন্দ। যে পার্ট কৰছে সে বলল, বহুস্পতিবার সে সবাৰ জন্য পাস নিয়ে আসবে। অফিসের শেষে সবাই তাৰ বাসায় চা-টা খেয়ে সক্ষ্যাবেলা এক সঙ্গে ছবি দেখতে যাবে।

মতিন সাহেব খুব আগ্রহ নিয়ে বহুস্পতিবারের জন্য অপেক্ষা কৰতে লাগলেন। ছবিঘৰে অনেকদিন ছবি দেখা হয় না। ছবি দেখা হবে। তাছাড়া দলবল নিয়ে ছবি দেখাৰ আনন্দও আছে। উদ্বেজনায় বহুস্পতিবারে তিনি অফিসেৰ কাজও ঠিকমত কৰতে পাৱলেন না। ছুটিৰ পৰ সবাই এক সঙ্গে বেকচেন, সিনেমাব ডাঙ্কাৰ অভিনেতা মতিন সাহেবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, একটা ভুল হয়ে গেছে। তেৰটা পাস এনেছি, এখন দেখি মানুষ চৌক্ষিক। কি কৱা যায় বলুন তো!

মতিন সাহেব কিছু বললেন না। তাৰ খুব যেতে ইচ্ছা কৰছে। নিজ খেকে বলতে ইচ্ছা কৰছে না, ‘আপনারা যান। আমি থাকি।’

‘শুনুন মতিন সাহেব, আপনি বৰং থাকুন। আপনাকে পৰে পাস এনে দেব। আমি ছবি ও খুব আজেবাজে। পুৱা ছবি দেখলে হলেৰ মধ্যে বমি কৰে দেবেন। না দেখাই আজান্তী।’

মতিন সাহেব বললেন, আচ্ছা।

‘মনে কিছু কৰলেন না তো আবার?’

‘জ্ঞি - না।’

‘বাসা পর্যন্ত চলুন। এক সঙ্গে চা থাই। অসুবিধা নেই কোনো?’

‘জ্ঞি-না।’

শেষ পর্যন্ত বাসায় যাওয়া হল না। একটা অস্তি-জোগাড় হয়েছিল, সেই জীপে সবাৰ জায়গা হল মতিন সাহেবেৰ হল না।

‘মতিন সাহেব, আপনি বরং একটা যিকশা নিয়ে চলে আসুন। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরী পাড়া। অসুবিধা হবে না তো?’

‘জি—না।’

ঠিকানা নিয়ে তিনি যিকশা করে মালিবাগে নামলেন বাসা খুঁজে পেলেন না কাবণ ঠিকানায় সবই দেয়া আছে বাসার নম্বর দেয়া নেই। মতিন সাহেবের একবর ক্ষীণ সন্দেহ হল — ইচ্ছা করেই বাসার নাম্বার দেয়ানি। পরম্পৃষ্ঠেই সেই সন্দেহ তিনি ঘোড়ে ফেলে দিলেন। তা কি করে হয়। সন্ধ্যা না মেলানো পর্যন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করলেন বাড়ি খুঁজে বের করবার। পারলেন না।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর চাকরির পর তিনি রিটায়ার করলেন। জুনিয়র অফিসার হিসেবে তুকেছিলেন, রিটায়ার করলেন সিনিয়র অফিসার হিসেবে। ত্রিশ বছরে একটিমাত্র প্রযোশন। বর্তমান অফিসের জেনারেল ম্যানেজার তাঁর সঙ্গেই চাকরিতে তুকেছিলেন। এখন তাঁকে স্যার ডাকতে হয়। মতিন সাহেবের লজ্জা লজ্জা করে। উপায় কি?

রিটায়ার করা উপলক্ষে অফিসে বিদায় সভার আয়োজন করা হয়েছে। অফিস শেষে বেলা সাড়ে পাঁচটায় সভা হবে। মতিন সাহেব কি বলবেন সব ভেবে রেখেছেন। ভেবে রাখা কথা সব বলতে পারবেন কি—না তা জানেন না। হয়ত চোখে পানি এসে যাবে, গলা ধরে যাবে। বিকাল পাঁচটা বাজতেই তিনি হলঘরে বসে রইলেন। আশ্চর্য তিনি একা — একটি লোকও নেই। ছটা পর্যন্ত তিনি একা একাই বসে রইলেন। লক্ষ্য করলেন অফিসের লোকজন একে একে চলে যাচ্ছে। এদিকে কেউ উকিও দিচ্ছে না।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় জি.এম. অফিস থেকে বেরুবার সময় বিস্তৃত হয়ে বললেন, আরে মতিন সাহেব আপনি? বসে আছেন কেন?

‘মতিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, বিদায় সভা হবে এই জন্যে . . .’

‘আজ তো হবে না। আজ আর্মি ব্যস্ত, এই জন্যে ক্যানসেল করে দিয়েছি। আপনি নোটিস পাননি?’

‘জি—না।’

‘আরে বলেন কি? আচ্ছা বাড়ি চলে যান। পরে এক সময় ফেয়ার ওয়েল করো। আপনাকে খবর দেয়া হবে।’

‘জি—আচ্ছা স্যার।’

চাকরি জীবন শেষ হয়ে অবসর জীবন শুরু এই ভেবে মতিন সাহেব এক কেজি সন্দেশ কিনে ফেললেন। হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। সন্ধ্যার দিকে হাঁটতে হাঁটতে হলুল লাগে। বাড়ি ফিরে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রাইল না। বাড়ি খালি। জনপ্রাণী নেই স্টেসবাবপত্র নেই। সব ধূধু করছে। রোগা একটা ছেলে বালতি ভর্তি পানি দিয়ে মেঝে ধূমজু। মতিন সাহেব বললেন, ওরা কোথায়?

ছেলেটি বলল, কারা?

‘এই বাড়িতে যারা থাকত?’

‘বাড়ি ছাইড়া নতুন বাড়িতে গেছে।’

BanglaBook.org

'কোথায় গেছে ?'

'আমি ক্যামনে কই ?'

বাড়িওয়ালাব কাছে খোজ নিয়ে জানলেন — তার পল্লবীতে বাড়ি নিয়েছে। বড় বাড়ি।
সে বাড়ির ঠিকানা তিনি জানেন না।

অনেক যত্নগা করে রাত দশটায় পল্লবীর বাড়িতে তিনি উপস্থিত। রাহেলা খড়খড়ে
গলায় বললেন, এতক্ষণে তোমার সময় হল ? আজি বাড়ি বদল হচ্ছে, কোথায় সকাল সকাল
ফিরবে। সাহায্য করবে। আর তুমি কি-না উদয় হয়েছ মাঝরাতে।

'বাড়ি বদল করছ জানতাম না। ভূমি আমাকে কিছু বলনি !'

'সব কিছু তোমাকে জানিয়ে তোমার অনুমতি নিয়ে করতে হবে ?'

'না — তা না। মানে আমি জানতাম না যে বাড়ি বদল করছ !'

'রোজ এই নিয়ে কথা হচ্ছে। জিনিসপত্র বাধাছাদা হচ্ছে — আব তুমি বলছ তুমি
জানতে না !'

'কিছু তো বলনি . . . '

'আব কিভাবে বলব ? মাইক ভাড়া করে বলতে হবে ?'

'নতুন বাড়ির ঠিকানাও জানতাম না — শুধু যত্নগা করে ঠিকানা বের করেছি।'

'যত্নগা করে ঠিকানা বের করতে হয়েছে ? কি এমন যত্নগা করেছ শুনি। হাতে ওটা কি ?'

'সন্দেশ !'

'সন্দেশ কিনলে কেন ?'

'এম্বি কিনলাম !'

'জান এই বাড়িতে মিটি কেউ খায় না — তারপরেও সন্দেশ কিনে আললে কি মনে
করে ?'

'ভুল হয়ে গেছে !'

নতুন বাসায় মতিন সাহেবের ঘর হল ছাদের চিলেকোঠায়। এই ঘরটা আগের চেয়েও
ছোট তবে প্রচুর আলো-বাতাস। সবচে 'বড় সুবিধা হচ্ছে যে কোন সময় ছাদে আসা যায়।
যাতে কোন কারণে তার ঘূম ভাঙলেই তিনি ছাদে এসে বসে থাকেন। তারাভরা আকৃষের
দিকে তাকিয়ে ভাবেন, কেন সবাই তাঁকে এত অপছন্দ করে ? তিনি কি মানুষটা খারাপ ?

তা তো না। কখনো কোন অন্যায় করেছেন বলে তো মনে পড়ে না। ^{সং} তাবে
থেকেছেন। ^{সং} জীবন যাপন করেছেন।

তাহলে কি তাঁর চেহারা খারাপ ? কিংবা চেহারাটা এমন যে দেখলেই সবার রাগ লাগে ?

তাও বোধ হয় না। আয়নায় তিনি দীর্ঘ সময় নিজেকে দেখেছেন। একবার না, অনেকবার
দেখেছেন। খারাপ বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া চেহারা কি খুব বড় ব্যাপার ? কত কুৎসিত-
দর্শন মানুষ পঢ়িবীতে আছে। তাদের প্রতি কত ভালবাসা স্বাই দেখায়। তাদের অফিসেই
তো একজন আছেন, পরিমল বাবু। আগুনে পুড়ে মুড়ে একটা দিক বলসে গেছে, বাঁ
চোখটা নষ্ট। তাকালে শিউরে উঠতে হয়। অপ্রচলিত মুখে — পরিমলদা, পরিমলদা।
অফিসের পিকনিক হবে, ব্যবস্থা করবে ^{পরিমলদা}। নাটক দেখতে যাবে, ডাকো
পরিমলদাকে।

তাহলে ব্যাপারটা কি? তিনি খানিকটা বোকা বলেই কি সবাই তাকে এড়িয়ে চলে? বোকাদের কেউ পছন্দ করে না — কিন্তু তিনি কি সত্ত্ব বোকা? কাউকে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছা করে। কাকে জিজ্ঞেস করবেন? জিজ্ঞেস করবার ঘত কোন বস্তু তাঁব নেই। কাজেই তিনি গভীর রাতে ছাড়ে বসে আকাশের তারা গুনেন।

দিনের বেলাটা তাঁর অবশ্যি খূব ভাল কাটে। সকালে নাশতা শেষ করেই বের হয়ে পড়েন। এগারোটা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করেন। বাচ্চাদের স্কুলগুলির সামনে দাঢ়ান। এক একদিন এক এক স্কুল। ছোট ছোট বাচ্চরা হৈচৈ করে স্কুলে চুকে। তাঁর দেখতে বড় ভাল লাগে। এগারোটাৰ দিকে রোদ কড়া হয়ে গেলে ঘূরতে আৰ ভাল লাগে না — কোন-একটা পার্কে চলে যান। দুপুরটা কাটে পার্কেৰ বেঞ্জিতে শুয়ে শুয়ে। দুপুরের খাবার তিনি পাকেই খান। এক ছাটাক বাদায়, এক প্লাস পানি আৰ এক কাপ চা। কোন কোন দিন দুটা সিঙ্গাড়া, একটা কলা। সবই পার্কে পাওয়া যায়। দুপুরে তিনি যে বাড়িতে থেতে যান না এ নিয়ে কেউ তাকে কখনো কিছু বলে না।

রোদ একটু কমে গেলে বেলা চারটার দিকে তিনি আবার ঘূরতে বের হন। বাসায় ফিরে যান সন্ধ্যার দিকে — এই হচ্ছে মতিন সাহেবেৰ কৃটিন। বাসায় ফিরে জিজ্ঞেস করেন অফিস থেকে কোন চিঠি এসেছে কি-না। বিদ্যায় সভার খবরেৰ জন্য তিনি এখনো মনে মনে অপেক্ষা কৰেন।

এক বোবারারেৰ কথা। চৈত্র মাস। বাঁকালো রোদ উঠেছে। মতিন সাহেব যথাবীতি রমনা পার্কে উপস্থিত হয়েছেন। পছন্দসই একটা বেঞ্জ বের কৰে লম্বা হয়ে শুয়েছেন। আকাশ ঘন নীল — আকাশেৰ দিকে তাকিয়ে আছেন হঠাৎ কেমন যেন হল। পায়েৰ নখ থেকে মাথাৰ চূল পর্যন্ত মদু অথচ তীক্ষ্ণ বাঁকনি অনুভব কৰলেন। পেটেৰ নাড়ীভূড়ি মনে হল হঠাৎ একটা পাক দিয়েছে। মুখ ভর্তি হয়ে গেল লালায়। চোখেৰ সামনে তীব্র নীল আলো বলসে উঠল।

তিনি চোখ বন্ধ কৰে তিনবাবৰ বললেন, ইয়া মাবুদ। ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ।

চোখ খুললেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। যা দেখলেন তাঁৰ জন্যে তাঁৰ কোন রকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তিনি দেখলেন — তাঁৰ চারপাশে ছসাতটি শিশু। বয়স সাত থেকে বারোৱ মধ্যে। প্রতিটি শিশুৰ মুখ এত সুন্দৰ যে মনে হয় যেন তুলি দিয়ে আঁকা। গায়েৰ রঞ্জ গোলাপী, পাতলা ঠোঁট, গা লাল রঞ্জেৰ। চোখেৰ পত্তন দীর্ঘ। চোখগুলি বড় বড়। মেঠা চোখ মুগ্ধ বিস্ময়।

মতিন সাহেব চোখ মেলাতেই সবগুলি বাচ্চা এক সঙ্গে কলকল কৰে উচ্ছব তাঁৰ কথা বলছে। অতি বিচিত্ৰ কোন ভাষায় কথা বলছে। সেই বিচিত্ৰ ভাষার এক কণ্ঠও তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁৰ কথা বলছে অতি যিষ্টি সুৰে। খানিকটা দেখে জেনে। এক-একটা বাক্য বলাব পৰ তাঁৰ বাঁ হাত চোখেৰ সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে টেক্জাই বোধ হয় এদেৱ কথা বলাব ভঙ্গ।

এৱা যে মানবশিশু এতে কোন সন্দেহ নেই! কিন্তু কোথাকাৰ মানবশিশু? এদেৱ পোশাকও অতি বিচিত্ৰ। সবাবই গলা থেকে পুঁয়েম গোড়ালি পৰ্যন্ত লম্বা পোশাক। যাৰ রঞ্জ কোন স্থায়ী রঞ্জ না — কখনে কখনে তা বদলাচ্ছে।

মতিন সাহেব চোখ বন্ধ করে ফেললেন বাচ্চাদের কলকল শব্দ সঙ্গে থেঁথে গেল। চারদিক পুরোপুরি নিঃশব্দ। এখনসের নীববতা সহ্য করাও মূশক্রিল। মতিন সাহেব চোখ মেললেন, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাবা আবার কলকল শুরু করল। এবা সবাই উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে। ব্যাপার কি হচ্ছে কিছুই বেঝা যাচ্ছে না। মতিন সাহেব ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন। যদিও এই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা মূশক্রিল।

তিনি শুয়ে ছিলেন সিমেন্টের বেঞ্জে। এখন তিনি শুয়ে আছেন ঘাসের উপর। ঘাসগুলি অবশ্যি অন্য রকম। সবুজ নয়, হালক নীল। ঘাসের পাতা সূতার মত সূক্ষ্ম। সিমেন্টের বেঞ্জে যখন শুয়েছিলেন তখন সূর্য ছিল মাথার উপর। এখন কোন সূর্য নেই। তিনি সূর্যের থেঁজে এদিক-ওদিক তাকালেন। বাচ্চারাও তার মত ওদিক-ওদিক দেখছে। তিনি হাতের ইশারায় বললেন — সূর্যটা কোথায়? বাচ্চারা কিছু বুঝতে পারল বলে মনে হল না — তারাও অবিকল তার মত হাতের ইশারা করল। এবা যেন একদল পুতুল। তিনি যা করবেন এবাও তাই করবে। মতিন সাহেব বললেন, ‘তোমরা কারা?’

এবা কয়েক সেকেণ্ট চুপ করে রইল। তারপর সবাই একসঙ্গে মিটি করে বলল, “তোমরা কারা?”

এর মানে কি? কি হচ্ছে এসব? তিনি কোথায়? আগে রফনা পার্কে শুয়ে ছিলেন — এখন যেখানে আছে এটাও মনে হয় কোন পার্ক তবে একটা গাছও চিনতে পারছেন না। অচেনা সব গাছ তবে বড় গাছ না সবই লতানো গাছ। পাতাগুলি বেশির ভাগই গোলাকার। প্রতিটি গাছ ফুলে ভর্তি। ফুলের রঙ নীল এবং বেগুনীতে মেশানো। চৈত্র মাসের ঝাঁঝালো রোদ নেই তবু চারদিক আলো হয়ে আছে। যে বাচ্চা কঢ়ি তাকে ধিরে আছে তাদের কারো পায়ে জুতো নেই। এত সুন্দর পোশাক কিন্তু এবা দাঁড়িয়ে আছে খালি পায়ে। মতিন সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সব কঢ়ি বাচ্চা আগের মত এক সঙ্গে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মতিন সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বাচ্চারাও তার মত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এদের সব কঞ্জন ছেলে না মেয়ে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। সবার চেহারাই দেখতে এক রকম। চূল ছোট ছোট করে কঢ়া।

মতিন সাহেব বুঝতে পারছেন — পুরো জ্যায়গাটাই বিরাট একটা বাগান। এত বুঝ বাগানে এই কঢ়ি মাত্র শিশু। আব কেউ নেই। এবা গোল হয়ে তাকে ধিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ হাসি-হাসি। চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। এবা তাকে দেখে কি ভাবছে? কোন জুত যে দেখতে যানুষের মত। এরকম হলে ছুটে গিয়ে বড় কাউকে নিয়ে আসে উচিত। তা তারা করছে না। কিংবা কে জানে হয়ত করেছে। তাদের ভেতর থেকে কেউ গেছে বড়দের খবর দিতে। এবা অপেক্ষা করছে। তবে এবা খুব যে ভয় পাচ্ছে তা না। ভয় পেলে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকত না। দূর থেকে দেখত। চোখে চোখ পড়ামাত্র থেকে নামিয়ে নিত। মতিন সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন। আসুক, বড় কেউ আসুক,

তার ক্ষিতে পেয়ে গেল। আজ ভোরে তিনি সন্তুষ্ট না থেঁয়ে বের হয়েছেন। দুপুরেও কিছু খাননি। দুচ্ছটাক বাদাম কিনেছিলেন। সেই বাদামের ঠোঙ্গা এখনো হাতে আছে। যার কাছ থেকে বাদাম কিনেছেন তাকে দাম পর্যন্ত দেননি। বাদামের ঠোঙ্গা হাতে আছে। তিনি

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা বাদাম ভেঞ্চে মুখে দিলেন। সবাই কোতৃহলী চোখে তাকে দেখছে। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। মতিনউদ্দিন ঠোংটি ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, থও, বাদাম। বাল ঘরিচ দিয়ে খেতে খুব ভাল। এবার আর তাঁর কথা শনে নবাহ এক সঙ্গে কথা বলে উঠল না। কেউ বাদামও নিল না। শুধু একজন একটু এগিয়ে এসে ঠোং থেকে বাদাম নিল। শোসা ছাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে মুখে দিল। সে এত ভয় পাচ্ছিল যে তার হাত-পা রীতিমত কঁপছে। অন্য বাচ্চাগুলি শংকিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। মতিন সাহেবের ভোবে পেলেন না — এবা এত ভয় পাচ্ছে কেন। বাদাম কি তারা আগে কখনো দেখেনি?

যে সাহস করে বাদাম খেয়েছে তার দিকে তাকিয়ে মতিন সাহেবে বললেন, আমার নাম মতিনউদ্দিন। এই জায়গাটা কোথায় আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বাচ্চাগুলি এবাবে ঠিক আগের মত করল। তিনি যা বললেন তারাও তাই বলল। তবে এবার একটু ব্যক্তিগত হল। কথা শেষ হওয়ামাত্র তারা সরে গেল। অনেকটা দূরে সরে গেল। যে ছেলেটি বাদাম খেয়েছে শুধু সে দাঁড়িয়ে রইল। মতিন সাহেবে তিনজন বয়স্ক মানুষকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। এদের ভেতর দুজন পুরুষ, একজন মহিলা। তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই অসুস্ত-দর্শন কিছু যত্নপাতি। যত্নগুলি থেকে মৌমাছির পাখা নাড়ার শব্দের মত শব্দ আসছে। বয়স্ক মানুষ তিনটির চোখে-মুখে গভীর বিস্ময়।

মতিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত গলায় বললেন, স্যার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই জায়গাটা কি তাও জানি না। এখানে কি করে আসলাম তাও জানি না। যদি অপরাধ করে থাকি, আপনাদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মতিন সাহেব দু'হাত জোড় করলেন। বয়স্ক মানুষ তিনজনের মুখে মদু হাসির রেখা দেখে গেল। তারা কি তাঁর কথা বুঝতে পেরে হাসছে না মতিন সাহেবকে হাত জোড় করতে দেখে হাসছে?

“স্যার আমার বাসা পদ্ধতীতে। এখন রিটায়ার করেছি তো। কিছু করার নেই তাই ঘুরে বেড়াই। ঘুরতে ঘুরতে রমনা পার্কে এসে বেঞ্চিতে বসেছি — তারপরেই এই কাণ। স্যার, এখন আমার অসম্ভব পানির ত্তশ্বা পেয়েছে। জানি আমার কথা আপনারা কিছুই বুঝতে পারছেন না তবু পানির ত্তশ্বার কথা না বলে পারলাম না।”

মতিন সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন তিনি তাদের কোন কথা বুঝতে না পারলেও তারা তাঁর কথা বুঝতে পারছে। কারণ পানির কথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বড় যত্নগুলি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাঁর কাঁধে ঝুলানো বস্তু, যাকে মতিন সাহেব যত্নপাতি বলে ভাবিছেন, তার এক ফাঁক দিয়ে দুটি খুব ছেট ছেট কফির কাপের মত বাতি বের করল। বাতি ভর্তি তবল পদার্থ যা পানি নয়। পানির চেয়ে অনেক হালকা। রঙ, হালকা ব্যস্ত থেকে চমৎকার। মুখে নেয়ামাত্র সমস্ত মুখে ঠাণ্ডা ভাব হল। ত্তশ্বা দূর হয়ে গেল। মতিন সাহেব দুটি কাপই শেষ করলেন। অন্য কাপটির তরল বস্তুর স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যাবাবো — টক টক।

মতিন সাহেবের বললেন, স্যার আপনাদের ধন্যবাদ।

পুরুষদের একজন এগিয়ে এসে মতিন সাহেবকে হাতের ইশারায় বলল, তিনি যেন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকোৱো।

প্রথমবারেই মতিন সাহেব তা বুঝলেন। তবু সে বারবাব এটা বুঝাতে লাগল। মতিন সাহেব বললেন, আপনার কথা আমি পরিকার বুঝতে পারছি। আপনি যা বলবেন আমি তাই কবব। শুধু যদি একটু বুঝিয়ে দেন আমি এখানে কিভাবে আসলাম — আপনারা কাবা — তাহলে মনটা শুন্ত হবে। আমার মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে।

তারা এই কথায় একসঙ্গে হাসল। মতিন সাহেব ভেবে পেলেন না — তিনি এমন কি বলেছেন যাতে এদের হাসি আসবে। বোঝাই যাচ্ছে তিনি কোন ভয়ংকর বামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। এতে হাসির তো কিছু নেই।

আবো তিনজন লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। এরা আগের তিনজনের মত হেঁটে আসেনি — গাড়িতে করে এসেছে। গাড়িগুলিকে কি গাড়ি বলা যায়? হাওয়া গাড়ি? কারণ গাড়িগুলি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এসেছে। গাড়ি ভর্তি নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। নতুন তিনজন মানুষ গাড়ি থেকে নেমেই মতিন সাহেবের চারদিকে যন্ত্রপাতি বসাতে লাগল। এমন সব বিকট আকৃতির যন্ত্র যে তাকালেই বুকে ধ্বনি করে থাকা লাগে।

মতিন সাহেবের চোখের ঠিক সোজাসুজি দশ ফুটের মত দূরে টিভি পর্দার মত পাতলা একটি পর্দা বসানো হয়েছে। মনে হচ্ছে এইটিই 'সবচে' জটিল যন্ত্র কারণ ছয়জন মানুষের মধ্যে চারজনই এটি নিয়ে ব্যস্ত।

মতিন সাহেব বাক্ষাগুলিকে কোথাও দেখতে পেলেন না। এরা নিঃশব্দে সরে গেছে। শুধু যে বাক্ষাটি বাদাম খেয়েছে সে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত তাকেও নড়াচড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তার চারপাশে গোল করে সাদা বাণের দাগ দেয়া হয়েছে। ছেলেটি এই দাগের বাইরে যাচ্ছে না। বাক্ষাটাকে এখন ঝুন্ট মনে হচ্ছে;

মতিন সাহেব বললেন, স্যার আমি কি বসতে পারি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিঁঝি থবে গেছে।

এরা তার কথা বুঝতে পারল। সম্ভবত যন্ত্রপাতিগুলি ভাষা অনুবাদ করে দিচ্ছে কিংবা কে জানে হয়ত তারা মনের কথা বুঝতে পাবে।

'সবচে' বয়স্ক মানুষটি তাঁকে বসতে ইশারা করল। মতিন সাহেব বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাদা পদাটা নিচে নেমে এল। চোখের সোজাসুজি স্থির হয়ে গেল। তিনি ডান দিকে ফিরলেন। পর্দাও ডান দিকে সরে গেল। মজার ব্যাপার তো।

বয়স্ক লোকটি ইশারায় বলল, পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে। তার ভাবভাস দেখে মনে হচ্ছে পর্দায় কিছু দেখা যাবে। অথচ তিনি কিছুই দেখেছেন না। লোকগুলি যদেহ হয় এতে খুব হতাশ হচ্ছে। মতিন সাহেবের আবার পানির পিপাসা পেয়ে গেল। একটু আগে পানি চেয়েছেন। আবার চাইতে লজ্জা লাগছে। তাহ্যাড়া এরা সবাই পদাটা নিয়ে খুব ব্যস্ত। হাওয়া গাড়িতে আরো তিনজন মানুষ এল। এখানকার ছাঞ্জল থেকে তিনজন ফিরে গেল। এই তিনজন সম্ভত পর্দার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। এখন নতুন 'তিনজনই' কাজ করছে। আগের তিনজন একটু দূরে হতাশ মুখে দাঢ়ানো। মনে হচ্ছে পদাটা কঠিন করা তাদের কাছে খুব অসুবিধী।



মতিন সাহেব মাথায় আচমকা একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ছবি দেখতে পেলেন : নিজের ছবি : দুঃহাত মেলে ল্শটি আঙ্গুল বেব করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এর ঘানে কি।

মতিন সাহেব বললেন, স্যার আমি ছবি দেখতে পাচ্ছি। নিজের ছবি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবি মুছে গেল। পর্দায় দেখা গেল তার পাশে বসে থাকা বাচ্চাটির ছবি। সেও আঙ্গুল মেলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার — এই ছেলেটির প্রতি হাতে চারটি করে ঘোট আটটি আঙ্গুল। তিনি পর্দা খেকে চোখ ফিরিয়ে পাশে বসে থাকা ছেলেটির দিকে তাকালেন। আসলেও তাই। এর হাতে চারটি করে আঙ্গুল। পায়েও তাই।

তিনি চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির দিকে তাকালেন। এদেরও সবার হাতে চারটি করে আঙ্গুল। পর্দার ছবির অর্থ এখন পরিষ্কার হচ্ছে — এরা বলতে চাচ্ছে — আমরা দেখতে অবিকল তোমাদের মত হলেও কিছু পার্থক্য আছে। এই হচ্ছে সেই পার্থক্য।

এখন আরো সব পার্থক্য দেখানো হচ্ছে — এগুলি মতিন সাহেব কিছুই বুঝছেন না। তারা চলে গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডি এন এ, আব এন এ তে। পুরো জিনিসটি যদিও দেখানো হচ্ছে ছবিতে তবু মতিন সাহেব কিছু বুঝলেন না। লাঞ্চুক গলায় বললেন,

‘স্যার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি আর্টস-এর ছাত্র। বি.এ-তে আমার ছিল লজিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইসলামের ইতিহাস।

পর্দার ছবি মুছে গেল — এখন অন্য ছবি আসছে। এই ছবিতে বাদাম খাওয়া বাচ্চাটিকে বাগানে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে। এটাই সেই বাগান। বাচ্চাটি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে সে কিছু-একটা দেখে ভয় পেয়েছে — সে উল্টো দিকে দৌড়াচ্ছে। আরো কয়েকটি শিশুর সঙ্গে তার দেখা হল। এবার সে কিছুটা সাহস ফিরে পেয়েছে। অন্য শিশুরাও আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে। তারা যে জিনিসটি দেখে ভয় পেয়েছে এবার সেটিকে দেখা যাচ্ছে — জিনিসটি হচ্ছে মতিন সাহেব।

পর্দায় দেখানো হচ্ছে মতিন সাহেবের এই জায়গায় আসার ছবি। মনে হচ্ছে দূরে ক্যামেরা বসিয়ে পুরো জিনিসটারই ছবি তোলা হয়েছে। এখন সে ছবি দেখানো হচ্ছে।

মতিন সাহেব দ্বিতীয় দফায় মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন — এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এদের কথা বুঝতে পারলেন। পরিষ্কার শুনলেন মাথার ভেতরে কে যেন বলছে—

‘আপনি কি আমাদের কথা বুঝতে পারছেন? আমরা নানান ভাবে চেষ্টা করছি যাতে আপনি আমাদের কথা বুঝেন। আমরা আপনার চিন্তা-ভাবনা বুঝতে পারছি নাম’ শেষ চেষ্টা হিসাবে ইরিওক্রোম পর্দা ব্যবহার করছি। এই পর্দায় তীব্র শক্তির বেড়িয়ে ব্যবহৃত হয় যা আপনার মস্তিষ্কের নিওরোনের জন্য ক্ষতিকর। কাজেই এই পর্দা আমরা বেশ সময় ব্যবহার করতে পারব না। আপনি কি আমাদের কথা বুঝতে পারছেন?’

‘পারছি।’

‘অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। আপনি আমাদের অভিনন্দনপ্রেরণ করুন।’

‘আপনারা কারা?’

‘আপনারা এবং আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুর্লভাস্তুর অধিবাসী। আপনার বাসস্থান যাকে আপনি পৃথিবী বলেন তার দূরত্ব আমাদের এখান থেকে প্রায় এক কোটি আলোকবর্ষ।’

'আমি এখনে কি করবে আলাম ?'

'এই প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞানীরা একটি খিওয়ী দিয়েছেন — সেই খিওয়ী আপনি চাইলে আপনাকে বলতে পারি।'

'আমি খিওয়ী বুঝব না — আমি বলতে শোলে একজন মূর্খ মানুষ। বি.এ. পাস করেছি থার্ড ডিগ্রিনে। তাও প্রথমবারে পাস করতে পারিনি, ইংরেজীতে রেফার্ড ছিল।'

'এই খিওয়ী যে-কেউ বুঝতে পারবে আপনি পারবেন। বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে নিজেদের সামনা দেওয়ার অন্য কিছু খিওয়ী তৈরি করেন। এটিও সে জাতের খিওয়ী। বিজ্ঞানীরা বলছেন — প্রকৃতির অতি সুস্থিত নিয়মেও মাঝে-মধ্যে ভুল হয়ে যায়। ভুল করে প্রকৃতি। আপনার ক্ষেত্রেও এরকম ভুল হয়েছে। যার জন্যে অকল্পনীয় দূরত্ব থেকে আপনি উপস্থিত হয়েছেন এখানে। তবে প্রকৃতি অতি দ্রুত তার ভুল ঠিক করে। আপনার ক্ষেত্রেও তাই করবে বলে আমাদের ধারণা। আপনি যেখান থেকে এসেছেন আবার সেখানে ফিরে যাবেন। প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করবে। আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান অতি উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আমরা আপনাকে ফেরত পাঠাতে পারছি না।'

'যদি প্রকৃতি তার ভুল ঠিক করতে না পারে তাহলে কি হবে ?'

'আপনাকে এখানেই থেকে যেতে হবে।'

'স্যার, আমার কোন অসুবিধা নেই। দেশ-বিদেশ দেখার আমার ধৰ্ম শৰ্ষ !'

'আপনার এই শৰ্ষ আমরা মেটানোর চেষ্টা করছি। পর্দায় আপনি আমাদের এই গ্রহ দেখতে পাবেন। তার প্রতিটি সুন্দর জ্যোগ্যা আপনাকে দেখানো হবে। তবে যে কোন মুহূর্তে আপনি হয়ত আপনার জ্যোগ্যায় ফিরে যাবেন। দয়া করে আমাদের কথা মনে রাখবেন। আপনার দেশের বিজ্ঞানীদের কলবেন আমাদের কথা।'

'আমি বললে লাভ হবে না, স্যার। কেউ আমার কথা বিশ্঵াস করবে না। তাছাড়া আমি কোন বিজ্ঞানীকে চিনি না। একজনকে শুধু চিনি — আবুস সোবহান — খিলগাও হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক। বোটানীতে এম.এসসি. ফাস্ট ক্লাস !'

'শুনুন মতিন সাহেব, আপনার এই গ্রহে আগমন একটি বিরাট ঘটনা। এই উপলক্ষে সমগ্র গ্রহে একদিনের ছুটি দেয়া হয়েছে। এই গ্রহের প্রতিটি প্রাণী বসে আছে ত্রিমাত্রিক নিচিত স্টেটের সামনে। এই মুহূর্তে সবাই দেখছে আপনাকে। এই গ্রহে আপনার 'অগ্নিম' চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এই গ্রহের সবচে 'বড় সড়কটির নাম রাখা হচ্ছে অপ্তার নামে — সড়কের দুম্যাথায় থাকবে আপনার দুটি ইরিডিয়ামের মৃতি।'

'আমাকে লঙ্ঘন দেবেন না, স্যার !'

'লঙ্ঘন দেয়ার কোন ব্যাপার নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার এই গ্রহে আগমন যে কত বড় ঘটনা তা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছায়াপথে একই ধরনের দুটি প্রাণের উন্নতি হয়েছে — এটা যে কত বড় ঘটনা আপনি অনুমান ও করতে পারবেন না !'

'একই ধরনের প্রাণী না স্যার — আবুলে বেশকতু আছে।'

'এই তফাত সামান্য — অতি সামান্য।'

'একটা ছোট কথা জিজ্ঞেস করি, স্যার ?'

'করুন।'

'আপনি বলেছেন প্রকৃতি ভূল করে। প্রকৃতির কি ভূল করা উচিত?'

'না উচিত নয়। হয়ত প্রকৃতি কোন ভূল করেনি। সে ইচ্ছা করেই আপনাকে এখানে এনেছে। অন্য কোথাও আপনাকে নিতে পারত। তা নেয়নি। এমন এক গ্রহে এনেছে যার তাপমাত্রা আপনার পৃথিবীর মত। যার অস্তিজ্ঞের পরিমাণও আপনার গ্রহের অস্তিজ্ঞের কাছাকাছি।'

মতিন সাহেব পর্দা থেকে দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্যে ফিরিয়ে নিলেন — তাকালেন চারদিকে। আশ্চর্য! কেউ নেই। শুধু বাদাম খাওয়া বাচ্চাটি বসে আছে। বে লোকগুলি যত্র ঠিক করছিল তারাও নেই। চারদিকে সুন্মান নীরবতা। মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, স্যার, ওরা কোথায়?

'সবাইকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।'

'কেন?'

'কারণ আমাদের বিজ্ঞানীদের ধারণা — আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে খাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। আপনার চারপাশের চৌম্বকক্ষেত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। বাস্তুতে আস্তনের পরিমাণ বাড়ছে।'

'ছোট বাচ্চাটিকে এখানে বসিয়ে রেখেছেন কেন?'

'আপনাকে যখন এখানে পাঠানো হয় তখন ছোট বাচ্চাটি আপনার পাশে ছিল। অবিকল আগের অবস্থা বজায় রাখার জন্য বাচ্চাটিকে আপনার পাশে রাখা হয়েছে।'

'এর কোন ক্ষতি হবে না তো?'

'সম্ভবত না। আপনাকে আমাদের উচ্চতর বিজ্ঞানের কিছু কথা শিখিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। আপনি আপনার পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের তা শেখাতে পারতেন ক্যানসারের চিকিৎসা কি শিখিয়ে দেব?

'দরকার নেই, স্যার। ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

'তারচেয়েও বড় কথা আপনি কিছু মনে রাখতে পারবেন না।'

'সত্যি কথা বলেছেন। আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।'

'চৌম্বকক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে — আপনি সম্ভবত চলে যাচ্ছেন।' স্যার দিকে তাকিয়ে থাকুন। দেশুন, আমাদের গ্রহ দেশুন — শেষবারের মত দেশুন।'

মতিন সাহেব পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে এই বিচিত্র গ্রহ দেখলেন — দেখলেন তার ভৃগুর্ভৃষ্ট বিশাল মগরী, দেখলেন তুষারতাঙ্কা পর্বতমালা, দেখলেন বনভূমি, দেখলেন এই গ্রহের প্রাণদায়ীণী সূর্য — যার আলো কিংকিং নীলস্তুর্প।

তাকে শনানো হল তাঁদের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত। দেখানো হল মহাব সব শিল্পকর্ম। আহ কি অপূর্ব অভিজ্ঞতা! মতিন সাহেব ইরিডিয়ামের তৈরি তাঁর মণি মৃত্তি দেখলেন। কি বিশাল মৃত্তি! আগামী লক্ষ বছর এই মৃত্তির কিছু হবে না। এই গ্রহের অস্তুত সুন্দর মানুষগুলি তাঁর মৃত্তির দিকে ঘূঢ় বিস্ময়ে তাকাবে।

'হে ভিন গ্রহের মানুষ, আমাদের ধারণা অপীয়ার বিদ্যায়ের মুহূর্ত সমাপ্ত। চৌম্বকক্ষেত্র সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। বিদ্যায়, বিদ্যায়।'

এই গ্রহের সব ক'র্তি মানুষ এক সঙ্গে বলল — বিদায়, বিদায় !

মতিন সাহেব হঠাৎ এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করলেন : শরীরের প্রতিটি রক্ত কমিকা এক সঙ্গে কেঁপে উঠল। তাবপর সব অগের ঘত হয়ে গেল, তিনি দেখলেন রখনা পার্কের বেঞ্চিতে তিনি চুপচাপ বসে আছেন হাতে বাদামের ঠোঁঝা। বাদামওয়ালা টাকার ভাণ্ডি নিয়ে এসেছে। তিনি বাদামওয়ালাকে চারটা টাকা দিলেন। তাঁর কৃটিনের ব্যক্তিক্রম হল না। দুপুরে বেঞ্চিতে ঘুমালেন। বিকেলে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন। সঙ্ক্ষয় ঠিক আগে আগে বাসায় ফিরলেন।

নামাঞ্জের সময় হয়েছে তিনি বারান্দায় বসে বদনার পানিতে অঙ্গু করছেন। তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন — ওকি ! ওকি !

মতিন সাহেব বললেন, কি হল ?

‘তোমার হাতে চারটা আঞ্চুল কেন ?’

মতিন সাহেব হাতের দিকে তাকালেন। আসলেই তাই। দৃষ্টি হাতেই চারটি করে আঞ্চুল। শুধু হাতে নয়। পায়েও তাই।

‘কি হয়েছে তোমার ? এসব কি ?’

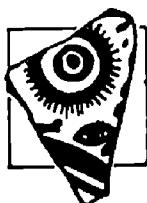
মতিন সাহেব উদাস গলায় বললেন, জ্ঞানি না।

‘কি বলছ তুমি ! কি সর্বনাশের কথা !’

মতিন সাহেব বললেন, সর্বনাশের কি আছে ? চারটা আঞ্চুলে অসুবিধা তো হচ্ছে না।

তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে অঙ্গু করে যাচ্ছেন। আঞ্চুল চারটা হয়ে যাওয়ায় তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর হচ্ছে না। তিনি জানেন প্রকৃতি ভুল করে না। এই গ্রহ থেকে এখানে ফিরিয়ে আনার সময় প্রকৃতি এই সামান্য পরিবর্তন করেছে। মিশয়ই তার প্রয়োজন ছিল। অন্তত তিনি নিজে তো বুঝছেন তাঁর জীবনে যা ঘটেছে তা স্বপ্ন নয় — বাস্তবেই ঘটেছে। প্রকৃতি তার প্রমাণ রেখে গেল।

তাছাড়া চার আঞ্চুলে হাতটাকে দেখাচ্ছেও সুন্দর !



শিকার

সে হাঁটে নিষ্পদ্ধে !

যখন হাঁটে বাতাস পর্যন্ত কাঁপে না। নিষ্পদ্ধের চলাফেরা। কিন্তু মতি মিয়া টের পায়। অঙ্গ মানুষদের এই একটি সুবিধা। এরা বাতাস শুরু আমেক কিছু বলে দিতে পারে। আজও পারল। মাথা ঘূরিয়ে বলল, কেড়া যাও ? আজ্জরফ মাছ ?

আজ্জরফ জবাব দিল না। যে নিষ্পদ্ধে হাঁটে সে ফস করে জবাব দেবে এটা আশা করা যায় না। মতি মিয়া আশাও করে না। হিতীজবাব ডাকে, “আজ্জরফ ও আজ্জরফ মিয়া !”

আজ্জরফ এবাবও জ্বাব দেয় না। জ্বাব দেয় তার পোষা বক। বকটির বয়স মাত্র পাঁচ মাস কিন্তু সে নব্বুই বছবেব বুড়োর মত ডাকে কক কক ককর। কড় কুৎসিত ডাক। মতি মিয়া নড়েচড়ে ঝঠে।

আজ্জরফ বক থরতে ঘাস নহি?

হ।

যাইস না বাজান। সোনা চান আমার!

আজ্জরফ চূপ করে থাকে।

পক্ষী ধরন বালা না। বদদোয়া লাগে। আমারে দেইখ্যা বুঝস না? ও আজ্জরফ! আজ্জরফ মিয়া!

‘কি?

ব' তুই। তরে একটা গফ কই। ক্যামনে বদদোয়া লাগে হেই গফ।

আজ্জরফ বসে না। গল্পের প্রসঙ্গ আসায় খাচার বকটি সন্তুষ্ট উৎসাহী হয়। সে ডানা ঝাপ্টায় এবং দ্বিতীয়বার ডাকে, কক কক কক। মতি মিয়া জুত হয়ে বসে। কার্তিক মাসের নরম রোদ তার পিঠে। রোদের মধ্যে নেশা জাতীয় কিছু কি আছে? কেমন যেন নেশা-নেশা ভাব হয়। বড় ভাল লাগে মতি মিয়ার। এই বয়সে শরীর বাঢ়তি উত্তাপ চায়। মতি মিয়ার সব রাতেই ইচ্ছা করে চারপাশে আগুন করে মাঝখানে বসে থাকতে। কিন্তু এখন মাত্র কার্তিক মাস। শীতও ভাল করে পড়েনি।

আজ্জরফ আছস?

হ।

বক পক্ষীর কথা কই। বড় হারামি পক্ষী। বুঝস?

বুঝলাম।

যে বক থরে তার চউখ থাকে না। চউখ তার যায়। আইজ ইউক কাইল ইউক চউখ যায়। আমারে দেইখ্যা বুঝস না?

বক পক্ষীর হারামিপনা বুঝাবার জন্যে মতি মিয়া তার বুজ্জে যাওয়া চোখ মেলতে চেষ্টা করে। মেলতে অবশ্যি পারে না।

অ আজ্জরফ!

কও হনতাছি।

ব' আজ্জরফ।

আজ্জরফ বসে না। মতি মিয়ার পিঠে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। মাত্র মিয়া গানের মত সুরে কথা বলে,

বক পক্ষী ঘরণঠোকর দেয় বুঝস? আর ঠোকর দেয় জাপ্তোমত। পরথম ধাক্কায় যায় ডাইন চউখ, পরের ধাক্কায় বাঁও। দুনিয়া হয় আজ্জরফ। নয়নের মত জিনিস মাই রে বাজান।

আজ্জরফ শুনছে কিনা মতি মিয়া বুঝতে পারেন না। খাচার কলী বক ডানা ঝাপ্টায়। মতি মিয়া তাতেই উৎসাহ বোধ করে।

বক-মারার চট্টে থাকে না বৈ আজরফ। আম'বে দেইধ্যা বিবেচনা কৰ। নেজামের ভাইস্তাৰ কথা মনে আছে?

কোন নেজাম?

মতি মিয়া উৎসুক্ষনাস্তি সোজা হয়ে বসে। নেজামের ভাইস্তাৰ গল্প সবিস্তারে শুক কৰে। কথা বলতে তাৰ বড় আৱাম লাগে ত ছাড়া পিঠোৰ উপৰ কাঠিক মাসেৰ বোদ। বোদেৰ মত ভাল জিনিস আছে? এক পৰ্যায়ে যিমুনী এসে যাবো মতি মিয়াৰ।

আজরফ বসে থাকে উক্তৰ বন্দেৰ নাবালে একটা জলা জ্বায়গায়। তাৰ এক হাতে বক 'ধৰাৰ ফাঁদ। কাঁচ' বেত প্ৰাতা দিয়ে ঢাকা গোল কৰে বাঁধা একটা চাটাই। বক কীশ দৃষ্টিৰ পাখি। ফাঁদটাকে তাদেৰ কাছে মনোৰম একটা ঝোপেৰ মত লাগে। দড়ি দিয়ে বাঁধা পোষা বকটি বসে থাকে চাটাইয়েৰ মাথায়। সে আকাশেৰ দিকে তাকিয়ে ঘনঘন ডাকে। সেই কৰ্কশ ডাকে বকদেৰ প্ৰতি কোন কৱণ আবেদন থাকে নিশ্চয়ই। কাৰণ মুক্ত বকেৰ দল তখন মাথার উপৰ চক্রাকাৰে ঘূৰতে থাকে। পোষা বকটি ক্ৰমাগত ডাকে। বকৰা নীচে নেমে আসে। সন্দেহ ভৰা চোখে তাকায়। তবু নেমে আসে। এবং এক সময় পোষা বকটিৰ পাশে এসে বসে। গভীৰ ময়তাষ কিছু হয়ত বলতে চায়। কিন্তু সে সুযোগ হয় না। বক-শিকারী এক হাতে খপ কৰে তাৰ পা ধৰে বিদ্যুৎগতিতে তাকে নামিয়ে এনে পায়েৰ নীচে চাপা দেয়। ক্রত তাকে হাত খালি কৰতে হয়। কাৰণ অন্য আৱেক্টি বক নামতে শুক কৰেছে। সময় নেই মোটাই। বক নীচে নামানোৰ সময়টাই ভয়াবহ। হকচকিত পাখিটি একবাৰ হলেও যৱণঠোকৰ দিতে চেষ্টা কৰে। সে তখন শুঁজে মানুষেৰ চোখ। একটা নৱম তুলতুলে জ্বায়গা যেখানে ঠোট অনেকখালি বসিয়ে দেয়া যায়। বক-মারাৰ চোখ যায় বকেৰ ঠোটে। প্ৰথমে ডানটি তাৰপৰ বাঁটি।

আজ পাখিৰা আসছে না। বেলা হয়ে গেছে বোধ হয়। বোদ চড়ে গেলে পাখিৰা নীচে নামতে চায় না। আজরফ তাকাল আকাশেৰ দিকে। আকাশ শূন্য এবং ঘন নীল। এমন নীল যে দৃষ্টি পিছলে যায়। তাকিয়ে থাকলে মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্ৰণা হয়। শূন্য নীল আকাশেৰ মত অস্তুত জিনিস আৱ আছে নাকি?

কিছু পাইছ আজরফ?

আজরফ তাকিয়ে দেখল মেঘৰ স্বাব। মেঘৰ জাতীয় লোকৰা সবাৰ সঙ্গেই দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কথা বলে। এৱা কথা বলতে বড় পছন্দ কৰে।

শুখনো মনে হয় কিছু পাও নাই?

ছি না।

কেমন ধৰা পড়ে ও আজরফ?

ঠিক নাই, কোন দিন আট-দশটাৰ পাই।

কও কি। দুই টেকা কইৱা বেচলেও তো বিশটোক্কত কইৱা বেচ?

ঠিক নাই।

আজরফেৰ কথা বলতে ভাল লাগে না। সে আকাশ আকাশেৰ দিকে। দূৰে বহু দূৰে একটি বক চক্কৰ থাক্ছে। এটি কি কি নামবে? পোষা বকটি উৎসজিত হয়ে উঠছে। ডান

ঝাপটাছে। আজরফ নিজের ঘনেই বলে — আইভাছে। ডাক দেরে অনুফ। তব বস্তুরে ডাক দে দেহী। পোষা বক (যার গোপন নাম অনুফা) ডাকে না, ত্রিশার্ত চোখে তাকায় আকাশের দিকে। মেঘের সাহেবও তাকন। তাবপর এক সময় রবারের জুতায় জলাভূমিতে ছপছপ শব্দ তুলে ডিস্ট্রিট বোর্ডের সড়কে গিয়ে উঠেন। সেখানে দাঙিয়ে ছাতা নেড়ে নেড়ে বলেন, যাইরে আজরফ।

আজরফ তাকায় তাঁর দিকে, ঠিক তখনি তাঁর বাঁ চোখ টেনটন করে উঠে। চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করে। এটা খুব খারাপ লক্ষণ। এর মানে হচ্ছে বাঁ চোখটির সময় শেষ হয়ে এসেছে। ধরা পড়া বকগুলির কোন-একটি ঠোকরে তুলে নেবে বাঁ চোখ। কিংবা হয়ত পোষা বকটি মরণ ঠোকর দেবে। বড় হারামি পাখি। আজরফ তাকাল অনুফার দিকে। হংদের মাথায় শাস্তি ভঙ্গিতে সে বসে আছে। আজরফের চোখে জল ঝঘে আছে বলেই সব কিছু অন্য রকম দেখাচ্ছে। ছোট অনুফাকে দেখাচ্ছে প্রকাণ্ড সারস পাখির মত। তার ঠোট দুটি সুবিশাল।

আজরফ শার্টের হাতায় চোখ মুছল, কিন্তু জল পড়া বক্ষ হল না। যাবে, এবার বাঁ চোখটা যাবে। আজ্জই বোধ হয় যাবে।

সফদর আলির এরকম হল। কথা নেই বার্তা নেই শুধু ডান চোখ দিয়ে জল পড়ে। সফদর ভাই দেখা হলেই বলতো, ডাইন চউখটা এই বুর যাইব। বুবছস আজরফ? এইটা নিশানা।

ক্যামনে কন?

চউখের নিজের একটা জীবন আছে। হে বুবৈ।

কথা ঠিক। তাঁর চোখ সত্ত্বি সত্ত্বি গেল। ভয়াবহ ব্যাপার! সফদর ভাইয়ের ভয়ৎকর চিৎকারে নবীনগরের সমস্ত মানুষের বুক কাঁপতে লাগল। পাখিবা কি কিছু বুঝতে পারে? সফদর ভাইয়ের পোষা বক (যার নাম সোনা) ক্রমাগত ডাকতে লাগল, “কক কক কক।” সেই ডাক বেদনার ডাক না। আনন্দ-উন্নাসের ডাক? — কোনদিন জানা যাবে না।

সদর হাসপাতাল নেত্রকোণায়। নৌকায় যেতে লাগে দু'দিন। ন্যাকড়া পোড়া ছাই দিয়ে, চোখ বেঁধে নৌকায় তোলা হল সফদর আলিকে। মাথার কাছে বসে রইল আজরফ আর সফদর আলির ছোট ছেলেটা, যার নামও সোনা। বড় খারাপ যাত্রা ছিল সেটি। একেকজনের মাথা তুলে হো হো করে চিৎকার করে উঠতো সফদর। তার ছেলেটাও তখন অবিকল বাঁকুর মত চেঁচাত, হো হো।

সদর হাসপাতালের বারান্দায় চারদিন শুয়ে থেকে পঞ্চম দিন সকায় আবর্জনা হল। চোখ বিষিয়ে গিয়েছিল।

আজরফ আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ কেন যেন ঘোলটে হয়ে আসছে। দু'একটা সঙ্গীহীন বক উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এরা এখন ঘূরবে। একা একটা সুন্দর বাঁধার সময় এখনো হয়নি। বাঁক বাঁধা হবে আরো দু'মাস পর। তখন বকগুলি আর্য রকম হয়ে থাবে। পোষা বকের ডাকে আর নিচে নাথবে না। কেন নামবে না? জগতে অনেক অবীর্যাংসিত রহস্য আছে। এ জগৎ বড় রহস্যময়। চোখ যাবার সময় হলো চোখ কান্দে। কেন কান্দে? আজরফ লুকির এক প্রাণ্ত টেনে চোখ মুছল। বড় জল পচাই। বেচারা শুধু কান্দছে। বোধ হয় ঘরতে চায় না।

অনুফ্রা মাথাটা কাত করে তাকে দেখছে। তার ছেটু চোখ দুটি টিকটকে লাল। সে হঠাতে কক কক করে ডেকে উঠল। সে কি কিছু বুঝে ফেলেছে? বুঝে ফেলেছে যে আজ পাখি-মাঝা অঞ্জরফের বাঁ চোখটি যাবে। আর সে আসবে না ফাঁদ নিয়ে। উন্নব বন্দের নাবাল অমিটায় চৃপচাপ এসে বসে থাকবে না।

পশ্চ-পাখিরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। মতি মিয়ার ধারণা — ওয়া মানুষের চেষ্টেও অনেক বেশী জানে। বেশী জানে বলেই গৃহস্থের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে কুপাখি আসে। কুড়াক ডেকে বাব বাব উড়ে উড়ে যায়। গৃহস্থের পোষা কুকুর কাঁদে উঁচু করে। দীর্ঘদিনের বাস্তুসাপ হঠাতে ঘর ছেড়ে যায়। মতি মিয়া বলে, বুঝছে আজফর, পশ্চপাখি খুব বুঝদার। এইজড়া আমার কথা না, হয়রত সোলায়মান আলায়হিস সালামের কথা। তারা সব বুঝে। সব না বুঝলে চড়কে ক্যান ঠোকর দেয়? শহিলে জ্বায়গা তো আরো আছে। আছে না? তুই ক' দেহি?

আকাশে বকগুলি চক্কর দিতে দিতে নীচে নামতে শুরু করেছে। অনেকগুলি পাখি এক সঙ্গে। এরকম তো হয় না। তাছাড়া রোদ চড়ে গেছে। এই সময় ওয়া নীচে নামে না। এখন নামছে কেন? ওবা কি সত্ত্বি সত্তি টের পেয়েছে কিছু।

আজরফের মনে হল আজ বেশ কিছু সাহসী পাখি স্বেচ্ছামৃতুর জন্যে তৈরি হয়েই নীচে নামতে শুরু করেছে। এদের ঠোট অসম্ভব ধারাল এবং নিশানা অব্যর্থ। আজ এবা একের পর এক ধরা দেবে। কোনই বাধা দেবে না। এস্তুকুণ্ড চমকাবে না। তারপর তাদের একজন বিদ্যুৎগতিতে ঠোট বসাবে চোখের তরল মাংসে। সেই পাখিটি হবে সতেজ স্বাস্থ্যবান পাখি। তার বসার ভঙ্গি হবে খঙ্গ ও গর্বিত। তার পালক হবে দুধের মত সাদা। আজরফের পোষা বকটির মধ্যে অস্থিবত্তা দেখা গেল। সে ডাকল এবং ডাকতেই থাকল। পাখিরা চক্রকারে নেমে আসছে। আজই সেই দিন। আজরফের কপালে বিনু বিনু ঘাম জমল। তৎক্ষণাৎ বোধ হল। নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ঘনঘন। পেটের মধ্যে কিছু—একটা পাক খাচ্ছে। বমি আসছে।

পাখি ধরা ছেড়ে দিলে কেমন হয়? ছেড়ে দেয়া কি যায় না? এই মূহূর্তেই তো সে অনুফ্রার বাঁধন খুলে দিতে পারে। পারে না কি? ছেড়ে দিলেই অবশ্যি অনুফ্রা যাবে না। ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকবে। বন্দী জীবনেরও একটা মায়া আছে। গত বছরও সে একবার আর বক ছেড়ে দিল। সেই বকটির নাম ছিল অস্ত। অস্ত ছাড়া পেয়েও উড়তে লাগল। আজরফ বলল — আর বেটা যা। পাখি ধরা ছাড়লাম। তুই যা।

অস্ত গেল না। চাটাইয়ের মাথায় বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বসে থাকল। মাঝে বেটা পাখি-মাঝার কাম করতাম না। তুই যা।” অস্ত তবু বসেই রইল। তারপর একটু স্মৃত খুবই অবাক হয়ে উড়ে গেল।

মতি মিয়ার ধারণা বকশিকারী কখনো শিকার ছান্তি পারে না। বড় পাখী নেশা। জীবন্ত কিছু ধরে ফেলার মত কড়া নেশা আর কিছু নেট। তাইশ্রেণি বছরই যে একবার বলত, “পাখি ধরা ছাড়লাম গো। আর না। বশ্রত হইছে।” তাইশ্রেণি দিন কঢ়িত খুবই বিষণ্ণ ভাবে। কিছুতেই তখন আর মন বসে না। পরের বৈশাখে আরো সে বকের ছানা এনে পুষ্যত শুরু করত।

কার্তিক মাসে সেই পোষযানা বক নিয়ে লজুক ভঙ্গিতে ঘর ছেড়ে বের হত। লোকসন্ধন কলত,
কি মিয়া আবার শুরু করলা?

এই এটু।

পাখি-মারারা চোখ না যাওয়া পর্যন্ত ফিরতে পারে না। প্রথমে ঘায় একটি। নেশা তখন
আবো বাড়ে। বক্সের মধ্যে বামকম শব্দ হতে থাকে। কক কক ডাক শুনলেই স্নায় কাপতে
থাকে উল্লাসে। তারপর ঘায় দ্বিতীয় চোখ। জগৎ অঙ্ককার হয়। অঙ্ককার না হওয়া পর্যন্ত
এদের মুক্তি নেই। যখন সব অঙ্ককার হয় তখন নেশা কেটে ঘায়। তখন তারা বাত জেগে
পাখির ডানা ঝাপ্টানি শোনে। সুযোগ পেলেই তত্ত্ব কথা বলে। অঙ্করা তত্ত্ব কথা বলতে বড়
ভালবাসে।

আজরফ অনুফ্রাকে ছেড়ে দিল। যা ভাবা গিয়েছিল তাই। অনুফ্রা একটু উড়ে গিয়েই
আবার এসে বসল চাটাইয়ের মাথায়। আজরফ ফ্লান্ট স্বরে বলল, ‘হ্স হ্স যা ভাগ।’ অনুফ্রা
গেল না। তার বসার ভঙ্গি বজ্র ও গর্বিত। তার পালক দুধের মত সাদা। একটি সতেজ
স্বাস্থ্যবান পাখি।

যা ভাগ ভাগ। যা।

কক কক।

ভাগ ব্যাটা ভাগ।

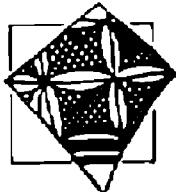
কক কক ককর।

পাখি মারা ছাড়ছি, তুই যা।

কক কক।

অনুফ্রা তার ধৰণবে সাদা পালকে ঠোট ঘসল। এর মানে কী? এইটিই কি সেই পাখি?
কড়া রোদ। আকাশ ঘোলাটে। অনেকগুলি পাখি চক্রাকারে উড়ছে। যেন সাহস দিচ্ছে
অনুফ্রাকে। আছি, আমরা আছি। আজরফের হাতিপিণ্ড লাফাতে লাগল। শরীর ঝনঝন
করছে। স্নায় টানটান হয়ে উঠছে। সময় নেই। আজই সেই বোঝাপড়ার দিন। অতি দ্রুত
এখন অনুফ্রার হলুদ পা ঝাপ্টে ধরে ফেলতে হবে। বিদ্যুৎগতিতে নামিয়ে আনতে হবে নীচে।
আজরফ ঘাড় উচু করে তাকাল। অনুফ্রাও তাকাল। আজরফের চোখে আবার ভজ আসছে।
পাখিটিকে আবার প্রকাশ মনে হচ্ছে। যেন সাদা পালকের অতিকায় একটি অচেনা (পাখি)
এর জন্য অদেখা এক ভুবনে। মাথার উপর উড়তে থাকা বকগুলি দ্রুত নীচে নেমে (আসছে)।
আজরফ হাত বাড়াল। আসছে ওরা নেমে আসছে। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত (কাঞ্জীয়ে তারা
ডাকল — কক কক।

BanglaBook.org



অসুখ

নয়া পটনেব এক গলিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার রিফ্লেক্স এ্যাকশন খুব ভাল। চট করে একটা দোকানের আড়ালে চলে গেলাম। কিন্তু তিনি টেচিয়ে উঠলেন, আরে রঞ্জু না? তিনি এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। আমি নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম, কেমন আছেন স্যার?

অতিরিক্ত উদ্দেশ্যনায় স্যারের হাঁপানির টান এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না। আকাশের দিকে তাকিয়ে শ্বাস টানতে লাগলেন। দয় ফিরে পাওয়ামাত্র প্রথম যে কথাটি বললেন, তা হচ্ছে — চল আমার সঙ্গে।

এখন তো স্যার যেতে পারব না। জরুরী কাজ আছে মতিবিলে। একজন বসে থাকবে।

স্যার আরো জ্বোরে আমার হাত চেপে ধরলেন। যেন আমি হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাব। আমি বললাম, স্যার আমি বরং কাল সকালে একবাব আসব। বাসায় থাকবেন তো? সকাল দশটার মধ্যে চলে আসব।

আমি তোমাকে অনেকদিন থেকে ঝুঁজছি। তুমি যে ঠিকানা দিয়েছিলে সেই ঠিকানায় কয়েকবার গেছি। সেখানে তো কেউ থাকে না।

আমি জবাব দিলাম না। স্যার বললেন, খোকনের মাব অবস্থা খুব খারাপ। তোমাকে ঝুঁজছি এই জন্যেই।

অসুখ বেড়েছে নাকি?

বাড়া-কমা আর কি। বেশীদিন বাঁচবে না। মরাই এখন ভাল।

আমি কিছু বললাম না। স্যার মৃদুস্বরে বললেন, এখন খুব বিরক্ত করে। ঠেচামেচি করে। আর ভাঙ্গাগে না। তোমাকে অনেক ঝুঁজছি। কেউ ঠিকানা বলতে পারে না।

তারপর আর না যাওয়া ভাল দেখায় না। আমি বিরক্ত মুখে হাঁটতে শুরু হলাম। মতিবিলে ফজলু আমার জন্য সত্যি সত্যি অপেক্ষা করবে। তার আমাকে নিয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাওয়ার কথা। সেই ইঞ্জিনিয়ার নাকি ইচ্ছা করলেই দশটুকু চাকরি দিয়ে ফেলতে পাবেন। এইসব গালগল্প আজকাল আমি আর বিশ্বাস করি না। তবু যে যা বলে করি। এখন যদি কেউ আমাকে বলে অমুক লোকের বাড়ির সামনে গিয়ে দশবার ডিগবাজি খেলে আমার একটি চাকরি হবে। আমি সন্তুষ্ট তাও করব। ফজলু করবে তার চেয়েও বেশী। সে হয়ত বিশ্টা ডিগবাজি থাবে।

আমরা হাঁটছি নিঃশব্দে। রাস্তায় হাঁটলেই আমার সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করে। এখন সেটা সন্তুষ্ট নয়। কারণ আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে হাঁটছেন তিনি স্কুলে আমাদের ইংরেজী পড়াতেন। এবং তাঁর বড় ছেলেটির সঙ্গে এককালীন আমার দাকুণ বন্ধুত্ব ছিল।

স্যার, বাসার অন্য সবাই ভাল ?

স্যার জবাব দিলেন না। সম্ভবত এখন আর তিনি কানে শেফন ভাল শুনেন না। স্কুলে
থাকতেও কম শুনতেন। একই কথা তিনিই চাবিবাব বলতে হত। আমি আবেকবাব বললাম,
বাসার সবাই ভাল তো স্যার ?

ভাল।

নীলুর বিয়ে হয়েছে ?

কি বললে ?

নীলুর বিয়ে হয়েছে নাকি ?

হয়েছে।

ছেলে কি করে ?

ব্যবসা করে।

আমার অল্প একটু মন আরাপ হল। নীলু যেয়েটি অসম্ভব রূপসী। এককালে নীলুর
জন্মে আমার বেশ দুর্বলতা ছিল। বেনামীতে কয়েকটি চিঠি লিখেছিলাম। সেই সব আমার
লেখা টের পেয়ে নীলু কেন্দে-কেটে অঙ্গুর।

আমি ছেটে একটি নিষ্পাস ফেললাম। স্যার বললেন, রিকশা নিব নাকি ? হাটতে কষ্ট
হচ্ছে ?

না, না কষ্ট কিসের। চাচীর চিকিৎসা করাচ্ছেন ?

মৃত্যুই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা।

বিলু কেমন আছে ?

ভাল। ওরও বিয়ে হয়েছে। জ্বামাই সিলেটের চা বাগানে কাজ করে।

খুব অল্প বয়সে বিয়ে দিলেন মনে হয়।

অল্প কোথায় ? তাছাড়া ঝামেলা কমল। ঝামেলা এখন আর ভাল লাগে না।

স্যার আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রায় দু'বছর পর এলাম
এ বাড়িতে। কিছুই বদলায়নি। কিছু কিছু বাড়ি আছে যেগুলি সব সময় আগের যত থাকে।
পর্দার রঙ পর্যন্ত পাস্টায় না। কিংবা হয়তো সব সময় একই রঞ্জের পর্দা কেনা হয়।

আমাকে অবাক করে দিয়ে নীলু এসে ঢুকল। মাঝের কাছে বেড়াতে এসেছে অঘোষণা।
বেশ সেজে গুজে আছে। বিয়ে হবার জন্মেই হোক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক
তাকে দেখাচ্ছে আরো সুন্দর। নালু এসেই ঝগড়ার ভঙ্গিতে কলল, আপনি বীবাকে ভুল
ঠিকানা দিয়েছিলেন কেন ?

ভুল না। আমি এক ঠিকানায় বেশিদিন থাকি না।

বগু ভাই, আপনি একটা মিথ্যা কথা বললেন।

যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সে ঠিকানায় বগু নামের কেউ নেসাদিন ছিল না।

আমি চুপ করে রইলাম। নীলু বলল, মাঝ জ্বে জ্বে অন্তত এক-আধবাব আপনার
আসা উচিত। উচিত না ?

সময় পাই না।

সময় পান না কেন ? কি এমন রাজকার্য ?

মানন ধার্ম্মিক।

আজ কিন্তু সঙ্গ্যার আগে যেতে পারবেন না। সঙ্গ্যাবেলো আমার বর আসবে। সে আপনার সঙ্গে যাবে। দেখে আসবে আপনি কোথায় থাকেন।

নীলু এমনভাবে বর কথাটি বলল যে, তাকে আরো সুধী-সুধী মনে হল। বোধহয় বেশ ভাল বিয়ে হওয়েছে। গলায় ভৱী একটা হার। হাতে মোটা মোটা বালা। ইচ্ছে হল জিঞ্জেস করি, বেনামী চিঠিগুলির কথা মনে আছে?

জিঞ্জেস করবার আগেই স্যাব এসে ভেতরে নিয়ে গেলেন। মৃদুব্রুরে বললেন, কাপড়-চোপড় এখন আর ঠিক থাকে না। ঠিকঠাক করতে সময় লাগে।

ঘরটি অঙ্ককার। কিছুই প্রায় চোখে পড়ে না। স্যাব বললেন, আলো সহ্য করতে পারে না তার জন্যে এই কক্ষস্থা। আমি বললাম, চাচী, ভাল আছেন? কোন উষ্ণর এল না। নীলু বলল, মা চিনতে পারছ? ভাইয়ার বঙ্গু। রঞ্জু ভাই।

বিছানার উপর কিছু-একটা ফেন নড়ল। পরিষ্কার গলায় চাচী বললেন, জানালাটা খুলে দে নীলু। ঘরে আলো হয়ে উঠতেই অপ্রকৃতিস্থ মহিলাটিকে আবার দেখলাম। কি ঝকঝকে চোখ। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। মাথা যিষ্যবিষ করে উঠে। আমি দ্বিতীয়বার বললাম, চাচী, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি খোকনের বঙ্গু।

চাচী কোন জবাব দিলেন না। স্যাব বললেন, রঞ্জু আগাগোড়াই খোকনের সঙ্গে ছিল। খোকন কিভাবে মারা গেছে সেটাও খুব ভাল জানে। রঞ্জু তুমি বল তো খোকন কিভাবে মারা গেল?

আমি চূপ করে রইলাম। নীলু বলল, রঞ্জু ভাই আপনি বলুন। মা কথা সব বুঝতে পাবেন। আর আপনাকে মা চিনতে পেরেছেন।

যে গল্প আরো কয়েকবার এই অপ্রকৃতিস্থ মহিলাকে শুনিয়েছি সেই গল্প আবার শুরু করলাম। চাচী তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

“মেঘিকান্দা অপারেশনে খোকনের তলপেটে গুলি লাগে। ওকে নিয়ে আমরা পালিয়ে আসি। খোকন যারা যায় নৌকায়। নৌকায় করে আমরা পালাচ্ছিলাম।”

চাচী তীক্ষ্ণ কষ্টে বললেন, এটা কি সত্যি কথা?

জ্বি সত্যি।

চাচীর গলা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে গেল, এটা কি সত্যি?

জ্বি চাচী, সত্যি। শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলব কেন?

চাচী এবার কেবলে উঠলেন। ফোপাতে ফোপাতে বললেন, তবে মে রঞ্জু বলে খোকনকে মিলিটারীরা ধরে ফেলেছিল, তারপর ঘাঠের মধ্যে নিয়ে জবাই করেছে।

চাচী, এটা মিথ্যা কথা।

কেন আমার ছেলেকে নিয়ে মিথ্যা কথা বলে?

যুদ্ধের সময় এ রকম মিথ্যা গুজ্জব রটে চাচী। জঙ্গল ওরা মানুষ কিভাবে জবাই করবে? ওরা নিজেরাও তো মানুষ।

কলতে বলতে আমি ফ্যাকাশে ভাবে হাসতে চেষ্টা করলাম। ঢাঢ়ী আব কিছু বললেন না। তার উদ্দেশ্যনা কমে আসছে। এখন বেশ কিছুদিন শাস্তি থাকবেন। কর্তৃক রাত তাঁর সুনিধা হবে। তারপর আবাব অস্তির হয়ে পড়বেন। স্যার খুঁজতে থাকবেন আমাকে।

মিথ্যা কথা বলতে আমার কখনো ধারাপ লাগে না। একটি মাঝে প্রবোধ দেবার জন্য আমি একলক্ষ মিথ্যা অনুসারে বলতে পারি। কিন্তু তবুও কখনো এ বাড়িতে আসতে চাই না। অপ্রকৃতিত্ব এই মহিলাটির সামনে এসে বসলেই আমি নিজেও কিছু পরিমাপে অপ্রকৃতিত্ব হয়ে পড়ি। সীমাহীন ক্রোধ আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে ফোন—একটি ভয়ংকর অপবাধ করি। যে অপরাধের কথা এর আগে কেউ কখনো শুনেনি। কিন্তু আমি তা করতে চাই না।

আমি অন্য দশজন মানুষের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাই। একটি ছেঁটু ঘর। একজন মহত্তময়ী নারী। একজন মানুষ খুব বেশী কিছু তো কখনো চায় না।

নীলু আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে খুব কাঁদল। নীলুর স্বামী এল আমার পিছু পিছু। আমি কোথায় থাকি তা জেনে আসবে। লোকটি ভাল মানুষ ধরনের। বাস্তায় নেমেই আমি তাঁকে বললাম, নীলুর সঙ্গে যে আমার প্রেম ছিল সেটা আপনি জ্ঞানেন নাকি ভাই? অদ্বৈত চমকে উঠলেন। আমি গাঁষ্ঠীর গলায় বললাম, দারুণ লদকা-লদকি ছিল।

আমি অপ্রকৃতিত্ব হতে শুরু করেছি।



খাদক

আমি লোকটির বয়স অন্দুজ করার চেষ্টা করছি। তার তেমন প্রয়োজন ছিল না। লোকটির বয়সে আমার কিছু যায় আসে না। তবু প্রথম দর্শনেই কেন যেন বয়স জ্ঞানতে ইচ্ছে করে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, লোকটিকে বেশ ঘটা করে আনা হয়েছে। দাঁড় করিয়ে দেখ হয়েছে আমার সামনে। আমাদের ঘরে মেটাযুটি একটা ভিড়। লোকটি জ্বলজ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ হাসি হাসি। সেই হাসির আড়ালে গোপন একটা অঙ্গকারণও আছে। কিসের অঙ্গকার কে জানে।

খোদকার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন—এই সেই লোক।

আমি বললাম, কোন্ লোক?

খাদক।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, খাদক মানে?

খোদকার সাহেব অবাক হয়ে বললেন—আবাবেই শুলে গেছেন? বাতে আপনাকে বললাম না — আমাদের গ্রামে একজন বিখ্যাত খাদক আছে। নারকরা খাদক।

আমার কিছুই মনে পড়ল না। খোদকার সাহেব লোকটি ক্রমাগত কথা বলেন। তাঁর সব কথা মন দিয়ে শোনা অনেক আগেই বন্ধ করেছি। কাল বাতে খাদক খাদক বলে কি সব মনে ফেরিলেন। এ-ই তাহলে সেই বিষ্যাত খাদক।

ও আচ্ছ।

আমি ভাল করে খাদকের দিকে তাকালাম।

বোগা বেঠেখাটো একজন মানুষ। মাথায় চুল নেই। সামান্য গোফ আছে। গোফ এবং ভুক্ত চুল সবই পাকা। পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবী গায়ে। শুধু যে পরিষ্কার তাই না, ইঞ্জো করা। পরনের লুঙ্গি গাঢ় নীল রঞ্জের। পায়ে রবারের জুতা।

জুতা জ্বোড়াও নহুন। সম্ভবত বাস্তে তুলে রাখা হয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পায়ে দেয়া হয়। যেমন আজ দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, আপনার নাম কি?

আমার নাম মতি। খাদক মতি।

এই বলেই সে এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল। বুড়ো একজন মানুষ আমরা পা ছুঁয়ে সালাম করবে, আমি এমন কোন সম্মানিত ব্যক্তি না। শুবই হকচকিয়ে গেলাম। অপ্রস্তুত গলায় বললাম, এসব কি করছেন?

লোকটি বিনয়ে নিচু হয়ে বলল, আপনি জ্ঞানী লোক, আমি আপনার পায়ের শুল। বলেই সে হাত কচলাতে লাগল। তার বলার ধরন থেকেই বুঝা যাচ্ছে এ-জাতীয় কথা সে প্রায়ই বলে। অভীতে নিশ্চয়ই অনেককে বলেছে। ভবিষ্যতেও বলার ইচ্ছা রাখে।

হজুর, আপনি অনুমতি দিলে পায়ের কাছে একটু বসি।

আবে আসুন বসুন। অনুমতি আবার কিসেব।

লোকটি বসে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। একবারও চোখ তুলল না। তার বিনয় একটা দেখার ঘত ব্যাপার।

আমার বিরক্তির সীমা রইল না। গত দুদিন ধরে আমি এই অজ পাড়াগায়ে আটকা পড়ে আছি। লক্ষে এখান থেকে অটিপাড়া যাওয়ার কথা। লক্ষের দেখা নেই। আছি খোদকার সাহেবের পাকা দালানে। ইনি এই অঞ্চলের একজন পঞ্চাশিয়ালা মানুষ। নিজের মায়ের নামে শুল দিয়েছেন। খোদকার সাহেব আমার অতি দূর-সম্পর্কের আত্মীয় কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা নেই। আদর-যত্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে গ্রামের দশলীয় বৃক্ষের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার পালা। অনেক দশলীয় জিনিস এর মধ্যে দেখে ফেলেছি। ভাঙ্গা কালীমন্দির, যেখানে কিছুদিন আগেও নাকি নরবলি হয়েছে। একটা জ্ঞানী বৃক্ষ। সে অচিন বৃক্ষটি নাকি এক যাদুকর কামরূপ থেকে এনে পুঁতেছেন। যাব ফল থেয়ে যৌবন ছি থাকে। তবে এই ফল এখনো কেউ খামনি, কারণ গাছটায় ফল হচ্ছে না। তেতুল গাছের ঘত গাছ — দশলীয় কিছু নয়, তবু ভাব দেখালাম যে পৃথিবীর স্মৃতি জ্ঞান্চর্য দেখেছি।

একজন দশলীয় বস্তু এই মুহূর্তে আমার পায়ের কাছে মাথা নিচু করে বসে আছে। লোকটি নাকি বিষ্যাত খাদক। এক বৈঠকে আধমশ গোশ্ট খেতে পারে।

আমি বিদ্যুমাত্র উৎসাহ বোধ করছি না। কিন্তু খোদকার সাহেবের উৎসাহ সীমাহীন। তিনি অহংকার মেশানো গলায় বললেন, ঘত মেডেল পেয়েছে তিনটা। এই, প্রফেসার সাহেবকে মেডেল দেখ।

মতি মিয়া পাঞ্চাবীর পকেট থেকে মেডেল বের করল। মনে হচ্ছে মেডেল তাৰ পকেটেই থাকে কিংবা আমাকে দেখানোৱ জন্যে সঙ্গে কৱে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা মেডেল দিয়েছেন নেতৃত্বেনার সি.ও. বেভিন্যু, একটা আজিভিয়া স্কুলেৰ হেড মাস্টার। অন্যটিতে নাম-শাম কিছু লেখা নেই। আমাৰ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল — একজন লোক পরিমাণে বেশি খাব বলেই তাকে মেডেল দিতে হবে? দেশটা ঘাজে ফোৰ দিকে?

খোদ্দকার সাহেব বললেন, অনেক দূৰ দূৰ থেকে লোক এসে মতিকে হায়াৰ কৱে নিয়ে যায়।

কেন?

বাজিৰ খাওয়া হয়। মতি ধায়, বাজি জিতে আসে। বৱাধাত্ৰীৱা সাথে কৱে নিয়ে যায়। মতি সঙ্গে থাকলে মেয়েৰ বাড়িতে খাওয়া শৰ্ট পড়ে। মেয়েৰ বাপেৰ একটা অপমান হয়। মেয়েৰ বাপেৰ অপমান সবাই চায়।

কিছু না বললে ভাল দেখায় না বলেই বললাম — ইন্টাৰেন্স্টিং মনে হচ্ছে।

খোদ্দকার সাহেব বললেন, মতিৰ রোজগারও খারাপ না। হায়াৰ কৱতে হলে তাৰ বেট হচ্ছে কুড়ি টাকা। দূৰে কোথাও নিতে হলে নৌকায় আনা-নেয়াৰ খৱচ দিতে হয়।

আমি বললাম, এইটাই কি প্ৰফেশন নাকি? আব কিছু কৱে না?

জ্বাব দিল মতি মিয়া। বিনয় বিগলিত গলায় বলল, খাওয়াৰ কাম ছাড়া কিছু কৱি না। কৱ না কেন?

এক সাথে দুই তিনটা কাম কৱলে কোনটাই ভাল হয় না। আল্লাহতালা একটা বিদ্যা দিছে। খাওনেৰ বিদ্যা। অন্য কোন বিদ্যা দেয় নাই।

আল্লাহতালাৰ প্ৰদত্ত বিদ্যাৰ অহংকাৰে মতি মিয়াৰ চোখ চিকচিক কৱতে লাগল। আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পাৱলাম না। পাগলেৰ প্ৰলাপ না-কি? খোদ্দকার সাহেব দৱাজ গলায় বললেন, সন্ধ্যাবেলায় মতি মিয়াৰ খাওয়াৰ ব্যবস্থা কৱেছি। নিজেৰ চোখে দেখেন। শহৰেৰ দশজনেৰ কাছে গল্প কৱতে পাৱবেন। গ্ৰাম দেশেও দেখাৰ জিনিস আছে প্ৰফেসোৱ সাৰ।

তাতো নিশ্চয়ই আছে। তবে ভাই, আমাকে দেখানোৰ জন্যে কিছু কৱতে হবে না। শুনেই আমাৰ আকেল গুড়ুম।

না দেখলে কিছু বুঝবেন না। আধমণ রাখা কৱা গোশ্ত যে কতখানি সেটা দেখাৰ পৰি মুখবেন মতি মিয়া কোন পদেৱ জিনিস। কি বে মতি, পাৱি তো?

মতি হসি মুখে বলল, আপনাদেৱ দশজনেৰ দোয়া।

খাওয়াৰ পৰ দুই সেৱ চমচমও খাবি। বিদেশী মেহমান আছে, দেশৰ বেহৰজত যেন না হই। গ্ৰামেৰ ইজ্জতেৰ ব্যাপার।

আলহামদুল্লিলাহ। দৱকাৰ হইলে জ্বেল দিয়া দিমু।

একটা লোক জীবন বাজি রেখে খাবে আৱ আমি বসি বসে দেখব, এৱ মধ্যে আনন্দেৱ কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ব্যাপৱটা কূৎসিত। যদিও অনেক কূৎসিত দশ্য আমৱা আগ্ৰহ কৱে দেৰি। মেলায় বা সাৰ্কাসে বিকলাঙ বিকট দৰ্শন কৰিবলৈ অনেকে আগ্ৰহ কৱে দেখতে আসে। এখানেও তাই হবে। মতি মিয়াকে ঘিৱে ধৱৰে একদল মানুষ। তাৰ সাথে আমাকেও বসে

থাকতে হবে। উৎসাহ দিতে হবে ভাগিস সঙ্গে ক্যামেরা নেই। ক্যামেরা থকলে ছবি তুলতে হত।

গ্রামে বেশ সাড়া পড়ল বলে মনে হল। খোদকার সাহেব একটা গরু জবাইয়ের ব্যবস্থ করলেন। চমচম আনতে লোক চলে গেল। খোদকার সাহেব বললেন, মতি আস্ত গুরু খেতে পারবি? বিশিষ্ট মেহমান আছে। তাঁর সামনে একটা রেকর্ড হয়। ঢাকায় ফিরে উনি কাগজে লিখে দেবেন।

আমি ভৱ পেয়ে বললাম, আস্ত গুরু খাবার দরকার নেই। একটা কেলেংকারি হবে।

আরে না, মতিকে আপনি চেনেন না। ও ইচ্ছা করলে হাতী খেয়ে ফেলতে পারে। বিরাট খাদক। অতি ওস্তাদ লোক।

এরকম ওস্তাদ বেশি না খাকাই ভাল। খেয়েই সব শেষ করে দেবে।

আরে না, খাওয়াবে কে বলেন ভাই? খাওয়ানোর লোক আছে? লোক নেই। খাওয়া-খাদ্যও নেই। এই যে গরু জবাই দিলাম তার দাম তিন হাজার টাকা। দেশের অবস্থা খুব খারাপ রে ভাই।

রাস্তার আয়োজন চলছে। মতি মিয়া বসে আছে আমার সামনে। হাসি হাসি মুখে। মাঝে মাঝে বিড়ি খাবার জন্যে বারান্দায় উঠে যাচ্ছে আবার এসে বসছে। আমি বললাম, এত যে খান, খাওয়ার টেকনিকটা কি?

মতি মিয়া নড়েচড়ে বসল, উৎসাহের সঙ্গে। বলল — গোশত চিপা দিয়া রস ফেলাইয়া দিতে হয়। কিছুক্ষণ পর পর একটু কাঁচা লবণ মুখে দিতে হয়। পানি খাওয়া নিষেধ।

ভাই নাকি?

হ্যাঁ। আর চাবাইতে হয় খুব ভাল কইরা। গোশত যখন মুখের মধ্যে তৃলার মত হয় তখন গিলতে হয়।

কামদা-কানুন তো অনেক আছে দেখি।

বসারও কামদা আছে। বসতে হয় সিধা হইয়া যেন পেটের উপর চাপ না পড়ে।

এই সব শিখেছেন কোথেকে?

নিজে নিজে বাইর করছি জ্ঞাব। ওস্তাদ কেউ ছিল না। আমারে তুঁধি কইরা বলবেন। আমি আপনার গোলাম।

মতি মিয়া খুব আগ্রহ নিয়ে নানা ধরনের গল্প শুক করল। সবই খাদ্য বিষয়ক। দু'বছর আগে কোন-এক প্রতিমন্ত্রী নাকি নেত্রকোনা এসেছিলেন। মতি মিয়া তাঁর কার্যনে আগ্রহণ জিলেপী খেয়ে তাঁকে বিস্মিত করেছে।

থাইতে খুব কষ্ট হইছে জ্ঞাব।

কষ্ট কেন?

জিলাপীর ভিতরে থাকে রস। রসটা গণগোল করে।

মন্ত্রী সাহেব খুশি হয়েছিলেন?

হ্যাঁ খুব খুশি। ছবি তুলেছিলেন। দুইশ' টেকাণ্ডোছেন। বিশিষ্ট অস্তলোক। বলছিলেন ঢাকায় নিয়া যাবেন, পেসিডেন সাহেবের সময়ে খাওনের ব্যবস্থা করবেন। প্রেসিডেন সাহেববে খুশি করতে পারলে কপাল ফিরত। কৃত্তি ঠিক না?

শুব ঠিক। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব কবি মানুষ। শুশি হলে হয়তো আপনাকে নিষ্ঠে
কবিতাও লিখে ফেলতেন। মতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি বললাম, আপনার ছেলেমেয়ে কি? তারাও কি থাক নাকি?

ঝি-না। তারা না-খওতির দল। খাইতে পার ন। কাজকাম তো কিছু করি না, খাওয়ামু
কি! তারা হইল শিয়ে আফনের দেখক।

সেটা আবার কি?

তারা দেখে। আমি যখন থাই, তখন দেখে। দেখনের মধ্যেও আরাম আছে।

মতি মিয়া বিষর্ষ হয়ে পড়ল। এই প্রথম বারান্দায় না গিয়ে আবার সামনেই বিড়ি ধরিয়ে
খকখক করে কাশতে লাগল।

খাওয়া শুরু হল রাত দশটার দিকে। একটা হ্যাজাক ঝালিয়ে উঠেনে খাবার আয়োজন
হয়েছে। এই প্রচণ্ড শীতে কাঁথা গায়ে গ্রাম ভেঙে লোকজন এসেছে। মতি মিয়া খালি গায়ে
আসনপিড়ি হয়ে বসেছে। ধ্যানস্থ মূর্তির মতি মিয়ার ছেলেমেয়েগুলিকেও দেখলাম। পেট বের
হওয়া হাড় জিরজিরে কয়েকটি শিশু। চোখ বড় বড় করে বাবার খাবার দেখছে। শিশুগুলি
কৃত্ত্বার্থ। হয়ত রাতেও কোন কিছু খায় নি। মতি একবারও তার বাচ্চাগুলির দিকে তাকাচ্ছে
না।

খোদকার সাহেব গ্রামের বিশিষ্ট কিছু লোকজনকে এই উপলক্ষে দাওয়াত করেছেন।
স্কুলের হেডমাস্টার, গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার, খানার ও.সি. সাহেব, পোস্টমাস্টার
সাহেব। সামাজিক মেলামেশার একটি উপলক্ষ। বিশিষ্ট মেহমানদের জন্যে খাসী জবেহ
হয়েছে। দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলোচনার প্রধান বিষয় ইলেকশন। ভাবভঙ্গ
দেখে মনে হচ্ছে খোদকার সাহেব ইলেকশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। এর আগেরবার
হেরেছেন। এবার হারতে চান না। জিততে চান এবং দেশের কাজ করতে চান।

অতিথিরা রাত বারটার দিকে বিদেয় হলেন। জাঁকিয়ে শীতে পড়েছে। মতি মিয়াকে ঘিরে
যারা বসে আছে তাদেরকে শীতে কাবু করতে পারছে না। খড়ের আগুন করা হয়েছে। সেই
আগুনের চারপাশে সবাই বসে আছে। শুশু মতি মিয়ার ছেলেমেয়েরা তার বাবার চারপাশে
বসে আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার বাবার খাওয়া দেখছে। মতি মিয়া ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার গা
দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। চোখ দুঁটি মনে হচ্ছে একটু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। অঘোষ
হনে হয় পিতলের এই বিশাল হাঁড়ির মাংস শেষ করবার আগেই লোকটা মারা দায়ে। আমি
হব মতুর উপলক্ষ। মনটাই খাবাপ হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটাই কৃৎসিত। অকৰ্দল কৃত্ত্বার্থ
মানুষ একজনকে ঘিরে বসে আছে। সে খেয়েই যাচ্ছে।

খোদকার সাহেব এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে বললেন, কেমন দেখছেন?

ভালই।

কলছিলাম না বিরাট খাদক।

তাই তো দেখছি।

শুয়ে পড়েন। শেষ হতে দেবি হবে। সকাল মশায়ে আগে শেষ হবে না। এখন খাওয়া স্নে
হয়ে যাবে।

তাই নাকি?

ম্বি। শেষের দিকে এক টুকরা গোশত গিলতে দশ মিনিট সময় লেয়।

আমি মতিব দিকে তকিয়ে বললাম, কি মতি খারাপ লাগছে?

জ্বে না।

খারাপ লাগলে বাদ দাও। বাকিটা তোমার বাচ্চাবা খেয়ে নেবে।

খেন্দকার সাহেব কলানে, অসম্ভব — একটা রেকর্ড করছে দেখছেন না? তুমি চালিয়ে যাও মতি। ভাই, আপনি গিষ্ঠে শুয়ে পড়ুন।

আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে অনেক চেষ্টা করলাম মতি মিয়ার চরিত্রে কিছু মানবিক গুণ দৃঢ়িয়ে দিতে। নানাভাবেই তা সম্ভব। রাত একটার দিকে যদি মতি মিয়া ঘোষণা করে — বাকি গোশত আমি আর খাব না। হাব মানলাম। এখানে যারা আছে তারা খাক। তাহলেই হয়।

কিংবা দৃশ্যটা আরো হস্তযুক্তি হস্ত যদি শেষ দৃশ্যটি এরকম হয় — মতি মিয়ার বাচ্চারা সব ঘূরিয়ে পড়েছে, একজন শুধু জেগে আছে। মতি মিয়া গোশতের শেষ টুকরাটি মুখে তুলে দিয়ে থমকে যাবে। মুখে না দিয়ে এগিয়ে দেবে শিশুটির দিকে। সবাই তখন চেঁচিয়ে উঠবে — কর কি কর কি? বাজিতে হেরে যাচ্ছ তো। এটাও খাও।

মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কলাবে — হাবলে হাবব।

আমি জানি বাস্তবে তা হবে না। সকাল দশটা হোক, এগারোটা হোক, মতি মিয়া খাওয়া শেষ করবে। কোন দিকে ফিরেও তাকাবে না। এত কিছু দেখলে খাদক হওয়া যায় না।



ফেরা

খেতে বসে জরীর রাগ হয়ে গেল। ভাতের খালা সরিয়ে তেজি গলায় বলল, মা আমি ভাত খাব না।

দীপু বসেছিল জরীর পাশে। বড় আপা মা করে তারও তাই করা চাই। সেও হাতে খুঁটিয়ে গঞ্জীর গলায় বলল, মা আমিও ভাত খাব না।

হাসিনা কিছু বলল না। জরীর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। জরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আগের মত তেজি গলায় বলল, রোজ বোজ এক জিমিস। ঘেঁষা লাগে মা।

বড় আপার দেখাদেখি দীপু বলল, আমারও ঘেঁষা লাগে। রোজ বোজ এক জিমিস।

হাসিনার ভীষণ ক্রিধে পেয়েছিল। দীপুর আকৰা কত ধীরে ফিরে তার ঠিক নেই। হাসিনা খানিক হিতস্তত করে নিজের জন্যে ভাত বাড়ল। দীপুর ঘৰুৱা হাত ঝোখে কোঘল স্বরে বলল, ভাত খেয়ে ফেল, লক্ষ্মী সোনা।

বড় আপা খাবে না?

না। সে রাজকন্যা কি-না পেলাও-কোর্মা ছড়া খেতে পারে না।

আমিও পোলাও-কোর্মা খাব মা।

আচ্ছা খেয়ো।

দীপু আড়চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে ভাত ঘাঁথতে শুরু করল। জরী বলল, ডিম
ভেজে দিলে খাবো।

ডিম মেই।

তাহলে কিন্তু আমি খাবো না।

হাসিনা কিছু বলল না। জরী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফের কলল, আমি কিন্তু মা কাল
সকালেও কিছু খাব না।

আচ্ছা, না খেলে কি করব আমি?

আমি তাহলে ঘুমুতে যাচ্ছি।

জরী প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। হাসিনা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। তাঁর এই মেয়েটি
বজ্জ অভিমানী হয়েছে। খাওয়া নিয়ে কেউ এরকম করে? অন্য ছেলেমেয়েগুলি খুব লক্ষ্য।
কোন কিছু নিয়েই কোন আস্থার নেই। গত সৈদে দীপুকে কোন কাপড় দিতে পারেনি। দীপুর
আক্ষা শুধু একজোড়া লাল মোজা দিয়েছিল ছেলেকে। তাই নিয়ে কি খুশী ছেলের। আর জরী
গাল ফুলিয়ে বলেছে,

বাবা তোমাকে সিক্কের কাপড় আনতে বলেছি, তুমি এটা কি এনেছ? না, এ আমা আমি
পরবো না।

সে কি কামা মেয়ের! দীপুর আক্ষা ভীষণ মন খারাপ করেছিল সেবার। হাসিনাকে
বলেছিল, মরে যেতে ইচ্ছে করে গো। ছেলেমেয়েগুলির সামান্য শখও মেটাতে পারি না। ছিঃ
ছিঃ।

হাসিনা ভেবে পায় না জরী এমন অবুব হল কি করে? বাবার রোজগারটাও তার চোখে
পড়ে না? বছর না ঘূরতে মেট্রিক দিবে যে মেয়ে।

সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। দীপু বলল, আচ্ছা তুমি আমাদের সঙ্গে ভাত খেয়েছ
মা?

হ্যা।

কি জন্মে খেয়েছ?

তোমরা যে লক্ষ্মী সোনা — এই জন্মে।

ও বুঝেছি।

দীপুটা এমন করে কথা বলে। বড়ো মায়া লাগে হাসিনার।

খাওয়া হয়ে যেতেই হাসিনা অসুস্থ পরীর জন্য দুধ গরম করতে বসল। পরী খুব অসুস্থ
ভোগে। কিছুদিন আগেই মাত্র হাম থেকে উঠল। এখন আবাব জরী বড় একজন জাঙ্গারকে
না দেখালেই নয়। দীপুর বাবাকে না জানিয়ে বড়দার কাছে চিঠি লিখলে 'কেবল হয়? এই
স্বাবতে ভাবতে হাসিনা পরীর কাছে গেল। পরী মাকে ছেঁকেই বলল, একটু ভাত খাব মা।
কাঁচা মরিচ দিয়ে খাল করে।

খাল খেয়ো মানিক।

না মা, আচ্ছা খাব। অল্প, মাত্র তিন লোকমা।

দীপু বলল, মা, পরী আপার জন্যে আমি ভাত বেড়ে আনব ?

না, তুমি ঘূর্ণাও ।

পরীকে অনেক সংক্ষেপ-সাধনা করে দুধ খাওয়াতে হল। হাসিনাৰ ঘূৰ পাঞ্চল
ছেলেমেয়েৱা সবাই ঘূৰিয়ে পড়েছে। এ অঞ্চলটায় শুধু সকাল সকাল বাত বাড়ে। নটাৰ
বাজেনি, এব যথে কেমন নীৰব হয়ে গেছে চারদিক। কূলী পাট্টিৰ দিকে যাবে যাবে হৱার
শব্দ উঠেছে — এ ছাড়া চারদিক ভীষণ নীৰব ।

বাত আৱো বাড়তেই শুড়শুড় শব্দে মেৰ ডাকতে লাগল। বিজলী চমকাতে লাগল ঘন
ঘন। আজ সারাদিন শুধু শুমোট গিয়েছে। ঝড়টড় হবে কিনা কে জানে। যিয়ি ডাকছে।
যেযেৱে ডাক আৱ মিহিৰ শব্দ এই দুই মিলিয়ে কেমন অস্তুত লাগছে। হাসিনা জেগে জেগে
মিহিৰ ডাক শুনতে লাগল ।

দীপুৰ বাবা এল ঠিক বড় আসাৰ আগে আগে। আৱেক দুই দেৱি হলে ভিজে চুপসে যেত।
সে এসে ঘৱে তুকছে শুন্মি ঝৰখৰিয়ে বৃষ্টি। দমকা বাতাস। হাসিনা বলল, আৱ কিছুক্ষণ পৱে
এলেই গোসল সেৱে আসতে পাৱতে ।

গোসল এখন সারব, তুমি ভাত চড়াও দেখি ।

হাসিনা অবাক হয়ে বলল, ভাত চড়াব কি ? ভাত তো রাঁধাই আছে ।

সে তো শুধু আমাৰ জন্যে। সবাই মিলে আজ আবাৰ খাব। দেখ কি এনেছি ।

হাসিনা দেখল বড়সড় একটি কুই মাছ দড়ি দিয়ে কানকোৱ সঙ্গে বাঁধা। হাসিনা বলল,
ওমা হঠাৎ এত বড় মাছ। কি ব্যাপার ?

আছে একটা ব্যাপার ।

দীপুৰ বাবা রহস্যময় হাসি হাসতে লাগল ।

আজ থেকে আমাৰ চলিশ টাকা বেতন বেড়েছে। তোল তোল সবাইকে ঘূৰ থেকে
ডেকে তোল। ওৱে ও জৰী, ওঠ তো মা ।

কিছুক্ষণ পৱ দেখা গেল সব কটি ছেলেমেয়ে উঠোনেৰ চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে।
অসুস্থ শৰীৰে পৰীও উঠে এসে তাৰ বাবাৰ গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে। দীপু বসেছে তাৰ
বাবাৰ কোলে। পৰী বলল, আমিও কিন্তু তোমাদেৱ সঙ্গে ভাত খাব বাবা ।

আচ্ছ খাবি ।

দীপু বলল, আমৱা আজ্ঞ দু'বাৰ করে খাব তাই না বাবা ?

হ্যা ।

দু'বাৰ কৱে কেন খাব বাবা ?

বড় মাছ এনেছি তো সেই জন্যে ।

ও বুঝেছি ।

জৱী মাছ ভেজে ভেজে খালায় রাখছিল। আনন্দে তাৰ চোখ বলমল কৰছে। সে বলল,
ৱোজ এৱকম বড় মাছ হলে বেশ হয়। তাই না বাবা ?

ইঁ। আমাৰ জৱী মা তাহলে শুধু খুশী হয়।

পৰী বলল, রঞ্জু মামা গত বছৰ এৱচে' ষড় একটা মাছ এনেছিল না মা ? সেটা আৱো
কৃত বড় ।

তোর বাবা একবার একটা চিতল মাছ এনেছিল। যাপ দিয়ে দেখেছি আমার চেমেও লম্বা।

দীপু চোখ কপালে তুল বলল, তুমি তয় পেয়েছিলে। তাই না যা?

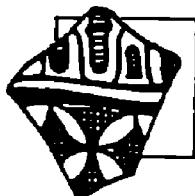
হেসে উঠল সবাই; ভাত তখনো হয়নি। কাজেই অনেকক্ষণ ধরে মাছ মারার পল্প হতে থাকল। দীপুর বাবা এক সময় ড্রিঙ্গেস করলেন, সবচেয়ে বড় মাছের কি নাম দীপ?

চিতল মাছ বাবা।

জরী বলল, দূর বোকা, তিমি মাছ।

রাত বাড়তেই থাকল। খাওয়া-দাওয়া অনেক আগেই সারা হয়েছে। তবু ছেলেমেয়েরা খাবাকে ঘিরে বসে রয়েছে। সামান্য সব কথার হা হা করে হেসে উঠছে।

বাসন-কোসন কলতলায় রাখতে গিয়ে হাসিনা অবাক হয়ে দেখে মেয়ে কেটে অপরপ জ্যোৎস্না উঠেছে। বৃষ্টি-ভেজা গাছপালায় ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। অকারণেই তার চোখে জল এসে যায়।



তুচ্ছ

আমি যাতির দিকে তাকিয়ে হাঁটি। এর প্রধান সুবিধা হচ্ছে পরিচিত কারো সঙ্গে চোখাচোখি হবার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যায়। একজনের সঙ্গে অন্যজনের একটা স্বাভাবিক আড়াল তৈরী হয়। কেউ কেউ তা বুঝতে পারেন না। ভদ্রতা দেখাবার জন্যে এগিয়ে এসে বলেন ম্লামালিকুম, ভাল আছেন?

এইসব ক্ষেত্রে আমি প্রশ়ুকর্তাৰ মূখের দিকে না তাকিয়েই অল্প একটু হেসে বলি, ভাল। এই বলে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। এতে প্রশ়ুকর্তা একটা সমস্যায় পড়ে যান। আমাকে কি বলবেন ভেবে পান না। গায়ে পড়ে কথাবার্তা শুরু করার যত্নণা আমি তাঁকে পেতে দেই। পরিষ্কার বুঝতে পারি ভদ্রলোক মনে মনে বলছেন, কী যত্নণা! কেন যে কথা বলতে জেলামি।

সব সময় এই অবস্থা হয় তা নয়। কিছু কিছু লোক আছেন যাঁরা কথা বলতে খুব পছন্দ করেন। ‘দেশের কি হচ্ছে বলুন দেখি ভাই?’ এই বলে নিজেই দেশের কি হচ্ছে সেই সম্পর্কে বিশ্বারিত বলতে থাকেন। এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সহজ কোম উপায় নেই।

বদরুল আলম সাহেব এই রকম একজন মানুষ। সরকারী কমিটারী। সম্পত্তি রিটায়ার করেছেন। হঠাৎ এসে পড়া অবসর নিয়ে কি করবেন তুম্হে উচ্চে স্থানে পারছেন না। দুটি কাজ খুব মন দিয়ে করছেন — শরীরচর্চা এবং দেশচর্চা। সরকার-বিকাল দু'বেলা জগিং করেন। জগিংয়ের জন্য একটা পোশাকও তৈরী করেছেন। সাদা হাফ শার্ট, হাফ প্যান্ট এবং ক্রিকেটের আস্পায়ারদের মত সাদা টুপী। দেশজ্ঞার মধ্যে আছে তাঁর নিষ্কৃত পরিকল্পনা।

দেখা হলেই বলবেন — প্রফেসর সাহেব, কিছু-একটা তো করতে হয়, কি বলেন? ভেজিটেলের মত বেঁচে থাকার তো কোন মানে হয় না। কি বলেন?

‘তা তো ঠিকই।’

‘প্রতিদিন পৃথিবীতে কতজন শিশু মারা যায় জানেন?’

‘জি না।’

‘চলিশ হজার। বাংলাদেশে প্রতিদিন কতজন মারা যায় আন্দাজ করুন তো দেখি?’

‘আন্দাজ করতে পারছি না।’

‘ইউনিসেফের একটা রিপোর্ট আছে আমার কাছে। আপনাকে পড়তে দেব। পড়লে মাথা ঘুরে যাবে। ভয়াহ অবস্থা। আমাদের কিছু-একটা করা দরকার। কি বলেন?’

‘তা তো বটেই।’

‘এই যে ছোট ছোট শিশু রাস্তার পাশে বসে ভিজা করছে, এদের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। হবে না?’

‘তা তো হবেই।’

‘আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি, প্রতিদিন পঞ্চাশটা করে হাতে-গড়া ঝটি তৈরী করে দেবে। আমি ডিস্ট্রিবিউট করব। সে রাজি হয়েছে। আপনাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। একার পক্ষে তো সম্ভব না। কি বলেন?’

‘তা তো বটেই।’

তত গজ্জে তত বর্ষে না — এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। বদরুল আলম সাহেবের বেলায় নিয়মের একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। তিনি সত্য-সত্য ঝটি বিতরণ সমিতি সংক্ষেপে ‘বুবিস’ স্থাপন করে বসলেন। সমিতির তিন-চারটা সভাও হয়ে গেল। আমি ঐ সমিতির একজিকিউটিভ কমিটির একজন সদস্য। পাড়ায় থাকতে গেলে কত রকম যত্নগ্রস্ত যে সহ্য করতে হয়। এই জাতীয় সমিতিগুলির আমু লিটন ম্যাগাজিনের আমুর চেয়েও কম হয় — এটাই হচ্ছে ভরসার কথা। দু'একদিন ঝটি বিলিয়েই সবার উৎসাহ মরে যাবে এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেয়া যায়।

আমাদের সমতায় ঠিক হল ‘বুবিস’র কার্যকলাপ বর্ষা মৌসুমে শুরু হবে। সেই সময়েই খাবার-দাবারের আকালটা একটু বেশী দেখা যায়। বর্ষার আগ পর্যন্ত দুমিটির সদস্যরা ঝটি বিতরণের পক্ষত সম্পর্কে খোজখবর করবেন এবং চিন্তা-ভাবনা করবেন।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বর্ষা আসতে দেরী আছে। ‘ঝটি’ ততদিন ছিঁড়বে না। বর্ষা বাদলায় ঝটি নিয়ে বের হবার উৎসাহ কারো থাকার কথা না। তবে বদরুল আলম সাহেব যে রকম উৎসাহী ব্যক্তি — কিছুই বলা যায় না।

বৈশাখ মাসের কথা। বিকালের দিকে আকাশ অঙ্ককার করে মেঘ করেছে। লির্ণাং একটা কালবৈশাখী হবে। ক্রতৃ পা চালিয়ে বাসায় ফিরছি — সেমেল চতুরের কাছে এসে বদরুল আলম সাহেবের সঙ্গে দেখা। যাথা নীচ করে চলে যাব ভাবছি সম্ভব হল না। বদরুল আলম সাহেব গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, ভাই একটু এলিকে আসুন তো। বিরাট বিপদে পড়েছি।

গিয়ে দেখি সত্য বিরাট বিপদ। চারজন শিশুর একটা দলের মধ্যে তিনি নার্তাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দলটির সঙ্গে বিছানা, একটা পাটি এবং হাড়ি-কূড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে এরা

গ্রাম ভ্যাগ করে সদ্য শহরে এসে পৌছেছে। চারদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে ভয়ানক হৃচকিয়ে গেছে। সবচেয়ে ছেটটি তিন-চার বছরের মেঝে। সে ক্রমাগত ফ্রকেব হাতায় চোখ মুছেছে। সবচেয়ে বড়টিও মেঝে। বার-তের বছর হবে। এও কাঁদছে। মাঝেব দুটি ছেলে, এবা কাঁদছে না। আমি হাসিমুখে বললাঘ, আলঘ সাহেব, আপনি মনে হচ্ছে আপনার কৃষি বিতরণের সাবজেক্ট পেয়ে গেছেন।

তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, আরে ভাই, হাসবেন না। বিরাট ঝামেলা। আপনি এসেছেন ভাল হয়েছে। এদের সমস্যাটা একটু মন দিয়ে শুনুন। কোন স্যালিউশন বের করা যায় কি-না দেখুন। আমি একটা সেকেন্ডও থাকতে পারছি না। জরুরী একটা এ্যাপ্যয়েন্টমেন্ট। অলরেডি আধা ঘণ্টা লেট। আকাশের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। কালৈবেশাখী শুরু হয়ে যাবে।

তিনি আমাকে বিড়ীয় কথা বলার সুযোগ দিলেন না। অতি ক্ষত রাস্তার ওপাশে তাঁর ঘরিস মাইনরের দিকে ছুটে গেলেন।

বাচাগুলির সমস্যা তেমন বিচিত্র কিছু না। বরং বলা চলে খুবই সাধারণ সমস্যা। এদের বাড়ি মস্বমনসিংহের ত্রিশালে। মা নেই। বাবার সঙ্গে থাকতো। সেই বাবা একদিন কাউকে না বলে উধাও। কোন ঘোঞ্জ নেই। বাচাগুলি বুদ্ধি করে চলে গেল নবীনগর। তাদের মামার বাড়ি। সেই মামা বর্তমানে তাদের ঢাকায় নিয়ে এসেছে। মামা নাকি ঘোঞ্জ পেয়েছে এদের বাবা থাকে ঢাকা শহরে। পাকা সংবাদ। মামা বড় মেয়েটির হাতে একটা দশ টাকার নেট ধরিয়ে দিয়ে বলেছে অপেক্ষা করতে। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। এরা অপেক্ষা করছে কিন্তু মামার ঘোঞ্জ নেই। আমি বললাঘ, মামা কখন গেছে?

বড় মেয়েটি ফেঁপাতে ফেঁপাতে বলল, সকালে। মেয়েটি মন খারাপ করিয়ে দেবার যত সুন্দর। ছেট বাচাটিও পুতুলের যত। এটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। এরা দেখতে কদাকার হলে কোন কথাবার্তা না বলে চলে যাওয়া যেত। এখন যাওয়া যাচ্ছে না।

‘বাবা কি করত?’

‘গাতক।’

‘সেটা আবার কি?’

‘গান গায়। সারি গান, মুশিদী গান।’

আরেক সমস্যা। সংগীতজ্ঞের পরিবার। এদের বাবা যদি কামলা-টামলা ভাতীয় কিছু হত তাহলে মনের উপর চাপ পড়ত না। বাচাগুলি এখনো বুঝতে পারছে না — মামা নামক মানুষটি এদের ফেলে পালিয়েছে। এখনো আশা করে আছে। আমি বললাঘ, ভৌমিরা খেয়েছে কিছু? বড় মেয়েটি ফেঁপাতে ফেঁপাতে জানাল, তিন টাকার বাদাঘ কিনে সবাই মিলে খেয়েছে। হাতে এখনো সাত টাকা আছে। আমি পকেট থেকে দুটা টাকা বের করে বললাঘ, নাও রাখ।

বড় মেয়েটা অবাক হৰে তাকিয়ে রইল। ভিক্ষা নিয়ে তাক হয়ত অভ্যাস নেই। বিপদের উপর বিপদ। ছেলে দুটিও কাঁদতে শুরু করেছে। বড় মেয়েটি একজনকে কোলে তুলে নিয়েছে। অন্য ছেলেটি বোনের ফ্রক ধরে আছে। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। আমি শুকনো গলায় কিছু কথাবার্তা চলাবার চেষ্টা করলাঘ, যেমন — নাথ কি? স্তুলে পড়ে কি-না।

তারাও কি ব্যবাহ ঘট গন জানে কি-না — এইসব। কোন আলাপই কেশী দূর আগায় না। এরা হা করে চেয়ে থাকে এবং ক্রমগতই চোখ মুছে। ছেট বাচ্চাটি কেঁদেই অস্ত্র।

একবাব ইচ্ছ হল মাঝায় হাত বুলিয়ে একটু আদব করি। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলাম। বাড়তি আদব দেখানো শানে নিষ্ঠের ঘাড়ে ঝামেলা টেনে আন। আকাশের অবস্থাও ন্তর খাবাপ হচ্ছে। হঠৎ বড়-বৃষ্টি শুরু হলে দৌড়ে আশ্রয় নেবারও জ্ঞায়গা নেই। একি মহা যত্নপায় পড়া গেল।

আমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাঝায় অপেক্ষা করতে লাগলাম — যদি কোন ভদ্রলোক এই রাস্তায় আসে তাকে কলব, আমার একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে। আমি থাকতে পারছি না। একজন ডাঙ্কাবের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট . . .

সত্ত্ব সত্ত্ব একজনকে আসতে দেখা গেল। যাকবয়েসী এক ভদ্রলোক। বড় আসছে দেখে ছুটে যাচ্ছেন। আমাদের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, কি হয়েছে?

আমি করণ পলাষ্ব বললাম, ওদের একটা সমস্য হয়েছে। একটু কাইগুলি শুনুন। আহি, তোমরা উনাকে বল তো ব্যাপারটা কি?

আমি আর দাঁড়ালাম না। লম্বা পা ফেলতে শুরু করলাম। বড় মেয়েটি খুবই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এতে অবাক হবার কি আছে কে জানে? মানুষের কাজ থাকবে না?

বদরুল আলম সাহেবের সঙ্গে পরদিন দেখা। বাজার করে ফিরছেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, কি ভাল?

আমিও হাসিমুখে বললাম, ছু ভাল।

‘ইলিশ মাছ আজ খুব সস্তা যাচ্ছে। পঞ্চাশ টাকায় যে জিনিস এনেছি অন্যদিন তার দাম পড়ত একশ’। এই দেখেন সাইজ।’

তিনি ইলিশ মাছ বের করে দেখালেন। বিশাল সাইজ।

সিডি দিয়ে উঠতে উঠতে বদরুল আলম সাহেব বললেন, ‘রুবিসে’র কাজকর্ম তো শুরু করা উচিত। বর্ষা তো এসে গেল, তাই না?’

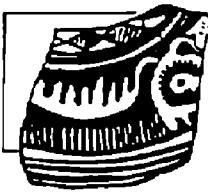
‘হ্যা, তাই। এবার বর্ষা আগে ভাগে নামবে।’

‘এ বছরেও ফ্লাড হলে তো সর্বনাশ। ফ্লাডের ব্যাপারটাও কলসিডারেশনে রাখতে হবে।’

আর কোন কথা হল না। তিনি ঐ বাচ্চাগুলির কথা কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। আমিও কিছু বললাম না। যেন ঐ জাতীয় কোন ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটেনি। আর ঘটলেও সেটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার।

তুচ্ছ কিছু নিয়ে মাঝা ঘামাবাব সময় কোথায় আমাদের?

BanglaBook.org



দ্বিতীয় জন

প্রিয়াৎকার খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ হয়েছে।

অসুখটা এমন যে কাউকে বলা যাচ্ছে না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিংবা বিশ্বাস করার ভান করে আড়ালে হাসাহাসি করবে। একজনকে অবশ্যি বলা যায় — জ্ঞানের জাতের স্বামী। স্বামীর কাছে কিছুই গোপন থাকে উচিত নয়। অসুখ-বিসুখের খবর সবার আগে স্বামীকেই বলা দরকার।

বিস্ত মুশকিল হচ্ছে জ্ঞানের সঙ্গে প্রিয়াৎকার পরিচয় এখনো তেমন গাঢ় হয়নি। হবার কথাও নয়। তাদের বিয়ে হয়েছে এক্ষণ্ড দিন আগে। এখনো প্রিয়াৎকার ‘তুমি’ বলা রপ্ত হয়নি। মুখ ফসকে ‘আপনি’ বলে ফেলে। এরকম গান্ধীর, বয়স্ক একজন মানুষকে ‘তুমি’ বলাও অবশ্যি খুব সহজ নয়। মুখে কেমন বাধো বাধো ঠেকে। প্রিয়াৎকা চেষ্টা করে ‘আপনি’ ‘তুমি’ কোনটাই না বলে চালাতে; যেমন —‘তুমি চা খাবে? না বলে সে বলে — চা দেব? এইভাবে দীর্ঘ আলাপ চালান যায় না, তার চেয়েও বড় কথা — মানুষটা খুব বৃক্ষিমান। ভাববাচ্যে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই সে হাসিমুখে বলে, তুমি বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না?

তুমি বলতে কষ্ট হওয়াটা দোষের কিছু না। প্রিয়াৎকার বয়স মাত্র সত্ত্বে। তাও পুরোপুরি সত্ত্বে হয়নি। জুন মাসে হবে। এখনো দুর্মাস বাকি। আব ঐ মানুষটার বয়স খুব কম ধরলেও ত্রিশ। তার বয়সের প্রায় দ্বিতীয়। সারাক্ষণ গান্ধীর থাকে বলে বয়স আরো বেশি দেখায়। বরের বয়স বেশি বলে প্রিয়াৎকার মনে কোন ক্ষোভ নেই। বরদের চেংড়া দেখালে ভাল লাগে না। তাছাড়া মানুষটা অত্যন্ত ভাল। ভাল এবং বৃক্ষিমান। কম বয়েসী বোকা বরের চেয়ে বৃক্ষিমান বয়স্ক বর ভাল।

বিয়ের রাতে নানা কিছু ভেবে প্রিয়াৎকা আতঙ্কে অস্থির হয়েছিল। ধৰকধৰক ক্ষেত্ৰক কাঁপছিল। কপাল ঝীতিয়ত ঘায়েছিল। মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে ফেলেছিল। কাছে ত্রিসে ভারী গলায় বলল, ভয় করছে? ভয়ের কি আছে বল তো?

প্রিয়াৎকার ঘুরের ধৰকধৰকানি আরো বেড়ে গেল। সে ‘হাঁ’ ‘না’ কিছুই বলল না। একবার মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা তখন নরম গলায় বলল ক্ষয়ে কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়। বলেই প্রিয়াৎকার গায়ে চাদর টেনে দিল। তাঁর গলার বাবে কিছু একটা ছিল। প্রিয়াৎকার তার পুরোপুরি কেটে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে একবার ঘুম ভেঙে দেখে লোকটি অন্যপাশ ফিরে ঘুমছে। আনিকক্ষণ জেগে থেকে প্রিয়াৎকা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। লোকটি তখন পাশে নেই।

একটা মানুষকে চেনার জন্যে এক্ষণ্ড নিল যুব দীর্ঘ সময় নয়। তবু প্রিয়াৎকার ধারণা মানুষটা ভাল, বেশ ভাল। এরকম একজন মানুষকে তার অসুখের কথাটা অবশ্যই বলা যায়।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অসুস্থিতার সঙ্গে এই মানুষটার সম্পর্ক আছে। এই কারণেই তাঁকে বলা যাবে না। কিন্তু কাউকে বলা দরকার। খুব ভাড়াতাড়ি বলা দরকার। নয়ত সে পাগল হব্বে যাবে। কিছুটা পাগল সে বোধ হয় হয়েই গেছে। সারাক্ষণ অস্ত্রিয় লাগে। সঙ্ক্ষয় মেলাবার পর শরীর কাঁপতে থাকে। ত্যক্ষণ বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেলেও ডৃশ্য মেটে না। সামান্য শব্দে ভয়ংকর চমকে উঠে। সেদিন বাতাসে জানালার কপাট নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভব্বে অস্ত্রিয় হয়ে গোঁওনির মত শব্দ করল প্রিয়াৎকা। হাতের চায়ের কাপ থেকে সবটা চা ছলকে পড়ল শাড়িতে। ভাগিয়ে আশেআশে কেউ ছিল না। কেউ থাকলে নিচয়ই খুব অবাক হত। প্রিয়াৎকার ছেট মামা যেমন অবাক হলেন।

তিনি প্রিয়াৎকাকে দেখতে এসেছিলেন। তার দিকে তাকিয়েই বিস্মিত গলায় বললেন, তোর কি হয়েছে রে? প্রিয়াৎকা হালকা গলায় বলল, কিছু হয়নি তো। ভূমি কেমন আছ মামা?

‘আমার কথা বাদ দে। তোকে এমন লাগছে কেন?’

‘কেমন লাগছে?’

‘চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ শুকনো। কি ব্যাপার?’

‘কোন ব্যাপার না মামা।’

‘গালটাল ভেঙে কি অবস্থা। তুই কথাও তো কেমন অন্য রকমভাবে বলছিস।’

‘কি রকম ভাবে বলছি?’

‘মনে হচ্ছে তোর গলাটা ভাঙা।’

‘ঠাণ্ডা লেগেছে মামা।’

প্রিয়াৎকা কয়েকবার কাশল। মামাকে বুঝাতে চাইল যে তার সত্ত্ব সত্ত্ব কাশি হয়েছে; অন্য কিছু না। মামা আরো গাঁজীর হয়ে গেলেন। শীতল গলায় বললেন,

‘আর কিছু না তো?’

‘না।’

‘ঠিক করে বল।’

‘ঠিক করেই বলছি।’

প্রিয়াৎকার কথায় তার মামা খুব আশ্চর্ষ হলেন বলে মনে হল না। সারাক্ষণ পঞ্জীয় হয়ে রহিলেন। চায়ের কাপে দুটা চুম্বক দিয়েই রেখে দিলেন। ‘যাইবে মা।’ বলেই কেন্দ্রস্থানে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। মামা চলে যাবার এক ঘণ্টার ভেতরই মাঝে এসে হাজির। বোঝাই যাচ্ছে মামা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মাঝী প্রিয়াৎকাকে দেখে আত্মকে উঠলেন। প্রায় চেঁচিয়েই বললেন, এক সপ্তাহ আগে তোকে কি দেখেছি আর এখন কি দেখছি? কি ব্যাপার তুই খেলাধুলি বল তো? কি সমস্যা?

প্রিয়াৎকা শুকনো হাসি হেসে বলল, কোন সমস্যা না! মাঝী কঠিন গলায় বললেন,

তুই বলতে না চাইলে আমি কিন্তু জামাইকে জিল্ডেক করব। জামাই আসবে কখন?

‘ও আসবে রাত আটটার দিকে। ওকে কিন্তু প্রিজেস করতে হবে না মাঝী। আমি বলছি।’

‘বল। কিছু লুক্ষণ না।’

প্রিয়াংকা প্রাথমিক করে বলল, আমি ভয় পাই, মাঝী

‘কিসের ভয়?’

‘কি যেন দেখি।’

‘কি দেখিস?’

‘নিজেও ঠিক জানি না কি দেখি।’

‘ভাসা ভাসা কথা বলবি না। পরিষ্কার করে বল কি দেখিস।’

প্রিয়াংকা এক পর্যায়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, মাঝী আমি বোধহৱ পাগল হয়ে গেছি। আমি কি সব যেন দেখি।

সে কি দেখে তা তিনি অনেক প্রশ্ন করেও বের করতে পারলেন না। প্রিয়াংকা অন্য সব প্রশ্নের জবাব দেয় কিন্তু কি দেখে তা বলে না। এড়িয়ে যায় বা কাঁদতে শুরু করে।

‘তোর কি বর পছন্দ হয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘সে কি তোকে ভয়-টয় দেখায়?’

‘কি যে তুমি বল মাঝী, আমাকে ভয় দেখাবে কেন?’

‘বাতে কি তোরা এক সঙ্গে মুমাস?’

প্রিয়াংকা লজ্জায় বেঙ্গলী হয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ।

‘সে কি তোকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে?’

‘কি সব প্রশ্ন তুমি কর মাঝী?’

‘আমি যা বলছি তার জবাদ দে।’

‘না, জাগিয়ে রাখে না।’

মাঝী অনেকক্ষণ থাকলেন। প্রিয়াংকাদের ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কাজের মেয়ে এবং কাজের ছেলেটির সঙ্গে কথা বললেন। কাজের মেয়েটির নাম মরিয়ম। দেশ খুলনা। ঘরের ধার্মতীয় কাজ সে-ই করে। কাজের ছেলেটির নাম জীতু মিহ্রা। তার বয়স নয়-দশ। এদের মূল্যনের কাছ থেকেও খবর বার করার চেষ্টা করা হল।

‘আচ্ছা মরিয়ম তুমি কি ভয়-টয় পাও?’

‘না। ভয় পায় ক্যাঁ?’

‘বাতে কিছু দেখ-টেখ না?’

‘কি দেখয়?’

‘আচ্ছা ঠিক আছে — যাও।’

প্রিয়াংকার মাঝী কোন রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। তবে খুব ইচ্ছা ছিল জাজেদের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করবেন, পরামর্শ করবেন প্রিয়াংকার জন্যে পারা গেল মা। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মাঝী তুমি যদি তাকে কিছু বল তাহলে আমি কিন্তু বিষ খাব। আঙ্গুহির কসম বিষ খাব। নয়ত ছাদ থেকে শিটেলাফিয়ে পড়ব।

তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ, প্রিয়াংকা সত্যি বিষ-টিষ খেয়ে ফেলতে পারে। “আমার মতুর জন্যে কেউ দায়ী নয়” — এই কথা শিখে একবার সে এক বোতল ডেটেল

খেয়ে ফেলেছিল। অনেক ডাক্তার-হাসপাতাল করতে হয়েছে। এই কাণ সে করেছিল অতি তুচ্ছ কারণে। তাব এক বাঙালীর সঙ্গে ঝগড়া করে। এই মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। তাকে কিছুতেই ঘাটান উচিত নয়।

জ্বান্তে এল রাত সাড়ে আটটার দিকে। জ্বান্তের সঙ্গে ধানিকক্ষপ টুকটোক গল্প করে প্রিয়ংকার ঘামী ফিরে গেলেন। তাঁর মনের মেঘ কাটিল না। হল কি প্রিয়ংকার? সে কি দেখে?

প্রিয়ংকা নিজেও জানে না তার কি হয়েছে। স্বামী চলে যাবার পর তার বুক খুক— খুক করা শুরু হয়েছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। অসম্ভব গরম লাগছে। কিছুক্ষণ পর পর মনে হচ্ছে বোধহয় নিঃশ্বাস বক্ষ হয়ে যাচ্ছে।

তারা খাওয়া-দাওয়া করে রাত সাড়ে দশটার দিকে ঘূমুতে গেল। জ্বান্তে বিছানায় শোয়াশাত্র ঘূমিয়ে পড়ে। আজো তাই হল। জ্বান্তে ঘূমুচ্ছে। তালে তালে নিঃশ্বাস পড়ছে। জেগে আছে প্রিয়ংকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পানির পিপাসা পেল। প্রচণ্ড পানির পিপাসা। পানি খাবার জন্যে বিছানা ছেড়ে নামতে হবে। যেতে হবে পাশের ঘরে কিন্তু তা সে করবে না। অসম্ভব। কিছুতেই না। পানির তৃষ্ণায় মরে গেলেও না। এই পানি খেতে গিয়েই প্রথমবার তার অসুখ ধরা পড়েছিল। ডয়ে ঐদিনই সে মরে যেত। কেন মরল না? মরে গেলেই ভাল হত। তার মত ভীতু মেয়ের মরে যাওয়াই উচিত।

ঐ রাতে সে বেশ আরাম করে ঘূমুচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি হবাব জন্যে চারদিক বেশ ঠাণ্ডা। জ্বান্তে দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। ঘূমুবার জন্যে চমৎকার রাত। এক ঘূমে সে কখনো রাত পার করতে পারে না। মাঝখানে একবার তাকে উঠে পানি খেতে হয় কিন্তু বাথরুমে যেতে হয়। সেই রাতেও পানি খাবার জন্যে উঠল। জ্বান্তে কাত হয়ে ঘূমুচ্ছে। গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে রেখেছে। অসুস্থ অভ্যাস মানুষটার। যত গরমই পড়ুক গায়ে চাদর দিয়ে রাখবে। প্রিয়ংকা খুব সাবধানে গায়ের চাদর সরিয়ে দিল। আহা আরাম করে ঘূমুক। কেমন ঘেমে গেছে।

স্বামীকে ডিঙিয়ে বিছানা থেকে নামল। স্বামী ডিঙিয়ে উঠানামা করা ঠিক হচ্ছে না—হয়ত পাপ হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি। প্রিয়ংকা ঘূমায় দেয়ালের দিকে। খাট থেকে নার্থেত ছুলে স্বামীকে ডিঙাতেই হবে।

তাদের শোবার ঘর অঙ্ককার, তবে পাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। এই একটা বাতি সাবারাতই জ্বলে। ঘরটা জ্বান্তের লাইব্রেরী ঘর। এই ঘরেই জ্বান্তে প্রিয়ংকার খাতা দেখে, পড়াশোনা করে। ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একটা বুক ক্লিফে কিছু বই, পুরানো ম্যাগাজিন। একটা বড় টেবিলের উপর রাজ্যের পরীক্ষার খাতা। একটা ইঞ্জিচেয়ার। ইঞ্জিচেয়ারের পাশে সাইড টেবিল টেবিল ল্যাম্প।

দরজার ফাঁক দিয়ে স্টাডি রুমের আলোর কিছুটা প্রিয়ংকাদের শোবার ঘরেও আসছে তবুও ঘরটা অঙ্ককার — স্যান্ডেল খুঁজে মেঘ বন্ধনী অনেকক্ষণ মেঘে হাতড়াতে হল। স্যান্ডেল পায়ে পরায়াত্ম পাশের ঘরে কিসের মেঘ একটা শব্দ হল।

ভারী অর্থ ঘন্টা গলায় কেউ-একজন কাশল, ইঞ্জিচেয়াব টেলে সবাল। নিশ্চয়ই মনের স্তুল। তবু প্রিয়াংকা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। না — আর কোন শব্দ নেই। শুধু সদৃশ বাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ট্রাক যাওয়া-আসা করছে। তহলে একটু অর্ধেক পাশের ঘরে কে শব্দ করছিল? অবিকল নিঃশ্বাস নেবার শব্দ। প্রিয়াংকা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকেই জ্বরে পাখর হয়ে গেল। ইঞ্জিচেয়ারে জ্বান্ডে বসে আছে। হাতে বই। জ্বান্ডে বই থেকে ঘূৰ্খ ভুলে তাকাল। নরম গলায় বলল, কিছু বলবে?

কতটা সময় পার হয়েছে? এক সেকেণ্ডের একশ' ভাগের এক ভাগ না অনন্তকাল? প্রিয়াংকা জানে না। সে শুধু জ্বানে সে ছুটে চলে এসেছে শোবার ঘরে — ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিছানায়। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে — সে কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। সব দূলছে। চারদিকের বাতাস অস্ত্রব ভারী ও উষ্ণ। জ্বান্ডে জেগে উঠেছে। সে বিছানায় পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, কি?

প্রিয়াংকা বলল, কিছু না। জ্বান্ডে ঘূম জড়ন স্বরে বলল, ঘূমাও। জেগে আছ কেন? বলতে বলতেই ঘূমে জ্বান্ডে এলিয়ে পড়ল। জ্বান্ডেকে জড়িয়ে ধরে সারারাত জেগে রইল প্রিয়াংকা। একটি দীর্ঘ ও ভয়াবহ রাত। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে প্রিয়াংকা শুয়ে আছে। তার সমস্ত ইলিয় পাশের ঘরে। সে স্পষ্টই শুনছে ছোটখাট শব্দ আসছে পাশের ঘর থেকে। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ, বইয়ের পাতা উল্টাবার শব্দ, ইঞ্জিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে যেমন ক্যাচক্যাচ শব্দ হয় সে রকম শব্দ, গলার শ্লেষা পরিষ্কার করার শব্দ। শেষ রাতের দিকে শোনা গেল বারান্দায় পাহচাবির শব্দ। কেউ-একজন বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। এই সব কি কল্পনা? নিশ্চয়ই কল্পনা। রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ আসছে না।

ফজরের আজানের পর প্রিয়াংকার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। ঘূম ভাঙল বেলা সাড়ে নটায়। ঘরের ভেতর রোদ ঝলকল করছে। জ্বান্ডে চলে গেছে কলেজে। মরিয়ম, জীতু মিয়ার সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। প্রিয়াংকার সব ভয় কর্পূরের মত উড়ে গেল। বাতে সে যে অস্ত্রব ভয় পেয়েছিল এটা ভেবে এখন নিজেরই কেমন হাসি পাচ্ছে। সে স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। মানুষ কত রকম দৃঢ়স্বপ্ন দেখে। এও একটা দৃঢ়স্বপ্ন। এর বেশ কিছু না। মানুষ তো এরচেয়েও ভয়াবহ দৃঢ়স্বপ্ন দেখে। সে নিজেই কতবার দেখেছে। একবার স্বপ্ন দেখেছিল — সম্পূর্ণ নগ্ন গায়ে বাসে করে কোথায় যেন যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ কি ভয়কুর স্বপ্ন!

প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামতে নামতে ডাকল, মরিয়ম।

'জ্বে আশ্মা!'

'বগড়া করছ কেন মরিয়ম?'

'জীতু কাচের জগটা ভাইস্তা ফেলছে আশ্মা!'

'চিংকার করলে তো জগ ঠিক হবে না। চিংকার কয়েনে না।'

'জিনিসের উপর কোন ঘায়া নাই... মহবত নাই...'

'ঠিক আছে, তুমি চূপ কর। তোমার স্বামী কিংবলে গেছেন?'

'জ্বে!'

'বাজ্জার করে দিয়ে গেছেন?'

'জ্বে।'

'কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন ?'

'দুপুরে থাইতে আসবেন :'

'আচ্ছা যাও। তুমি আমার জন্যে খুব ভাল করে এক কাপ চা বানিয়ে আন।'

'নাশ্তা থাইবেন না আম্মা ?'

'না। তোমার স্যার নাশ্তা করবে ?'

'জ্বে।'

মরিয়ম চা আনতে গেল। প্রিয়ংকা মুখ শুয়ে চামের কাপ নিয়ে বসল। এখন তার করার কিছুই নেই। দুজন মানুষের সংসার। কাজ তেমন কিছু থাকে না। এ সংসারে কাজ-কর্ম যা আছে সবই মরিয়ম দেখে এবং খুব ভালমতই দেখে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া প্রিয়ংকার কেন কাজ নেই। এই ফ্ল্যাটে অনেক গল্পের বই আছে — গল্পের বই পড়তে প্রিয়ংকার ভাল লাগে না। ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার জন্যে পড়াশোনা করা দরকার। পড়তে ভাল লাগে না। কারণ প্রিয়ংকা জানে পড়ে লাভ হবে না। সে পাস করতে পারবে না। কোন-একটা কলেজেই তাকে বি.এ. পড়তে হবে। কে জানে হয়ত জাত্তের কলেজেই। যদি তাই হয় তাহলে জাত্তে কি তাকে পড়াবে ? ফ্লাসে তাকে কি ডাকবে — স্যার ?'

চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মরিয়ম তাকে একটা চিঠি দিল।

'কিসের চিঠি মিয়ম ?'

'স্যার দিয়া গেছে।'

চিঠি না — চিরকৃট। জাত্তে লিখেছে — প্রিয়ংকা, তোমার গা-টা গরম মনে হল। তৈরি হয়ে থেকো। আমি দুপুরে তোমাকে একজন ডাঙ্কারের কাছে নিয়ে যাব।

প্রিয়ংকার মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে গেল। মানুষটা ভাল। হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান। স্বামীদের কত বক্ষ অন্যায় দাবী থাকে — তাঁর তেমন কিছু নেই। অন্যদের দিকেও খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রিয়ংকা কেন, আজ যদি জীতু মিয়ার জ্বর হয় তাকেও সে সঙ্গে সঙ্গে ডাঙ্কারের কাছে নিয়ে যাবে। জাত্তে এমন একজন স্বামী যার উপর ভরসা করা যায়।

যে যাই বলুক, এই যানুষটাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তার খুব লাভ হয়েছে। জাত্তেদের আগে একবার বিয়ে হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। বেচারার শ্রী মারা গেছে বিয়ের আচ্ছ মাসের মাথায়। শ্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে বিয়ে করার জন্যেও অস্থির হয়ে পড়েন। দুবছর অপেক্ষা করবেছে। যামা-যামী যে তাকে দোজবর একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন এই নিয়েও প্রিয়ংকার মনে কোন কোভ নেই। যামা দরিদ্র মানুষ। তিনি আর কত করবেন। যথেষ্টই তো করবেন। যামী নিজের গয়না ভেঙে তাকে গয়না করে দিয়েছেন। কঞ্জন মানুষ এরকম করে ? আট নটা নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছেন। এবং যানুষ একটা শাড়ি আছে বারশ' টাকা দামের।

জাত্তেদের আগের শ্রীর অনেক শাড়ি এই ঘরে কয়ে গেছে। এই মেয়েটির শাড়ির দিকে তাকালেই মনে হয় খুব সৌখ্য যেয়ে ছিল। ডেসিপ্রেসল ভর্তি সাজগোজের জিনিস। কিছুই ফেলে দেয়া হয়নি। বসার ঘরে মেয়েটির বড় একটি বাঁধান ছবি আছে। খুব সুন্দর মুখ। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এই ডাক্তার জান্দের বক্তু।

কাজেই ডাক্তার অনেক আজেবাজে রসিকতা কবল — যেমন হাসি মুখে বলল, ভাবীকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সংসারে নতুন কেউ আসছে নাকি? হা-হা-হা। মুক্তিমান হয়ে ঠিক কাজটি করে ফেলেননি তো?

দুস্প্রাহণ হয়নি যার বিষে হয়েছে তার সঙ্গে কি এরকম রসিকতা করা যায়? রাগে প্রিয়াৎকার গা খুলতে লাগল।

ডাক্তার তাকে একগাদা ভিটামিন দিলেন এবং কলেন, ভাবীকে মনে হচ্ছে রাতে ঘুমুতে-টুমুতে দেয় না? দুপুরে ঘুমিয়ে পুষ্টিয়ে নেবেন। নয়ত শরীর খারাপ করবে — হা-হা-হা।

প্রিয়াৎকা বাড়ি ফিরল রাগ করে। সক্ষ্য মেলাবার পৰ সেই রাগ ভয়ে ক্রপান্তরিত হল। সীমান্তীন ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলল। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয়। বারান্দায় যেতে ভয়। হাতমুখ খুতে বাথরুমে গিয়েছে— বাথরুমের দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আর সে দরজা খুলতে পারবে না। দরজা আপনা-আপনি আটকে গেছে। সে দরজা খোলার চেষ্টা না করেই কাঁপা গলায় ডাকতে লাগল — মরিয়ম, ও মরিয়ম। মরিয়ম।

রাতে আবার ঐ দিনের মত হল। জান্দে পাশেই প্রায় নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে আর প্রিয়াৎকা স্পষ্টই শুনছে স্যাণ্ডেল পরে বারান্দায় কে যেন পায়চারি করছে। প্রিয়াৎকা নিজেকে বুঝাল — ও কেউ না, ও হচ্ছে মরিয়ম। মরিয়ম হাড়া আব কে হবে? নিশ্চয়ই মরিয়ম। স্যাণ্ডেলে কেমন ফটফট শব্দ হচ্ছে। জান্দে যখন স্যাণ্ডেল পরে হাঁটে তখন এরকম শব্দ হয় না। একবার কি বারান্দায় উকি দিয়ে দেখবে? কি হবে উকি দিলে? কিছুই হবে না। ভয়টা কেটে যাবে। রাত একটা বাজে — এমন কিছু রাত হয়নি। রাত একটায় ঢাকা শহরের অনেক দোকান-পাট খোলা থাকে। এই তো পাশের ঝুঁয়াটের বাচ্চাটা কাঁদছে। এখন নিশ্চয়ই বারান্দায় যাওয়া যায়।

খুব সাবধানে জান্দেকে ডিতিয়ে প্রিয়াৎকা বিছানা থেকে নামল। তার হাত-পা কাঁপছে, তৎক্ষণাত বুক ফেটে যাচ্ছে, কানের কাছে কেমন বাঁ বাঁ শব্দ হচ্ছে। সব অগ্রাহ্য করে বারান্দায় চলে এল। আব তার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়ান মানুষটা বলল, প্রিয়াৎকা এক প্লাস প্লান্ট দিও তো।

বিছানায় যে মানুষটা শুয়ে আছে এই মানুষটাই সেই জান্দে। তার প্লাসে জান্দের মতই লুঙ্গি, হাতকাটা গেঞ্জি। মুখ গঞ্জীর ও বিষণ্ণ।

প্রিয়াৎকা ছুটে শোবার ঘরে চলে এল। কোনমতে বিছানায় উঠল — ঐ তো জান্দে ঘুমুচ্ছে। গায়ে চাদর টানা — এতক্ষণ যা দেখেছি ভুল দেখেছি যা উনেছি তাও ভুল। কিছু-একটা আমার হয়েছে। ভয়ংকর কোন অসুখ। সকাল হলৈ আমার এই অসুখ থাকবে না। আঞ্চাহু তুমি সকাল করে দাও। খুব তাড়াতাড়ি সকাল জানে দাও। সব মানুষ জেগে উঠেক। সূর্যের আলোয় চারদিক ভরে যাক। সে জান্দেক শুল্ক করে অভিয়ে ধরল। জান্দে ঘুমযুম গলায় বলল, কি হয়েছে?

সকল বেলা সত্তি সত্তি সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। রাতে এ বকম ভয় পাওয়ার জন্যে
লজ্জা লাগতে লাগল। জান্নেদ কলেজে চলে যাবার পর সে স্বাভাবিক ভঙিতে মরিয়মকে
তরকাবি কাটায় সাহায্য করতে গেল। মরিয়ম বলল,

‘আফার শইল কি ধারাপ?’

‘না।’

‘আফনের কিছু করণ লাগত না আফ। আফনে গিয়া হইয়া থাকেন।’

‘এইমাত্র তো ঘূম থেকে উঠলাম এখন আবার কি শয়ে থাকব?’

‘চা বানায়া দেই?’

‘দাও। আচ্ছা মরিয়ম, তোমার আগের আপাও কি আমার মত চা খেত?’

‘হ। তয় আফনের মত চুপচাপ থাকত না। সারদিন হৈচে করত। গান-বাজনা করত।’

‘যারা গেলেন কিভাবে?’

‘হঠাতে মাথাড়া ধারাপ হইয়া গেল। উল্টা-পাল্টা কথা কওয়া শুরু করল — কি জানি
দেখে।’

প্রিয়াংকা শক্তিত গলায় বলল, কি দেখে?

‘দুইটা মানুষ না-কি দেখে। একটা আসল একটা নকল। কোনটা আসল কোনটা নকল
বুঝতে পারে না।’

‘তুমি কি বলছ তাও তো আমি বুঝতে পারছি না।’

‘পাগল মাইনষের কথার কি ঠিক আছে আফ? নেন চা নেন।’

প্রিয়াংকা মাথা নিচু করে চায়ের কাপে ছেট ছেট চুমুক দিচ্ছে। একবারও মরিয়মের
দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। তার ধারণা, তাকালেই মরিয়ম অনেক কিছু বুঝে ফেলবে।
বুঝে ফেলবে যে প্রিয়াংকারও একই অসুখ হয়েছে। সে চায় না মরিয়ম কিছু বুঝুক। কাবণ
তার কিছুই হয়নি। অসুখ কি মানুষের করে না? করে। আবার সেবেও যায়।
তারটাও সারবে।

রাত গভীর হচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টুপটুপ করে। খোলা জানালায় হাওয়া আসছে।
প্রিয়াংকা জান্নেদকে জড়িয়ে ধরে শয়ে আছে। তার চোখে ঘূম নেই।

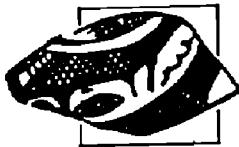
পাশের ঘরে বহিয়ের পাতা ওল্টানোর শব্দ হচ্ছে। এই যে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের
ধোয়ার গুরু ভেসে আসছে। ইঞ্জিচেয়ার থেকে উঠল — ক্যাচক্যাচ শব্দ হচ্ছে ইঞ্জিচেয়ারে।

প্রিয়াংকা স্বামীকে সঙ্গোরে জড়িয়ে ধরে কঁপা গলায় উকল — এই

ঘূম ভেঙে জান্নেদ বলল, কি?

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, না কিছু না। তুমি ঘূমাও।

BanglaBook.org



সাদা গাড়ী

আমি যাদের পছন্দ করি না তাদের সঙ্গেই আমার ঘুরেফিরে দেখা হয়। হয়ত খুব জমিষ্ঠে গল্প করছি — কাজের ছেলেটি এসে বলল, ‘কে জানি আইছে, আপনারে বুলায়।’ বাইরে উকি দিলে এমন একজনকে দেখা যাবে যার সঙ্গে এক সময় খাতির ছিল। এখন নেই। তবু হাসির একটা ভাব করে উল্লাসের সঙ্গে বলতে হবে, আরে আরে কি খবর? তারপর কেমন চলছে? এক সময় হয়তো এই লোকটির সঙ্গে তুই-তোকারি করতাম। এখন দূরত্ব রাখার জন্যে ভাববাচ্যে কথা বলতে হয়। বাঁলা ভাষার ভাববাচ্য খুব উন্নত নয়। দীর্ঘসময় কথা চালানো যায় না।

আজকের ব্যাপারটাই ধরা যাক। আজ্ঞা জমে উঠেছে। বাঁলা বানান নিয়ে খুব তর্ক দেখে গেছে। এমন সময় কাজের ছেলেটি এসে বলল আমাকে কে নাকি ডাকছে। বেরিয়ে দেখি সাক্ষির। আমি হাসিমুখেই বললাম, বাইরে কেন, ভেতরে এসে বসুন। সে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল।

আসুন ভেতরে।

না, না ঠিক আছে।

আমার কয়েকজন বক্স-বাক্স এসেছে। গল্প-গুজব হচ্ছে। আসুন পরিচয় করিয়ে দেই।
অন্য আরেকদিন আসব।

আজ অসুবিধা কিসের? আসুন ভেতরে।

সাক্ষির চোখ-মুখ লাল করে ভেতরে ঢুকল। পুরুষ মানুষদের লজ্জায় এমন লাল হতে কখনো দেখিনি। নাকের পাতায় কিন্দু বিন্দু ঘায়।

ভেতরে তখন তুমুল উত্তেজনা। আজিজ ফজলুকে জিজ্ঞেস করছে, ‘ধূলি বানান কর দেখি? হুস্কেকার না দীঘটকার?’ রাগের চোটে ফজলু তোতলাচ্ছে। ক্রমাগত তার মুখ দ্বারা খুব পড়েছে। বিশ্রী অবস্থা।

সাক্ষির নার্ভাস ভঙ্গিতে রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছল এবং মন্দুরে বলল, ‘আজ যাই, অন্য আরেক দিন আসব?’

বসুন না। তাশ হবে। তাশ খেলতে পারেন তো?

হ্যানা। আজ আমি যাই। আজ আমার একটা কাজ আছে।

আমি সাক্ষিরকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। স্মিথেনে সাদা রঞ্জের প্রকাণ্ড একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। মুশকো জোয়ান এক ড্রাইভার সাক্ষিরকে দেখে স্মিথেনের মত লাফিয়ে বের হল এবং ক্রস্ট দরজা খুলে মৃত্তির মত হয়ে পেল আমাদের বহুসী একটা ছেলের জন্যে এতটা আয়োজন আছে ভাবাই যায় না। আমি টেন্ট একটা ঝৰ্ণা নিয়ে মোড়ের দোকান থেকে

সিগারেট কিনলাম। ছুটির সকালে ঈর্ষার মত জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু এটা অনেকক্ষণ ধরে বুকে খচখচ করতে লাগল।

সাক্ষিরের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটা এ রকম — পুরানা পল্টনের এক ওষুধের দোকানে ঢুকেছি প্যারাসিটামল কিমতে। পয়সা দিয়ে বেকুবার সময় দেখলাম ছটাঘট শব্দে সব দোকানের আপ পড়ে যাচ্ছে। চাবদিকে দারুণ ব্যস্ততা। কি হয়েছে কেউ কিছু বলতে পাবছে না। সবাই ছুটছে। ট্রাকওয়ালাদের সঙ্গে বাসওয়ালাদের কি নাকি একটা ঝামেল। একদল লোক নাকি রাম দা নিয়ে কের হয়েছে। ব্যাপারটা শুভ হবাবই কথা। এ যুগে রাম দা নিয়ে কেউ কের হয় না। তবে সাবধানের মার নেই। শুভ পাশের গলিতে ঢুকে দেৰি পলির মাথায় একটা পাঞ্জাবী গায়ে দারুণ ফর্সা ছেলে লয়ালয়ি হয়ে পড়ে আছে। তার চশমা ছিটকে পড়েছে অনেকটা দূরে। আমি শিয়ে তাকে টেনে তুললাম। সে বিড়বিড় করে বলল, 'চশমা ছাড়া আমি কিছু দেখতে পাই না। আমার মায়েপিয়া চোখের পাওয়ার সিঙ্গ ডাইওপ্টার।' চশমার একটা কাঁচ খুলে পড়ে গিয়েছিল। এক কাচের চশমা পরে সে অস্তুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাকে বাড়ী না পৌঁছানো পর্যন্ত সে আমার বাঁ হাত শক্ত করে ধরে রাখল। সম্ভবত ভয় পাছিল, আমি তাকে ফেলে রেখে চলে যাব।

কোন পুরুষ মানুষের এমন যেয়েদের মত চেহারা হয় আমার জ্ঞানা ছিল না। পাতলা ঠোঁট। কাচবিহীন চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কাজল পরানো। কিশোরীদের মত ছেট চিবুক। আমি বললাম, আপনি কি করেন?

ইংরেজীতে এম.এ. পরীক্ষা দেব।

ভাই নাকি? ভাল।

গত বৎসর পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। দেইনি। আমার হাতের অসুখ, হার্টবিটের রিদমে গঙগোল আছে।

চিকিৎসা করছেন তো?

এর কোন চিকিৎসা নেই।

এই বলেই সে ফ্যাকাশে ভাবে হাসতে লাগল। আমি সিগারেট বের করলাম, নেন, সিগারেট নেন।

আমি সিগারেট খাই না। নিকোটিন হাতের মাসলে ক্ষতি করে। ফাইবারগুলি খেকে ক্ষয় দেয়।

এতসব জ্ঞানলেন কিভাবে?

আমার মা ডাক্তার।

নিউ ইস্ক্রাটনের ষে বাড়ির সামনে রিকশা থামল সেটাকে বাড়ি বলা ঠিক না। সেটা একটা হলসুল ব্যাপার। আমরা রিকশা থেকে নামতেই চারদিকে ছোটাছুটি গড়ে গেল। সাক্ষিরের মত দেখতে একজন মহিলা তীক্ষ্ণ কষ্টে বলতে লাগলেন, কেন তুমি কাউকে কিছু না বলে বেরুলে? আর বেরুলেই যখন কেন গাড়ি নিলেন?

সাক্ষির অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। ক্ষমাতেলা অভিষ্ঠানী শব্দে বললেন, কেন তুমি আমাদের কষ্ট দাও?

আর যাব না মা।

তোমার দুর্বল হাতে। যে কোন সময় কিছু-একটা যদি হয়ে যেত। তখন?
মা আব যাব না।
এ ছেলেটাই সাক্ষির।

বাত ৮ টার আগে আমি এদের বাড়ি থেকে বেকতে পাবলাম না। সাক্ষিরের বাবা এবং মা এখন একটা ভাব করতে লাগলেন যেন আমি সাক্ষিরকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। এ রকম বড় একটা কান্দের যোগ্য পূর্ণস্কার দিতে না পেরে তারা দুঃখনেই অস্থির।

আমাকে বাড়ি পৌছে দিতে এবং বাড়ি চিনে আসবার জন্যে একজন লোক চলল আমার সঙ্গে। ছেটি গলিতে বড় গাড়ী টুকুবে না — এইজন্য টেলিফোন করে একটা ছেটি গাড়ী আনানো হল।

সাক্ষির মা-বাবার নিমেষ অগ্রহ্য করে আমাকে এগিয়ে দিতে এলো গেট পর্যন্ত। নীচু স্বরে বলল, বাবা-মা আমার জন্যে খুব ব্যক্ত। একটামাত্র ছেলে তো।

আপনি একাই নাকি?

হ্যাঁ। পাঁচ ভাইবেন ছিলাম আমরা। এখন আমি একা আছি।

বাকিরা কোথায়?

সবাই মারা গেছে। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ বেশি দিন বাঁচে না। আমার এক চাচা ছিলেন। তাঁরও চার ছেলেমেয়ে ছিল। সবাই ত্রিশ হ্রবার আগেই মারা গেছে।

বলেন কি?

হ্যাঁ। আমিও বাঁচব না।

আবে, এসব কি বলছেন?

হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলছি। দেখেন না হাতের অসুখ হয়ে গেল।

আমার বক্সু-বাঙ্কবরা সব আমার মত। পাস করবার পর সবাই কিছু-একটাতে চুকে পড়েছি। ব্যাংক, ট্রান্সেল এজেন্সি, নাইট কলেজের পার্ট টাইম টিচার। একমাত্র আজিজ কোথাও কিছু না পেয়ে লাভে ভর্তি হয়েছে। ছুটি-ছাটার দিনে তাশ-তাশ খেলি। মাঝে-মধ্যে পরিমলদের মামার বাড়িতে ভিসিআর দেখি এবং প্রায় সবদিনই আজডাটা শেষ হয় এক্ষণ্টা ঝগড়ার মধ্যে। কোন কোন সময় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। তাতে অসুবিধা হয় মা কিছু। আবার যখন দেখা হয় পুরানো কথা আর মনে থাকে না। বিয়ে করার আগ পর্যন্ত এই সময়টা বেশ ভাল। চায়ের দোকানে বসে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দেয়ামাত্র মনে হয় জীবনটা বড়ই সুখের। ফজলুর ভাড়াটদের ছেটি যেয়ের হৃদয়হীনতা আমাদের ফজলুর চেয়েও বেশি আহত করে।

এ রকম সুখের সময় উপদেবের মত মাঝে মাঝে উপস্থিত হয় সাক্ষির। তাদের গাড়ীর মুশকে দ্বাইভার চায়ের দোকান থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। সাক্ষির লজ্জায় লাল হয়ে যাসে, চা খাচ্ছিলেন সবাই মিলে?

ই আজ্ঞা দিছি, আসুন না।

হ্যাঁ-না, আমি চা খাই না।



চা না খেলে না খাবেন, বসে গচ্ছ করুন।

অরেকদিন আসব। আজ একটু কাজ আছে।

কাজ থাকলে চলে গেলেই হয়। তা না। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। বিরক্তিতে আমার গা ঝুলে থায়, তবু উদ্দতা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

কি নিয়ে এত গচ্ছ করেন?

গচ্ছ করার টপিকের অভাব আছে নাকি? রাজনীতি, মেয়েমানুষ, সিনেমা, প্রেম। এসে শুনুন না। শুনতে না চাইলে বলুন।

কি বলব?

প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন।

সাক্ষির টমেটোর মত লাল হয়ে বলল, মেয়েদের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমি কোন মেয়ের সঙ্গে সামনা—সামনি বসে কথা বলিনি।

বলেন কি?

ক্ষি সত্য। আমি একাই থাকি। মেয়েদের সঙ্গে মেশা আমার মা পছন্দ করেন না। আমার হাটের অসুখ।

তাতে কি?

মানে ইয়ে — সাধান্যতম এক্সাইটমেন্টে রিদমে গণগোল হয়। মেজর প্রবলেম হতে পারে।

আমি ঝামেলামুক্ত হবার জন্য বলি, আজ তাহলে যান। রোদ লাগছে। সাক্ষির তবু যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। তার একটু দূরে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুশকো ড্রাইভার। কৃৎসিত ব্যাপার।

মেয়েলী চেহারার এই মুবকের সুধ-দুঃখের সাথে আমার সুধ-দুঃখের কোন মিল নেই। এর সঙ্গে নরম স্বরে মিষ্টি কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। আমি সাক্ষিরকে এড়িয়ে চলবার জন্য নানা রকম কৌশল করি। ঘরে বসে থেকে কাজের ছেলেটিকে বলে পাঠাই — বাসায় নেই। কখন ফিরবে তারো ঠিক নেই। কোন কোন দিন নিজেই গিয়ে বলি, আমি এক্ষণি বেরুব। হাসপাতালে এক বন্ধুকে দেখতে যাবার কথা। আজ তো কথা বলতে পারছি না।

আসুন, হাসপাতালে পৌছে দেই। কোন হাসপাতাল?

না না, তার দরকার নেই।

আমার কোন অসুবিধা হবে না, আসুন না।

মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। রাস্তায় কোন সাদা রঙের গাড়ী দেখলেই মনে হয় — এই বুঝি গাড়ী থামিয়ে ফর্সা পাঞ্জাবী-পরা সাক্ষির বেরিয়ে আসবে। মোটে ক্ষেত্রে আড়ালে যার ঢোক ঢাকা বলে মনের ভাব বোঝা যাবে না। কথা বলবে এমন ভাল মনুষের মত যে রাগ করা যাবে না আবার সহ্যও করা যাবে না।

রাস্তায় বেরুলেই একটা অস্পষ্ট অস্তিত্ব লেগে থাকে। এই বুঝি দেখা হল। অস্তিত্ব সবচে' বেশি হয় নীলু সঙ্গে থাকলে। নীলু তার কালু স্বর্ণতে পারে না। সে বিরক্ত হয়ে বলে, এরকম কর কেন? দেখা হলে কি হবে? অম্বৰে তো অঙ্গোককে দেখতেই ইচ্ছা করছে। একদিন অবশ্যি দেখা হলো। গ্রীন রোড দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছি। হঠাৎ রাস্তার পাশে সাদা

গাড়িটি দাঢ়িয়ে গেল। গাড়ীর শিতর থেকে সাক্ষির অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের লিঙ্কে। আমি না দেখার ভাব করলাম। এবং অতি শুন্ত একটা রিকশা ঠিক কবে নীলুকে নিয়ে ৫টে পড়লাম। সারাক্ষণই ভয় করতে লাগল এক্ষুণি হয়ত সে গাড়ী নিয়ে সামনে এসে থামবে। সারুক গলায় কলবে, কোথায় যাবেন বলুন, নামিয়ে দি। সে রকম কিছু ঘটল না। নীলু বিবর্জন হয়ে বলল, হট করে রিকশা নিলে কেন? আমি কতবার বলেছি পাশাপাশি রিকশায় চড়তে আমার ভাল লাগে না।

ভাল লাগে না কেন?

হড় তুলতে হয়। হড় তুললেই আমার কেন জ্ঞানি দম বক্ষ হয়ে আসে।

হড় না তুললেই হয়।

পাগল, হড় না তুলে অবিবাহিত একটা ছেলের সঙ্গে আমি রিকশায় চড়ব!

বিকালটা আমার চমৎকার কাটিল। দুঃজনে শুব্র পুরলাম। সংক্ষ্যাবেলা দূকে পড়লাম একটা চাইনীজ রেস্টুরেন্টে। নীলু সারাক্ষণই বলল, ইশ, বাসার সবাই দুচিন্তা করছে। তবু উঠবার কোন তাড়া দেখাল না।

নীলুকে শ্যামলীতে রেখে বাসায় ফিরে দেখি সাক্ষির আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, কি ব্যাপার?

কোন ব্যাপার না, এম্বি এলাম। দিনে এলে তো আপনাকে পাওয়া যায় না।

কোন বিশেষ কাজে এসেছেন, না শুধু গল্প করবার জন্য?

না কোন কাজে না, এম্বি। সাক্ষির কুমাল দিয়ে কপালের দ্বায় মুছতে লাগল। আমি বললাম, চা খান। চা দিতে বলি?

ছি না, চা-টা না। আমি এখন যাব। যা চিন্তা করছেন, এত রাত পর্যন্ত বাইবে কখনো থাকি না।

আজই বা থাকলেন কেন?

আপনাদের দুঃজনকে আজ দেখলাম। বড় ভাল লাগল। সেইটা বলবার জন্য।

সাক্ষির লজ্জায় বেগুনী হয়ে গেল।

আমাকে আর নীলুকে দেখেছেন বুঝি?

ছি। বড় ভাল লাগল। আমি একবার ভাবলাম এগিয়ে গিয়ে বলি, কোথায় যাবেন বলুন পৌছে দেই। আপনারা কি যানে করেন এই ভেবে গেলাম না।

আমি নিশ্চলে একটা সিগারেট ধরলাম। সাক্ষির মুদ্রাতে বলল, আমি অবশি আপনাদের পেছনে পেছনে গিয়েছি।

তাই নাকি?

ছি, দ্রাইভারকে বললাম দূর থেকে এই রিকশামুলে ফলো করো।

তারপর ফলো করলেন?

ছি। শাহবাগ পর্যন্ত। তারপর প্রাইভেট আর রিকশাটা লোকেট করতে পারল না। আপনি কি রাগ করছেন?

না।

আমি একবাব ভেবেছিলাম আপনাকে বলব না। কিন্তু আপনাদের দুঃজনকে এত সুন্দর লাগছিল। কি সুখী-সুখী লাগছিল। অমার মনে হল এটা বলা উচিত, আপনি রাগ করেননি তো?

আমি ঠাণ্ডা স্বরে বললাম, না রাগ করিনি। রাত অনেক হয়ে গেছে এখন বাসায় ঘান। নয়ত আপনার মা আবার রাগ করবেন।

কিছি তা ঠিক।

সাবিব চলে গেল কিন্তু আমাব বিরক্তিৰ সীমা বইল না। লোকটি কি নির্বোধ না অন্য কিছু? আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ হল। এৱকম ঘটনা আবার ঘটবে, ও যদি আমাকে এবং নীলুকে আবার কখনো দেখে তাহলে আবারো তাৰ সাদা গাড়ী আসবে পেছনে পেছনে। কি অসহ্য অবস্থা।

ঘটলোও তাই। দিন সাতেক পৰ সাবিব এসে হাসিমুখে বলল, আপনারা কি বুধবাৰ বিকালে শিশু পাৰ্কেৰ সামনে ফুচকা খাচ্ছিলেন?

মনে নেই।

আপনার পৱনে ছিল একটা চেকচেক শার্ট আৱ আপনার বাঙ্গবীৰ গায়ে লাল রঙেৰ চাদৰ। হাতে একটা চট্টেৰ ব্যাগ, মনে পড়েছে?

হ্যা, পড়েছে।

আমি কিন্তু ফুচকা খাবাৰ পৰ থেকে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এক ঘণ্টা আপনাদেৱ ফলো কৱেছি।

তাই নাকি?

কিছি।

এত ভাল লাগছিল আমার। দ্রাইভারকে বললাম তাৰা দেখতে পায় না এমনভাৱে তাদেৱ ফলো কৱো। আপনি অবশ্যি একবাৰ পেছনে তাকিয়েছেন। কিন্তু কিছু বুঝতে পাৱেননি।

আমি দীৰ্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, নীলুৱ সঙ্গে থাকলে আমি একট অন্যমনস্ক থাকি।

সাবিব গভীৰ আগ্ৰহে বলল, আচ্ছা এলিফেট রোডেৱ ঐ দোকানটা থেকে কি কিনলেন আপনারা?

আমি তাৰ জবাব না দিয়ে গত্তীৰ হয়ে বললাম, আসুন, আপনার সঙ্গে নীলুৱ প্ৰতিয়ম কৱিয়ে দেই।

না না, তাৰ কোন দৰকাৰ নেই। আপনাদেৱ দুঃজনকে এক সঙ্গে দেখতেই আমি ভাল লাগে। কি রকম অস্তুত সুখী-সুখী চেহাৰা। জানেন আমি মাকে আপনাদেৱ কথা বলেছি?

ভাল কৱেছেন।

আমি যে মাঝে মাঝে আপনাদেৱ পেছনে পেছনে যাই আপনি রাগ কৱেন না তো?

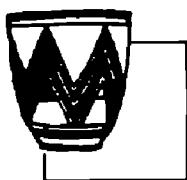
আমি উত্তৰ না দিয়ে সিগারেট ধৰলাম। একটা সাধাৰণ গাড়ী সৰ্বত্র আমাদেৱ অনুসৰণ কৱছে এটা ভাবতেই মন শক্ত হয়ে যায়।

সাবিব বসে আছে আমার সামনে। তাৰ ফলো কিশোৱাদেৱ মত মুখে উত্তেজনাৰ ছাপ। কপালে বিদু বিদু ঘাম। চোখ চকচক কৱছে মোখ হয় কেইদেই ফেলবে। সে অনেকখানি খুঁকে এসে বলল, পৃথিবীৰ মানুষ এত সুখী কেন বলুন তো?

সাক্ষিরের সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। আর কখনো সে আমার কাছে আসেনি। হয়ত শরীর খুব বেশি খারাপ ঘর থেকে বেরোতে পারছে ন। কিংবা শিয়েছে বাইরে। কিংবা অন্য কিছু। গিয়ে খেঞ্জ নেবার যত ইচ্ছা কখনো হয়নি।

সাক্ষির আর কখনো আসেনি কিন্তু তার সাদা গাড়িটি ঠিকই অনুসরণ করেছে আমাদের। যখনই নীলু মজ্জার একটা-কিছু কলাছে কিংবা যখনই আমার নীলুর হাত ধরতে ইচ্ছা হয়েছে তখনই বুঝতে পেরেছি বিশাল সাদা গাড়িটা আশেপাশে কোথাও আছে। এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

নীলুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার বিয়ে হয়নি। যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছি সে নীলুর মত নয়। কিন্তু তার জন্যেও আমি প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করি। বাটির রাতে যখন হঠাতে বাতি চলে যায়, বাইরে হাওয়ার মাতামাতি শুরু হয় আমি গভীর আবেগে হাত রাখি তার গায়ে। তখনি মনে হয় কাছেই কোথাও সাদা গাড়িটি বৃষ্টিতে ভিজছে। চশমা পরা অসুস্থ যুবক ভুক্ত কুঁচকে ভাবছে, মানুষ এত সুর্খী কেন?



অসময়

ঘরে চুক্কেই দেখি বসার ঘরের সোফায় হলুদ চাদর গায়ে দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে রগ-উঠা ময়লা পা বের হয়ে আছে। সোফার হাতলে যে গোলাকার দাগ তা এই পা থেকে এসেছে, বলাই বাহল্য। রাগে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। রামাধনে জরী চা বানাচ্ছিল। আমাকে দেখেই হাসিমুখে কলল, চায়ের সঙ্গে কি খাবে? ঘরে কিছুই নেই। লুটি ভেজে দেব?

আমি শুকনো গলায় বললাম, কে এসেছে?

আমি জানি না। যগবাজ্জার থেকে এসে দেখি উনি শুয়ে আছেন। করিম দুরজা শুলে দিয়েছে। তোমার নাকি কি রকম আত্মীয় হন।

অনেকক্ষণ আমার মুখে কোন কথা এল না। দু'দিন পরপর একি যন্ত্রণাগঁত সপ্তাহেই এসেছে দু'জন। এর মধ্যে একজনের আবার ফিরে যাওয়ার ভাড়া ছিল না। তাকে নেতৃত্বেনায় ফিরে যাওয়ার ভাড়া বাবদ ত্রিশ টাকা দিতে হয়েছে। আমার হিসেব করা বেতনে ত্রিশ টাকার দাম আছে। মাসের বিশ তারিখে অফিস থেকে ফিরে নকল প্রক্রিয়ান মেহমানকে দেখলে আমার সঙ্গত কারণেই মন খারাপ হয়।

তুমি হাত-মুখ ধূয়ে বারান্দায় গিয়ে বস। আমি জনিয়ে আসছি।

কতদিন থাকবেন কিছু জ্বানো নাকি?

না। তবে বিছানাপত্র নিয়ে এসেছেন। কাজেই দীর্ঘ পরিকল্পনা থাকা বিচ্ছিন্ন নয়।

জরী মুখ নিচু করে হাসল। এর মধ্যে হাসির কি আছে কে জানে। জরীকে আমি ঠিক
বুঝতে পারি না।

বিয়ের পর থেকেই সে মেহমানদারী করছে। সবই আমার গ্রামের বাড়ির গরীব আত্মীয়-
স্বজন। কেউ চাকরির সঙ্গে, কেউ চিকিৎসার জন্য। আবার কেউ কেউ নিছক বেড়াবার
জন্য। নতুন এয়ারপোর্ট দেখবে, চিড়িয়াখানায় যাবে, শিশুপার্ক যাবে। জরী নির্বিকার। যেন
এইসব ঘামেলা বিচলিত হওয়ার মতো কোন ঘামেলা নয়।

আমি প্রথম-প্রথম ভেবেছিলাম জরীর এই ব্যাপারটি লোক-দেখানো। আমার কাছে
প্রমাণ করতে চাচ্ছ যে সে যদিও অনেক বড়লোকের বাড়ির মেয়ে তবু আমার গরীব
আত্মীয়-স্বজনদের সে মোটেই অবহেলা করে না। এখন বুঝতে পারছি আমার ধূঁণা ঠিক
নয়। কোন-এক বিচিত্র কারণে জরীর মধ্যে বিরক্ত হবার ক্ষমতা গড়ে উঠেনি। আমি যখন
দেখি আমার কোন ফুপাতো ভাই কিংবা খালাতো ভাই কার্পেটের ওপর নাক ঝেড়ে টেবিল
কাঁথে হাত মুছছে তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। অথচ জরীকে দেখি বেশ সহজ এবং
স্বাভাবিক যেন কার্পেটে নাক ঝাড়া তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

বারান্দায় ফুবফুরে হাওয়া। তবু আমার বিরক্ত ভাব কাটিল না। জরী চা নিয়ে আসতেই
বললাম, এই রকম মেহমানদারী করলে তো চলবে না জরী।

যতক্ষণ চলছে চলুক। তুমি চা খেয়ে ভদ্রলোককে ডেকে তুলে আলপ-পরিচয় কর।
রাগ করার কি আছে বল?

রাগ করার কিছু নেই?

উহু।

সময়-অসময় নেই স্পষ্টের স্যাঁগেল পরে মাথায় একটা কাঁঠাল নিয়ে লোকজন আসতে
থাকবে আর আমি গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরবো?

জরী খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন এরকম ঘজার কথা সে বহুদিন শুনেনি। চা
খেতে-খেতেই জানা গেল মেহমানের ঘূম ভেঙেছে এবং মেহমান আমার খোজ করেছেন।
আমি গিয়ে দেখি হাসু চাচা! প্রায় এগারো বছর পরে দেখা। ডান গালে লাল জড়ুল না দেখলে
চিনতেই পারতাম না। কি চেহারা হয়েছে! মাথার চুল উঠে গেছে, সরু-সরু হাত-পা।
আমাকে দেখেই বললেন, বিয়ে করলি, খবর তো দিস নাই।

আপনিও তো আমাকে কোনদিন কোন খবর দেননি চাচা?

তা ঠিক। খুব ঠিক কথা।

আপনার শরীরের একি অবস্থা হয়েছে?

মরণ রোগ। মরবার সময় যে-সব অসুখ-বিসুখ হয় সেইসব। ভবলাম মরবার আগে
একবার দেখে যাই। বৌমাকেও দেখি। বৌমার খুব প্রশংসা শুনি যাকের কাছে।

আমি জরীকে গিয়ে বললাম, ইনি আমাদের হাসু চাচা।

তুমি যার বাড়িতে থেকে মেট্রিক পাস করেছিলে?

ঠ্যা।

এই প্রথমবার দেখলাম মেহমান দেখে বিরক্ত হওনি।

হাসু চাচা না থাকলে আমার পড়াশোনা হত না জরী।

জরী হাসতে হাসতে বলল, পড়াশোনা না হলে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হতো না।
কাজেই আমাদের দুঃজনের দেখা হওয়ার পেছনেও তোমার হাসু চাচা।

রাতে হাসু চাচার অবস্থা খারাপ হল। আকাশ-পাতাল হ্রব' আমাদের পাড়া'র আফজল
ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম রাত এগারোটার ! ডাক্তার বললেন,
এতো সিরিয়াস রোগী হাসপাতালে দিতে হবে।

হাসু চাচা শ্বাস টানতে-টানতে বহু কষ্টে বললেন, হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।
প্রয়োজন নেই বললে তো হবে না। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।

জরী আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, ইনার আর্ট্রীয়-স্বজনদের খবর দেয়া
প্রয়োজন মনে হয়। কেমন করে তাকাছেন দেখো না। তুমি আমার ফুপার কাছেও একবার
যাও। ফুপাকে নিয়ে এসো সঙ্গে করে।

ফুপা অবশ্যি এলেন না। জরীর আর্ট্রীয়-স্বজনরা কেউ কখনো আসেন না আমার
এখানে। তবে তিনি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। রাগী রাগী গলায় বললেন, শুধু-
শুধু বাড়িতে ঝামেলা করবেন না। হাসপাতালে দিন। আমি বলে দেবো ভালো খোজৰ্ববর
করবে।

বাসায় ফিরে দেখি হাসু চাচার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। আমাকে চিনতে পারেন না,
কথা বললে জ্বাব দেন না, মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চারদিকে তাকান।

জরী একবার পানির গ্লাস নিয়ে ঢকতেই অবাক হয়ে ডাকতে লাগলেন, ও মিনু ও মিনু।

জরী ফ্যাকাশে হয়ে বললো, মিনু কে ? আমি বললাম, হাসু চাচার মেয়ে। অনেকদিন
আগে মারা গেছে। হাসু চাচা টেনে টেনে বললেন, ও মিনু ও মিনু, বেটি কাছে আয়। আয় না।

রাত একটার সময় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত দুটা
বেজে গেল। জরী দেখি একা একা জেগে বসে আছে। তার মূখ বক্ষশূণ্য। একদিনের পরিশ্রমে
চোখের নিচে কালি পড়েছে।

অবস্থা কি তাঁর ?

বেশি ভালো না। স্যালাইন দিচ্ছে।

তুমি কি চা খাবে এক কাপ ?

না, এতো রাতে ইচ্ছা করছে না।

খাও না। আমার খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে বসো। আমি নিয়ে
আসছি।

আমরা দুমুক্তে গেলাম প্রায় শেষরাতে। বাতি নিভিয়ে বিছানায় উঠতেই জরী মন্দুরে
বলল, তোমার হাসু চাচার যে একটি মেয়ে ছিল মিনু — এই কথা কিন্তু তুমি আমাকে কখনো
বলোনি।

এটা এমন কোনো দরকারী কথা না জরী।

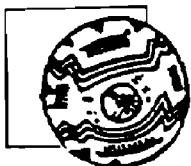
জরী অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর হঠাৎ বলল, মাঝে মাঝে তুমি যখন
আমাকে খুব আদর করো তখন কিন্তু আমাকে 'মিনু' ডাকো।

আমি কোনো জ্বাব দিলাম না। জরী বলল, হাসু চাচার মেয়েটি কখন মারা গিয়েছিল ?

ঝাস নাইনে পড়ার সময়।

মেয়েটি কেমন ছিল দেখতে ?

আমি জরাব দিলাম না । দীর্ঘ সময় চূপ করে থেকে জরী আমার হ্যাত ধরল । ভালোবাসার গাঢ় স্পর্শ । বাইরের অস্পষ্ট আলোয় জরীর মুখ অবিকল সেই বালিকা মিনুর মুখের মতো দেখাতে লাগল । সেই মুখ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ।



পাখির পালক

হ্যালো জরী ?

ইঁয়া ।

কেমন আছ ?

আপনি কে বলছেন ?

আমি একটু থমকে গেলাম । জরী কি সত্যি সত্যি আমরা গলা চিনতে পারছে না ? তা কেমন করে হয় ?

হ্যালো, কথা বলছেন না যে ? কে আপনি ?

আমি । আমি আনিস ।

ও, তাই বলুন । আপনার কি ঠাণ্ডা লেগেছে ?

না তো ।

গলার স্বর ভারী ।

আমি ছোটু একটি নিষ্পাস গোপন করলাম । আমার গলার স্বর ঠিকই থাকে কিন্তু জরীর কাছে কখনো মনে হয় ভারী, কখনো ভাঙ্গা ভাঙ্গা । কোনদিন চিনতে পারে না ।

হ্যালো জরী, তুমি কী আজ বাসায় থাকবে ?

কখন বলুন তো ?

এই ধর বিকেলে ?

উঞ্চ, বিকেলে থাকব না । কেন ?

একটু দরকার ছিল । সঙ্ক্ষ্যাবেলো থাকবে ?

না, সঙ্ক্ষ্যাবেলো জুনু খালাদের বাসায় যাব ।

কখন ফিরবে ?

তা কি করে বলব ? জুনু খালা কি সহজে ছাড়বে । রাতে হ্যাত ফিরবেই না ।

জরী খিলখিল করে হাসল । যেন রাতে না ফেরার প্রেক্ষিকটা হাসি-ভাষণার ব্যাপার ।

হ্যালো আনিস ভাই, একটু ধরন তো, যে ধৈর্য আমাকে ডাকছে । আসছি এক্ষুণি ।

আমি টেলিফোন কানে লাগিয়ে বসে রহলাম । গ্রীন ফার্মেসীর ছেলেটা আড়চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে । তার মুখে বিরক্তির রেখা গাঢ় হতে শুরু করেছে । সে পঙ্ক্তীর স্বরে

কলন, কতক্ষণ ফোন ধরে বসে থাকবেন? ইম্পটেট কল-টল আসতে পারে। লাইন আটকে রাখলে চলে নাকি?

এই যে ভাই একটু।

একটু একটু করে তো এক ঘণ্টা নিয়ে নিলেন।

আমি না শোনাব ভাব করে সামান্য ঘূরে দাঢ়ালাম। লাইনের ও-পাশ থেকে কোন সাড়-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথম কিছুক্ষণ পৌঁ-পৌঁ শব্দ হচ্ছিল। এখন তাও নেই। চারদিকে অশ্ব নীরবতা। জরী নিশ্চয়ই ভূলে বসে আছে। জরীর মা হয়তো রিসিভার উঠিয়ে রেখেছেন। ঘণ্টা খানেক পর আবার করলে কেমন হয়?

কি রে ভাই, আপনার হয়েছে না কানে নিয়ে আরো খানিকক্ষণ বসে থাকবেন?

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। একটা ঘয়লা এক টার্কার নেটও বাড়িয়ে দিলাম। পয়সা দিয়ে ফোন করি, তবু এমন যন্ত্রণা। ইচ্ছা করছিল একটা চড় দিয়ে ছেলেটার মুখে আঙুলের দাগ বসিয়ে দেই — হারামজাদা ছেটলোক। কিন্তু সে বকম কিছুই করি না। সারা মুখে একটা তেলতেলে ভাব এনে নরম সুবে বলি, বিজ্ঞনেস কেমন? সে জবাব দেয় না।

মিন, একটা সিগারেট মিন।

সে নিতান্ত অবহেলায় সিগারেট ধরায়। আমার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। রহমানকে বলে এই শালাকে একটা ধোলাই দিয়ে দিলে কেমন হয়? শালা হারায়।

আজ আমার কিছু করবার নেই। কোনদিনই অবশ্যি থাকে না। তবে আজ আমি বিশেষ রকম ফ্রি। বাজার করতে যেতে হয়নি। বাবা বাজারে গিয়েছেন। তিনি সপ্তাহে দু'দিন বাজারে যান। আজ হচ্ছে সেই দু'দিনের একদিন। আজ তিনি দুপুর পর্যন্ত মাছের বাজারে ঘুরবেন। অসংখ্য মাছ টিপে টিপে দেখবেন এবং শেষ পর্যন্ত কিছু পচা মাছ কিনে অঙ্ককার মুখে বাড়ি ফিরবেন। লেবু পাতা দিয়ে সেই মাছ রাখা হবে। বাড়িওয়ালার একটি লেবু গাছ আছে। তার পাতাগুলি আমরা পচা মাছ দিয়ে কৃত খেয়ে ফেলছি। সেদিন বাড়িওয়ালার মেয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছে, একি গোটা গাছটাই দেখি মুড়িয়ে ফেলেছে। এখন খেকে কেউ গাছে হাত দিতে পারবে না। এইসব সহজ হবে না। গাছ তোলা সহজ ঝামেলা?

বাড়িওয়ালার এই মেয়েটা দারুণ ক্যাটক্যাট করে। মেয়েটার অনেক বয়স। কিন্তু যোগা এবং বেঁটে বলে বয়সটা চোখে পড়ে না। মেয়েটির দাঁত ভাসা তবে গায়ের রং দারুণ ফস্তু। ফস্তু রঙের যে কোন মেয়ে দেখলেই আমার মা মনে মনে সেই মেয়ের সঙ্গে আমার স্বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। এবং মা'র চোখে তার নানা রকম গুণাবলী ধৰা পড়তে থাকে। এই পুরুষালী মেয়েটি সম্পর্কে মা'র মন্তব্য হচ্ছে — বড় তেজী মেয়ে। আজকাল মুগ তেজী মেয়েই দরকার, পুতু পুতু মেয়ে দিয়ে কাজ হয় না। আর চুল দেখেছিস? শুচু পর্যন্ত। একবার চুল বাধতেই এই মেয়ের আধা সের তেল লাগে।

বাড়িওয়ালার এই মেয়েটির সঙ্গে আমার কোন কথাবাণী হয় না। সে আমাকে বখা ছেলে হিসেবে জানে। চোখে চোখ পড়লেই সে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। অধি গায়ে মাথি না। এই মুগে কোন কিছু গায়ে চুপ্পাপে নেই। এটা হচ্ছে গায়ে না-মাথার মুগ। সফিকের ভাষায়, “মুমে লাখ মার ফিল ভি হাস্স সি।” সে ইসামীং উর্দুতে বাতচিত করছে।

কখন যে পাবলিকেব হাতে ঘাবে। দিনকাল খাবাপ। পাবলিক আজকাল সহজেই চেতে যায়।

আমি মতিঝিলেব দিকে রওনা হলাম। গন্তব্য জলীলের অফিস। সেখান থেকেই জরীকে আবার একটা ফোন করা যাবে। বাসে গাদাগাদি ভীড়। সবগুলি মানবের গা থেকে ঘামেব গন্ধ আসছে। হানড়েড হস্ত পায়োরেব গন্ধ। যাথা বিমুক্তি করে। তবু তাব মধ্যেই জরীব সঙ্গেব কথাবার্তাগুলি বিহার্সেল দিষ্টে রাখলাম।

হ্যালো জরী ?

হ্যা, ইশ টেলিফোন রেখে দিয়েছিলেন কেন? আমরা যা বাগ লাগছিল।
লাইনটা হঠাতে করে কেটে গেল।

আমি তখন থেকে ফোনের সামনে বসে আছি।
সে কি? কোথায় যে যাবার কথা ছিল। যাওনি?
যাব কিভাবে? আপনি যদি ফোন করেন।
শোন জরী, হ্যালো।
বলুন, শুনছি।

আমার পাশের লোকটি হঠাতে করেই তাব কোঘৰ ঝাকুনি দিল। কাঞ্চনিক ফোনের কথাবার্তা থেমে গেল। জরীব সঙ্গে কথাবার্তা বলাব সময় আমার মনটা অস্বাভাবিক তরল অবস্থায় থাকে বলে আমি কিছুই বললাম না। তবে আমার পাশের রোগামত লোকটি ঠাণ্ডা গলায় বলল, “ভাইজ্ঞান, আপনার পাছটা সামলে রাখেন। বেশী নড়াচড়া করছে।” পাছ নাড়ানো লোকটি চোখ লাল করে তাকাল। লোকটি বিশাল। সে থমথমে স্বরে বলল, কী কইলেন?

শুনলেন তো কি বললাম। পাছা সামলান।
খবর্দার।

কাকে খবর্দার বলেন? ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব, বুঝলেন? এটা পাবলিক বাস। আপনার মামার গাড়ি না।

পাছ দুলানো লোকটি থমকে গেল। রোগা লোকটির সাহসের তারিফ করতে হয়। মুক্তিযোদ্ধা ছিল বোধহয়। আমি একটু সরে গিয়ে ওদের জ্যাগা করে দিলাম। বোষাপ্টা করতে চাইলে করুক। কিন্তু মোটা লোকটি ভড়কে গেছে। লোকটির দেহটাই বিশাল, সাহস নেই। সে প্রেসক্রুবে অন্য একজনের পা মাড়িয়ে নেমে গেল।

জলীল অফিসেই ছিল। সাধাৰণত থাকে না। এটা তাব নিজেৰ অফিস। নিজেৰ অফিসে না থাকলে কিছু যায় আসে না। জলীল আমাকে দেখেই জু কুচক্কল। এজ সে নতুন শিখেছে। পহিসা হবাব পৱ মানুষ যে জিনিসটা প্ৰথম শিখে তা হচ্ছে জু কুচক্কলনো। তাৰপৱ শিখে ঝাঁধ ঝাঁকানো। জলীল কঁধও ঝাঁকাল। এটা বিশেষ ভাল হল না। পঠকমত শিখে উঠতে পাৰেনি বোধ হয়।

কি বে, তুই কি মনে করে?

আসলাম।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। চাস কি?

Bangla
Book
Collection

চাই না কিছু।

টাকা-পয়সা চাইলে পাবি না। বক্সু-বাঙ্গবন্দের ধার দেয়া বক্স করে দিয়েছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। এদিন শফিক এসে দুশ্শ টাকা নিয়ে গেল। না দিয়ে পারলাম না, খুব ঝোলাযুলি।
দিয়ে ভালই করেছিস।

আর ভাল ক্ষেত্রে পয়সা কী আর ফেরত পাব? জলে গেছে।

এত পয়সা তোর। ঘাক না কিছু জলে।

জলীল খুশী হল। এই প্রথম তার মুখে হাসির একটা আভাস দেখলাম। জলীলকে খুশী
করবার সবচে' ভাল বৃদ্ধি হচ্ছে ওর টাকা-পয়সা নিয়ে কথা বলা।

কী লাল হয়ে যাচ্ছিস?

দূর, কি যে বলিস। বহু কষ্টে পাঁচ লাখ টাকার একটা কাজ ম্যানেজ করেছি। একটা
কালভার্ট। তবে মারজিন থাকবে না। মানান লোকদের খাওয়াতে হবে।

শালা তুইই উঠে গেলি আমাদের মধ্যে।

উঠে গেল কথাটা ঠিক না। জলীল বরাবর উঠেই ছিল। তাদের দুপুরক্ষের ব্যবসা। ইটের
ব্যবসা। তিন-চারটা নাকি ত্রিক ফিল্ড আছে। ব্যবসাদারের ছেলেপুলেরাও পড়াশোনা করে।
এবং দেখা গেল ভালই করে। এম.এ-তে দিবিয় সেকেণ্ড ফ্লাস ম্যানেজ করে ফেলল। তারপর
একদিন শুনলাম বিজ্ঞনেস শুরু করেছে। মতিখিলে অফিস। শফিককে নিয়ে দেখতে এলাম।
তেমন কিছু না। যয়লা যয়লা আসবাব। সোফার গদি ছেঁড়া। একটা স্টেনো আছে, শাকচূমীর
মত দেখতে। কথা বলে নাকে। তবে জলীল জমিয়ে ফেলল। ওদের রক্তের মধ্যে ব্যবসা। ধাই
ধাই করে উঠে গেল। শাকচূমীর মত স্টেনোটা পর্যন্ত সুন্দর হয়ে গেল। শফিক একদিন বলেই
ফেলল, বেটি দেখতে থারাপ না। লদকা লদকি করব? প্রথম লদকা লদকি তারপর হাম
তোম। তবে স্টেনোটা আমাদের মোটেই পাঞ্জা দিল না। তার বড় সাহেবের আমরা হচ্ছি
বোসম ফ্রেণ্ড। তাতে তার কোন মাখাব্যথা নেই। চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত। শালী।

জলীল বলল, চা টা কিছু খাবি?

দিতে বল।

নাকি কফি দিতে বলবো? ভাল কফি আছে।

শালা কফি ধরেছিস নাকি?

ধরতে হয়। মানান ধরনের লোকজন আসে। বাংলাদেশে ব্যবসা করা মুশকিল আছে।

মুশকিল থাকবেই। মাগনা কেউ পয়সা দিবে নাকি?

জলীল সিগারেট বের করে ধরাল। দায়ী জিনিস। কিন্তু প্যারেচেজ আমার দিকে বাঢ়াল
না। ইচ্ছা হলে তুলে নিতে পার এই ভাব। নিজ থেকে দেবে না। ইংগিতও করবে না। এই
কায়দাটিও সে নতুন শিখেছে। ইউনিভার্সিটিতে দেদার বিজ্ঞাতো। তার সঙ্গে আমাদের
খাতিরের মূল কারণই ছিল ফ্রি সিগারেট।

কফি চলে এল। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে ওয়েস্টার্নেট থেকে সিগারেট নিলাম। জলীল
গম্ভীর হয়ে বলল, করছিস কি এখন?

কিছু করছি না।

না করলে হবে নাকি ? কিছু-একটাতে লেগে পর।

দেখি।

দেখতে দেখতে তো চূল পাকিয়ে ফেলছিস। পাবলিক ওয়ার্কসেব এই চাকাবিট' কি হল ?
হয় নাই ?

এটাতে আমার ইন্টারেস্ট নই। বোগাস জিনিস

বোগাস কেন ?

আমি জ্বাব না দিয়ে কলাম, একটা টেলিফোন করব। জলিল সঙ্গে সঙ্গে মুখ অঙ্ককার
করে ফেলল।

আমার এখানে যেই আসে তাই দেখি টেলিফোন করা লাগে। এইদিন শফিক এসে
চিটাগং-এ কল করল। এটা কি টেলিফোন এক্সচেণ্ড নাকি ?

পয়সা দেব শালা। মাগনা করব না।

পয়সার গাছ হয়েছে তো তোব। কোথায় করবি ? সেই তোর জরিনা না কি যেন — তার
কাছেই নাকি ?

আমি জ্বাব দিলাম না।

কেন খামাখা ঝুলাঝুলি করছিস। এই মেয়ে তোর সাথে ভিড়বে নাকি ? শুধু খেলাবে।
বুঝলি কি করে খেলাবে ?

এসব বোঝা যায়।

জলীল হাই তুলল। শালা হামবাগ দুটা পয়সা হাতে আসতেই সব কিছু বুঝে ফেলছে।
জলীল বলল, এসব চিন্তা বাদ দে। চোখ বুজে কোন-একটা কিছুতে লেগে পর। বিজনেস
করতে চাস তো সুযোগ সঞ্চান দিতে পারি।

চূপ থাক। বিজনেস আমি করব না। ছেটলোকের কাজ। এসব পোষায় না।

জলীল মুখ কালো করে ফেলল। ব্যাটাকে আরেকটু ঘায়েল করবার জন্যে আমি সক
গলায় বললাম, বিজনেসওয়ালাকে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দেয় না। মেয়ের বাপ মেয়ে দেয়
না। বাংলাদেশে বিজনেসম্যানরা হচ্ছে শিডিউল কাস্ট। কই দেখি টেলিফোনটা। জলীল ফোন
এগিয়ে দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল। তার মুখ কালো। আমি তাব আঁতে ঘা দিয়েছি।
নীলুফার নামের একটি মেয়ের প্রতি তার কিছু বস সঞ্চার হয়েছিল। মেয়ের বাবা রাজি হননি।
সোজা বলে দিয়েছেন — বিজনেসম্যানের কাছে মেয়ে দিব না। মাসখানেক জলীল শুব গন্তীর
ছিল। অফিসে গেলে কথা বলতো না। চা খাওয়াতে বললে বলতো — চা হ্যার্ব, চিনি নেই।
খসকরকে একদিন তো চূড়ান্ত অপমান করল। খসক ঘরে ফিরবার জন্মে দৃষ্টা টাকা চেয়েছিল
রিকশা ভাড়া। জলীল বলেছে, হেঁটে হেঁটে বাড়ি যা। ভিক্ষার পয়সায় রিকশা চাপতে লজ্জা
লাগে না ?

ভিক্ষা কোথায় ? ফিরত দেব।

বড় বড় বাত দিয়ে লাত নাই। ফিরত দেবার যুদ্ধ জেব নেই।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। ভিক্ষাই করবি সারা জীবন। ভিক্ষা করবি আর ভিক্ষার পয়সায় রিকশা চড়বি।
তোদের আমার চেনা আছে।

মুখ সামলে কথা বল শালা। একটা ফটো নাইন বসিয়ে দেব মুখে।
সেটা পাবলেও তো কাজ হতো। সেটাও পারবি না। চোটপট যা করবার মুখেই করবি।
তোদের আমি চিনি।

সহজেই লাইন পাওয়া গেল। আমি বললাম, হ্যালো জরী?
হ্যা। কে কথা বলছেন?
আমি, আমি আনিস।
মুখতে পারছি। কিছু বলবেন?
তুমি আমাকে টেলিফোন ধরিয়ে রেখে কোথায় গেলে, তারপর আর এলে না।
ওয়া কখন?
আমি ছেট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। সত্যি কি তার মনে নেই? না ইচ্ছা করে ভান
করছে। জরী ভান করার মেয়ে নয়।
হ্যালো জরী?
বলুন।
তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।
কথা থাকলে বলুন। শুনছি।
টেলিফোনে বলা যাবে না।
এমন কি কথা যা টেলিফোনে বলা যাবে না?
আমি সামনা-সামনি বলতে চাই। কবে তুমি ফ্রি থাকবে বল তো।
আমি ফ্রি নেই। বাড়ি ভর্তি মেহমান, নানান ঝামেলা। এদিকে সামনের সপ্তাহে নেপাল
যাচ্ছি।
কোথায় যাচ্ছ?
নেপাল। দুলাভাই নিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে কথা ছিল কস্তুরাজার যাব। পরে হিসাব করে
দেখলাম কস্তুরাজার যেতে যে খরচ নেপাল যেতেও একই খরচ। শেষে নেপাল যাওয়া ঠিক
হল।

কতদিন থাকবে?
বেশীদিন থাকা যাবে না। এক সপ্তাহ। ওখানে থাকার খরচ খুব বেশী। টুরিস্ট স্টেট তো।
আমেরিকানরা এসে এসে সব জিনিসের দাম বাড়িয়ে ফেলেছে। আচ্ছা রাখ।
হ্যালো জরী?
বলুন। একটু তাড়াতাড়ি বলুন, যা আমাকে ডাকছে। হ্যালো, কেমন কি বলবেন। হ্যালো।
আমি কিছু বললাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে বলার কিছু প্রাণ্য গেল না। জলীল বলল, কী
কথা শেষ?

ই।

আমি টেলিফোন রাখতেই জলীল বিরস মুখ্যমন্ত্রী, কি করবি এখন? বাড়ি যাবি?

ই।

আমি উঠে পড়লাম। জলীল বলল, চল নিউ মার্কেট পর্যন্ত লিফট দেই। সোবাহান, গাড়ি

বের কৰতে বল তো।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

গাড়ি কিনেছিস নাকি ?

এখনো পুরোপুরি কিনিনি। ট্রায়াল দিয়ে দেখছি। এক সপ্তাহের অন্তে ট্রায়াল দিতে এনেছি। তবে বোধ হয় কিনব।

দাম কত ?

এক লাখ চায়। পুরানো গাড়ি, কিছু কমাবে। আমি সম্ভবে আছি। এর বেশী হলে — নো। খুব টাইট অবস্থা আমার।

জলীল আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। গাড়িতে উঠে নিজ খেকেই সিগারেটের প্যাকেট বাঢ়িয়ে দিল।

দেখিস ভাই গাড়িতে ছাই ফেলিস না। একটু টিপ্পটপ কঙিশনে রাখতে চাই। দেখ, হাতলের কাছে ছাইদান আছে।

আমি খুব সাধারণে ছাইদানে ছাই ফেলতে লাগলাম। জলীল গঞ্জীর গলায় বলল, সোবাহান সরোদটা দাও তো।

দাকুণ আরামের গাড়ি। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। জলীল বলল, কালারটা কেমন দেখছিস ? সোবার না ?

হ্য। খুব সোবার।

আরেকটা পেয়েছিলাম লাল। লাল আমার পছন্দ না। এত দাম দিয়ে একটা জিনিস কিনব, কি বলিস ?

তা তো ঠিকই।

এই লাইনে গাড়িটা হচ্ছে একটা নেসিসিটি। নানান ধরনের পার্টির কাছে যেতে হয়। সব জায়গায় বিকশা চেপে গেলে মান থাকে না।

তা তো ঠিকই। তুমি এখন মানী লোক।

ঠাট্টা করছিস নাকি ?

না ঠাট্টা করব কেন ?

সরোদ কেমন লাগছে ?

ভালই।

ভাল বললে হয় না। বুঝলি ক্লাসিক জিনিস।

হ্য।

নে নে আরেকটা সিগারেট নে।

থাক। এই থাত তো খেলাম।

তাহলে রেখে দে একটা। ভাত খাওয়ার পর খাস।

জলীল আমাকে যথেষ্ট খাতির করল। বাসার সামল এন্ড নামিয়ে দিল।

খেতে বসে দেখি বাবা আজ ভালই বাজারে আবেছেন। মাছ পচা নয়। টিটিকা সরপুটি। মা হাসিমুখে বললেন, বাজারে আজ মাছ সন্তা গেছে।

তাই নাকি ?

ঁ। খুব সন্তা।

বাবা আজ অফিসে যাননি দেখলাম।

তার শরীরটা ভাল না।

কি হয়েছে ?

বুকে নাকি ব্যথা করছে। শুয়ে আছেন। বয়স হয়েছে তো।

দুপুরে খাওয়াটা ভালই হল। তবে বেচারা বাবা খেতে পারলেন না। বিছানায় উঁৰু হয়ে শুয়ে রইলেন। মা বললেন, বিকালে তোর বাবাকে ফগবাজারে নিয়ে যাস।

ঠিক আছে। নিয়ে যাব।

ফগবাজারে আমার এক মামা থাকেন। ডাক্তার। বিনা পয়সায় আমাদের চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা ভালই করেন। রোগ সাবে।

পান খাবি ?

দাও একটা।

মা পান এনে দিলেন। তাকে হাসি-শুশীই মনে হল। তিনি বিছানায় পা উঠিয়ে বসলেন, বাড়িউলীর বড় এসেছিলো আজকে, বুঝলি।

কেন ?

নানান গল্প-গুজ্জব করল। শেষে বলল আমার মেয়েটার জন্যে একটা ছেলে দেখেন না আপা। ভাল পরিবারের শিক্ষিত ছেলে হলেই হবে। চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা কিছু ব্যবস্থা আবরাই করব। মজুরটা তোর দিকে বুঝলি তো !

তুমি কি বললে ?

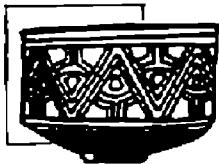
আমি কিছু বলি নাই। আগ বাড়িয়ে কিছু বললে ভাববে আমাদের গরজ। কি দরকার।

আমি চূপ করে রইলাম। মা বললেন, কথায় কথায় আবার শুনিয়ে দিল মেয়ের নামে পঁচিশ হাজার টাকা জমা আছে। তা আছে ঠিকই। টাকার কুমীর।

মা তঃপুরি হাসি হাসলেন। আমি বারান্দায় গিয়ে জলীলের সিগারেটটা ধরালাম। খাবার পর একটা দায়ী সিগারেট বেশ লাগে। মনের মধ্যে অনেক উচ্চ শ্রেণীর ভাব আসে।

বাড়িওয়ালার মেয়েটা বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছে। দূর থেকে তার ফসো হাত দেখা যাচ্ছে। চুলগুলি ছাড়া। মা ঠিকই বলেছেন লম্বা চুল মেয়েটির। জরীর চুলও লম্বা ? আমি কখনো লক্ষ্য করিনি। জরীর মত মেয়েদের কখনো খুঁটিয়ে দেখা যায় না। এদের সঙ্গে দেখা হয় স্বপ্নে। স্বপ্ন সব সময়ই অস্পষ্ট।

BanglaBook.org



বেবি রুম্ব

আমার পাশের ঘরের বাসিন্দা —সন্তুর বছরের বুড়ি, এলিজাবেথ এগুয়াসন একটা সাপ কিনে এনেছে। সে নাকি পূৰ্বে। প্রথমে খবরটা বিশ্বাস করিনি — বুড়ির ঘরে দুক্তেই দেখি সত্য সত্যই সাপ। চোকো ধরনের কাচের বাল্লো অজগর সাপের মত দেখতে প্রকাণ্ড এক সাপ কৃগুলী পাকিয়ে আছে। আমেরিকানদের কোন কাওকারখানায় অবাক হব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সিদ্ধান্ত ভুলে হতভন্দ্য হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

বুড়ি হাসিমুখে বলল, কত দিয়ে কিনেছি বল তো?

আমি শীতল গলায় বললাম, এই সাপ তুমি কিনে এনেছ?

‘হ্যা, বিনে পয়সায় আমাকে কে দেবে?’

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। পাশের ঘরে অজগর সাপ বাস করবে ভাবতেই বুক শুকিয়ে আসছে, একি যন্ত্রণায় পড়লাম।

‘আহমেদ, তুমি কি ভয় পাছ?’

‘ভয় না পাওয়ার কোন কারণ আছে কি?’

‘অবশ্যই আছে। নির্বিষ সাপ। তুমি ওর গায়ে হাত দাও — দেখবে কিছুই করবে না। ওর স্বত্ত্ব-চরিত্র শান্ত ধরনের। দাও, গায়ে হাত দাও।’

আমি শুকনো গলায় বললাম, তুমি কিছু মনে করো না, সাপের গায়ে হাত দিতে আমার ইচ্ছা করছে না।

বুড়ি উজ্জ্বল চোখে বলল, কত সন্তায় কিনলাম তোমাকে বলি। মাত্র কুড়ি ডলার। অবশ্য এই কুড়ি ডলারে কাচের বাল্লো পড়ছে না। বাল্লো ফেরত দিতে হবে।

‘বাল্লো ফেরত দিলে সাপ রাখবে কোথায়?’

‘পোষা সাপ তো, ঘুরেফিরে বেড়াবে।’

‘বল কি?’

আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেল। কি সর্বনাশের কথা! আমি শুকনো গলায় বললাম, বাড়িওয়ালী কি তোমাকে সাপ পুষতে দেবে?

অবশ্যই দেবে। তার সঙ্গে কুমিং হাউস ভাড়া নেবার সময় কে কল্টাস্ট হয়েছিল তাতে কোথাও লেখা নেই — সাপ পোষা যাবে না।’

‘তাই বুঝি?’

‘হ্যা, তাই। তোমরা তো কল্টাস্টে কি লেখা আছে না পড়েই সই দিয়ে দাও। ভালমত

পড়ে ভারপর সই দিতে হয়। ধর, এখন তুমি যদি সাপের ভয়ে বাঢ়ি ছেড়ে দিতে চাও — তোমাকে ছামসের ভাড়া পেন্টিং হিসেবে দিতে হবে।'

'এই কথা লেখা আছে?'

'অবশ্যই লেখা আছে। ছপ্পয়েন্টের টাইপে লেখা। চোখে না পড়ার মত।'

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া ছাড়া আমার গতি রইল না। ক্যাম্পাসের কাছে এবং অসম্ভব সম্ভাৱ দেখে এই কুমিৎ হাউসে থাকছি। একজলায় বাড়িওয়ালী, দোজলার পাঁচটি কুমে আমরা পীচজন। শুধু শোবার ব্যবস্থা। রাঙ্গার ব্যবস্থা নেই। খাওয়া-দাওয়া সেৱে রাতে এসে ঘূমিষ্ঠে থাকা। এর নাম — কুমিৎ হাউস।

আমি থাকি বাথরুমের মুখোমুখি ঘরে। আমার পাশের ঘরে থাকে ভারতীয় ছাত্র অনন্ত নাগ। একটা করিডোরের মত আছে। করিডোরের ওপাশে ফিলিপিনো ছাত্রী তোহা। অসম্ভব কৃপবর্তী। তার দিকে তাকালে আপনা থেকেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠে আসে। তোহার পাশের কামরায় থাকে কোরিয়ান ছাত্র হান। ইয়েস এবং নো ছাড়া অন্য কোন ইংরেজী শব্দ সে গত ছামসে শিখতে পারেনি — এরকম ধারণা প্রচলিত আছে। হানের মুখোমুখি ঘরটায় এলিজাবেথের বাস। এতদিন এলিজাবেথ একাই থাকত। এখন এলিজাবেথের সঙ্গে থাকবে প্রকাণ্ড এক সাপ, যার নাম মেরিকান পাইথন।

বিপজ্জনক জীবজন্তু পোষার ব্যাপারে আমেরিকানদের নাম-ডাক আছে। এদেশে বেশকিছু মানুষ আছে যারা কাচের বোতলে ব্লাক উইডো মাকড়সা পুষে। এই মাকড়সাগুলো ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। মানুষকে কামড়ানো মানেই মৃত্যু। যারা এদের পুষে তাদের ঝুঁকের মত আছে — ব্ল্যাক উইডো ঝুঁক। সেই ঝুঁক থেকে নিয়মিত পত্রিকা বের হয়। অনেকের আছে বিষাক্ত সাপ পোষার হবি। কুমির পোষা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কবে যেন পত্রিকায় পড়লাম পোষা কুমির কামড়ে ঠ্যাং খেয়ে ফেলেছে। আমেরিকান ছেটি-বড় সব শহরেই 'পেট হাউস' আছে, যেখানে তক্ক থেকে শুরু করে মাকড়সা পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায়।

বুড়ি সাপ কিনে আনার পর কুমিৎ হাউসের সদস্যদের মধ্যে বিশাদের ছায়া নেমে এল। কেউ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারছে না আবার থাকতেও ভরসা পাচ্ছে না। প্রথম রাতে আমার এক ফেঁটা ঘূম হল না। এদেশে মশারি বলে কিছু নেই। মশারি থাকলে মশারি ফেলে থাবিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করতাম। সারারাত বিছানায় বসে পার করে দিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, এই বুধি মেরিকান পাইথন গা বেয়ে উঠে আসছে।

দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। ফিলিপিনো তরুণী তোহা বাথরুম থেকে নেমিয়ে কি যেন বলতে লাগল। তার নিজস্ব টেগালোগ ভাষা, আমরা কিছুই বুঝছি না। তার চিৎকারের ধ্রুন দেখে মনে হচ্ছে — বাবাবে, মাবে, খেয়ে ফেলল বে। দরজা ভেঙে ভেঙে ঢোকা হবে কিমা যখন ভাবা হচ্ছে তখন তোহা নিজেই দরজা খুলে ঝড়ের বেগে বের হয়ে এল। গায়ে কাপড়ের বৎশও নেই। তোহা হড়বড় করে বলল, সে শাওয়ার বেয়ের জন্যে বাথটাবে নেমেই দেখে পানিতে গা ডুবিয়ে মেরিকান পাইথন শুরু আচ্ছ।

অনন্ত নাগ দাঁত বের করে বলল, দয়া করে ঘটনাটি আরেকবার বল। কাপড় পরাব জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। বিনা কাপড়েই তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে। আমার কথা বিশ্বাস

না হলে অন্যদের জিজ্ঞেস কর। তোহা একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সম্বিত ফিরে পেয়ে ছুটে নিজের ঘরে দুকে দুবজা কর্ক করে দিল। অনস্ত নাগ বলল, ঘরে একটা সাপ থাকা নেহায়েত মন্দ না। কি বল শোমরা? সাপ না থাকলে এই জিনিস দেখতে পেতে?

আমাদের দিন এবং রাত কাটতে লাগল দুঃস্বপ্নের মধ্যে। সাপটাকে অস্তুত অস্তুত জ্ঞায়ন্ত্র পাওয়া যেতে লাগল। হান একদিন ওভারফোট গায়ে দিয়ে আফনার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে — হঠাৎ তার মনে হল, গা বেয়ে হড়হড় করে কি ঘেন নেমে যাচ্ছে।

অনস্ত নাগ এক বাতে জেগে ওঠে দেখে, সে কোল বালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছে। তার হঠাৎ মনে হল, আমেরিকায় তো কোল বালিশ থাকার কথা না, তারপরই তার বিকট চিৎকার শোনা যেতে লাগল।

আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, একমাত্র এলিজাবেথেরই কোন বিকার নেই। সাপ ষতই যত্নে করে সে ততই মধুর ভঙ্গিতে বলে — মাই নটি গার্ল। মাই নটি গার্ল। নটি গার্ল বলার কারণ — সাপটি স্ত্রী জাতীয়।

বুড়ি তার নটি গার্ল নিয়ে নানান ধরনের আহলাদিও করতে লাগল। সেই আহলাদির একটা নমুনা হচ্ছে ইনস্যুকেস। সাপের জন্যেও যে ইনস্যুকেস কিনতে পাওয়া যায় তা আমাদের জানা ছিল না। এই বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব।

আমি ঠিক করে ফেললাম, ছামাসের পেনাস্টি দিতে হলেও আমি এই কুমিং হাউসে থাকব না। সারাঙ্গ আতঙ্কের মধ্যে বাস করা যায় না। অনস্ত নাগ এবং হানেরও একই মত। শুধু তোহা বলল, সাপটা বড় হলেও তার মুখটা ছোট। সেই মুখে সাপটা তাকে শিলে খেতে পারবে না। কাজেই অসুবিধা কি, ধাক্কুক না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে মাস্থানিক যেতেই আমাদেরও তোহার যতই মনে হতে লাগল — সাপ এমন তয়াবহ কিছু না। বরং প্রাণী হিসেবে বেশ মজার।

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মন্ত্রিক অতি ক্ষুদ্র হয়। সে কারণে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নপর্যায়ের হওয়ারই কথা। দেখা গেল আমাদের এই সাপের বুদ্ধিবৃত্তি বেশ উচ্চপর্যায়ের। সে তিভি দেখে। আমাদের মধ্যে একমাত্র তোহার ঘরেই তিভি আছে। তিভি অন করামাত্র মেঝিকান পাইথন উপস্থিত হয়। সুবিধামত একটা জ্ঞান্যা দেখে সেখানে কুঙ্গলী পাকিয়ে শুয়ে থাক। যতক্ষণ তিভি চলে ততক্ষণ সেখান থেকে নড়ে না। তোহার ধারণা, তিভির কিছু বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রাম যেমন ‘বানি মিলার’, ‘যি ইজ কোম্পানি’ তার খুব পছন্দ। এই সময় তাকে বেশ উপস্থিত মনে হয়। ফোস ফোস জাতীয় শব্দ করতে থাকে।

এলিজাবেথ তার পোষা সাপের নাম রাখল কৃত্তি। কৃত্তি বলে ডাকিল সে অবশ্য ছুটে উপস্থিত হয় না, তবে মেঝেতে আঁশুল দিয়ে কয়েকবার টোকা দিলেই ছুটে আসে।

কৃত্তির রসবোধ বেশ প্রশঁর বলেই আমাদের মনে হল, তার রসবোধের উদাহরণ না দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। ধরা যাক, বাইরের কোন গেস্ট এসেছে, পা নামিয়ে বসে জমিয়ে গল্প করছে। কৃত্তি তার নজর এড়িয়ে ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হবে। তার পায়ের কাছে এসে হঠাৎ নিয়মের মধ্যে গেস্ট বেচারার দুশ্মানের শরীর দিয়ে জড়িয়ে ফেলবে। গেস্ট বেচারা ভয়ে-আতঙ্কে যতই চেঁচাবে আমরা ততই হেসে এ গুর গায়ে গড়িয়ে পড়ব।

অন্যান্য প্রাণী পোষার চেয়ে সাপ পোষার বক্ষাটি অনেক কম — এ সত্যও সহজেই টের

পেলাম। তাকে খাওয়ানোর যত্নগা নেই। সপ্তাহে একদিন সে একটি ইন্দুর থায়। সে ইন্দুর আমাদের খাওয়াতে হয় না। আমরা তাকে ‘পেট-সপে’ নিয়ে ষাট। পেট-সপের কর্মচারিবা খাইয়ে দেয়। বিনিময়ে এক ডলার দিতে হয়। চমৎকার ব্যবস্থা।

শ্রীং কোয়ার্টার শেষ হবার আগে আগে কখ উধও হয়ে গেল। আমরা খোজাখুঁজির চূড়ান্ত করলাম — লাভ হল না। কুমিং হাউসের সদস্যদের যে কি পরিমাণ মন খারাপ হল বলার না। সবচেয়ে মন খারাপ করল তোহা। প্রায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেয়ার মত অবস্থা। সে শির্জায় মোম ঝালিয়ে এল। কখ ফিরল না।

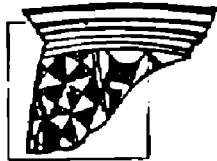
কখের উপস্থিতিতে যেমন অভ্যন্তর হয়েছিলাম অনুপস্থিতিতেও একসময় অভ্যন্তর হয়ে গেলাম। কুমিং হাউসের সদস্যদের মধ্যে হান চলে গেল নিজের দেশে। হানের জাষগায় থাকতে এল আমেরিকান ছাত্র কর্ল। তোহা এক আমেরিকান কোটিপতিকে বিয়ে করে চলে গেল আটলান্টায়। দিন আগের মতই কাটিতে লাগল। বৃত্তি এলিজাবেথ ব্যাঞ্জো নামের একটা বাদ্যযন্ত্র কিনে নিয়ে এল। সময়ে অসময়ে সে যত্ন বেঞ্জে ওঠে। বিরক্তির একশেষ। আমার কোয়ার্টার ফাইনল মাথার উপর। দম ফেলার সময় নেই। বেবি কখের কথা আমরা ভুলে গেলাম। মনে রাখার ক্ষমতার মত ভুলে যাবার ক্ষমতাও মানুষের অস্বাভাবিক।

এক সন্ধ্যায় পড়ার টেবিলে উবু হয়ে কোয়ার্টাম মেকানিস্মের একটি জটিল সমাধান করার চেষ্টা করছি — একেক বাব একেক উপর হচ্ছে। নিজেকেই নিজে গাধা বলে গালাগালি করছি। তখন বিকট হৈচৈ শূরু হল। বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে সবাই যেমন একসঙ্গে চেঁচাতে থাকে সেরকম অবস্থা। বই বক্স করে ঘরের বাইরে এসে থমকে গেলাম। কখ ফিরে এসেছে, তবে একা ফেরেনি। তার সঙ্গে কিলবিল করছে গোটা বিশেক সাপের ছানা। সব কটি প্রায় এক ফুটের মত লম্বা। বোঝাই যাচ্ছে, কখ কোথাও গিয়ে ডিম দিয়েছে। বাচ্চা ফুটিয়ে তাদের খানিকটা বড় করে নিয়ে এসেছে আমাদের দেখাতে।

সাপের ছানাগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। আমরা সবাই বিছানায় পা উঠিয়ে বসে ঠকঠক করে কাপছি। এলিজাবেথ নিজে ‘হেল্প, হেল্প’ বলে চিৎকার করে গলা ভেঙে ফেলল। বাড়িওয়ালী দমকল বাহিনীকে টেলিফোন করল — আমাদের উদ্ধার করার জন্য।

দমকল বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে চলে এল।

সাপ ধরার কলাকৌশল তাদের জ্ঞান নেই। তারা খবর দিয়ে অন্য কাদের যাত্রা আনল। সাপ ধরে ধরে পলিথিনের ব্যাগে ভরা শূরু হল। কখ কোন রকম প্রতিবাদ করল নাই। সে হয়ত গভীর ভালবাসায় তার বাচ্চগুলোকে আমাদের দেখাতে এনেছিল। বেচাই জ্ঞান না — মানুষ শুধু মানুষের ভালবাসাই গ্রহণ করতে পারে — অন্য কারোর ভালবাসা গ্রহণ করার ক্ষমতা মানুষের নেই।



চোখ

ভোর ছটায় কেউ কলিং বেল টিপতে থাকলে মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা। মিসির আলির মেজাজ তেমন বিগড়াল না। ভোর দশটা পর্যন্ত কেন জানি তাঁর মেজাজ বেশ ভাল থাকে। দশটা থেকে খারাপ হতে থাকে, চূড়ান্ত রকমের খারাপ হয়ে দুটির দিকে। তারপর আবার ভাল হতে থাকে। সন্ধ্যার দিকে অসন্তুষ্ট ভাল থাকে। তারপর আবার খারাপ হতে শুরু করে। ব্যাপারটা শুধু তর বেলায় ঘটে না সবার বেলায়ই ঘটে তা তিনি জানেন না। প্রায়ই ভাবেন একে ওকে জিজ্ঞেস করবেন— শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়ে উঠে না। তাঁর চরিত্রের বড় রকমের দুর্বল দিক হচ্ছে পরিচিত কারো সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না। অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারেন, কথা বলতে ভালও লাগে। সেদিন রিকশা করে আসতে আসতে রিকশাওয়ালার সঙ্গে অতি উচ্চ শ্রেণীর কিছু কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন। রিকশাওয়ালার বক্তব্য হচ্ছে— পথিবীতে যত অশাস্ত্র সবের মূলে আছে মেয়েছেলে।

মিসির আলি বললেন, এই বক্তব্য মনে হওয়ার কারণ কি?

রিকশাওয়ালা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল, চাচামিয়া এই দেহেন আমারে। আইজ আমি রিকশা চালাই। এর কারণ কি? এর কারণ বিবি হাওয়া। বিবি হাওয়া যদি কুসুম্বি দিয়া বাবা আদমবে গঙ্গম ফল না খাওয়াইতো তা হইলে আইজ আমি থাকতাম বেহেশতে। বেহেশতে তো আর রিকশা চালানীর কোন বিষয় নাই, কি কন চাচামিয়া? গঙ্গম ফল খাওয়ানির কারণেই তো আইজ আমি দুনিয়ায় আইসা পড়লাম।

মিসির আলি রিকশাওয়ালার কথাবার্তায় চমৎকৃত হলেন। পৰবৰ্তী দশ মিনিট তিনি রিকশাওয়ালাকে যা বললেন, তার মূল কথা হল — নারীর কারণে আমরা যদি স্বর্গ থেকে বিভাগিত হয়ে থাকি তাহলে নারীই পারে আবার আমাদের স্বর্গে ফিবিয়ে নিয়ে যেতে।

রিকশাওয়ালা কি বুঝল কে জানে। তার শেষ বক্তব্য ছিল — যাই কন চাচামিয়া, মেয়ে মানুষ আসলে সূবিধার জিনিস না।

কলিং বেল আবার বাজছে।

মিসির আলি বেল টেপার ধরন থেকে অনুমান করতে চেষ্টা করলেন — কে হতে পারে।

ভিধিরি হবে না। ভিধিরিরা এত ভোরে বের হয় না। ভিক্ষুণি যাদের পেশা তারা পরিশ্রান্ত হয়ে গভীর রাতে ঘূমতে যায়, ঘূম ভাঙতে সেই জায়গাই দেরি হয়। পরিচিত কেউ হবে না। পরিচিতবা এত ভোরে আসবে না। তাঁকে মুস থেকে ডেকে তুলতে পারে এমন ঘনিষ্ঠতা তাঁর কারো সঙ্গেই নেই।

যে এসেছে, সে অপরিচিত। অবশ্যই মহিলা। পুরুষরা কলিং বেলের বোতাম অনেকক্ষণ

চেপে ধরে থাকে ; মেঝেরা তা পারে না । মেয়েটির বয়স অল্প তাও অনুমান করা যাচ্ছে । অল্পবয়স্ক মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের ছটফটে ভাব থাকে । তারা অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকবাব বেল টিপবে । নিজেদের অস্ত্রিতা ছড়িয়ে দেবে কলিং বেলে ।

মিসির আলি, পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে দরজা খুললেন, বিশ্বিত হয়ে দেখলেন, তাঁর অনুমান সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে—মাঝেয়েসো এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন । বেঁটেখাট একজন মানুষ, গায়ে সাফারি । চোখে সান্ত্বাস । এত ভোরে কেউ সান্ত্বাস পরে না । এই লোকটি কেন পরেছে কে জানে ।

‘স্যার স্লামালিকুম ।’

‘ওয়ালাইকুম সালাম ।’

‘আপনার নাম কি মিসির আলি ?’

‘জি ।’

‘আমি কি আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি ?’

মিসির আলি কি বলবেন মনস্তির করতে পারলেন না । লোকটিকে তিনি পছন্দ করছেন না, তবে তার মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস লক্ষ করছেন — যা তাঁর ভাল লাগছে । আত্মবিশ্বাসের ব্যাপারটা আজকাল আর দেখাই যায় না ।

লোকটি শাস্ত গলায় বলল, আমি আপনার কিছুটা সময় নষ্ট করব ঠিকই তবে তার জন্যে আমি পে করব ।

‘পে করবেন ?’

‘জি । প্রতি ঘণ্টায় আমি আপনাকে এক হাজার করে টাকা দেব । আশা করি আপনি আপনি করবেন না । আমি কি ভেতরে আসতে পারি ?’

‘আসুন ।’

লোকটি ভেতরে চুক্তে চুক্তে বলল, মনে হচ্ছে আপনার এখনো হাত-মুখ ধোয়া হয়নি । আপনি হাত-মুখ ধূয়ে আসুন, আমি অপেক্ষা করছি ।

মিসির আলি বললেন, ঘণ্টা হিসেবে আপনি যে আমাকে টাকা দেবেন নেই হিসেব কি এখন থেকে শুরু হবে ? না—কি হাত-মুখ ধূয়ে আপনার সামনে বসার পর থেকে শুরু হবে ?

লোকটি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, টাকার কথায় আপনি কি রাগ করেছেন ?

‘রাগ করিনি । যজ্ঞ পেয়েছি । চা খাবেন ?’

‘থেতে পারি । দুধ ছাড়া ।’

মিসির আলি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, এক কাজ করুন — রাস্তাঘরে চলে যান । কেতলি বসিয়ে দিন । দু'কাপ বানান । আমাকেও এক কাপ দেবেন ।

ভদ্রলোক হতভস্য হয়ে তাকিয়ে রয়েছিলেন ।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, আমাকে ঘণ্টা হিসেবে পে করবেন বলে কেভাবে হকচকিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও ঠিক একই ভাবে আপনাকে হকচকিয়ে দিলাম । বসুন, চা বানাতে হবে না । সাতটার সময় রাত্তির ওপাশের রেস্টুরেন্ট থেকে আমার জন্যে চা- নাশত আসে । তখন আপনার জন্যেও চা আনিয়ে দেব ।

‘প্রত্যক্ষ ইউ স্যাব।’

‘আপনি কৃষ্ণ বলার সময় বারবার বাঁ দিকে ঘূরছেন, আমার মনে হচ্ছে আপনার বাঁ চেঁটা নষ্ট। এই জন্মেই কি কলো চশমা পরে আছেন?’

ভদ্রলোক সহজ গলায় বললেন, হ্যাঁ। আমার বাঁ চোখটা পাথরেৰ।

ভদ্রলোক সোফাৰ এক কোণে বসলেন। মিসিৰ আলি লক্ষ কৱলেন, লোকটি শিৰদাঁড়া সোজা কৰে বসে আছে। চাকুৱিৰ ইট্যারভুং দিতে এলে ক্যানডিডেটবা যে ভঙ্গিতে চেয়াৰে বসে অবিকল সেই ভঙ্গি। মিসিৰ আলি বললেন, আজকেৰ খবৱেৰ কাগজ এখনো আসেনি। গতদিনেৰ কাগজ দিতে পাৰি। যদি আপনি চোখ বুলাতে চান।

‘আমি খবৱেৰ কাগজ পড়ি না। একা একা বসে খেকে আঘাত অভ্যাস আছে। আমাৰ জন্মে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। শুকন্তে টাকা দেয়াৰ কথা বলে যদি আপনাকে আহত কৰে থাকি তাৰ জন্মে কমা প্ৰাৰ্থনা কৰছি।’

মিসিৰ আলি টুথব্ৰাশ হাতে বাথকুমে ঢুকে গেলেন। লোকটিকে তাৰ বেশ ইন্টারেষ্টিং বলে মনে হচ্ছে। তবে কোন গুৰুতৰ সমস্যা নিয়ে এসেছে বলে মনে হয় না। আজকাল অকারণেই কিছু লোকজন এসে তাঁকে বিৱৰণ কৰা শুৰু কৰেছে। মাস্থানিক আগে একজন এসেছিল ভূতবিশারদ। সে মা-কি গবেষণাধৰ্মী একটি বই লিখেছে, যাৰ নাম “বাংলাৰ ভূত”। এ দেশে ষত ধৰনেৰ ভূত পেঁচৰী আছে সবাৰ নাম, আচাৰ-ব্যবহাৰ বই-এ লেখা। মেছো ভূত, গেছো ভূত, ভুলা ভূত, শাকচুমি, কুকুকোটা, কুনী ভূত, অঁধি ভূত . . .। সৰ্বমোট একশ' ছৰকমেৰ ভূত।

মিসিৰ আলি বিৱৰণ হয়ে বলেছিলেন, ভাই আমাৰ কাছে কেন? আমি সারাজীবন ভূত নেই এইটা প্ৰমাণ কৰতে চেষ্টা কৰেছি . . .।

সেই লোক মহা উৎসাহী হয়ে বলল, কোন কোন ভূত নেই বলে প্ৰমাণ কৰেছেন— এইটা কাইগুলি বলুন। আমাৰ কাছে ক্যাসেট প্ৰেয়াৰ আছে। আমি টেপ কৰে নেব।

সানগ্লাস পৰা বেঁটে ভদ্রলোক সেই পদেৰ কেউ কিনা কে বলবে?

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মিসিৰ আলি বললেন, ভাই বলুন কি ব্যাপার।

‘প্ৰথমেই আমাৰ নাম বলি — এখনো আমি আপনাকে আমাৰ নাম বলিনি। আমাৰ নাম রাখেদুল কৱিম। আমেৰিকাৰ টেক্সাস এম এণ এন বিশ্ববিদ্যালয়েৰ গণিত বিভাগৰ আমি একজন অধ্যাপক। বৰ্তমানে এক বছৱেৰ স্যাবোটিক্যাল লীভে দেশে এসেছি। আপিনাৰ হোৰ্জ কিভাৰে এবং কাৰ কাছে পেয়েছি তা কি বলব?’

‘তাৰ দৰকাৰ নেই। কি জন্মে আমাৰ হোৰ্জ কৰছেন সেটা বলুন।

‘আমি কি ধূমপান কৰতে পাৰি? সিগাৱেট খেতে খেতে কৃষ্ণ বললে আমাৰ জন্মে সুবিধা হবে। সিগাৱেটেৰ হোৱা এক ধৰনেৰ আড়াল সংষ্ঠি কৰে।’

‘আপনি সিগাৱেট খেতে পাৱেন, কোন অসুবিধা নেই।

‘ছাই কোথাৰ ফেলব? আমি কোন এস্টেট ব্যাস্ত পাইছি না।’

‘মেৰেতে ফেলুন। আমাৰ গোটা বাড়িটাই ছুক্টা এস্টেট।’

রাখেদুল কৱিম সিগাৱেট ধৰিয়েই কথা বলা শুৰু কৱলেন। তাৰ গলাৰ দ্বাৰা ভাৱী এক

স্পষ্ট। কথাবার্তা খুব গোছনো। কথা শুনে মনে হৈ তিনি কি বলবেন তা আগে- ভাগেই জানেন। কোন্ বাক্যটির পৰ কোন্ বাক্য বলবেন তাও ঠিক কৰা। যেন ফ্লাসের বক্তৃতা। আগে থেকে ঠিকঠাক কৰা। প্রবাসী বাঙালীৰা একনাগাড়ে বাংলায় কথা বলতে পাৰেন না — ইনি তা পাৰছেন।

‘আমাৰ বস্তুস এই নভেম্বৰে পঞ্চাশ হবে। সম্ভৱত আমাকে দেখে তা বুঝতে পাৰছেন না। আমাৰ মাথাৰ চূল সব সাদা। কলপ ব্যবহাৰ কৰছি গত চার বছৰ থেকে। আমাৰ স্বাস্থ্য ভাল। নিয়মিত ব্যায়াম কৰি। মুখেৰ চামড়াৰ এখনো ভাঁজ পড়ে নি। বয়সজনিত অসুস্থি-বিসুস্থি কোনটাই আমাৰ নেই। আমাৰ ধাৰণা শাৰীৰিক এবং মানসিক দিক দিয়ে আমাৰ কৰ্মক্ষমতা এখনো একজন পৰ্যাপ্তি বছৰেৰ যুৰকেৰ মত। এই কথাটা বলাৰ উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি বিষে কৰতে যাচ্ছি। আজ আমাৰ গায়েহলুদ। মেয়ে পক্ষীয়াৰা সকাল নষ্টায় আসবে। আমি ঠিক আটটায় এখন থেকে যাব। আটটা পৰ্যন্ত সময় কি আমাকে দেবেন?’

‘দেব। ভাল কথা, এটা নিশ্চয়ই আপনাৰ প্ৰথম বিবাহ না। এৱ আগেও আপনি বিষে কৰেছেন?’

‘জ্ঞি। এৱ আগে একবাৰ বিয়ে কৰেছি। এটি আমাৰ দ্বিতীয় বিবাহ। আমি আগেও বিয়ে কৰেছি তা কি কৰে বললেন?’

‘আজ আপনাৰ গায়েহলুদ তা খুব সহজভাৱে বললেন দেখে অনুমান কৱলাম। বিয়েৰ তীব্র উদ্দেজনা আপনাৰ মধ্যে দেখতে পাইনি।’

‘সব মানুষ তো এক রকম নয়। একেক জন একেক রকম। উদ্দেজনাৰ ব্যাপারটি আমাৰ মধ্যে একেবাৰেই নেই। প্ৰথমবাৰ যখন বিয়ে কৰি তখনো আমাৰ মধ্যে বিদুমাত্ উদ্দেজনা ছিল না। সেদিনও আমি যথাবীতি ফ্লাসে গিয়েছি। গ্ৰুপ থিওৰীৰ উপৰ এক ঘণ্টাৰ লেকচাৰ দিয়েছি।’

‘ঠিক আছে আপনি বলে যান।’

ৱাশেদুল কৱিম শাস্তি গলায় বললেন, আপনাৰ ভেড়ৰ একটা প্ৰবণতা লক্ষ কৰছি — আমাকে আৱ দশটা মানুষেৰ দলে ফেলে বিচাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰছেন। দয়া কৰে তা ভৱবেন না। আমি আৱ দশজনেৰ মত নহি।

‘আপনি শুকু কৰুন।’

‘অংকশাস্ত্র এম.এ. ডিগ্ৰী নিয়ে আমি আমেৰিকা যাই পি-এইচ.ডি. কৰ্মসূৰ্য এম.এ-তে আমাৰ রেজাল্ট ভাল ছিল না। টেনেটুনে সেকেণ্ড ফ্লাস। প্ৰাইভেট কলেজ কলেজে চাকিৰ খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন বস্কুদেৰ দেখাদেখি জি-আৱ-ই পৰীক্ষা দিয়ে ফেললাম। জি-আৱ-ই পৰীক্ষা কি তা কি আপনি জানেন? গ্ৰাজুয়েট রেকৰ্ড একজুন্মনেশন। আমেৰিকান ইউনিভার্সিটিতে গ্ৰাজুয়েট ফ্লাসে ভৱি হতে হলে এই পৰীক্ষা দিয়ে হয়।’

‘আমি জানি।’

‘এই পৰীক্ষাটো আমি আশাৰ্তীত ভাল কৰে ফেললাম। আমেৰিকান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাৰ কাছে আমন্ত্ৰণ চলে এল। চৰকু গেলাম। পি-এইচ.ডি. কৱলাম প্ৰফেসৱ হোবলেৰ সঙ্গে। আমাৰ পি-এইচ.ডি. ছিল গ্ৰুপ থিওৰীৰ একটি শাখায় — নন এ্যাবেলিয়ান

ফাঁশানের উপর। পি-এইচ.ডি.-র কাজ এতই ভাল হল যে আমি বাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলাম। অংক নিয়ে বর্তমান কালে যারা নাড়ুচাড়া করেন তারা সবাই আমার নাম জানেন। অংকশাস্ট্রের একটি ফঁশান আছে যা আমার নামে পরিচিত। আর কে এক্সপোনেনশিয়াল আর কে হচ্ছে রাশেদুল করিম।

পি-এইচ.ডি.-র পরপরই আমি ফটো স্টোর ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেলাম। সেই বছরই বিয়ে করলাম। যেযেটি ফটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টসের ছাত্রী—স্প্যাশীশ আমেরিকান। নাম, জুডি বারনার।

‘প্রেমের বিয়ে?’

‘প্রেমের বিয়ে বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। বাছাবাছির বিয়ে করতে পারেন। জুডি অনেক বাছাবাছির পর আমাকে পছন্দ করল।’

‘আপনাকে পছন্দ করার কারণ কি?’

‘আমি ঠিক অপছন্দ করার মত মানুষ সেই সময় ছিলাম না। আমার একটি চোখ পাথরের ছিল না। তেহারা তেমন ভাল না হলেও দুটি সুন্দর চোখ ছিল। আমার মা ক্লিনে, রাশেদের চোখে জন্ম-কাঙ্গল পরামো। সুন্দর চোখের ব্যাপারটা অবশ্য ধর্তব্য নয়। আমেরিকান তরুণীরা প্রেমিকদের সুন্দর চোখ নিয়ে মাথা ঘামায় না — তারা দেখে প্রেমিক কি পরিমাণ টাকা করেছে এবং ভবিষ্যতে কি পরিমাণ টাকা সে করতে পারবে। সেই দিক দিয়ে আমি যোগাযুক্তি আদর্শ স্থানীয় বলা চলে। তিশ বছর বয়সে একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি পজিশন পেয়ে গেছি। ট্যানিউর পেতেও কোন সমস্যা হবে না। জুডি স্বামী হিসেবে আমাকে নির্বাচন করল। আমার দিক থেকে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। জুডি চমৎকার একটি মেয়ে। শত বৎসর সাধনার ধন হয়ত নয় তবে বিনা সাধনায় পাওয়ার মত মেয়েও নয়।

বিয়ের সাতদিনের মাঝায় আমরা হানিমুন করতে চলে গেলাম সানফ্রান্সিসকো। উঠলাম হোটেল বেডফোর্ডে। দ্বিতীয় রাত্রির ঘটনা। ঘুমুছিলাম। কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখি জুডি পাশে নেই। ঘড়িতে রাত তিনটা দশ বাজছে। বাথরুমের দরজা বন্ধ। সেখান থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ আসছে। আমি বিস্মিত হয়ে উঠে গেলাম। দরজা ধাক্কা দিয়ে বললাম, কি হয়েছে? জুডি কি হয়েছে? কান্না থেমে গেল। তবে জুডি কোন জবাব দিল না।

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর সে দরজা খ্লে হতভস্য হয়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম, কি হয়েছে?

সে ক্ষীণ স্বরে বলল, ভয় পেয়েছি।

‘কিসের ভয়?’

‘জানি না কিসের ভয়।’

‘ভয় পেয়েছ তো আমাকে ডেকে তোলনি কেন? বৈকল্যের দরজা বন্ধ করেছিলে কেন?’

জুডি জবাব দিল না। এক দৃষ্টিতে আমার দিব্য জোরয়ে রইল। আমি বললাম, ব্যাপারটা কি আমাকে খুলে বল তো?

‘সকালে বলব।’

‘না, এখনি বল। কি দেখে তুর পেয়েছ?’

জুড়ি অস্পষ্ট স্বরে বলল, তোমাকে দেখে।

‘আমাকে দেখে তুর পেয়েছ যানে? আমি কি করেছি?’

জুড়ি যা বলল তা হচ্ছে — রাতে তার ঘূর্ম ভেঙ্গে যায়। হোটেলের ঘরে নাইট লাইট ঝলছিল, এই আলোয় সে দেখে তার পাশে যে শুয়ে আছে সে কোন জীবন্ত মানুষ নয়। মত মানুষ। যে মত মানুষের গা থেকে শবদেহের গন্ধ বেরছে। সে ভয়ে কাঁপতে থাকে তবু সাহসে হাত বাড়িয়ে মানুষটাকে স্পর্শ করে। স্পর্শ করেই চমকে উঠে, কারণ মানুষটার শরীর বরফের মতই শীতল। সে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায় যে আমি মরা গেছি। তার জন্যে এটা বড় ধরনের শক হলেও সে যথেষ্ট সাহস দেখায় — টেবিল ল্যাম্প ছেলে দেয় এবং হোটেল ম্যানেজারকে টেলিফোন করবার জন্যে টেলিফোন সেট হাতে তুলে নেয়। ঠিক তখন সে লক্ষ্য করে মতদেহের দৃঢ়ি বক্ষ চোখের একটি ধীরে ধীরে খুলছে। সেই একটিমাত্র খোলা চোখ তাঁর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জুড়ি টেলিফোন ফেলে দিয়ে ছটে বাথরুমে ঢুকে দরজা বক্ষ করে দেয়। এই হল ঘটনা।

রাশেদুল করিম কথা শেষ করে সিগারেট ধরালেন। হাতের ঘড়ি দেখলেন। আমি বল্লাম, থামলেন কেন?

‘সাতটা বেজেছে। আপনি বলেছেন সাতটার সময় আপনার জন্যে চা আসে। আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। চা খেয়ে শুরু করব। আমার গল্প শুনতে আপনার কেমন লাগছে?’

‘ইটারেল্স্টিং। এই গল্প কি আপনি অনেকের সঙ্গে করেছেন? আপনার গল্প কলার ধরন থেকে মনে হচ্ছে, অনেকের সঙ্গেই এই গল্প করেছেন।’

‘আপনার অনুমান সঠিক। ছ’ থেকে সাতজনকে আমি বলেছি। এর মধ্যে সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন। পুলিশের লোক আছে।’

‘পুলিশের লোক কেন?’

‘গল্প শেষ করলেই বুঝতে পারবেন পুলিশের লোক কি জন্যে।’

চা চলে এল। চায়ের সঙ্গে পরোটা ভাস্তি। মিসির আলি নাশতা করলেন। রাশেদুল করিম সাহেব পর পর দু'কাপ চা খেলেন।

‘আমি কি শুরু করব?’

‘হ্যাঁ, শুরু করুন।’

“আমাদের হানিমুন মাত্র তিনদিন স্থায়ী হল। জুড়িকে নিয়ে পুরানো জায়গায় চলে এলাম। মনটা খুবই খারাপ। জুড়ির কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারতো না। বোজ রাতে সে ভয়ংকর চিংকার করে উঠে। ছুটে ঘব থেকে বেব হয়ে যায়। আমি যখন জেগে উঠে তাকে সাম্রাজ্ঞা দিতে যাই তখন সে এমনভাবে তাকায় যেন আমি একটা পিশাচ কিংবা মৃত্যুন শয়তান। আমার দৃঢ়খের কোন সীমা রইল না। সেই স্থয়ী অবিবেলিয়াম গ্রন্থের উপর একটা জঙ্গি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাঙ্গ করছিলাম। আমার প্রেরকার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার মত পরিবেশ। মানসিক শাস্তি। সব দূর হয়ে গেল। অবশ্যি দিনের ক্লোয় জুড়ি স্বাভাবিক। সে

বদলাতে শুরু করে সূর্ঘ দ্বীপ পর থেকে। আমি তাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেলাম।

সাইকিয়াট্রিস্ট প্রথমে সন্দেহ করলেন সমস্যা ড্রাগঘটিত। হয়ত জুডি ভাগে অভ্যন্তরে সেই সময় বাজারে হেলুসিনেটিং ড্রাগ এল এস ডি প্রথম এসেছে। শিল্প সাহিত্যের লোকজন শখ করে এই ড্রাগ থাচ্ছেন। বড় গলায় বলছেন — মাইও অল্টারিং ট্রিপ নিয়ে এসেছি। জুডি ফাইন আর্টস-এর ছাত্রী। ট্রিপ নেয়া তার পক্ষে ধূম অস্বাভাবিক না।

দেখা গেল ড্রাগঘটিত কোন সমস্যা তার নেই। সে কখনো ড্রাগ নেয়নি। সাইকিয়াট্রিস্টরা তার শৈশবের জীবনে কোন সমস্যা ছিল কি-না তাও বের করতে চেষ্টা করলেন। লাভ হল না। জুডি এসেছে গ্রামের কৃষক পরিবার থেকে। এ ধরনের পরিবারে তেমন কোন সমস্যা থাকে না। তাদের জীবনযাত্রা সহজ এবং স্বাভাবিক।

সাইকিয়াট্রিস্ট জুডিকে ঘুমের অমুখ দিলেন। কড়া ডোজের ফেনোবারবিটিন। আমাকে বললেন, আপনি সম্ভবত লেখাপড়া নিয়ে থাকেন। স্ত্রীর প্রতি বিশেষ করে নববিবাহিত স্ত্রীর প্রতি ফতো সময় দেয়া দরকার তা দিচ্ছেন না। আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর এক ধরনের ক্ষোভ জন্মগ্রহণ করেছে। সে যা বলছে তা ক্ষোভেরই বহিপ্রকাশ।

জুডির কথা একটাই — আমি ঘূমুবার পর আমাব দেহে প্রাণ থাকে না। একজন মৃত মানুষের শরীর যেমন অসাড় পড়ে থাকে আমার শরীরও সে রকম পড়ে থাকে। ঘুমের মধ্যে মানুষ হাত নাড়ে, পা নাড়ে — আমি তার কিছুই করি না। নিষ্ঠাস পর্যন্ত ফেলি না। গা হয়ে যায় বরফের মত শীতল। এক সময় গা থেকে মৃত মানুষের শরীরের পচা গঁজ বেরতে থাকে এবং তখন আচমকা আমার বাঁ চোখ খুলে যায়, সেই চোখে আমি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সেই চোখের দৃষ্টি সাপের মত কৃটিল।

জুডির কথা শুনে আমার ধারণা হল হত্তেও তো পারে। জগতে কত রহস্যময় ব্যাপারই তো ঘটে। হয়ত আমার নিজেরই কোন সমস্যা আছে। আমিও ডাক্তারের কাছে গেলাম। স্লীপ এ্যানালিস্ট। জ্বানাব উদ্দেশ্য একটাই — ঘুমের মধ্যে আমার কোন শারীরিক পরিবর্তন হয় কি-না। ডাক্তাররা পুৎখানুপূৎখ পরীক্ষা করলেন। একবার না বারবার করলেন। দেখা গেল আমার ঘূম আব দশটা মানুষের ঘুমের চেয়ে আলাদা নয়। ঘুমের মধ্যে আমিও হাত-পা ঝুঁকি। অন্য মানুষদের যেমন ঘুমের তিনটি স্তর পার হতে হয়, আমারো হয়। ঘুমের সময় আব দশটা মানুষের মত আমার শরীরের উপাপও আধ ডিগ্রী হ্রাস পায়। আমিও অন্য মানুষের মত স্বপ্ন ও দৃষ্টিপুর্ব দেখি।

জুডি সব দেখেশুনে বলল, ডাক্তাররা কিছুই জানে না। ডাক্তাররা কিছুই জানে না। আমি জানি। তুমি আসলে মানুষ না। দিনের বেলা তুমি যানুষ থাকু স্বৃষ্টি ডোবার পর থাক না।

আমি কি হই?

তুমি পিশাচ বা এই জাতীয় কিছু হয়ে যাও।

আমি বললাম, এইভাবে তো বাস করা সম্ভব না। তুমি বরং আলাদা থাক।

ঘূবই আশ্চর্যের ব্যাপার, জুডি তাতে রাজি হল না। অতি তুচ্ছ কারণে আমেরিকানদের বিয়ে ভাষ্টে। স্বামীর পছন্দ হলুদ রঞ্জের বিছানার চাদর, স্ত্রীর পছন্দ নীল রঞ্জ। ভেঙে গেল

বিয়ে। আমাদের এত কড়ি সমস্যা কিন্তু বিয়ে ভাগ্নলো না। অমি বেশ কয়েকবার তাকে বললাম, জুড়ি ভূমি আলাদা হয়ে যাও। ভাল দেশে একটা ছেলেকে বিয়ে কর। সারা জীবন তোমার সামনে পড়ে আছে। তুমি এইভাবে জীবনটা নষ্ট করতে পাব না।

জুড়ি প্রতিবারই বলে, যাই হোক, যত সমস্যাই হোক আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না, I love you. I love you.

আমি গল্পের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শেষ অংশটি বলার আগে আমি আপনাকে আমার চোখের দিকে তাকাতে অনুরোধ করব। দয়া করে আমার চোখের দিকে তাকান।

রাশেদুল করিম সানগ্লাস খুলে ফেললেন। মিসির আলি স্টেকগার্ল বললেন, আপনার চোখ সুন্দর। সত্যি সুন্দর। আপনার মা যে বলতেন — চোখে জন্ম-কাজল, ঠিকই বলতেন।

রাশেদুল করিম বললেন, পৃথিবীতে সবচে 'সুন্দর চোখ কাব ছিল জানেন?

'ক্লিওপেট্রা'।

'অধিকাংশ মানুষের তাই ধারণা। এ ধারণা সত্যি নয়। পৃথিবীতে সবচে' সুন্দর চোখ ছিল বুদ্ধদেবের পুত্র কৃষ্ণের। ইংরেজ কবি শেলীর চোখও খুব সুন্দর ছিল। আমার স্ত্রীর ধারণা, এই পৃথিবীতে সবচে' সুন্দর চোখ আমার। জুড়ি বলত এই চোখের কারণেই সে কোনদিন আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।

রাশেদুল করিম সানগ্লাস চোখে দিয়ে বললেন, গল্পের শেষ অংশ বলার আগে আপনাকে ক্ষুণ্ণ ধন্যবাদ দিতে চাই।

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, কি জন্যে বলুন তো?

'কাউকে যখন আমি আমার চোখের দিকে তাকাতে বলি, সে আমার পাথরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনি প্রথম ব্যক্তি যিনি একবারও আমার পাথরের চোখের দিকে তাকান নি। আমার আসল চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। So nice of you, Sir.'

রাশেদুল করিমের গলা মুহূর্তের জন্যে হলেও তারী হয়ে গেল। তিনি অবশ্য চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আটটা প্রায় বাজতে চলল, গল্পের শেষটা বলি-

"জুড়ির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। কড়া ডোজের ঘুমের অবৃথ থেয়ে ঘুমুতে যায়, দু'এক ঘন্টা ঘুম হয়, বাকি রাত জেগে বসে থাকে। মাঝে মাঝে চিংকার কুরি ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফুপিয়ে কাঁদে।

এমনি এক রাতের ঘটনা। জুলাই মাস। রাত সাড়ে তিনটার মুগ্ধ হনো জুড়ির মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল — সে আমার বাঁ চোখটা গেলে দিল।

আমি ঘুমছিলাম, নারকীয় ঘন্টায় চিংকার করে উঠলাম (সেই ভয়াবহ কষ্টের কোন সীমা-পরিসীমা নেই।)

রাশেদুল করিম চূপ করলেন। তার কপালে বিদ্যু বিলুপ্তি জমতে লাগল।

মিসির আলি বললেন, কি দিয়ে চোখ গেলে ছিলো?

'সুচালো পেনসিল দিয়ে। আমার মাথার রালিশের নিচে প্যাড এবং পেনসিল থাকে। তখন গ্রহ থিওরী নিয়ে গভীর চিন্তায় ফেলিলাম। মাথায় যদি হঠাতে কিছু আসে — তা লিখে ফেলার জন্যে বালিশের নিচে প্যাড এবং পেনসিল রাখতাম।'

‘আপনার স্ত্রী এ ঘটনা প্রসঙ্গে কি বক্তব্য দিয়েছেন।’

তার মাথা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুই বলেনি, শুধু চিংকার করেছে। তার একটই বক্তব্য — এই লোকটা পিশাচ। আমি প্রমাণ পেয়েছি। কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে।’

‘কি প্রমাণ আছে তা—কি কখনো জিজ্ঞেস করা হয়েছে?’

‘না। একজন উদাদকে প্রশ্ন করে বিপর্শন্ত করার ফোন মানে হয় না। তাহাড়া আমি তখন ছিলাম হাসপাতালে। আমি হাসপাতালে থাকতে থাকতেই জুড়ির মৃত্যু হয়।’

‘স্বাভাবিক মৃত্যু?’

‘না। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। সে মারা ষায় ঘুমের অশ্বুধ খেয়ে। এইটুকুই আমার গল্প। আমি আপনার কাছে একটাই অনুরোধ নিয়ে এসেছি, আপনি সমস্যাটা কি বের করবেন। আমাকে সাহায্য করবেন। আমি যদি পিশাচ হই তাও আমাকে বলবেন। এই ফাইলের ভেতর জুড়ির একটা স্কেচ বুক আছে। স্কেচ বুকে নানান ধরনের কমেন্টস লেখা আছে। এই কমেন্টসগুলি পড়লে জুড়ির মানসিক অবস্থা আঁচ করতে আপনার সুবিধা হতে পারে। আটটা বাজে, আমি তাহলে উঠি?’

‘আবার কবে আসবেন?’

‘আগামীকাল ভোর ছটায়। ভাল কথা, আমার এই গল্পে কোথাও কি প্রকাশ পেয়েছে জুড়িকে আমি কতটা ভালবাসতাম?’

‘না— প্রকাশ পায় নি।’

‘জুড়ির প্রতি আমার ভালবাসা ছিল সীমাহীন। আমি এখন উঠেছি।’

‘ছিল বলছেন কেন? এখন কি নেই?’

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না।

বাশেন্দুল করিয় চলে যাবার পর মিসির আলি ফাইল খুললেন। ফাইলের শূরুতেই একটা খাম। খামের উপর মিসির আলির নাম লেখা।

মিসির আলি খাম খুললেন। খামের ভেতর ইংরেজীতে একটা চিঠি লেখা। সঙ্গে চারটি একশ” ডলারের মোট। চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সার্ভিসের জন্য সম্মানী বাবদ সামান্য কিছু দেয়া হল। গহণ করলে খুশি হব।

বিনীত

আর করিম।

।।১।।

মিসির আলি স্কেচ বুকের প্রতিটি পাতা সাবধানে খুল্লালেন। চারকোল এবং পেনসিলে স্কেচ আঁকা। প্রতিটি স্কেচের নিচে আঁকার ভাবিষ্য স্কেচের বিষয়বস্তু অতি তুচ্ছ, সবই ঘরোয়া জিনিস — এক জোড়া জুতা, মলাট জোড়া বই, টিভি, বুক শেলফ। স্কেচ বুকের শেষের দিকে শুধুই চোখের ছবি। বিড়ালের চোখ, কুকুরের চোখ, মাছের চোখ এবং মানুষের

চোখ। মানুষের চোখের মডেল যে রাশেদুল করিম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। না বললেও ছবির নিচের মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে। মন্তব্যগুলি বেশ দীর্ঘ। বেমন একটি মন্তব্য —

আমি খুব যন দিয়ে আমার স্বামীর চোখ লক্ষ্য করছি। মানুষের চোখ একেক সময় একেক রকম থাকে। ভোরবেলার চোখ এবং দুপুরের চোখ এক নয়। আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম চোখের আইরিশের ট্রান্সপারেন্সি মূড়ের উপর বদলায়। বিষাদগ্রস্ত মানুষের চোখের আইরিশ থাকে অস্বচ্ছ। মানুষ যতই আনন্দিত হতে থাকে তার চোখের আইরিশ ততই স্বচ্ছ হতে থাকে। আমার এই অবজ্ঞারভেশন কতটুকু সত্য তা বুঝতে পারছি না।

মেয়েটি মাঝে মাঝে তার মনের অবস্থাও লিখেছে — অনেকটা ডামেরী লেখার ভঙ্গিতে। মনে হয় হাতের কাছে ডামেরী না ধাকায় স্কেচ বুকে লিখে রেখেছে। সব লেখাই পেনসিলে। প্রচুর কাটাকুটি আছে। কিছু লাইন রাখার ঘমে তুলেও ফেলা হয়েছে।

১৮.৪.৮২

আমি ভয়ে অস্ত্রি হয়ে আছি। নিজেকে বুঝানোর চেষ্টা করছি — এই ভয় অমূলক। বুঝাতে পারছি না। আমি আমার স্বামীকে ভয় পাছি এই তথ্য স্বত্বাবত্তি স্বামী বেচারার জন্য সুরক্ষকর না। সে নানাভাবে আমাকে সাম্রাজ্য দেবার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু চেষ্টা বেশ হাস্যকর। আজ আমাকে বলল, জুড়ি আমি ঠিক করেছি — এখন থেকে রাতে ঘুমুব না। আমার অংকের সমস্যা নিয়ে ভাবব। লেখালেখি করব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও। আমি দিনের বেলায় ঘুমুব। একজন মানুষের জন্যে চার ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। নেপোলীয়ান মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমতেন।

আমি এই গন্তীর, স্বল্পভাষী লোকটিকে ভালবাসি। ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। আমি চাই না, আমার কোন কারণে সে কষ্ট পাক। কিন্তু সে কষ্ট পাচ্ছে। খুব কষ্ট পাচ্ছে। হে মৌশুর, তুমি আমার মন শাস্ত কর। আমার ভয় দূর করে দাও।

২১.৪.৮২

যে জিনিস খুব সুন্দর তা কত দ্রুত অসুন্দর হতে পারে — বিশ্বিত হয়ে আমি তাই দেখছি। রাশেদের ধারণা আমি অসুস্থ। সত্যি কি অসুস্থ? আমার মনে হয় না। কারণ এখনো ছবি আঁকতে পারছি। একজন অসুস্থ মানুষ আর যাই পারক — ছবি আঁকতে পারে না। গত দু'দিন থেরে ওয়াটার কালারে বাসার সামনের চেবী গাছের ফুল ধরতে চেষ্টা করছিলাম। আজ সেই ফুল কাগজে বন্দি করেছি। অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে রাখলাম। তাল হয়েছে। রাশেদ ছবি তেমন বুঝে বলে মনে হয় না — সেও মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দেখল। তাবপর বলল, আমি যখন বুঢ়ো হয়ে যাব, বিশবিদ্যালয় থেকে অবসর নেব, তখন তুমি আমাকে ছবি আঁকা শিখিয়ে দেবে। এই কথাটি সে আজ প্রথম বলেনি। আগেও আলোছে। আন্তরিক ভঙ্গিতে বলেছে। কেউ যখন আন্তরিকভাবে কিছু বলে তখন তা জের প্রাণ্যা ধায়। আমার মনে হয় না সে কোনদিন ছবি আঁকবে। তার মাথায় অংক ছাড়ে নিস্তুর নেই।



১১.৫.৮২

আমি ছবি আঁকতে পারছি না। যেখানে নৈল রঙ চড়ানো দরকার সেখানে গাঢ় হলুদ বঙ্গ বসছি। তাঙ্গুর পিত্তেচিত্তে পরিমাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। সাবাক্ষণ মাথা কিম ধরে থাকে। কেন জানি খুব বমি হচ্ছে।

আজ দুপুরে অনেকক্ষণ ঘূমলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সুন্দর একটা স্বপ্নও দেখে ফেললাম। সুন্দর স্বপ্ন আমি অনেকদিন দেখি না। অনেকদিন দেখি না। অনেকদিন দেখি না। অনেকদিন দেখি না। আচ্ছা, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? শুনেছি পাগলবাই একই কথা বার বার লেখে। কারণ তাদের মাথায় একটি বাক্যই বার বার দ্বুরপাক খায়।

বৃহস্পতিবার কিংবা বুধবার —

আজ কত তারিখ আমি জানি না। বেশ কয়েকদিন ধরেই দিন-তারিখে গণগোল হচ্ছে। আজ কত তারিখ তা জানার কোন রকম আগ্রহ বোধ করছি না। তবে মনের অবস্থা লেখার চেষ্টা করছি যাতে পৱবর্তী সময়ে কেউ আমার লেখা পড়ে বুঝবে যে মাথা খারাপ হবার সময় একজন মানুষ কী ভাবে। কী চিন্তা করে।

মাথা খারাপের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, আলো অসহ্য হওয়া। আমি এখন আলো সহ্য করতে পারি না। দিনের বেলায় দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখি। ঘর অঙ্ককার বলেই প্রায় অনুমানের উপর নির্ভর করে আজকের এই লেখা লিখছি। দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে, সাবাক্ষণ শরীরে এক ধরনের ঝালা অনুভব করা। মনে হয় সব কাপড় খুলে বাথটাবে শুয়ে থাকতে পারলে ভাল লাগত। আমার আগে যারা পাগল হয়েছে তাদেরও কি এমন হয়েছে? জানার জন্যে পাবলিক লাইব্রেরীতে টেলিফোন করেছিলাম। আমি খুব সহজভাবে বললাম, আচ্ছ আপনাদের এখানে পাগলের লেখা কোন বই আছে?

যে যেয়েটি টেলিফোন ধরেছিল সে বিস্মিত হয়ে বলল, পাগলের লেখা বই বলতে কি বুঝাচ্ছেন?

‘মানসিক রুগ্নীদের লেখা বই।’

‘মানসিক রুগ্নীরা বই লিখবে কেন?’

‘কেন লিখবে না। আমি তো লিখছি, বই অবশ্যি নয় — ডায়েরীর আকারে লেখা।’

‘ও আচ্ছ। ঠিক আছে আপনার বই ছাপা হোক। ছাপা হবার পর অবশ্যই আমিরা আপনার বই—এর কপি সংগ্রহ করব।’

আমি মনে মনে হাসলাম। যেয়েটি আমাকে উদ্বাদ ভাবছে। ভাবুক উদ্বাদকে উদ্বাদ ভাববে না তো কি ভাববে?

বাত দুটা দশ —

আমার মা, এই কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করলেন। দুপুর রাতে তাঁর টেলিফোন করার বদঅভ্যাস আছে। আমার মা'র অনিদ্রা রোগ আছে, কুক্ষেই তিনি মনে করেন পৃথিবীর সবাই অনিদ্রা রুগ্নী। যাই হোক, আমি জেগে ছিলাম। বললেন, ঝুঁড়ি তুই আমার কাছে চলে আয়। আমি বললাম, না রাশেদকে ফেলে আমি যাব না।

মা বললেন, আমি তো শুনলাম ওকে নিষ্ঠেই তোর সমস্যা।

'ওকে নিয়ে আমার কেন সমস্যা নেই মা। I love him, I love him, I love him.

'টিংকাব কবছিস কেন?'

'টিংকাব কবছি না। মা' টেলিফোন রাখি। কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে বাখ্লাম। রাশেদকে ফেলে যাবার প্রশ্নই উঠে না। আমার ধারণা রাশেদ নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেও এখন রাতে ঘুমায় না। গ্রুপ ফিঙুরীর যে সমস্যাটি নিয়ে সে ভাবছিল, সেই সমস্যার সমাধান অন্য কে না—কি বের করে ফেলেছে। জ্ঞানালে ছাপা হয়েছে। সে গত পরশু ঐ জ্ঞানাল পেয়ে কৃচি কৃচি করে ছিড়েছে। শুধু তাই না — বারাদার এক কোণায় বসে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে শুরু করেছে। আমি সান্দুনা দেবাব জ্ঞন্য তার কাছে শিয়ে চফকে উঠলাম। সে কাঁদছে ঠিকই কিন্তু তার বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়েছে। ডান চোখ শুকনো।

আমি তাকে কিছু বললাম না। কিন্তু সে আমার চাউনি থেকেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। নীচু গলায় বলল, জুড়ি, ইদানীং এই ব্যাপারটা হচ্ছে — মাকে মাকেই দেখছি বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

কথাগুলি বলার সময় তাকে এত অসহায় লাগছিল যে আমার ইচ্ছা করছিল তাকে জড়িয়ে ধরে বলি — I love you, I love you, I love you.

হে সৈশ্বর। হে পরম কর্কণাময় সৈশ্বর। এই ভয়াবহ সমস্যা থেকে তুমি আমাদের দুঃজনকে উদ্ধার কর।

স্কেচ বুকের প্রতিটি লেখা বার বার পড়ে মিসির আলি খুব বেশি তথ্য বের করতে পারলেন না, তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা জ্ঞান গেল তা হচ্ছে — যেয়েটি তার স্বামীকে ভালবাসে। যে ভালবাসায় এক ধরনের সারল্য আছে।

স্কেচ বুকে কিছু স্প্যানিশ ভাষায় লেখা কথাবার্তাও আছে। স্প্যানিশ ভাষা না জ্ঞানার কারণে তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হল না। তবে এই লেখাগুলি যেভাবে সাজানো তাতে মনে হচ্ছে — কবিতা কিংবা গান হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মডার্ন ল্যাংগুয়েজ ইনসিটিউটে স্কেচ বুক নিয়ে গেলেই ওরা পাঠোকারের ব্যবস্থা করে দেবে — তবে মিসির আলির মনে হল তার প্রয়োজন নেই। আজানার তিনি জ্ঞেনেছেন। এর বেশি কিছু জ্ঞানার নেই।

॥ ৩ ॥

রাশেদুল করিম ঠিক ছটায় এসেছেন। মনে হচ্ছে বাহুবে অস্থেক্ষণ করছিলেন। ঠিক ছটায় বাজার পর কলিং বেলে হাত রেখেছেন। মিসির আলি দরজা খুলে বললেন, আসুন।

রাশেদুল করিমের জ্ঞন্যে সামান্য বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তার জ্ঞন্যে টেবিলে দুধ ছাড়া চা। মিসির আলি বললেন, আপনি কঁটায় কঁটায় ছাটায় আসবেন বলে ধারণা করেই চা আনিয়ে রেখেছি। লিকার কড়া হয়ে গেছে বলে স্বাস্থ্য ধারণা। খেঘে দেখুন তো।

রাশেদুল করিম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, ধন্যবাদ।

মিসির আলি নিজের কাপ হাতে নিতে বললেন, আপনাকে একটা কথা শুনতেই বলে নেয়া দরকার। আমি মাঝে মাঝে নিজের শখের কারণে — সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি। তার জন্যে কখনো অর্থ গ্রহণ করি না। আমি যা করি তা আমার পেশা না — নেশা বলতে পারেন। আপনার ডলার আমি নিতে পারছি না। তাছাড়া অধিকাংশ সময়ই আমি সমস্যার কোন সমাধানে পৌছতে পারি না। আমার কাছে ‘পাঁচশ’ পৃষ্ঠার একটা নোট বই আছে। ঐ নোট বই ভর্তি এমন সব সমস্যা — যার সমাধান আমি বের করতে পারিনি।

‘আপনি কি আমার সমস্যাটার কিছু করেছেন?’

‘সমস্যার পূরো সমাধান বের করতে পারিনি — আংশিক সমাধান আমার কাছে আছে। আমি মেটামুটিভাবে একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছি। সেই সম্পর্কে আপনাকে আমি বলব, আপনি নিজে ঠিক করবেন — আমার হাইপোথিসিসে কি কি ক্রটি আছে। তখন আমরা দুজন মিলে ক্রটিগুলি ঠিক করব।’

‘শুনি আপনার হাইপোথিসিস।’

‘আপনার স্ত্রী বলেছেন, ঘূরুবার পর আপনি মৃত মানুষের মত হয়ে যান। আপনার হাত-পা নড়ে না। পাথরের মূর্তির মত বিছানায় পড়ে থাকেন। তাই না?’

‘হ্যাঁ — তাই।’

‘স্লীপ এ্যানালিস্টরা আপনাকে পরীক্ষা করে বলেছেন — আপনার ঘূর সাধারণ মানুষের মূর্মের মতই। ঘূরের মধ্যে আপনি স্বাভাবিক ভাবেই নড়াচড়া করেন।’

‘জ্ঞি — কয়েকবারই পরীক্ষা করা হয়েছে।’

‘আমি আমার হাইপোথিসিসে দুজনের বক্তব্যই সত্য ধরে নিছি। সেটা কিভাবে সত্য? একটিমাত্র উপায়ে সত্য — আপনি যখন বিছানায় শুয়েছিলেন তখন ঘূরছিলেন না। জ্ঞেগে ছিলেন।’

রাশেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বললেন, কি বলছেন আপনি?

মিসির আলি বললেন, আমি গতকালও লক্ষ্য করেছি — আজও লক্ষ্য করছি আপনার বসে থাকার মধ্যেও এক ধরনের কঠিন্য আছে। আপনি আরাম করে বসে নেই — শিরদীড়া সোজা করে বসে আছেন। আপনার দুটা হাত হাঁটুর উপর রাখা। দীর্ঘ সময় চলে গেছে আপনি একবারও হাত বা পা নাড়ান নি। অথচ স্বাভাবিকভাবেই আমরা হাত-পা নাড়ি কেউ কেউ পো নাচান।

রাশেদুল করিম চুপ করে রইলেন। মিসির আলি বললেন, ঐ রাতে আপনি বিছানায় শুয়েছেন — মূর্তির মত শুয়েছেন। চোখ বন্ধ করে ভাবছেন আপনার সবক্তব্যের সমস্যা নিয়ে। গভীরভাবে ভাবছেন। মানুষ যখন গভীরভাবে কিছু ভাবে তখন এবং ধরনের ট্রেন্স স্টেটে ভাবজগতে চলে যায়। গভীরভাবে কিছু ভাবা হচ্ছে এক ধরনের মেডিটেশন। রাশেদুল করিম সাহেব।

‘জ্ঞি।’

‘অংকে নিয়ে ঐ ধরনের গভীর চিন্তা কি আপনিই করেন না?’

‘জ্ঞি, করি।’

‘আপনি কি লক্ষ্য করেছেন এই সমস্ত আশেপাশে কি ঘটছে তা আপনার খেয়াল থাকে মা।’

‘লক্ষ্য করেছি।’

‘আপনি নিশ্চব্বই আরো লক্ষ্য করেছেন যে, এই অবস্থায় আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিচ্ছেন। লক্ষ্য করেননি?’

‘করেছি।’

‘তাহলে আমি আমার হাইপোথিসিসে ফিরে আসি। আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন। আপনার মাথায় অংকের জটিল সমস্য। আপনি ভাবছেন, আর ভাবছেন। আপনার হাত-পা নড়ছে না। নিঃশ্বাস এত ধীরে পড়ছে যে মনে হচ্ছে আপনি মৃত।’

রাশেদুল করিম সাহেব সানগ্লাস খুলে — এক দ্রষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, ভাল কথা আপনি কি লেফ্ট হ্যানডেড পারসন? ন্যাটা?

জন্মলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

‘আমার হাইপোথিসিসের জন্যে আপনার লেফ্ট হ্যানডেড পারসন হওয়া শুধুই প্রয়োজন।’

‘কেন?’

‘বলছি। তার আগে — শুরুতে যা বলছিলাম সেখানে ফিরে যাই। দৃশ্যটি আপনি দয়া করে কঢ়েন করুন। আপনি এক ধরনের ট্রেস অবস্থায় আছেন। আপনার স্ত্রী জেগে আছেন — ভীত চোখে আপনাকে দেখছেন। আপনার এই অবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা হল আপনি মারা গেছেন। তিনি আপনার গায়ে হাত দিয়ে আরো ভয় পেলেন। কারণ আপনার গা হিমশীতল।’

‘গা হিমশীতল হবে কেন?’

‘যানুষ যখন গভীর ট্রেস স্টেটে চলে যায় তখন তার হার্ট বিট করে যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে বয়। শরীরের টেম্পারেচার দুই খেকে তিন ডিগ্রী পর্যন্ত নেমে যায়। এইটুকু নেমে যাওয়া মানে অনেকখানি নেমে যাওয়া। যাই হোক আপনার স্ত্রী আপনার গায়ে হাত দেয়ার ফিল্টুকশের মধ্যেই আপনি তাকালেন — তাকালেন, কিন্তু এক চোখ মেলে। বাঁ চোখে ডান চোখটি তখনো বক্ষ।’

‘কেন?’

‘ব্যাখ্যা করছি। রাইট হ্যানডেড পারসন যারা আছে তাদের এক চোখ করে অন্য চোখে তাকাতে বললে তারা বাঁ চোখ বক্ষ করে ডান চোখে তাকাবে। ডান চোখ বক্ষ করে বাঁ চোখে তাকানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সম্ভব শুধু যারা ন্যাটা জন্মের জন্যেই। আপনি লেফ্ট হ্যানডেড পারসন — আপনি এক ধরনের গভীর ট্রেস স্টেটে আছেন। আপনার স্ত্রী আপনার গায়ে হাত রেখেছেন। আপনি কি হচ্ছে জানতে চাচ্ছেন? চোখ মেলছেন। দুটি চোখ মেলতে চাচ্ছেন না। গভীর আলস্যে একটা চোখ কোরাম্বেট ফেললেন — অবশ্যই সেই চোখ হবে বাঁ চোখ। আমার যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?’

রাশেদুল করিম হ্যাঁ-না কিছু বললেন না।

মিসির আলি বললেন, ‘আপনার স্ত্রী আরো ভয় পেলেন। সেই ভয় তাঁর রক্তে মিলে

গেল। কারণ শুধুমাত্র একবার এই ব্যাপার ঘটেনি, অনেকবার ঘটেছে। আপনার কথা থেকেই আমি জ্ঞেনেছি সেই সময় অংকের একটি জটিল সমাধান নিয়ে আপনি ব্যস্ত। আপনার সমগ্র চিন্তা-চেতনায় আছে — অংকের সমাধান — নতুন কোন ঘিরী। নয়—কি?

‘হ্যা’

‘এখন আমি আমার হাইপোথিসিসের সবচেয়ে জটিল অংশে আসছি। আমার হাইপোথিসিস বলে আপনার স্ত্রী আপনার চোখ গেলে দেননি, তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। তিনি আপনার চোখের প্রেমে পড়েছিলেন। একজন শিঙ্গী মানুষ কখনো সুন্দর কোন সৃষ্টি নষ্ট করতে পারেন না। তবুও যদি ধরে নেই তাঁর মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠে পিয়েছিল এবং তিনি এই ভয়াবহ কাণ্ড করেছেন — তাহলে তাঁকে এটা করতে হবে ঝোকের মাথায় — আচমকা। আপনার চোখ গেলে দেয়া হয়েছে পেনসিল — যে পেনসিলটি আপনার মাথার বালিশের নিচে রাখা। যিনি ঝোকের মাথায় একটা কাজ করবেন তিনি এত যত্নশা করে বালিশের নিচে থেকে পেনসিল নেবেন না। হয়তবা তিনি জ্বানতেনও না বালিশের নিচে পেনসিল ও মোট বই নিয়ে আপনি ঘুমান।’

রাশেদুল করিম বললেন, কাজটি তাহলে কে করেছে?

‘সেই প্রসঙ্গে আসছি, আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন? বানিয়ে দেব?’

‘না।’

‘এ্যাকসিডেন্ট কিভাবে ঘটিল তা বলার আগে আপনার স্ত্রীর লেখা ডায়েরীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক জ্বায়গায় তিনি লিখেছেন, আপনার বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ত। কথাটা কি সত্যি?’

‘হ্যা, সত্যি।’

‘কেন পানি পড়তো? একটি চোখ কেন কাঁদতো? আপনার কি ধারণা?’

রাশেদুল করিম বললেন, ‘আমার কোন ধারণা নেই। আপনার ধারণাটা কলুন। আমি অবশ্যি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ডাক্তার বলেছেন’ এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। যে গ্ল্যান্ড চোখের জল নিয়ন্ত্রণ করে সেই গ্ল্যান্ড বাঁ চোখে বেশি কর্মক্ষম ছিল।’

মিসির আলি বললেন, এটা ‘একটা মজার ব্যাপার। হঠাৎ কেন বাঁ চোখের গ্ল্যান্ড কর্মক্ষম হয়ে পড়ল। আপনি মনে মনে এই চোখকে আপনার সব রকম অশান্তির মূল বলে। কিছুতে করার জন্যেই কি এটা হল? আমি ডাক্তার নই। শরীরবিদ্যা জ্ঞানি না। তবে আমি দুষ্টন বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বলেছেন, এটা হতে পারে। মোটেই আঘাতাত্তীক নয়। গ্ল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করে মতিষ্ক। একটি চোখকে অপছন্দও করছে মতিষ্ক।

‘তাতে কি প্রমাণ হচ্ছে?’

মিসির আলি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, তাতে একটি জিমসই প্রমাণিত হচ্ছে — আপনার বাঁ চোখ আপনি নিষ্পেই নষ্ট করেছেন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে রাশেদুল করিম ভাসা গলায় বললেন, কি বলছেন আপনি?

‘কনসাস অবস্থায় আপনি এই ভয়ংকর ক্ষমতা করেননি। করেছেন সাব কনসাস অবস্থায়। কেবল করেছেন তাও বলি, আপনি আপনার স্ত্রীকে অসম্ভব ভালবাসেন। সেই স্ত্রী আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। কেবল দূরে সরে যাচ্ছেন? কারণ তিনি ডয় পাচ্ছেন

আপনার বাঁ চোখকে। আপনি আপনার স্ত্রীকে হারাচ্ছেন বাঁ চোখের জন্যে। আপনার ভেতর রাগ, অভিমান জমতে শুরু করেছে। সেই রাগ আপনার নিজের একটি প্রত্যঙ্গের উপর। চোখের উপর। এই বগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রচণ্ড হতাশা। আপনি যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন সেই গবেষণা অন্য একজন করে ফেলেছেন। জ্ঞানে তা প্রকাশিত হয়ে গেছে। আপনার চোখ সমস্যা তৈরি না করলে এমনটা ঘটতো না। নিজেই গবেষণাটা শেষ করতে পারতেন। সব কিছুর জন্যে দায়ী হল চোখ।

মিসির আলি আরেকটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমার এই হাইপোথিসিসের পেছনে আরেকটি শক্ত যুক্তি আছে। যুক্তিটি বলেই আমি কথা শেষ করব।

‘কলুন।’

‘আপনার স্ত্রী পুরোপুরি যান্তিক্কবিকৃত হ্বার পরে যে কথাটা বলতেন, তা হল — এই লোকটা পিশাচ। আমার কাছে প্রমাণ আছে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু প্রমাণ আছে। তিনি এই কথা বলতেন কারণ পেনসিল দিয়ে নিজের চোখ নিজের গেলে দেয়ার দশ্য তিনি দেখেছেন। আমার হাইপোথিসিস আমি আপনাকে বললাম। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।’

রাশেদুল করিম দীর্ঘ সময় চূপ করে রইলেন।

মিসির আলি আরেকবার বললেন, ভাই চা করব? চা খাবেন?

তিনি এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন নাঁ। উঠে দাঁড়ালেন। চোখে সানগ্লাস পরলেন। শুকনো গলায় বললেন, যাই?

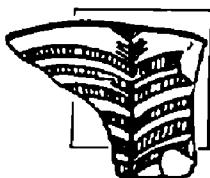
মিসির আলি বললেন, মনে হচ্ছে আমি আপনাকে আহত করেছি — কষ্ট দিয়েছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। নিজের উপরেও বাগ করবেন না। আপনি যা করেছেন—প্রচণ্ড ভালবাসা থেকেই করেছেন।

রাশেদুল করিম হাত বাড়িয়ে মিসির আলির হাত ধরে ফেলে বললেন, আমার স্ত্রী বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতাম — আপনি দেখতেন সে কি চমৎকার একটি মেয়ে ছিল। এবং সেও দেখতো — আপনি কত অসাধারণ একজন মানুষ। ঐ দুঃটিনার পর জুড়ির প্রতি তীব্র ঘণ্টা নিয়ে আমি বেঁচে ছিলাম। আপনি এই অন্যায় ঘণ্টা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন। জুড়ির হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভদ্রলোকের গলা ধরে এল। তিনি চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলে বললেন, মিসির আলি সাহেব। ভাই দেখুন — আমার দুটি চোখ থেকেই এখন পানি পড়ছে। চোখ পাথরের হলেও চোখের অক্ষগুরুত্ব এখনো কার্যকর। কূড়ি বছর পর এই ঘটনা ঘটল। আচ্ছা ভাই, যাই।

দু' মাস পর আমেরিকা থেকে বিমান ডাকে মিসির আলি কিছু একটা প্যাকেটে পেলেন। সেই প্যাকেটে জল রঞ্জে আঁকা একটা চেরী গাছের ছবি। অপর ছবি

ছবির সঙ্গে একটি নেট। রাশেদুল করিম সাহেব জানেছেন, আমার সবচে’ প্রিয় জিনিসটি আপনাকে দিতে চাচ্ছিলাম। এই ছবিটিকে চেরে প্রিয় কিছু এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। কোনদিন হাঁপ বলেও মনে হয় না।



৫ কজন গ্রীতদাস

কথা ছিল পারুল নটার মধ্যেই আসবে।

কিন্তু এল না। বারোটা পর্যন্ত দাঙিয়ে রইলাম একা একা। চোখে জল আসবার মত কষ্ট হতে লাগল আমার। মেয়েগুলি বড় খেয়াল হয়।

বাসাস্ব এসে দেখি ছোট্ট চিরকূট লিখে ফেলে গেছে। “সঞ্চায় ৬৯৭৬২১ নম্বরে ফোন করো — পারুল।” তদের পাশের বাড়ীর ফোন। আগেও অনেকবার ব্যবহার করেছি। কিন্তু আজ তাক ফোনে ডাকতে হবে কেন? অনেক আলাপ আলোচনা করেই কি ঠিক করা হয়নি আজ সোমবার বেলা দশটায় দুঃখন টাস্টাইল চলে যাব। সেখানে হারুনের বাসায় আশাদের বিয়ে হবে।

সারা দুপুর শুয়ে রইলাম। হোটেল থেকে ভাত এনেছিল। সেগুলি স্পর্শও করলাম না। ছোটবেলায় যে রকম রাগ করে ভাত না খেয়ে থেকেছি আজও যেন রাগ করবার মত সে রকম একটি ছেলেমানুষী ব্যাপার হয়েছে। ‘পারুলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়েছে’ — এই ভাবতে ভাবতে নিজেকে খুব তুচ্ছ ও সাধান্য মনে হতে লাগল। সঞ্চায়েলো টেলিফোন করবার জন্যে যখন বেরিয়েছি তখন অভিমানে আমার ঠোট ফুলে রয়েছে। গ্রীন ফার্মেসীর মালিক আমাকে দেখে আঁককে উঠে বললেন, অসুখ নাকি ভাই?

আমি শুকনো গলায় বললাম, একটা টেলিফোন করব।

পারুল আশেপাশেই ছিল। রিনরিনে দ্রু—সাত বছর বয়েসের ছেলেদের মত গলা যা শুনলে বুকের মধ্যে সুখের মত ব্যথা বোধ হয়।

হ্যালো শোন, কিউডারগার্টেনের মাস্টারীটা পেয়েছি। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? বড় ডিস্টাৰ্ব হচ্ছে লাইনে।

পারুলের উৎফুল্ল সতেজ গলা শুনে আমি ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম। তেজস্ববোধ তোতলাতে কোনরকমে বললাম, আজ নটার সময় তোমার আসবার কথা ছিল।

মনে আছে, মনে আছে। শোন তারিখটা একটু পিছিয়ে দাও। এখন ক্ষেত্রাবি সে রকম ইয়াজেন্সি নেই। তা ছাড়া . . .

তা ছাড়া কি?

তোমার ব্যবসায় এখন যা অবস্থা বিয়ে করলে দুঃখনকেই একেবলো খেয়ে থাকতে হবে।

হড়বড় করে আরো কি কি যেন সে কলল। হাসির শব্দেও শুনলাম একবার। আমি বুবতে পারলাম পারুল আর কখনোই আমাকে বিয়ে করতে আসবে না। কাল তাকে নিয়ে ঘর সাজাবার জিনিসপত্র কিনেছি। সারা নিউ মার্কেট খুব সুন্দর হয়ে সে কেনাকাটা করেছে। দোকানীকে ডবল বেডসৈট দেখাতে বলে সে লজজায় মুখ শাল করেছে। এবং আজ সঞ্চায়েই

শুব সহজ সূরে বলছে, 'তোমার ব্যবসার এখন যা অবস্থা'। আঘাতটি আমার জন্যে খুব উত্তে ছিল। আমাব সাহস কম নন তো সে রাতেই আমি বিষ খেয়ে ফেলতাম বিংবা তিনিলা থেকে বাস্তায় লাফিয়ে পড়তাম। আমি বড় অভিযানী হয়ে জ্বেছি।

সে বৎসর আরো অনেকগুলি দুঃঘটনা ঘটল। ইরফানের কাছে আমার চার হাজার টাকা জমা ছিল। সে হঠাৎ যাবা গেল। যামগঞ্জে এক ওয়াগন লকশ বুক করেছিলাম। সেই ওয়াগনটি একেবারে উঁচোও হয়ে গেল। পার্কের কুচি সপ্লাইয়ের কাজটায় বড় বকমের লোকসান দিলাম। ভদ্রভাবে থাকবার মত পয়সাতেও শেষ পর্যন্ত টান পড়ল। মেয়েরা বেশ ভাল আনন্দাজ করে। পার্কল সত্যি সত্যি আমার ভবিষ্যৎটা দেখে ফেলেছিল। পার্কলের সঙ্গে যোগাযোগ করে গেল। আমি নিজে কখনো যেতাম না তার কাছে। তবু তার সঙ্গে যাবে মধ্যে দেখা হয়ে যেত। হয়ত বাস স্টপে দুঃখন একসঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছি। পার্কল আমাকে দেখামাত্রই আন্তরিক সূরে বলেছে, কি আশ্চর্ষ, তুমি! একি স্বাস্থ্য হয়েছে তোমার? ব্যবসাপত্র কেমন চলছে?

চলছে ভালই।

ইস বড় রোগা হয়ে গেছ তুমি। চা খাবে এক কাপ? এসো তোমাকে চা খাওয়াবো।

দুপুরকেলা সিনেমা হলের সামনে একদিন দেখা হয় গেল। আমি তাকে দেখতে পাইনি এরকম একটা ভান করে রাস্তায় নেমে পড়লাম। কিন্তু সে পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, এই এই। সিনেমা দেখতে এসেছিলে নাকি?

না।

শোন, একটা কথা শুনে যাও।

কি?

আমার এক বাঙ্গবীর ছেলের আজ জন্মদিন। পুরী একটা উপহার আমাকে চয়েস করে দাও। চল আমার সাথে।

পার্কলকে যতবার দেখি ততবারই অবাক লাগে। তিনশ' টাকার স্কুল মাস্টারী তাকে কেমন করে এতটা আত্মবিশ্রামী আর অহংকারী করে তুলেছে, ভেবে পাই না। ভুলেও সে আমাদের প্রসঙ্গ ভুলে না। এক সোমবারে আমরা যে একটি বিয়ের দিন ঠিক করেছিলাম তা যেন বাঙ্গবীর ছেলের জন্মদিনের চেয়েও অবিস্কৃত ব্যাপার। তার উজ্জ্বল চোখ, দৃঢ় কথাবালার ভঙ্গি স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় জীবন অনেক অর্থবহ ও সুরভিত হয়ে হাত ঝাড়িয়েছে তার দিকে।

এগুলি মাসের তের তারিখে পার্কলের বিয়ে হয়ে গেল। নিমজ্জনের কান্তে পাঠিয়ে সে যে আমাকে তার আর একটি নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখায়নি সেই জন্যে আমি তাকে প্রায় ক্ষমা করে ফেললাম। সেদিন সক্ষ্যায় আমি একটি ভাল রেস্টুরেন্টে খেয়ে অনেকাই পর সিনেমা দেখতে গেলাম। সিনেমার শেষে বস্তুর বাড়ীতে অনেক রাত পর্যন্ত হাত্যামে গল্প করতে লাগলাম। এমন একটা ভাব করতে লাগলাম যেন পার্কলের বিয়েতে আমার বিশেষ কিছুই ঘায় আসে না। একজনের সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে অন্য একজনকে বিয়ে করা যেন খুব একটা সাধারণ ব্যাপার, অহরহই হচ্ছে।

সে রাতে ঘরের বাতাস আমার কাছে উঁচু ও আর্দ্ধ মনে হতে লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এজ না। শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত ভাবলাম ব্যবসার অবস্থাটি অস্প একটু ভালো হলেই একটি

সরল দৃঢ়ী-দৃঢ়ী চেহারাব মেয়েকে বিয়ে করে ফেলব। এবং সেই মেয়েটির সঙ্গে পারুলের হৃদয়হীনতার প্রশ্ন করতে হা হা করে হাসবো।

কিন্তু দিনদিন অমাব অবস্থা আরো খাবাপ হল। একটা ছেট খট কন্ট্রিক্ট নিয়েছিলাম। তাতে সঞ্চিত টাকার সবটাই নষ্ট হয়ে গেল। একেবাবে ডুবে ঘাবার ঘন্ত অবস্থা। চাকর ছেলেটিকে ছড়িয়ে দিতে হল। দুএকটি সৌখিন জিনিসপত্র (একটি শ্রী বেগ ফিলিপ্স ট্রানজিস্টাৰ, একটি ন্যাশনাল রেকোর্ড প্লেয়ার, একটি দামী টেবিল ঘড়ি) যা বহু কষ্ট করে কৃপণের ঘন্ত পৰসা জমিয়ে জমিয়ে কিনেছি, বিক্রি করে দিলাম। এবং তারপৰও আমাকে একদিন শুধু হফ পাউণ্ডের একটি পাউরটি খেয়ে থাকতে হল।

সহায় সফলহীন একটি ছেলের কাছে এ শহুর যে কি পৰিমাণ হৃদয়হীন হতে পারে তা আমাব চিঞ্চাৰ বাইরে ছিল। নিষ্ঠাৰ এবং অকৰণ এই শহুরে আমি ঘূৰে বেড়াতে লাগলাম। সে সময় সাৱাঙ্কণ্ঠই কিধেব কষ্ট লেগে থাকতো। ফুটপাতেৰ পাশে চটেৰ পাৰ্দাৰ আড়ালে ভাতেৰ দোকানগুলি দেখলেই মন খাবাপ হয়ে যেত। দেখতাম রিকশাৰালা শ্ৰেণীৰ লোকৱা উৰু হয়ে বসে গ্ৰাস পাকিষ্যে মহানন্দে ভাত খাচ্ছে। চুম্বকেৰ ঘন্ত সেই দশ্য আমাকে আকৰ্ষণ কৰত। ‘আহ ওৱা কি সুখেই না আছে!’ — এই রকম মনে কৰে আমাব চোখ ভিজে উঠত। আমি বেঁচে থাকাৰ জন্যে প্ৰাণপথ চেষ্টা কৰে যেতে লাগলাম। ‘নিউ ইংক’ কালি কোম্পানীৰ সেলসম্যানেৰ চাকৰি নিলাম একবাৰ। একবাৰ কাপড়কাঁচা সাৰানৈৰ বিজ্ঞাপন লেখাৰ কাজ নিলাম। পারুলকে আমাৰ মনেই রইল না। বেয়ালুম ভুলে গেলাম।

একদিন সঞ্জ্যাবেলা মোহাম্মদপুৰ বাজাৰেৰ কাছ দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি পারুল। সঙ্গে ফুটফুটে একটি বাচ্চা। পায়ে লাল জুতো, মুখটি ডল পুতুলেৰ ঘন্ত গোলগাল। পারুলেৰ শাড়ীৰ আঁচল ধৰে টুকুটুক কৰে হাঁটছে। পারুল যাতে আমাকে দেখতে না পায় সেই জন্যেই আমি সুঁট কৰে পাশেৰ গলিতে ঢুকে পড়লাম। অথচ তাৰ কোন প্ৰয়োজন ছিল না। পারুলেৰ সমস্ত ইলিয় তাৰ মেয়েটিতে নিবন্ধ ছিল। মাত্ৰ এক মুহূৰ্তেৰ জন্য আমাৰ মনে হল এই চমৎকাৰ ডল পুতুলেৰ ঘন্ত মেয়েটি আমাৰ হতে পাৰতো। কিন্তু পৰক্ষণেই সোৱহান মিয়া হয়ত আমাকে কাজ্জটা দেবে না। এই ভাবনা আমাকে অস্ত্ৰি কৰে ফেলল।

আমাৰ ভাগ্য ভাল। কাজ্জটা হয়ে গেল। রোজ সকালে সেগুন বাগিচা থেকে হেঁটে হেঁটে মোহাম্মদপুৰে আসি। সমস্ত দিন সোৱহান মিয়াৰ ইন্ডেন্টিং ফার্মেৰ হিসাব নিকাশ দেখে অনেক রাতে সেগুন বাগিচায় ফিরে যাই। নিৱানন্দ একদৰ্শে ব্যবস্থা। গভীৰ রাতে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে গেল মৰে যেতে ইচ্ছে কৰে।

ৱাস্তায় আমি মাথা নীচু কৰে হাঁটি। পৱিচিত কেউ আমাকে উচ্চস্বৰে ডেকে উঠুক তা এখন আৱ চাই না। কিন্তু তবু পারুলেৰ সঙ্গে আৱো দুৰ্বাৰ আমাৰ মুখ্য হয়ে গেল। একবাৰ দেখলাম জড়-ফেলা রিকশায় সে বসে, চোখে বাহাৰি সানগ্লাস আৱপাশে চমৎকাৰ চেহারাৰ একটি ছেলে (খুব সৰ্ব এই ছেলেটিকেই সে বিয়ে কৰেছে কৰুণ সফিকেৰ কাছে শুনেছি পারুলেৰ বৰ হ্যাণ্সাম এবং বেশ ভাল চাকৰি কৰে) স্থিতীয়বাৰ দেখলাম অন্য একটি মেয়েৰ সঙ্গে হাসতে হাসতে যাচ্ছে। কোনোবাৰই সে আমাকে দেখতে পাৱনি। অবশ্যি দেখতে পেলেও সে আমাকে চিনতে পাৱত না। অভাৱ অস্থাৱাৰ ও মূৰ্ভাৰনা আমাৰ চেহারাকে সম্পূৰ্ণ পাল্টে দিয়েছিল। তাছাড়া পুৱানো বঙ্গদেৱ কৰণা ও কৌতৃহল থেকে বাঁচবাৰ জন্যে আমি

দাঢ়ি রেখেছিলাম। লম্বা দাঢ়ি ও ভাঙা চোঁচালই আমার পরিচয়কে গোপন বাধবার জন্যে যথেষ্ট ছিল। তবু আমি হাত দুলিয়ে অন্য বকম ভঙ্গিতে হাঁটা অভ্যাস করলাম। যার জন্যে সফিক (ধার সঙ্গে এক বিছানায় অনেকদিন ঘুমিয়েছি) পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারেনি। চেহারা পরিচিত খনে হলে যানুষ যে বকম পিট পিট করে দু'একবার তাকায় তাও সে ভাকায়নি

আমি নিশ্চিত, পারলের সঙ্গে কোন একদিন চোখাচোখি হবে। এবং সেও চিনতে না পেরে সফিকের মত ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে যাবে। কিন্তু পারল আমাকে এক পলকে চিনে ফেলল। আমাকে দেখে সে হতভয় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু' এক মৃহূর্ত সে কোন কথা বলতে পারল না। আমি খুব স্বাভাবিক গলায় বললাম, তাল আছ পারল? অনেকদিন পরে দেখা। আমার খুব একটা জরুরী কাজ আছে। যাই তাহলে কেমন?

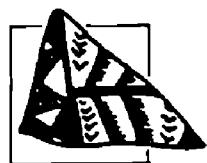
পারল আশ্চর্য ও দৃঢ়বিত চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি যখন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি তখন সে কথা বলল, তোমার এমন অবস্থা হয়েছে?

আমি অল্প হাসির ভঙ্গি করে হাঙ্কা সুরে বলতে চেষ্টা করলাম, ব্যবসাটা ফেল মেরেছে পারল। আচ্ছা যাই তাহলে?

পারল সে কথার জবাব দিল না। আমি বিশ্বিত হয়ে দেখি তার চোখে পানি এসে পড়েছে। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঝাস্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল।

পারলকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যে জীবন আমার শুরু হয়েছে সেখানে প্রেম নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু সামান্য কয়েক ফৌটা মূল্যহীন চোখের জলের মধ্যে পারল নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করল। সমস্ত দৃঢ় ছাপিয়ে তাকে হারানোর দৃঢ়ত্ব নতুন করে অনুভব করলাম।

আমার জন্যে এই দৃঢ়খ্টার বড় বেশি প্রয়োজন ছিল।



অপরাহ্ন

রিকশাওয়ালাটাকে ইসহাক সাহেবের পছন্দ হল না।

কেমন উচ্ছৃত ভাবভঙ্গি। ঘামে ভেজা চকচকে মুখ। ঘাড় পর্মসু লম্বা চুল। দেখেই মনে হচ্ছে এ নির্বিকার ভঙ্গিতে ট্রাকের সামনে রিকশা নিয়ে চলে যাবে। জালবাতির দিকে ফিরেও তাকাবে না এবং ভাড়া নিয়ে গশগোল করবে। ভাড়া দেয়ার প্রতিক্রিয়া হয়ে বলবে, সাত টেকা ঠিক কইৱা পাঁচ টেকা দেন কেন?

অবশ্যি এই লোক এ রকম নাও করতে পারে। যামুমের চেহারা দেখে তার মনের ভাব টের পাওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু লোকটির মুখ লাগব। লম্বা চুল মানেই একটা ফ্যাশনের

ব্যাপার। একজন রিকশাওয়ালা যখন ফ্যাশন করে তখন বুঝতে হবে তার ভেতরে কোন আমেলা আছে।

ইসহাক সাহেব বললেন, কিমাতলা কত নিবে? রিকশাওয়ালা পিচ করে তার টিক সামনেই খুপু ফেলে বলল, যা নায় ভাড় হয় দিবেন।

নায় ভাড়টা কত, শুনি?

রিকশাওয়ালা বিরক্ষ মুখে তাকাল। কোন উত্তর দিল না। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে সে আমেলাটা করবে নায় ভাড় নিয়ে। যখন তাকে ভাড় দেয়া হবে সে থমথমে গলায় কলবে, এইটা কি দিলেন? এমন হৈচে শুরু করবে যে চাবদিকে লোক জয়ে যাবে।

ইসহাক সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, পাঁচ টাকা দেব — যাবে? রিকশাওয়ালা হ্য-না কিছুই কলল না। পিচ করে আবার খুপু ফেলল। মনে হচ্ছে তার যাবার ইচ্ছা নেই।

আকাশে ঝুন মাসের রোদ ঝাঁ ঝা করছে। আগে এই রোদে রাস্তার পিচ গলে যেত। এখন গলে না। এবা বোধ হয় রাস্তায় নতুন ধরনের কোন পিচ ব্যবহার করে।

কি যাবে নাকি?

উঠেন।

পাঁচ টাকায় রাজি হওয়া একটা সন্দেহজনক ব্যাপার। এই কড়া রোদে ভাড় পাঁচ টাকার বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু এ ব্যাটা রাজি হয়ে গেল কেন? অন্য কোন যতলব আছে নাকি? একবার তিনি গুলিঙ্গান থেকে নিউ মাকেট যাবেন — রিকশাওয়ালা তিন টাকায় রাজি হয়ে গেল। রহস্যটা টের পেলেন কিছুদূর যাবাব পৰ। রিকশাওয়ালা বিরাট এক কাহিনী কেঁদে বসল। যে কাহিনী বিশ্বাস করাব কোন প্রশ্নই উঠে না। আজই নাকি তার মেয়ের বিয়ে। সঙ্ক্ষয়াবেলা বরযাত্রি আসবে। তাদের দুটা ডালভাত খাওয়াতে হবে। কিন্তু সেই পয়সা এখনো জোগাড় হয়নি। রিকশার জমার টাকা উঠতে এখনো বাকি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

হত ফালতু কথা। তবু ইসহাক সাহেব তাকে একটা চকচকে দশ টাকাব নোট দিলেন এবং প্রতিষ্ঠা করলেন, এখন থেকে যারা কম ভাড়ায় যেতে চায় তাদের বিকশায় উঠবেন না।

এই ব্যাটা কম ভাড়ায় যেতে রাজি হয়েছে। এর কারণটা কি? ইসহাক সাহেব মনে মনে গল্পের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গল্পটা শুরু হবে কখন? কিন্তু শুরু হচ্ছে না। রিকশাওয়ালা মাথা নিচু করে, মাথার বাবড়ি চুল হাওয়ায় উড়িয়ে এক মনে চালাচ্ছে। গল্পটা হয়ত খারাপ নয়। ইসহাক সাহেব বললেন, এই তোমার নাম কি? রিকশাওয়ালা ঘৃণ্ণ ধূরাল।

আমারে কন?

হ্যাঁ। কি নাম?

ইসহাক।

বলে কি এ? এর নামও ইসহাক? ইসহাক সাহেবের অস্ত্র হতে লাগল। যদিও অস্ত্র বোধ করার কোনই কারণ নেই। মুসলমানদের নামের সংখ্যা অল্প। অল্প কিছু নামই ঘুরে ফিরে আসে। একবার এক বাড়িতে দাওয়াত থেতে গিয়ে সেখন বাবুটির নাম ইসহাক। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে সেই ইসহাকের সঙ্গে তাঁর চেচেয়াতেও খানিকটা মিল ছিল। বড়ই অস্ত্রিয় ব্যাপার। অবশ্যি এই রিকশাওয়ালার সঙ্গে তাঁর স্থায় কোন মিল নেই।

বাড়ি কোথায় তোমার?

আমারে কম ?

ইয়া । কোথায় তোমার বাড়ি ?

বড়ি-ঘব কিছু নাই । বড়ি-ঘব থাকলে কি রিকশা চালাই ?

গুমাও কোথায় ? রিকশার উপর তো নিশ্চয়ই গুমাও না ।

রিকশাওয়ালা জ্বাব দিল না । পিচ করে থুথু ফেলল । এই ব্যাটার থুথু ফেলাব রোগ আছে । অসম্ভব রোদ । ব্যাটার রিকশা টানতে কষ্ট হচ্ছে । ইসহাক সাহেবের অস্বস্তি বাড়তে লাগল । অস্বস্তির কারণ কি দুঃজনের একই নাম ? নামের প্রতি আমাদের কি অন্য এক ধরনের মরতা আছে ? হয়তো বা ।

তোমার ছেলেপুলে আছে নাকি ইসহাক মিয়া ?

আছে ।

কম্বজন ?

দুই মাইয়া ।

কি সর্বনাশ, বলে কি এই লোক ? তাঁরও দুই মেয়ে, লোপা এবং ইন্দ্রানী । তিনি দাক্ষণ উৎকষ্ঠা নিয়ে জিঞ্জেস করলেন, এদের নাম কি ?

নাম দিয়া কি করবেন ?

আহ, বল না ।

একজনের নাম হইল মিয়া . . .

বলতে বলতে সে রাস্তার পাশে হঠাতে রিকশা দাঢ় করিয়ে দিল ।

এ্যাই কি হয়েছে ?

শহিলটা খারাপ । পেটে ব্যথা ।

নতুন ধরনের কোন চাল কি ? শরীর খারাপের অঙ্গুহাতে বাড়তি কিছু লাভের চেষ্টা ? হয়ত এই রোদে তাঁর আর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না । ইসহাক সাহেবকে এখানেই নেমে যেতে হবে এবং পুরো পাঁচ টাকাই দিতে হবে । বিচিত্র কিছু না । এরা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত ।

ইসহাক সাহেব একটা সিগারেট ধরিয়ে আড়চোখে রিকশাওয়ালার দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলেন । শরীর খারাপের কতটা ভান কতটা সত্তি এটা ধরতে চান । তিনি দেখলেন সে ঘূটপাতে শুয়ে পড়েছে । দুঃহাতে খামচি দিয়ে তাঁর পেট ধরে রেখেছে । কোন রকম প্রক্রিয়া চিকিৎসা করছে না । কাজেই সম্ভবত ভান নয় । ভান হলে উঁ আঁ করে লেকে জমিয়ে ফেলত । এখানে কোন লোকজন জমছে না । পাঁচ ছ' বছর বয়সের একটা/টোকাই শ্রেণীর বালিকা কৌতুহলী চোখে দেখেছে । বালিকাটির মুখ হাসি হাসি, যেন সে খুব শঙ্গ পাচ্ছে ।

ইসহাক সাহেব রিকশা থেকে নামলেন । কি যন্ত্রণায় পড়া গেল । পাঁচটা টাকা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যাবেন কি ? এ রকম হৃদয়হীন কোন কাজ করা সম্ভব নয় ।

তোমার অসুবিধাটা কি ?

পেটে ব্যথা ।

এ রকম আগেও হয়েছে ?

হ্যাঁ, হইছে ।

এমন অসুখ নিয়ে রিকশা চালাও কেন ? পাপল নাকি ?

বিকশাওয়ালা লাল চোখে আকাল। চোখ দুটি এখন লাল হয়েছে না আগেই লাল ছিল তিনি লক্ষ্য করেননি।

সাব, আপনে আমার বিকশাটা দেখবেন। গরীব মানুষ বিকশা গেলে সর্বনাশ।
বিকশা যাবে কেন?

সাব একটু দেখবেন। বিকশাটা দেখবেন সাব। আপনার পায়ে ধরি।

বলতে বলতে সত্ত্ব সত্ত্ব তার পায়ে ধরবার জন্যে রিকশাওয়ালা এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল। তিনি চমকে পেছনে সরে ফেলেন। ঠিক তখন লোকটি একগাদা রক্ষিত করল। ইসহাক সাহেব কপালের ঘাম মুছে কাঁপা গলায় ডাকলেন, এ্যাহৈ এ্যাহৈ। এ্যাহৈ ইসহাক মিয়া।

সাব আমার বিকশা। আমার বিকশা।

দেখতে দেখতে চাবদিকে ভিড় জমল। মানুষের হন্দয় থেকে মমতা বোধহয় পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়নি। দুটি যুবক ছেলে তাকে ধরাধরি করে বেবী টেক্কাতে তুলল। নিয়ে যাবে পিঙ্গিতে। তার বিকশার দায়িত্ব নিতে অনেককেই আগ্রহী দেখা গেল। ইসহাক সাহেব কাউকে সে দায়িত্ব দিতে রাখি হলেন না। জুন মাসের প্রচণ্ড রোদে নিজেই বিকশা টেনে টেনে নিয়ে গেলেন সামেন্স ল্যাবোবেটোরীর পুলিশ ফাঁড়িতে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে? বিকশা জমা দিয়ে যে বাসায় চলে যাবেন সে উপায় নেই। যেতে হবে পিঙ্গিতে। ইসহাক মিয়াকে বলতে হবে — বিকশা জায়গামত আছে। সে সৃষ্ট হয়ে ফিরে এলে তার বিকশা ফেরত পাবে। অথচ আজ তাঁর সকাল সকাল বাসায় ফেরা দরকার। ইস্তানীর দাঁত ব্যথা। ছটার সময় তাকে ডেনটিস্টের কাছে নিতে হবে।

মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক যন্ত্রণা। ইসহাক সাহেব পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত যেতেই ঘেমে নেয়ে উঠলেন। তাঁর বড় বড় নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। খালি বিকশা এত ভারী হয় তাঁর ধারণা ছিল না। কৌতুহলী লোকজন দৃশ্যমান থেকে তাঁকে দেখছে। ঢাকা শহরের মানুষের কৌতুহলের শেষ নেই। একটা গর্ত খুঁড়ে রাখলেও তার চাবদিকে ভীড় জমে যায়। কমইন লোকজন গভীর আগ্রহে গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন এই মুহূর্তে গর্তের ভেতর থেকে অস্তুত কোন জন্ম লাফিয়ে বের হবে। ইসহাক সাহেবের পানির পিপাসা পেয়ে গেল। বুক খা খা করতে লাগল। আহ কি যন্ত্রণা! পরিচিত কেউ না দেখলে বাঁচা যায়। চেনা-জানা কারো সঙ্গে দেখা হলে খুব কম করে হলেও এক লক্ষ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। অফিসের নিজামুদ্দিনের সঙ্গে যদি দেখা হয় সে নির্বাক বলবে, আপনি অফ টাইমে বিকশা চালান তা তো জানতাম না। হা হা হা। এখান থেকে আজিমপুর যেতে কত মেবেন? নিজামুদ্দিনের স্বত্ত্বাবলোকন বদলিয়ে রাস্তা করা। ছেটলোক কোথাকার! ইসহাক সাহেব ‘পিচ’ করে খুঁত হেলালেন এবং দারুণ চমকে উঠলেন। তিনিও বিকশাওয়ালার মত খুঁত ফেলতে শুরু করেছেন। কি সর্বনাশের কথা।

পিঙ্গিতে ইসহাক মিয়াকে খুঁজে বের করতে দেরী হল না। ইমজিস্টিতে একটি বেঞ্চের উপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। যাথার উপর একটা ফান্ন ফ্যান প্রবল বেগে ঘুরছে এবং বাতাসে ইসহাক মিয়ার লম্বা চুল উড়ছে। দীর্ঘ সময় পরিবর্তে তার পাশে দাঁড়িয়ে রাইলেন। তারপর গেলেন অল্প বয়সী এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার হেলেটি ক্লান্স এবং কোনকিছু নিয়ে খুবই চিন্তিত। তার বিরক্ত ম্খের দিকে সাক্ষীয়ে কথা কলতে ইচ্ছে করে না। তবু তিনি বললেন, এই বিকশাওয়ালা কখন মারা গেছে?

ডাক্তার ছেলেটি ঠাণ্ডা গলায় বলল, জানি না কখন।

ওর বিকশাটি আমি থানায় দিয়েছি। এখন কি করব? কাকে খবর দেব?

আমকে এই সব বলছেন কেন?

তিনি বারান্দায় সরে এলেন। মিনিট দশক দাঁড়িয়ে রইলেন একা একা। বোদ মবে আসছে। আকাশে মেঘ। তিনি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ঠাণ্ডা এক বোতল পেপসি খেলেন। ছটা বাজতে দেরী নেই। ইন্দোনেশিয়ার ডেনচিস্টের কাছে নিতে হবে। তিনি একটা বিকশায় উঠে পড়লেন।

রিকশাওয়ালাটির বয়স খুবই কম। উৎসাহ বেশি। সে রিকশা নিয়ে ছুটছে। অকারণে কেল বাজাচ্ছে। খুব কায়দা করে সে দৃঢ়ি রিকশা অভারটেক করে দাঁত বের করে হাসল। ইসহাক সাহেব যদু স্বরে বললেন, নাম কি তোমার?

সামসু।

ইসহাক সাহেব কোমল স্বরে বললেন, তুমি কেমন আছ সামসু?

সামসু অবাক হয়ে পেছনে তাকাল। কোন জবাব না দিয়ে ক্রত প্যাডেল চাপতে লাগল। সামনেই ট্রাফিক সিগন্যাল। অনেকক্ষণ সবুজ বাতি ঝলছে। ওটি লাল হবার আগেই তাকে পাব হয়ে যেতে হবে। যাত্রীদের আঙ্গেবাজে প্রশ্নের জবাব দেবার তার সময় নেই।



জীন-কফিল

জ্ঞায়গাটার নাম, ধূনূলনাড়।

নাম যেমন অসুস্থ, জ্ঞায়গাও তেমন জঙ্গল। একবার গিয়ে পৌছলে মনে হবে সভ্য সমাজের বাইরে চলে এসেছি। সেখানে যাবার ব্যবস্থাটা বলি — প্রথমে যেতে হবে ঠাকরাকোনা। যয়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ ব্রাহ্ম লাইনের ছেট্টি স্টেশন। ঠাকরাকোনা প্রক্রিয়া গয়নার নৌকা যায় হাতীর বাজার পর্যন্ত। যেতে হবে হাতীর বাজারে। ভাগ্য ভালো হলে হাতীর বাজারে কেরায়া নৌকা পাওয়া যাবে। যদি পাওয়া যায় সেই নৌকায় শিয়ালজানি খাল ধরে যাইল দশক উত্তরে যেতে হবে। বাকি পথ পায়ে হেঁটে। পেকুজে হবে মাঠ, ডোবা, জলাভূমি। জুতা খুলে হাতে নিয়ে নিতে হবে। পাঁকাটিবে ভাঙা শামিরে পুরোটা বিশেক জ্বেক ধরবে। বিশ্বী অবস্থা। কড়োটা হাঁটতে হবে তারো অনুমান নেই। একেকজন একেক কথা কলবে। একটা সমস্ত আসবে যখন লোকজন হাসিমুখে বলবে — ধূনূলনাড়া? ও তো দেখা যায়। তখন বুঝতে হবে আরো যাইল সাতেক বাকি।

বছর পাঁচেক আগে এই জঙ্গলে জ্ঞায়গায় আঞ্চলিক জনৈক সাধুর সঙ্গানে যেতে হয়েছিলো। সাধুর নাম, কালু খা। মুসলিমান বায় হলেও সাধু হিন্দু ব্রাহ্মণ। বাবা-মা তাঁকে শৈশবেই পরিত্যাগ করেন। তিনি মানুষ হন মুসলিম পরিবারে। কালু খা নাম তাঁর মুসলিম।

পালক ব্যাব দেয়। যৌবন তিনি সংসর ত্যগী হয়ে শুশানে আশ্রয় নেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা, বিভূতীর কোনো সীমা সংখ্যা নেই। তিনি কোনো বকম খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁর গা থেকে সবসময় কাঠালাটাপা ফুলের তীব্র গন্ধ বের হয়। পৃষ্ঠিমার সবচেয়ে সেই গন্ধ এতো তীব্র হয় যে কচে গেলে বন্ধি এসে যায়। নাকে কমাল চেপে কচে যেতে হয়।

সাধু-সম্ম্যাসী, তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা এইসব নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না। আমি মনেপ্রাপ্তে বিশ্বাস করি ব্যাখ্যার অভীত কোন ক্ষমতা প্রকৃতি মানুষকে দেয়নি। কোনো সাধু যদি আমাব চোখের সামনে শূন্যে ভাসতে থাকেন আমি চমৎকৃত হবো না। ধরে নেবো এর পেছনে আছে ম্যাজিকের সহজ কিছু কলাকৌশল যা এই সাধু আয়ত্ত করেছেন। কাজেই আমার পক্ষে সাধুর খোঁজে 'ধূলুলনাড়া' নামের অজ্ঞ অজ্ঞ পাড়াগাঁয় যাবার প্রশ্নই আসে না। যেতে হয়েছিলো সফিকের কারণে।

সফিক আমার বাল্যবন্ধু। সে বিশ্বাস করে না এমন জিনিস নেই। ভূত-প্রেত থেকে সাধু-সম্ম্যাসী সব কিছুতেই তার অসীম বিশ্বাস। বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও সে বিশ্বাস করে যে সাপের মাথায় মণি আছে। কষ্টপক্ষের রাতে এই মণি সে উগড়ে ফেলে। চারদিক আলো হয়ে যায়। আলোয় আকষ্ট হয়ে পোকা-মাকড় আসে। সাপ তাদেব ধরে ধরে থায়। ভোজন পর্ব শেষ হলে মণিটি আবার গিলে ফেলে।

সাধু কালু খাঁর ধ্বনির সফিকই নিয়ে এলো এবং এমন ভাব করতে লাগলো যেন অবতারেব সঙ্গান পেয়ে গেছে। যে অবতারের সঙ্গে দেখা না হলে জীবন বৃথা।

আমি সফিকের সঙ্গে রওনা হলাম দ্বিতীয় কারণে। এক, সফিককে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। তাকে একা একা ছেড়ে দেয়ার প্রশ্ন উঠে না। দুই, সাধু খোঁজা উপলক্ষে গ্রামের দিকে খানিবটা হলেও ঘোরা হবে। মাঝে মাঝে এককম ঘূরে বেড়াতে মন লাগে না। নিজেকে পরিব্রাজক-পরিব্রাজক মনে হয়। যেন আমি ফাঁহিয়েন। বাংলার পথে পথে ঘূরে বেড়াচ্ছি।

খুব আগ্রহ নিয়ে রওনা হলেও আগ্রহ হাতীর বাজারে পৌছবাব আগেই শেষ হয়ে গেলো। অমানুষিক পরিশ্রম হলো। হাতীর বাজার থেকে যে কেরায়া নৌকা নিলাম সে নৌকাও এখন ডুবে তখন ডুবে অবস্থা। নৌকার পাটাতনের ফুটা দিয়ে বিজ্বিজ করে পানি উঠেছে। সাবাক্ষণ সেই পানি সেচতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সফিকের মতো পাগলেরও ধৈর্যচূড়ি হলো। কয়েকবার বললো, বিরাট বোকামি হয়েছে। গ্রেট মিসটেক। এবচে' কঙ্গো নদীর উৎস বের করা সঙ্গে ছিলো।

আমি বললাম, এখনো সময় আছে। ফিরে যাবি কি-না বলু।

আরে না! এতোদূর এসে ফিরে যাবো মানে। ভালো জিনিসের জন্যে কষ্ট করতেই হবে। জাস্ট চিন্তা করে দেখ একজন মানুষের গা থেকে ভূরভূর কলো কাঠালাটাপা ফুলের গন্ধ বেকেছে। ভাবতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। হাউ এআইটা!

সঞ্চয়ের পথপর ধূলুলনাড়া গ্রামে উপস্থিত হলাম। স্থানের পানিতে মাথামাথি। তিনবার বৃষ্টিতে ভিজেছি। কুখ্য এবং ত্রশ্ণায় জীবন বেব হবার উপর যাবে। বিদেশী মানুষ দেখলেই গ্রামের লোকজন সাধাবণত খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে। এইখানে উল্লে নিয়ম দেখলাম। আমাদেব ব্যাপারে কারো কোনো আগ্রহ নেই। সেখেকে এসেছি! যাবো কোথায়? এইটুকু দায়িত্ব পালন কৰাব ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেই সবাই চলে যাচ্ছে। একি যত্নণ।

সাধু কালু ঝা-কে দেখেও খুব হতাশ হতে হলো। বন্ধ উদ্ঘাদ একজন মানুষ। শুশানে একটা পাকড় গাছের নিচে ন্যাংটো অবস্থায় বসা। আমাদের দেখেই গলগালি শুরু করলো। পারগালি যে এতো নেঁঁবা হতে পাবে তা আমার ধারণার বইবে ছিলো। আমাকে এবং সাধককে কালু ঝা সবচে' সন্তু কথা য' বললো ত' হচ্ছে — বাড়িত যা। বাড়িত শিয়া খাবলাইয়া খাবলাইয়া 'গু' ঝা।

আমি হতভস্য। ব্যাটা বলে কি!

সফিকের দিকে তাকালাম। সে ভাবগদগদ স্বরে বললো, লোকটার ভেতর জিনিস আছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, কি করে বুঝলি? আমাদের 'গু' খেতে বলেছে এই জন্যে?

'আরে না। সে আমাদের এড়তে চাচ্ছে। মানুষের সংসর্গ পছন্দ নয়। মানুষের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার এটা একটা সহজ টেকনিক।'

'লোকটা যে বন্ধ উদ্ঘাদ তা শোর মনে হচ্ছে না?'

'তাও মনে হচ্ছে, তবে একটা প্রবাবিলিটি আছে যে সে উদ্ঘাদ না।'

গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। সাধুর প্রতি তাঁদের ভক্তি-শুক্ষাও সফিকেব যতহী। তাঁদের একজন বললেন, বাবার মাথা এখন একটু গরম।

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, মাথা ঠাণ্ডা হবে কখন?

'ঠিক নাই। চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ।'

'চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ মানে?'

'আমাবস্যা-পূর্ণিমায় মাথা গরম থাকে।'

এই ব্যাপারেও যতভেদ দেখা গেলো। একজন বললো, আমাবস্যা-পূর্ণিমাতেই মাথাটা ঠাণ্ডা থাকে। অন্য সময় গরম। বাবার কাছে মাসের পর মাস পড়ে থাকতে হয়। অপেক্ষা করতে হয়, কখন বাবার মাথা ঠাণ্ডা হবে।

আমি বললাম, সফিক, বাবার গা থেকে ফুলের গন্ধ তো কিছু পাছ্ছি না। আমাদের যে প্রব্য খেতে বলছিল তার গন্ধ পাছ্ছি। তুই কি পাছ্স?

সফিক জবাব দেবার আগেই আমাদের সঙ্গী মানুষদেব একজন ভাত গলায় বললো, একটু দূরে যান। বাবা অখন চিল মারবো। আইজ মনে হইতাছে বাবার মিজাজ বেশি খুবাপু।

কথা শেষ হবার আগেই চিলবষ্টি শুরু হলো। দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলাম। বাবার কাণ্ডকারখানায় সফিকের অবশ্য মোহভঙ্গ হলো না। সে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বললো, দুটা দিন থেকে দেখি। এতোদূর থেকে আসা। ভালো মতো পরীক্ষা না করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

'আর কি পরীক্ষা করবি?'

'মানে উনার মাথা যখন ঠাণ্ডা হবে তখন দু'একটা কথা চেঁচাবে জেস করলৈ . . . '

আমি হাল ছেড়ে দেয়া গলায় বললাম, থাকবি কেমায়ে!'

'স্কুল ঘরে শুয়ে থাকবো। খানিকটা কষ্ট হবে কেন্তে আব করা। কষ্ট বিনে কেট মেলে না।'

জানা গেলো এই গ্রামে কোনো স্কুল নেই। পাশের গ্রামে প্রাইমারী স্কুল আছে — এখান থেকে ছশ্মাইলের পথ। তবে গ্রামে পাকা মসজিদ আছে। অতিথি মোসফির এলে মসজিদে

থাকে। মসজিদের পাশেই ইমাম সাহেব আছেন। তিনি অতিথিদের র্যাজ্ঞিখবব করেন। প্রয়োজনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন:

অর্বি খুব-একটা উৎসহ বেশ করলাম না। গ্রামের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম সাহেব লোক কেমন? সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দার্শনিকের মতো বললো, ভালোয় মন্দয় যিলাইয়া যানুষ। কিছু ভালো। কিছু মন্দ। এই উত্তবও আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হলো। উপায় নেই। আকাশে আবার যেগ জমতে শুরু করেছে। বরণা হলাম মসজিদের দিকে। গ্রামের লোকগুলো অভদ্রের চূড়ান্ত। কেউ সঙ্গে এলো না। কিভাবে যেতে হবে তাই বলেই ভাবলো আমাদের জন্যে অনেক করা হচ্ছে।

মসজিদ খুঁজে বের করতেও অনেক সময় লাগলো।

অক্ষয়কাব বাত। পথ-ঘাট কিছুই চিনি না। সঙ্গে টর্চলাইট ছিলো — বৃষ্টিতে ভিজে সেই টর্চলাইটও কাজ করছে না। অঙ্কের মতো এগুতে হচ্ছে। যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই খানিকটা জ্বেরা করে, ঝুঁস্মাঘরে যাইতে চান ক্যান? কার কাছে যাইবেন? আপনের পরিচয়?

শেষ পর্যন্ত মসজিদ পাওয়া গেলো। গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা খালের পাশে মসজিদ। মসজিদের বয়স খুব কম হলেও দুশ বছরের কম হবে না। বিশাল সূর্পের মতো একটা ব্যাপার। সেই সূর্পের সবটাই শ্যাওলায় ঢাকা। গা বেয়ে উঠেছে বটগাছ। সব মিলিয়ে কেমন গা ইমচয়ানি ব্যাপার আছে।

আমাদের সাড়া-শব্দ পেয়ে হারিকেন হাতে ইমাম সাহেব চলে এলেন। ছোটখাট মানুষ। খালি গা। কাঁধে গামছা চাদবের মতো জড়ানো। বয়স চাঞ্চিলের মতো হবে। দাঢ়িতে তাকে খানিকটা আনেকটা হেমিংওয়ের মতো দেখাচ্ছে। আমার ধারণা ছিলো মসজিদে বাত্রি যাপন করবো শুনে তিনি বিরক্ত হবেন। হলো উল্টোটা। তাঁকে আনন্দিত মনে হলো। নিজেই বালতি করে পানি এনে দিলেন। গামছা আনলেন। দুজোড়া খড়ম নিয়ে এলেন। সফিক বললো, ‘ভাই, আমাদের খাওয়া-দাওয়া দরকার। সারাদিন উপাস। টাকা-পয়সা নিয়ে যদি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।’

ইমাম সাহেব বললেন, ব্যবস্থা হবে জনাব। আমার বাড়িতেই গৰীবী হালতে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা।

‘নাম কি আপনার?’

‘মুনশি এরভাজ উদ্দিন।’

‘থাকেন কোথায়, আশেপাশেই?’

‘মসজিদের পেছনে — ছেটি একটা টিনের ঘব আছে।’

‘কে কে থাকেন?’

‘আমার স্ত্রী, আর কেউ না।’

‘ছেলেমেয়ে?’

‘ছেলেমেয়ে নাই জনাব। আল্লাহপাক সজ্ঞান নেয়াছিলেন, তাদের হায়াত দেন নাই। হায়াত-মউত সবই আল্লাহপাকের হাতে। আপসারা হাত-মুখ ধূয়ে বিশ্রাম করেন, আমি আসতেছি।’

ভদ্রলোক ছেট ছেট পা ফেলে অঙ্ককাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, সফিক বললো, ইয়াম সাহেবকে নিতান্ত ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। মাই ডিয়ার টাইপ। মনে হচ্ছে আমাদের দেখে শুণ হয়েছেন।

আমি বললাম, ভদ্রলোক জন্মলৈ জ্ঞানগায় একা পড়ে আছেন — আমাদের দেখে সেই কারণেই শুশি। এই মসজিদে নামাজ পড়তে কেউ আসে বলে আমার মনে হয় না।

‘বুঝলি কি কবে?’

‘লোকজনের ঘাতায়াত থাকলে পায়ে চলার পথ থাকতো। পথ দেখলাম না।’

সফিক হাসতে হাসতে বলল, মিসির আলির সঙ্গে থেকে থেকে তোর অবজারভেশন পাওয়ার বেড়েছে বলে মনে হয়।

‘কিছুটা তো বেড়েছেই। ইয়াম সাহেব আমাদের বসিয়ে বেঞ্চে যে চলে গেলেন, কি নিয়ে ফিববেন জানিস?’

‘কি নিয়ে?’

‘দু'হাতে দু'টা কাটা ডাব নিয়ে।’

‘এই তোব অনুমান?’

আমি হাসিমুখে বললাম, মিসির আলি থাকলে এই অনুমানই করতেন। অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে গ্রামে প্রচুর ডাব গাছ। অতিথিদেব ডাব দেয়া সন্তান রীতি।

‘লজিক তো ভালোই মনে হচ্ছে।’

আমার লজিক ভূল প্রমাণ কবে মুনশি এরতাজ উদ্দিন ট্রে হাতে উপস্থিত হলেন। ট্রেতে দু'কাপ চা। একবাটি তেল-মরিচ মাখা মুড়ি। এই অতি পাড়া গাঁ জ্ঞানগায় অভাবনীয় ব্যাপার তো বটেই। মফস্বলের চা-অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত মিষ্টি এবং অতিরিক্ত কড়া হয়। তবু চা হচ্ছে চা। চকিল ঘন্টা পর প্রথম চায়ে চুমুক দিলাম। মনটা ভালো হয়ে গেলো। চমৎকার চা। বিস্মিত হয়ে বললাম, চা কে বানিয়েছে? আপনার শ্রী?

ইয়াম সাহেব লাজুক মুখে বললেন, ছি। তার চায়ের অভ্যাস আছে। শহরের মেয়ে। আমার শুশুর সাহেব হচ্ছেন নেত্রকোনার বিশিষ্ট মোকাব মমতাজউদ্দিন। নাম শুনেছেন বোধহয়।

আমরা এমন ভঙ্গি করলাম যে নামটা আমাদের কাছে অপরিচিতি নয়।^{আজগা} অনেকবার শুনেছি।

ইয়াম সাহেব বললেন, আমি চা খাই না। আমার শ্রীর চায়ের অভ্যাস আছে। শহর থেকে ভালো চায়ের পাতা এনে দিতে হয়। বিবাটি খরচান্ত ব্যাপার।

‘আপনি কি ইয়ামতি ছাড়া আর কিছু কবেন?’

‘ছি না। সামান্য জমিজমা আছে। আধি দেই। আমার শুশুর সাহেব তাঁর মেয়ের নামে নেত্রকোনা শহরে একটা ফার্মসী দিয়েছেন, সান রাইজ ফার্মসী। তার আয় আমে আসে। রিজিফের মালিক আল্মাহ্পাক। তাঁর ইচ্ছায় চলে আসে।’

‘ভালো চলে বলেই তো মনে হচ্ছে।’

‘ছি জ্ঞাব, ভালোই চলে। সংসার ছেট ক্ষেপলু নাই।’

এশার নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিলো। ইয়াম সাহেব আজান দিয়ে নামাজ পড়তে

গোলেন। কোনে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নামাজে আসতে দেখলাম না। ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জন্মলাম — নেক এমনিতেই হতো না। দুঃবিষ্঵ ধরে একেবাবেই হচ্ছে ন। শুধু জুম্বারাবে কিছু মুসুলীরা আসেন।

লোকজন না হওয়ার কারণও বিচির। মসজিদ সম্পর্কে গুরুব রাটে পেছে — এখানে ঝীন থাকে। নাপাক অবস্থায় নামাজ পড়লে ঝীন তার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। নানান ধরনের যত্নগু করে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ঝীন কি সত্ত্ব সত্ত্ব আছে?

‘অবশ্যই আছে। আল্লাহপাক কোরান মজিদে বলেছেন। একটা সূরা আছে — সুবায়ে ঝীন।’

‘সেই কথা জিজ্ঞেস করছি না — জানতে চাচ্ছি, ঝীন গিয়ে বিরক্ত করে এটা সত্ত্ব কি-না?’

‘জ্ঞি জনাব সত্ত্ব। তবে লোকজন ঝীনের ভয়ে মসজিদে আসে না এটা ঠিক না — আসলে সাপের ভয়ে আসে না।’

‘সাপের ভয়ে আসে না? কি বলছেন আপনি?’

‘একবার নামাজের মাঝখালে সাপ বের হয়ে গেলো। দাঁড়াস সাপ। অবশ্য কাউকে কামড়ায় নাই। বাস্তু সাপ কামড়ায় না। মাঝে-মধ্যে ভয় দেখায়।’

সফিক আঁধকে উঠে বললো, মাই গড! যখন-তখন সাপ বের হলে এইখানে থাকব কিভাবে?

‘ভয়ের কিছু নাই। কাবলিক এসিড ছড়ায়ে দিব।’

‘কাবলিক এসিড আছে?’

‘জ্ঞি। নেত্রকোনাব ফামেসী থেকে তিন বোতল নিয়ে আসছি। আমার স্ত্রীরও খুব সাপের ভয়। এই অঞ্চলে সাপখোপ একটু বেশি।’

মসজিদের সামনে উচু চাতাল ঘরে জ্যায়গায় বসে আছি। সাপের ভয়ে খানিকটা আতঙ্কগ্রস্ত। আকাশে মেঘ ডাকছে। বড় ধরনের বর্ষণ মনে হচ্ছে আসম। ইমাম সাহেব বললেন, খাওয়া দিতে একটু দেরি হবে। আমার স্ত্রী সব একা করছে, লোকজন নাই।

‘ভাব দেশে মনে হচ্ছে — বিরাট আয়োজন।’

‘জ্ঞি না। আয়োজন কিছু না, দরিদ্র মানুষ। আপনারা এসেছেন শুনে আমরা স্ত্রী খুব খুশি। কেউ আসে না। আমি বলতে গেলে একা থাকি। সবাই আমাকে ভয় করবে।’

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

‘সবার একটা ধারণা হয়েছে আমি ঝীন পুঁধি। ঝীনদের নিয়ে কাজকর্ম করাই . . .’

‘বলেন কি?’

‘সত্ত্ব না জনাব। তবে যানুষ অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করেন। অসত্য বিশ্বাস করা সহজ, কারণ — শয়তান অসত্য বিশ্বাসে সাহায্য করে।’

ইমাম সাহেব বেশ মন থারাপ করে চুপ হয়ে দালেন। প্রসঙ্গ পাণ্টাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, সাধু কালু র্ধা সম্পর্কে কি জানেন?

ইমাম সাহেব বললেন, তেমন কিছু জানি না। তবে আপনাদের ঘরে দূর দূর থেকে

উনার কাছে লোকজন আসে এইটা দেখেছি। বিশিষ্ট ভদ্রলোকরাই আসে বেশ। খ্যামনসিংহের ডিসি সাহেব উনার পন্থীকে নিয়ে এসেছিলেন।

‘উনার ক্ষমতা-ট্রিমতা কিছু আছে?’

‘মনে হয় না। কৃৎসিত গালাগালি করেন। কাঘেল মানুষের এই রকম গালিগালাজ করার কথা না। তাছাড়া কালু ধীর কারণে অনেক বেদাতী কাণ্ডকারখনা হয়, এইগুলাও ঠিক না।’

‘কি কাণ্ডকারখনা হয়?’

‘উনি নগু থাকেন — এইজন্য অনেকের ধারণা, নগু অবস্থায় তাঁর কাছে গেলে তাঁর মেজাজ ঠিক থাকে। অনেকেই নগু অবস্থায় যান।’

‘সে-কি?’

‘উনি পাগল মানুষ। সমস্যার কারণে যাঁরা তাঁর কাছে আসেন তাঁরাও এক অর্থে পাগল। পাগল মানুষের কাজকর্ম তো এই রকমই হয়। সমস্যা হলে তাঁর পরিত্রাণের জন্য আলাহপাকের দরবারে কাঙ্কালি করতে হয়। মানুষ তা করে না, সাধু-সম্যাসী, পীর-ফকির হোজে।’

ইমাম সাহেবের কথাবার্তায় আমি অবাক হলাম। পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা। গ্রাম্য মসজিদের ইমামের কাছ থেকে এমন মুক্তি-নির্ভর কথা আশা করা যায় না। লোকটির প্রতি আমার এক ধরনের শুন্ধাবোধ তৈরি হল। তাছাড়া ভদ্রলোকের আচার-আচরণেও সহজ-সারল্য আছে যে সারল্যের দেখা সচরাচর পাওয়া যায় না।

বাত নটাব দিকে ইমাম সাহেব বললেন, চলেন যাই, খানা বোধহয় এর মধ্যে তৈরি হয়েছে। ডাল-ভাত — এর বেশি কিছু না। নিজ গুণে ক্ষমা করে চারটা মুখে দিবেন।

ইমাম সাহেবের বাড়িটা ছোট টিনের দুর্কামরার বাড়ি। একচিলডে উঠোন। বাড়ির চারদিকে দর্মার বেড়া। আমাদের ঘরে নিয়ে বসানো হলো। মেঝেতে শতরঞ্জি বিছানো। খালা-বাসন সাজানো। আমরা সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। খাবারের আয়োজন অল্প হলেও ভালো। সবজি, ছোট মাছের তরকারি, ডাল এবং টক জাতীয় একটা খাবার। ইমাম সাহেব আমাদের সঙ্গে বসলেন না। খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। খাবারের শেষ পর্যায়ে আমাদের অবাক করে দিয়ে ইমাম সাহেবের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। এবং শিশুর মতো কৌতুহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ব্যাপারটা এতো আচমকা হয়ে যে আমি বেশ হকচকিয়েই গেলাম। অজ্ঞ পাড়াগায়ে এটা অভাবনীয়। কঠিন পর্যবেক্ষণই আশা করেছিলাম। আমি খানিকটা সংকুচিত হয়েই রইলাম। ইমাম সাহেবকেও সেখলাম পূর্ব অপ্রস্তুত বোধ করছেন।

সফিক যেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি কেমন আছেন?

ইমাম সাহেবের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, জালোনাই। আমার সঙ্গে একটা জীন থাকে। জীনটার নাম কফিল। কফিল আমারে খুব অনুসৃত করে।

সফিক হতভস্ব হয়ে বললো, আপনি কি বললেন বুঝলাম না।

যেয়েটি যেস্তের মত বললো, আমার সঙ্গে একটা জীন থাকে। জীনটার নাম কফিল। কফিল আমারে বড় যত্নপূর্ণ করে।

সফিক অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। আমি নিজেও বিস্মিত। ব্যাপার কি কিছু

বুঝতে পারছি না। ইয়াম সাহেব শ্তৰীর দিকে আকিয়ে বললেন, লতিফা, তুমি একটু ভিতরে যাও।

‘তদ্মহিলা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ক্যান? ভিতরে ক্যান? থাকলে কি অস্বিধা?’

‘উন্নাদেব সঙ্গে কিছু কথা বলবো। তুমি না থাকলে ভালো হয়। সব কথা যেয়েছেলেদেব শোনা উচিত না।’

লতিফা তীব্র চোখে স্বামীর দিকে আকিয়ে রইলো। ধাওয়া বক্ষ করে আমরা হাত গুটিয়ে বসে রইলাম। একি সমস্যা!

লতিফা যেয়েটি রূপবতী। শুধু রূপবতী নয়, চোখে পড়ার মতো রূপবতী। হাঙ্গা-পাতলা শরীর। ধৰণবে ফর্সা গায়ের রঙ। লম্বাটে স্লিপ মুখ। বয়সও খুব কম মনে হচ্ছে। দেখাচ্ছে আঠারো-ডিনিশ বছরের তরুণীর মতো। এতো কম বয়স তার নিষ্ঠয় নয়। যার স্বামীর বয়স চাঞ্জিশের কাছাকাছি তার বয়স আঠারো-ডিনিশ হতে পারে না। আবো একটি লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হলো — যেয়েটি সাজগোজ করেছে। চুল বৈধেছে, চোখে কাজল দিয়েছে — কপালে লাল রঞ্জের টিপ। গ্রামের যেয়েবা কপালে টিপ দেয় বলেও জানতাম না।

ইয়াম সাহেব আবার বললেন, লতিফা ভিতরে যাও।

যেয়েটি উঠে চলে গেলো।

ইয়াম সাহেব গলার ঘৰ নিচু করে বললেন, লতিফার মাথা পুরাপুরি ঠিক না। এর দুটা সন্তান নষ্ট হয়েছে। তার পৰ থেকে এ রকম। তার ব্যবহারে আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি তার হয়ে আপনাদেব কাছে ক্ষমা চাই। কিছু মনে করবেন না — আল্লাহর দোহাই।

আমি বললাম, কিছুই মনে করিনি। তাছাড়া মনে করার মতো কিছু তো উনি করেননি।

ইয়াম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, জ্বীনের কারণে এরকম করে। জ্বীনটা তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। মাঝে মাঝে মাস খানিকের জন্যে চলে যায়। তখন ভালো থাকে। গত এক মাস ধৰে তার সাথে আছে।

‘আপনি এসব বিশ্বাস করেন?’

‘বিশ্বাস করবো না কেন! বিশ্বাস না করার তো কিছু নাই। বাতাস আমরা চোখে দেখি না কিন্তু বাতাস বিশ্বাস করি। কারণ বাতাসের নানান আলামত দেখি। সেই বকম জ্বীন কফিলেরও নানান আলামত দেখি।’

‘কি দেখেন?’

‘জ্বীন যখন সঙ্গে থাকে তখন লতিফা খুব সাজগোজ করে। কথায় কথায় আসে। কথায় কথায় কাঁদে।’

‘জ্বীন তাড়াবার ব্যবস্থা করেননি?’

‘করেছি। লাভ হয় নাই। কফিল খুব শক্ত জ্বীন। দীর্ঘদিন লতিফার সঙ্গে আছে। প্রথম সন্তান যখন গর্ভে আসলো তখন থেকেই কফিল আছে।’

‘জ্বীন চায় কি?’

ইয়াম সাহেব মাথা নিচু করে বসে রইলেন। স্টোক দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনো কারণে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আমার মনে কীণ সন্দেহ হলো — জ্বীন বোধহয় লতিফা যেয়েটিকেই স্তৰী হিসেবে চায়। বিল্ল শতাব্দীতে এই ধরনের চিঞ্চী মাধ্যম আসছে দেখে আমি নিজের উপরও

বিরক্ত হলায়। ইমাম সাহেব বললেন, এই স্তীনটা আমর দুহটা বাচ্চা মেবে ফেলেছে। আবার যদি বাচ্চা হয় তারেও মারবে। বড় মন্ত্রকটে আছি জনাব। দিনবাত আল্লাহপাকের ডাকি। আমি গুনাহগার মানুষ। আল্লাহপাক আমার কথা শুনেন না।

‘আপনার স্ত্রীকে কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন?’

‘ডাক্তার কি করবে, ডাক্তারের কোন বিষয় না। স্তীনের শুধু ডাক্তারের কাছে নাই।’

‘তবু একবার দেখালে হতো না?’

‘আমার শুশুর সাহেব দেখিয়েছিলেন। একবার লতিফাকে বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। শুশুর সাহেব তারে ঢাকা নিয়ে গেলেন। চিকিৎসা-চিকিৎসা করালেন। লাভ হল না।’

বারদ্দা থেকে গুণগুণ শব্দ আসছে। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। খুবই যিষ্টি গলায় টেনে টেনে গান হচ্ছে — যার কথাগুলোর বেশির ভাগই অস্পষ্ট। মাঝে মাঝে দুএকটা লাইন বোঝা যায় যার কোনো অর্থ নেই। যেমনঃ ‘এতে না দেহে না দেহে না এতে না।’

ইয়াম সাহেব উচু গলায় বললেন, লতিফা চূপ কর। চূপ কব বললাম।

গান থামিয়ে লতিফা বললো, তুই চূপ কব। তুই থাম শুওরের বাচ্চা।

অবিকল পুরুষের ভাবী গলা। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। সেই পুরুষকষ্ট থমথমে স্বরে বললো, চূপ কইয়া থাকবি। একটা কথা কইলে টান দিয়া মাথা আলগা করুম। শহিল থাকব একখানে মাথা আরেকখানে। শুওরের বাচ্চা আমারে চূপ করতে কয়।

আমবা হাত শুয়ে উঠে পড়লাম। এত কাণ্ডের পর খাওয়া-দাওয়া চালিয়ে খাওয়া সম্ভব না।

এ জ্ঞাতীয় যন্ত্রণায় পড়ব কখনো ভাবিনি।

সফিক নিচু গলায় বললো, বিরাট সমস্যা হয়ে গেলো দেখি। ভয় ভয় লাগছে। কি করা যায় বল তো?

মসজিদের ভেতর এব আগে কখনো রাত্রি যাপন করিনি। অস্বস্তি নিয়ে ঘূর্যতে গেলাম। কেমন যেন দমবক্ষ দমবক্ষ লাগছে। মসজিদের একটা মাত্র দরজা — সেটি পেছন দিকে। ভেতরে গুঁট ভাব। ইয়াম সাহেব যত্নের চূড়ান্ত করেছেন। স্তীর অঙ্গভাবিক আচরণভঙ্গিত লঙ্ঘন হয়তো বা ঢাকার চেষ্টা করেছেন। আমাদের দুজনের জন্যে দুটা শীতল ধূঁটি, পাটির চারপাশে কাবলিক এসিড ছড়ানো হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা দুটা মর্জাবি খাটানো হয়েছে।

ইয়াম সাহেব বললেন, ভয়ের কিছু নাই। হারিকেন জ্বালানো থাকবে। আলোতে সাপ আসে না। দরজা বক্ষ। সাপ ঢেকারও পথ নাই।

আমি খুব যে ভরসা পাচ্ছি তা না। চৌকি এনে ঘুমোক্তি শারলে হতো। মসজিদের ভেতর চৌকি পেতে শোঁয়া — ভাবাই যায় না।

সফিকের হচ্ছে ইচ্ছাযুক্ত। শোঁয়ামাত্র নাক ডাঙড়াত শুরু করেছে। বাইবে বিবরিব করে বাটি হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মসজিদের ভেতর আগরবাতির গন্ধ। যে গন্ধ সব সময় মত্তুকে মনে করিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে গা ছমছমানো ব্যাপার।

আমি ইয়াম সাহেবকে বললাম, আপনি চলে যান, আপনি এখানে বসে আছেন কেন? আপনার স্ত্রী এক। তাঁর শরীরও ভলো না।

ইয়াম সাহেব বললেন, আমি মসজিদেই থাকব। এবাদত— বন্দেগী করব। ফর্জবে নামাজ শেষ করে বাসায় শিয়ে শূচুব।

‘কেন?’

‘লতিফা এখন আমাকে দেখলে উমাদের মতো হয়ে যাবে। মেঘেতে ঘাথা টুকবে।’

‘কেন?’

‘ওর দোষ নাই কিছু। সঙ্গে জীন আছে — কফিল। এই জীনই সবকিছু করায়। বেচারীর কোন দোষ নাই।’

আমি চূপ করে রইলাম। ইয়াম সাহেব ঝাস্ত গলায় বললেন, এমনিতে তেমন উপদ্রব করে না সন্তানসন্ত্বা হলেই কফিল ভয়ংকর যন্ত্রণা করে। বাচ্চাটা মেরে না ফেলা পর্যন্ত থামে না। দুইটা বাচ্চা মেরেছে — এইটাও মারবে।

‘আপনার স্ত্রী কি সন্তানসন্ত্বা?’

‘ঞ্জি।’

‘আপনি কি নিশ্চিত যে পুরো ব্যাপারটা জীন করছে। অন্য কিছু না?’

‘ঞ্জি নিশ্চিত। জীনের সঙ্গে আমার মাঝে-মধ্যে কথা হয়।’

‘অবিশ্বাস্য সব কথাবার্তা বলছেন আপনি।’

‘অবিশ্বাসের কিছু নাই। একদিনের ঘটনা বলি তাহলে বুঝবেন। ভাত মাস। খুব গরম। একটা ভেজা গামছা শরীরে জড়ায়ে এশার নামাজে দাঢ়ি হয়েছি। মসজিদে আমি এক। আমি ছাড়া আব কেউ নাই। হঠাৎ দপ করে হারিকেনটা নিভে গেল। চমকে উঠলাম। তাবপর শুনি মসজিদের পেছনের দরজার কাছে ধ্পধূপ শব্দ। খুব ভয় লাগল। নামাজ ছেড়ে উঠতে পারি না। নামাজে মনও দিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর পিছনের দরজায় ধুপধূপ শব্দ। যেন কেউ কিছু—একটা এনে ফেলছে। সেজন্দায় যাবার সময় কফিলের গলা শুনলাম — টেনে টেনে বলল, তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব। তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব। তারপর ধপ করে আগুন ছ্বলে উঠল। দাউ দাউ আগুন। নামাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। দেৰি দরজার কাছে গাদা করা শুকনা লাকড়ি। আগুন ছ্বলছে। আমি চিংকার দিয়ে উঠলাম, বাঁচাও বাঁচাও। আমার চিংকার শুনে লতিফা পানির বালতি হাতে ছুটে আসল। পানি দিয়ে আগুন নিজে^{যে} আমারে মসজিদ থেকে টেনে বার করল। আমার স্ত্রীর কারণে সেই যাত্রা বেঁচে গেলাম। লতিফা সময়মত না আসলে মারা পড়তাম।’

‘জীন মসজিদের ভেতরে চুকলো না কেন?’

‘খাবাপ ধরনের জীন। আস্থাহর ঘরে এরা চুকতে পারে না। আমি এই জন্মেই বেশিরভাগ সময় মসজিদে থাকি। মসজিদে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি। ঘরে পারি না।’

‘কফিল আপনাকে খুন করতে চায়?’

‘তাও ঠিক না — একবারই চেয়েছিলো। তাবলে আব চায় নাই।’

‘খুন করতে চেয়েছিলো কেন?’

ইয়াম সাহেব চূপ করে রইলেন, আমি বললাম, আপনার যদি আপন্তি না থাকে পুরো

ঘটনাটি বলুন। আপন্তি থক্কন বলার দরকার নেই।

'না। আপন্তির কি আছে? আপন্তিব কিছু নাই। আমি লতিফাব অবস্থা একটু দেখে আর্মস।'

'যদি দেখে আসুন।'

ইয়াম সাহেব চলে গেলেন। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভূত-প্রেত, ঝীন-পরী কখনো বিশ্বাস করিনি, এখনো করছি না তবু আতঙ্কে আধমরা হয়ে গেছি। সফিক জেগে থাকলে খানিকটা ভরসা পাওয়া যেত। সে চুমুচু মরার মত। একেই বলে পরিবেশ। ইয়াম সাহেব দশ মিনিটের মধ্যে ফিবে এলেন। বিস গলায় বললেন, ভালই আছে তবে ভীষণ চিকিৎসা করছে।

'তালা বন্ধ করে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ না। তালা বন্ধ করে তাকে রাখা সম্ভব না। কফিল ওব সঙ্গে থাকে — কাজেই ওর গায়ের জ্বোর থাকে অসম্ভব। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

ইয়াম সাহেব মন খারাপ করে বসে রইলেন। আমি বললাম, গল্পটা শুরু করুন ভাই।

তিনি নিচু গলায় বললেন, আমাব স্তৰীৰ ডাকনাম বৃড়ি।

কথা পুরোপুরি শেষ করতে পারলেন না। মসজিদে প্রচণ্ড শব্দে তিল পড়তে লাগলো। ধূপধূপ শব্দ। সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে কয়েকজন মানুষ যেন চারদিকে ছুটাছুটি করছে। আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, কি ব্যাপার?

ইয়াম সাহেব বললেন, কিছু না। কফিল চায় না আমি কিছু বলি।

'থাক ভাই, বাদ দিন। গল্প বলার দরকার নেই।'

'অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিল ছেঁড়া বন্ধ হবে। ভয়েব কিছুই নাই।'

সত্ত্ব সত্ত্ব বন্ধ হলো। বৃষ্টিৰ বেগ বাড়তে লাগলো। ইয়াম সাহেব গল্প শুরু কৰলেন। আমি তাঁৰ গল্পটাই বলছি। তাঁৰ ভাষাতে। তবে আঞ্চলিকতাটা সামান্য বাদ দিয়ে।

গল্পেৰ মাধ্যমেও একবাৰ তুমুল তিল ছেঁড়া হলো। ইয়াম সাহেব একমনে আয়াতুল কুরসি পড়লেন। আমাৰ জীবনে সে এক ভয়াবহ রাত।

২

নেত্ৰকোনা শহৱেৰ বিশিষ্ট মোক্তাৰ মহতাজউদ্দিন সাহেবেৰ বাড়ীতে তখন আমি থাকি। উনাৰ সংগে আমাৰ কোনো আত্মীয়তা সম্পৰ্ক নাই। লোকমধ্যে শুনেছিলাম — বিশিষ্ট ভদ্ৰলোক। কেউ কোনো বিপদে পড়ে তাঁৰ কাছে গেলে তিনি সহায়া কৰেন। আমাৰ তখন মহাবিপদ। একবেলা আই তো এক বেলা উপোস দেখু সহিসে ভৱ কৰে তাঁৰ কাছে গেলাম চাকৱিৰ জন্মে। উনি বললেন, চাকৱি যে দিবো পঞ্জামোনি কি জনো?

আমি বললাম, উলা পাস কৰেছি।

উনি বিৱৰণ হয়ে বললেন, মদ্রাসা পৰ্যন্ত কৱা লোক, তোমাৰে আমি কি চাকৱি দিব।' আই.এ., বি.এ. পাস থাকলে একটা কথা ছিলো। চেষ্টা-চৰিত্ৰ কৰে দেখতাম। চেষ্টা কৰাবড়ে তো কিছু নাই।

আমি চূপ করে রইলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বড় আশা ছিল কিছু হবে। একটা পয়সা সংগে নাই। উপোস দিছি। রাতে নেওকেনা স্টেশনে ঘূমাই।

মমতাজ সাহেব বললেন, তোমাকে চাকরি দেয়া সম্ভব না। নেও, এই বিশ্য টাকা রাখো। অন্য কারো কাছে যাও। মসজিদে খোজ-টোজ নাও — ইমামতি পাও কি-না দেখো।

আমি টাকাটা নিলাম। তাবপর বললাম, ভিক্ষা নেয়া আমরা পক্ষে সম্ভব না। যদি ঘরের কোনো কাজকর্ম থাকে বলেন করে দেই।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, কি কাজ করতে চাও?

‘যা বলবেন করবো। বাগানের ঘাসগুলো তুলে দেই?’

‘আচ্ছা দাও।’

আমি বাগান পরিষ্কার করে দিলাম। গাছগুলোতে পানি দিলাম। দুএক জায়গায় ঘাটি কুপিয়ে দিলাম। সন্ধ্যাবেলা কাজ শেষ করে বললাম, জনাব যাই। আপনার অনেক মেহেরবানী। আল্লাহপাকের দরবারে আমি আপনার জন্য দোয়া করি।

মমতাজ সাহেব বললেন, এখন যাবে কোথায়?

‘ইস্টিশনে। রাতে নেওকেনা ইস্টিশনে আমি ঘূমাই।’

‘এক কাজ করো। রাতটা এইখানেই থাকো। তারপর দেখি।’

আমি থেকে গেলাম।

একদিন দুইদিন তিনদিন চলে গেলো। উনি কিছু বলেন না। আমিও কিছু বলি না। বাংলাঘরের এক কোণায় থাকি। বাগান দেখাশোনা করি। চাকরিব সকান করি। ছোট শহর, আমার কোনো চিনা-পরিচয়ও নাই। কে দিবে চাকরি? ঘুরাঘুরি সার হয়। মোক্তার সাহেবের সংগে যাবে—মধ্যে দেখা হয়। আমি বড়ই শ্রদ্ধিন্দা বোধ করি। উনিও এমন ভাব করেন যেন আমাকে চেনেন না। মাসখানেক এইভাবে চলে গেলো। আমি মোটামুটি তাদের পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। মোক্তার সাহেবের স্ত্রীকে ‘মা’ ডাকি। তেতরেব বাড়িতে থেতে যাই। তাঁদের কোনো একটা উপকার করার সুযোগ পেলে প্রাণপণে করার চেষ্টা করি। বাজার করে দেই, কল থেকে পানি তুলে দেই।

মোক্তার সাহেবের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাবার সংগে আছে। তাঁর দুই বাচ্চাকে আমি আমপারা পড়াই। বাজা-সদাই করে দেই। টিপকুল থেকে রোজ ছয় সপ্তাহ বালতি পানি তুলে দেই। মোক্তার সাহেবের কাছে যখন হক্কেলরা আসে তখন তিনি ঘন-ঘন তামাক খান। সেই তামাকও আমি সেজে দেই। চাকর-বাকরের কাজ। আমি আনন্দের সংগেই করি। যাবে যাবে মনটা খুবই খারাপ হয়। দরজা বক্স করে একমাত্র কোবান শরীফ পড়ি। আল্লাহপাকের তেকে বলি — হে আল্লাহ, আমার একটা উপকার করে দেও। কতোদিন আব মানুষের বাড়িতে অমদাস হয়ে থাকবো!

আল্লাহপাক মুখ তুলে তাকালেন। সিদ্ধিকূর রহমান সাহেব বলে এক ব্যবসায়ী বলতে গেলে সেধে আমাকে চাকরি দিয়ে দিলেন। চালেন আজক্ষণ্য ছিসাবপত্র বাখা। মাসিক বেতন পাঁচশ' টাকা।

মোক্তার সাহেবকে সালাম করে খবরটা শিখেন: উনি খুবই খুশি শিখেন। বললেন তোমাকে অনেকদিন ধৰে দেখতেছি, তুমি সৎ দ্বারের মানুষ। ঠিকশতো কাজ করো।

তোমার আস্ত-উন্নতি হবে। আর বাতে তুমি আমার বাড়িতেই থাকো। তোমার কোনো অসুবিধা নাই। খাওয়া-দাওয়াও এইখানেই করবে। তোমাকে আমি ঘরের ছেলের মতই দেখি।

অনলে ঘনটা ভরে গেল। চোখে পানি এসে গেলো। আমি মোকাব সহেবের কথামত তার বাড়িতেই থাকতে লাগলাম। ইচ্ছা করলে চালের আড়তে থাকতে পাবতাম। যন টানলো না। তাছাড়া মোকাব সাহেবের বাগানটা নিজের হাতে তৈরি করেছি। দিনেব মধ্যে কিছুট সময় বাগানে না থাকলে খুব অস্থির লাগে।

একমাস চাকরির পর প্রথম বেতন পেলাম। পাঁচশ' টাকার বদলে সিদ্ধিকুর বহমান সাহেব ছশ' টাকা দিয়ে বললেন, তোমার কাজকর্ম ভালো। এইভাবে কাজকর্ম করলে বেতন আরো বাড়িয়ে দিবো।

আমার মনে বড় আনন্দ হলো। আমি তখন একটা কাজ করলাম। পাগলামিও বলতে পারেন। বেতনের সব টাকা খবচ করে মোকাব সাহেবের স্ত্রী এবং তার তিন মেয়েব জন্য তিনটা শাড়ি কিনে ফেললাম: টাঙ্গাইলের সৃষ্টী শাড়ি। মোকাব সাহেবের জন্য একটা খদ্দবে চাদর।

মোকাব সাহেবের স্ত্রী বললেন, তোমার কি মাথাটা খারাপ? এইটা তুমি কি করলা? বেতনের প্রথম টাকা — তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য জিনিস কিনবা, বাড়িতে টাকা পাঠাইবা।

আমি বললাম, মা, আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নাই। আপনারাই আমার আত্মীয়-স্বজন।

তিনি খুবই অবাক হয়ে বললেন, কই কোনোদিন তো কিছু বলো নাই।

'আপনি জিজ্ঞেস করেন নাই — এই জন্যে বলি নাই। আমার বাবা-মা খুব ছেটিবেলায় মারা গেছেন। আমি মানুষ হয়েছি এতিমধ্যানায়। এতিমধ্যানা খেকেই উলা পাস করেছি।'

উনি আমার কথায় মনে খুব কষ্ট পেলেন। উনাব মনটা ছিলো পানির মতো। সবসময় টেলটেল করে। উনি বললেন, কিছু মনে নিও না। আমার আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো। তুমি আমারে 'মা' ডাকো আর আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না। এইটা খুবই অন্যায় কথা। আমার খুব অন্যায় হইছে।

তিনি তাঁর তিন মেয়েবে ডেকে বললেন, তোমরা এবে আইজ থাইক্যা নিজেব টেল-গ্রেফ মতো দেখবা। মনে করবা তোমরার এক ভাই। তাৰ সামনে পর্দা কৰাব দৰকাৰ নাই।

এব মধ্যে একটা বিশেষ জুকুৰী কথা বলতে ভুলে গেছি — মোকাব সাহেবের ছেট মেয়ে লতিফার কথা। এই মেয়েটা পৰীৱ মতো সুন্দৰ। একটু পাগল ধৰনেৰ। নিজেৰ মনে কথা বলে। নিজেৰ মনে হাসে। যখন-তখন বাঁচাঘৰে চলে আসেন। আমাৰ সংগে দুই-একটা ঢুকটাক কথাও বলে। অস্তুত সব কথা। একদিন এসে বললো, এই যে মৌলানা সাব, একটা কথা জিজ্ঞেস কৰতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো, শয়তান পৰীক্ষা মেয়েছেলে?

আমি বললাম, শয়তান পুরুষ।

লতিফা বললো, আম্মা যেয়ে শয়তান তৈরি কৰেন নাই কেন?

আমি বললাম, তা তো জানি না। আম্মা আপুকৰ ইচ্ছাৰ খবৰ কেমনে জানবো? আমি অতি তুচ্ছ মানুষ।

‘কিন্তু শয়তান যে পুরুষ তা আপনি জানেন?’

‘জানি।’

‘আপনে স্তুল জানেন। শয়তান পুরুষও না স্তুইও না। শয়তান আলাদা এক জাত।’

অধি মেয়েটার বুদ্ধি দেখে খুবই অবাক হই। এই বকম সে প্রাপ্তি করে। একদিনের কথা। ছুটির দিন। দুপুরবেলা। বাংলাঘবে আমি ঘূমাচ্ছি। হঠাৎ ঘূম ভেঙে গেলো। অবাক হয়ে দেরি লতিফা আমার ঘরে। অধি ইডমড় করে উঠে বসলাম। লতিফা বললো, আপনেরে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো —

‘হেন কোনো গাছ আছে এ ধরায়

স্তুলে জলে কস্তুর তাহা নাহি জন্মায়।’

আমি ধাঁধার জবাব না দিয়ে বললাম, তুমি কখন আসছো?

লতিফা বললো, অনেকক্ষণ হইছে আসছি। আপনে ঘূমাইতেছিলেন, আপনাবে জাগাই নাই। এখন বলেন — ধাঁধার উত্তর দেন,

‘হেন কোনো গাছ আছে এ ধরায়

স্তুলে জলে কস্তুর তাহা নাহি জন্মায়।’

আমি বললাম, এইটার উত্তর জানা নাই।

‘উত্তর খুব সোজা — উত্তর হইলো — পরগাছা। আচ্ছা আবেকটা ধরি বলেন দেখি . . .

‘পাকলে খেতে চায় না, কাঁচা খেতে চায়

এ কেমন ফল বল তো আমায়?’

মেয়েটার কাণ্ডকাবখানায় আমার ভয় ভয় লাগতে লাগলো। কেন সে এই বকম কবে? কেন বার বার আমার ঘরে আসে? লোকেব চোখে পড়লৈ মানান কথা রট্টে। মেয়ে যতো সুন্দর তারে নিয়া বটনাও ততো বেশি।

লতিফা আমার বিছানায় বসতে বসতে বললো, কই বলেন এটাৰ উত্তর কি —

‘পাকলে খেতে চায় না, কাঁচা খেতে চায়

এ কেমন ফল বল তো আমায়?’

বলতে পারলেন না — এটা হলো — শশা। পাকা শশা কেউ খায় না। সবাই কাচা শশা চায়। আচ্ছা আপনার বুদ্ধি এতো কম কেন? একটাও পারেন না। আপনি একটা ধৰ্ম ধৰ্ম আমি সংগে সংগে বলে দেবো।

‘আমি ধাঁধা জানি না লতিফা।’

‘আপনি কি জানেন? শুধু আল্লাহ আল্লাহ করতে জানেন, আৱ কিন্তু জানেন?’

‘লতিফা তুমি এখন ঘরে যাও।’

‘ঘৰেইও তো আছি। এইটা ঘর না? এইটা কি বাহিৰ?’

‘যখন-তখন তুমি আমার ঘরে আসো — এটা ঠিক নাপ।

‘ঠিক না কেন? আপনি কি বায় না ভালুক?’

আমি চুপ করে রইলাম। আধা-পাগল এই মেয়েকে আমি কি বলবো? এই মেয়ে একদিন নিজে বিপদে পড়বে। আমাকেও বিপদে ফেলবে। লতিফা বললো, আমি যে যাবে-মধ্যে আপনার এখানে আসি — সেইটা আপনাব ভালো লাগে না — ঠিক না?

‘হ্যাঁ ঠিক।’

‘ভালো লাগে না কেন?’

‘নানান জনে নানান কথা বলতে পাবে।’

‘কি কথা বলতে পাবে? আপনার সৎগে আমাৰ ভালোবাসা হয়ে গেছে? চুপ কৰে আছেন কেন বলেন।’

‘তুমি এখন ষাও লতিফা।’

‘আছা যাই। কিন্তু আমি আবাৰ আসবো। রাত দুপুৰে আসবো। তখন দেখবেন — কি বিপদ।’

‘কেন এই রকম কৱতেছে লতিফা?’

লতিফা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, যে ভয় পাৰ তাকে ভয় দেখাতে আমাৰ ভালো লাগে। এইজন্যে এৱকম কৰি। আছা মৌলানা সাহেব, যাই। আসসমলামু আলায়কূম। ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বৰকাতুল্লাহ হি -হি - হি।

ভাই, আপনাৰ কাছে সত্য কথা গোপন কৰবো না। সত্য গোপন কৰা বিবাটি অন্যায়। আল্লাহপাক সত্য গোপনকাৰীকে পছন্দ কৰেন না। চাকৰি পাওয়াৰ পৰেও আমি মোক্তাৰ সাহেবেৰ বাড়িতে থেকে গেলাম শুধু লতিফার জন্য। তাৰে দেখাৰ জন্য মন্টা ছটফট কৱতো। মনে মনে অপেক্ষা কৰতাম কোন সময় তাৰে এক নজৰ হলেও দেখব। তাৰ পায়েৰ শব্দ শূন্লেও বুক ধড়ফড় কৱতো। রাত্ৰে ভাল সূম হত না। শুধু লতিফার কথা ভাৰতাম। বলতে খুব শৰম লাগছে ভাই সাব তবু বলি — লতিফার চুলেৰ একটা কাঁটা আমি সব সময় আমাৰ সঙ্গে রাখতাম। আমাৰ কাছে মনে হত এইটা চুলেৰ কাঁটা না। সাতৰাজাৰ ধন। আমি আল্লাহপাকেৰ দৰবাৰে কাম্পাকাটি কৰতাম। বলতাম — হে পৰোয়াৰদিগাৰ, হে গাফুৰুৰ রহিম, তুমি আমাকে একি বিপদে ফেললা। তুমি আমাৰে উদ্ধাৰ কৰো।

আল্লাহপাক আমাকে উদ্ধাৰ কৱলেন। লতিফার বিবাহেৰ প্ৰস্তাৱ আসলো। ছেলে এমবিএস ডাক্তাৰ। বাড়ি গৌরিপুৰ। ভালো বংশ। খানদানি পৰিবাৰ। ছেলে নিজে এসে মেষে দেখে গেলো। মেয়ে তাৰ খুব পছন্দ হলো। পছন্দ না হওয়াৰ কোনো কাৰণ নাই। লতিফার মতো কৃপবৰ্তী মেয়ে সচৰাচৰ দেখা যায় না। ছেলেও দেখতে শুনতে ভালো। শুধু মায়েৰ রঙটা একটু ময়লা। কথায় বাৰ্তায়ও ছেলে অতি ভদ্ৰ। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেলো। কাঙ্গাই শ্ৰাবণ। শুক্ৰবাৰ দিবাগত রাত্ৰে বিবাহ পড়ান হবে।

আমাৰ মন্টা বড়ই খাৰাপ হয়ে গেলো। আমি জানি এই মেষেৰ সংশ্লেষণেৰ বিবাহেৰ কোনো প্ৰশংসন ওঠে না। কোথায় সে আৰ কোথায় আমি। চাকৰ-শৈলীৰ আন্তৰিক একজন মানুষ। জমিজমা নাই, আকৃষ্ণ-স্বজন নাই, সহায়-স্মৰণ নাই। তাৰ জন্য আমি কোনদিন আফসোস কৰি নাই। আল্লাহপাক যাকে যা দেন তাই নিয়ন্ত্ৰণ স্বৃষ্টি থাকতে হয়। আমি ছিলাম। কিন্তু যেদিন লতিফার বিয়েৰ কথা পাৰাপাৰি হয়ে গেলো সেদিন কি যে কষ্ট লাগলো। বলে আপনাকে বুঝাতে পাৱবো না। সারাৰাত শহৰেৰ পথে পথে ঘূৰলাম। সৌবন্ধে কোনোদিন নামাজ কুঞ্জা কৰি নাই — এই প্ৰথম এশাৰ নামাজ কুঞ্জা কৰলাম। ফজৰেৰ নামাজ কুঞ্জা কৰলাম। এতোদিন পৰে বলতে লজ্জা লাগছে। আমাৰ প্ৰায় মাথা আৱাপেৰ মতো হয়ে গিয়েছিলো। ভোৱেলা মোক্তাৰ সাহেবেৰ বাসায় ফেলাম। সবাৰ কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

এইখানে আর থাকবো না। বাস্তারে চালের আড়তে থাকবো। মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, এখন ঘৰে কেন বাবা? মেঝেব বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কতো কাজকর্ম। কাজকর্ম শেষ কবে তবপৰ যও

আমি মিথ্যা কথা বলি না। প্রথম মিথ্যা বললাম। আমি বললাম, মা, সিদ্ধিকুর বহমান সাহেব আমাকে আজই দেকানে গিয়ে উঠতে বলেছেন — উনি আমার মনিব। অম্বদাতা। উনাব কথা না রাখলে অন্যয় হবে। বিয়ের সময় আমি চলে আসবো। কাজকর্মের কোনো অসুবিধা হবে না, মা।

সবাব কাছ থেকেই বিদায় নিলাম। লতিফ'র কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলাম না। সে ঘৰন সামনে এসে দাঁড়ালো তখন চোখ তুলে তাৰ দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না।

লতিফা বললো, চলে যাচ্ছেন? আমি বললাম — হ্যাঁ।

'কেন, আমৰা কি কোনো দোষ করেছি?'

'চিং ছিং দোষ কৰবে কেন?'

'আচ্ছা, যাওয়াৰ আগে এই ধৰ্মাটা ভাঙায়ে দিয়ে যান — বলেন দেখি —

'ছাই ছাড়া শোয় না,

'লাথি ছাড়া উঠে না। এই জিনিস কি?'

'জানি না লতিফা।'

'এতো সহজ জিনিস পাবলেন না? এটা হলো কৃতুব। আচ্ছা যান। দোষ-ঘাট হলে — ক্ষমা কবে দিয়েন।'

আমি আড়তে চলে আসলাম। রাত আটটাৰ দিকে মোক্তার সাহেব লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি শোবার ঘৰে চেয়াৰে বসেছিলেন। আমাকে সেইখনে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি খুবই অবাক হলাম। একটু ভয় ভয় কৰতে লাগলো। তাকিয়ে দেখি — মোক্তার সাহেবের স্ত্রী খাটে বসে আছেন। নিঃশব্দে কাঁদছেন। আমি কিছুই বুঝলাম না। বুক ধড়ফড় কৰতে লাগলো। না জানি কি হয়েছে।

মোক্তার সাহেব বললেন, তোমাকে আমি প্ৰেৰ মতো স্নেহ কৰেছি। তাৰ বদলে তুমি এই কৰলে? দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষাৰ কথা শুনুন্তে। আজ নিজেৰ চোখে দেখলাম।

আমি মোক্তার সাহেবের স্ত্রীৰ দিকে তাকিয়ে বললাম, মা, আমি কিছুই বুঝতোছি না।

মোক্তার সাহেব চাপা স্বৰে বললেন, বোকা সাজাৰ দৱকাৰ নাই। বোকা সাজাৰ নাই। তুমি যা কৰেছো তা তুমি ভালোই জানো। তুমি পথেৰ কুকুৰেণ্ড অধম।

আমি বললাম, আমাৰ কি অপৰাধ দয়া কৰে বলেন।

মোক্তার সাহেব রাগে কাপতে কাপতে বললেন, মেঘবপট্টি যে শাওৰ থাকে তুই তাৰ চেয়েও অধম — তুই নৰ্দমাৰ ময়লা। বলতে বলতে তিনিও কেবল ফেললেন।

মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, লতিফা সবই আমাদেৱ বলেছে — কিছুই জুকায় নাই। এখন এই অপমান, এই লজ্জাৰ হাত থেকে বাঁচাৰ একমতি উপায় লতিফাৰ সংগে তোমাৰ বিবাহ দেয়া। তুমি তাতে রাজি আছো? না মেঘেৰ সমৰাপ কৰে পালানোই তোমাৰ ইচ্ছে?

আমি বললাম, মা, আপনি কি বলছেন, আমি কিছুই কুমতে পারতোছি না। লতিফা কি বলেছে আমি জানি না। তবে আপনাৰ যা বলবেন — আমি তাই কৰবো। আঞ্চলিক উপরে

আছেন। তিনি সব জানেন, আমি কোনো অন্যায় করি নাই, মা।

মোক্ষার সাহেব চিৎকার করে বললেন, চূপ থাক শুণেরের বাচ্চা। চূপ থাক।

সেই রাতেই কাঞ্জী ডাকিয়ে বিয়ে পড়ানো হলো। বাসরাতে লতিফ বললে, আমি একটা অন্যায় করেছি — আপনার সাথে যেন বিবাহ হয় এই ঘন্টে বাবা-মাকে মিথ্যা করে বলেছি — আমার পেটে সংস্কার আছে। বিরাট অপরাধ করেছি, আপনার কাছে ক্ষমা চাই।

আমি বললাম, লতিফা আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম। তুমি আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাও।

‘আপনি ক্ষমা করলেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তাছাড়া আমি তেমন বড় অপরাধ তো করি নাই। সামান্য মিথ্যা বলেছি। আপনাকে বিবাহ করার জন্য অনেক বড় অপরাধ করার জন্যও আমি তৈরি ছিলাম। আচ্ছা, এখন বলেন এই ধাঁধাটির মানে কি

‘আমার একটা পাখি আছে
যা দেই সে খায়।
কিছুতেই মরে না পাখি
জলে মারা যায়।’

বুঝলেন ভাই সাহেব, আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেলো। এই আনন্দের কোনো সীমা নাই। আমার যতো নাদান মানুষের জন্য আল্লাহপাক এতো আনন্দ রেখে দিয়েছেন আমি কল্পনাও করি নাই। আমি কতোবার যে বললাম, আল্লাহপাক আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি। আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি।

বিয়ের পর আমি শুশুর বাড়িতেই থেকে গেলাম। আমার এবং লতিফার বড় দুঃখে সময় কাটিতে লাগলো। শুশুর বাড়ির কেউ আমাদের দেখতে পারে না। শুবই খারাপ ব্যবহার করে। আমার শাঙ্কুঁড়ী দিনবাত লতিফাকে অভিশাপ দেন, যব যব তুই যব।

আমার শুশুর সাহেব একদিন আমাকে ডেকে বললেন, সকাল বেলায় তুমি আমার সামনে আসবা না। সকাল বেলায় তোমার মুখ দেখলে আমার দিন খারাপ যায়।

শুশুর বাড়ির কেউ আমার সংগে কথা বলে না। তারা এক সংগে থেতে বসে। সেখানে আমার যাওয়া নিষেধ। সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে লতিফা খালায় করে আমার জন্য শুশুর নিয়ে আসে। সেই ভাত আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না।

লতিফা রোজ বলে — চলো, অন্য কোথায়ও যাই গিয়া।

আমি চূপ করে থাকি। কই যাবো বলেন? আমার কি যাওয়ার জন্মজ্ঞ আছে? যাওয়ার কোনো জ্ঞানগা নাই। লতিফা শুব কান্নাকাটি করে।

একদিন শুব অপমানের মধ্যে পড়লাম। আমার শুশুর সাহেবের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে এক হাজার টাকা চুরি গেছে। তিনি আমারে ডেকে নিয়ে যাবলেন, এই যে দাঢ়িওয়ালা, তুমি কি আমার টাকা নিয়েছো?

আমার চোখে পানি এসে গেলো। একি আপমানের কথা। আমি দরিদ্র। আমার যাওয়ার জ্ঞানগা নাই — সবই সত্য, কিন্তু তাই বলে আমি কি চেব? ছিঃ ছিঃ।

শুশুর সাহেব বললেন, কথা বলো না কেন?

আমি বললাম, আমারে অপমান কইবেন না। যতে ছোটই হই আমি আপনার কন্যার
স্বামী।

ক্ষণের সহেব বলালেন, চুপ। চেব আবাব ধন্দেব কথা বলে

লতিফা সেইদিন থেকে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলো। সে কললো, এই বাড়ির ভাত দে
মুখে দিবে না।

আমার শাঙ্গড়ী বললেন, চং কবিস্ম না। এই বাড়ির ভাত ছাড়া তুই ভাত পাবি কই?

দুই দিন দুই বাত গেলো লতিফা পানি ছাড়া কিছুই মুখে দেয় না। আমারে বলে, তুমি
আমারে অন্য কোথাও নিয়া চলো। দরকার হইলে গাছতলাস্ব নিয়া চলো। এই বাড়ির ভাত
আমি মুখে দিবো না।

আমি মহবিপদে পড়লাম।

সাবাবাত আল্লাহনে ডাবলাম। ফজরের নামাজেব শেষে আল্লাহপাকের দ্ববাবে হাত
উঠায়ে বললাম, হে যাবুদ! হে পাক পরোয়ারদিগার—! তুমি ছাড়া আমি কাব কাছে যাবো?
আমার দুঃখের কথা কাবে বলবো? কে আছে আমাব? তুমি আমারে বিপদ থাইক্যা বাঁচাও।

আল্লাহপাক আমাব প্রার্থনা শুনলেন।

ভোরবেলায় চালেব আড়তে গিয়েছি। সিদ্ধিকূব রহমান সহেব আমারে ডেকে বললেন,
এই যে মৌলানা, আমার একটা উপকার করতে পাববে?

আমি বললাম, জি জনাব বলেন।

‘অয়মনসিংহ শহবে আমি নতুন বাড়ি করেছি। এখন থেকে এই বাড়িতে থাকবো। সপ্তাহে
সপ্তাহে এইখানে আসবো। নেত্রকোনায় আমার যে বাড়ি আছে — তুমি কি সেই বাড়িতে
থাকতে পারবে? নেত্রকোনার বাড়ি আমি বিক্রি করতে চাই না। শুনলাম তুমি বিবাহ করেছো
— তুমি এবং তোমার স্ত্রী দুজন মিলে থাকো।’

আমি বললাম, জনাব আমি অবশ্যই থাকবো।

‘তাহলে তুমি এক কাজ করো, আজকেই চলে আসো। একতলার কয়েকটা ঘর নিয়ে
তুমি থাকো। দুতলার ঘব তালাবন্ধ থাকুক।’

‘জি আচ্ছা।’

‘বাড়িটা শহব থেকে দূৰে। তবে ভয়ের কিছু নেই, একজন দারোয়ান আছে। চারিখণ্ড ঘণ্টা
থাকবে। দারোয়ানেব নাম — বললাম। ভালো লোক।’

‘জনাব আমি আজকেই উঠবো।’

সেইদিন বিকালেই সিদ্ধিক সাহেবের বাড়িতে এসে উঠলাম। বিবাহ বাড়ি। বাড়িব নাম
‘সরজুবালা হাউস।’ হিন্দুবাড়ি ছিলো। সিদ্ধিক সাহেবের বাবা কিম্বে মাঝেছিলেন।

আট ইঞ্জি ইটের দেয়ালে বাড়িব চারদিক ঘেৱা। দোতলা পাখা দালান। বিৱাটি বড় বড়
বারান্দা। দেয়ালের ভেতৱে নানান জাতের গাছগাছড়া। দিনেব খেলায় অঙ্ককার হয়ে থাকে।

আমি লতিফাকে বললাম, বাড়ি পছন্দ হয়েছে লতিফা।

লতিফা আনন্দে কেঁদে ফেললো। দুইদিন খাওয়া-দাওয়া না কৰাব লতিফাব শৰীব নষ্ট
হয়ে গিয়েছিলো। চোখ ছোট ছোট কাঁজত মুখ শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেছে। এই
অবস্থাতেই সে বাস্তাবনা কৱলো। অতি সামান্য আয়োজন। ভাত ডাল পেপে ভাজা। খেতে

অথবের মতো লাগলো ভাই সাহেব।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে হাত ধ্বাধবি করে বাগানে হাঁটলাম। হাসবেন না ভাইসার, ওগুন আনন্দের বয়স ছিলো অল্প। মন ছিল অন্য রকম। হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হলো এই দূনিয়াতে আপ্লাইপাক আমার মতো সুৰী মানুষ তৈরি করেন নাই। আনন্দে বাববাব চোখে পানি এসে যাচ্ছিলো ভাই সাহেব।

ঙ্কাণ্ট হয়ে একসময় একটা লিচুগাছের নিচে আমরা বসলাম। লতিফা বললো, আমি যে মিথ্যা কথা বহিলা আপনেবে বিবাহ কবছি এই জন্যে কি আমার উপর রাপ করছেন?

আমি বললাম, না লতিফা। আমার মতো সুৰী মানুষ নাই।

‘যদি সুৰী হন তাহলে এই ধাঁধাটা পাবেন কিনা দেখেন। বলেন দেখি —

‘কাটলে বাঁচে, না কাটলে ঘরে

এমন সুন্দর ফল কোন্ গাছেতে ধরে?’

‘পারলাম না লতিফা।’

‘ভালোমতো চিন্তা কইয়া বলেন। এইটা পাবা দবকার। খুব দবকার —

কাটলে বাঁচে, না কাটলে ঘরে

এমন সুন্দর ফল কোন্ গাছেতে ধরে?’

‘পারবো না লতিফা। আমার বুদ্ধি কম।’

‘এইটা হহলো সন্তানের নাড়ি কাটা। সন্তানের জন্মের পর নাড়ি কাটলে সন্তান বাঁচে। না কাটলে বাঁচে না। আচ্ছা, এই ধাঁধটা আপনেরে কেন জিজ্ঞেস করলাম বলেন তো?’

‘তুমি বলো। আমার বিচার-বুদ্ধি খুবই কম।’

‘এইটা আপনেরে বললাম — কারণ আমার সন্তান হবে।’

লতিফা লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললো। কি যে আনন্দ আমার হলো ভাই সাহেব। কি যে আনন্দ।

সেই রাতে লতিফার জ্বর আসলো।

বেশ ভালো জ্বর। আমি জ্বরের খবর রাখি না। ঘুমুচ্ছি। লতিফা আমাবে ডেকে তুললো। বললো, আমার খুব ভয় লাগতেছে। একটু উঠেন তো।

আমি উঠলাম। ঘর অঙ্ককার। কিছু দেখা যায় না। হারিকেন জ্বালায়ে শুমেছিলো। বাতাসে নিতে গেছে। হারিকেন জালালায়।

তাকিয়ে দেখি লতিফার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে এন্তুলা, ছাদের বারান্দায় কে যেন হাঁটে।

আমি শোনাব চেষ্টা করলাম। কিছু শুনলাম না।

লতিফা বললো, আমি স্পষ্ট শুনেছি। একবার না। অনেকবার শুনেছি। জুতা পায়ে দিয়া থাটে। জুতাব শব্দ হয়। হাঁটার শব্দ হয়।

‘বোধহয় দারোয়ান।’

‘না দাবোয়ান না। অন্য কেউ।’

‘কি করে বুবলা অন্য কেউ?’

‘বললাম না — জুতাব শব্দ। দারোয়ান কি জুতা পৰে?’

‘তুমি থাকো। আমি খোঁজ নিয়া আসি।’

‘না না। এইখানে একা থাকলে আমি যরে যাবো।’

আমি লতিফার হাত ধরে বসে রইলাম। এই প্রথম বুকলাম লতিফার খুব জ্বর। জ্বর আরো বাড়লো। একসময় জ্বর নিয়ে ঘুমায়ে পড়লো। তখন আমি নিজেই শব্দটা শনলাম। ঘনবন শব্দ। জ্বুভাব শব্দ না। অন্যরকম শব্দ। ঘন-বন-বন- ঘন।

একমনে আব্রাত্তুল কূরসি পড়লাম।

তিনবার আব্রাত্তুল কূরসি পড়ে হাত তালি দিলে — সেই হাত তালির শব্দ ঘোদূর যায়। তোদূর কোনো ঝীন-ভূত আসে না। হাত তালি দেম্বার পর ঘনবন শব্দ কমে গেলো, তবে পুরোপুরি গেলো না। আমি সারাবাত জ্বেগে কঢ়িলাম।

ভোরবেলা সব শাভাবিক।

রাতে ষে এতো ভয় পেয়েছিলাম যেনেই রইলো না। লতিফার গায়েও জ্বর নাই। সে ঘর-দোয়ার গুছাতে শুরু করলো। একজলার সর্বদক্ষিণের দুটা ঘর আশৰা নিয়েছি। বারান্দা আছে। কাছেই বলরাম। লতিফা নিজের সংসার ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। দারোয়ান বলরাম সাহায্য করার জ্বন্য চলে আসলো। বলরামের বয়স প্রায় সন্তরের কাছকাছি। আদি বাড়ি নেপালে। দশ বছর বয়সে বাংলাদেশে এসেছে। আর ফিরে যায়নি। এখন পুরোপুরি বাঞ্ছলী। বাঞ্ছলী একটি মেঝেকে বিয়ে করেছিলো। সে মেয়ে শরে গেছে। বলরামের এক ছেলে আছে। খুলনার এক ব্যাংকের দাবোয়ান। ছেলে বিয়ে-শাদী করেছে। বাবার কোনো খোঁজ খবর করে না।

বলরামের সংগে অতি অল্প সময়ে লতিফার ভাব। বলরাম লতিফাকে মা ডাকা শুরু করলো। আমি নিশ্চিত হয়ে দোকানে চলে গেলাম। ফিরতে ফিরতে সজ্জ্য হয়ে গেলো।

বাড়িতে তুকে দেখি বারান্দায় পা ছড়িয়ে লতিফা বসে আছে। তার মুখ শুকন। আমি বললাম, কি হয়েছে?

‘ভয় লাগছে।’

‘কিসের ভয়?’

‘বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।’

‘কি স্বপ্ন?’

‘দেখলাম আমি ঘুমাচ্ছি। একটা লম্বা, কালো এবং খুব মোটা লোক ঘেঁষে রাখলো। লোকটার সারা শরীরে বড় বড় লোম। কোনো দাঁত নেই। চোখগুলো অস্তরে ছেট ছেট, দেখাই যায় না — এরকম। হাতের থাবাগুলিও খুব ছেট। বাজা ছেবেসের মতো। আমি লোকটাকে দেখে ভয়ে চিন্কার করে উঠলাম। সে বললো, এই ভয় কেন? আমার নাম কফিল। আমি তো তোর সাথেই থাকি। তুই টের পাস না! তুই বিয়ে করেছিস আমি কিছু বলি নাই। এখন আবার সন্তান হবে। ভালোমতো শুনে রাখ — তোর সন্তানটারে আমি শেষ করে দিবো। এখনি শেষ করতাম। এখন শেষ করলে তোর জীবন শুরু হবে। এই জন্যে কিছু করছি না। সন্তান জন্মের সাতদিনের ভিত্তির আমি তারে জোর করবো। এই বলেই সে আমারে ধরতে আসলো। আমি চিন্কার করে জ্বেগে উঠলাম। অরপর থেকে এইখানে বসে আছি।’

আমি বললাম, স্বপ্ন হলো স্বপ্ন। কতো খারাপ খারাপ স্বপ্ন মানুষ দেখে। সবচে বেশি

খারাপ স্বপ্ন দেখে পোয়াটী যেঘেছেলো। তাদেব মনে থাকে শৃঙ্খলাম।

কথাবার্তা বলে লতিফাকে মোটামুটি স্বাভাবিক করে তুলাম। সে ঘরেব কাঞ্জকর্ম করতে লাগলো। রাঙ্গা করলো। আমরা সকাল সকাল খওয়া-দাওয়া করলাম। তারপর বাগানে হাঁটতে বের হলাম। লতিফা বললো, এই বাড়িতে একটা দোষ আছে সেইটা কি আপনি জানেন?

‘কি দোষ?’

‘এই বাড়িতে একটা খারাপ কূয়া আছে। সিদ্ধিক সাহেবের চার বছর বয়সের একটা ছোট মেঝে কূয়ায় পড়ে মারা গিয়েছিলো। কূয়াটা দোষী।’

‘কি যে তুমি বলো। কূয়া দোষী হবে কেন? বাচ্চা মেয়ে খেলতে খেলতে পড়ে গেছে।’

‘তা না, কূয়াটা আসলেই দোষী।’

‘কে বলোছে?’

‘বলরাম বলেছে। কূয়াটার মুখ সিদ্ধিক সাহেব তিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। সেই টিনে রাতের বেলা ঘনবন শব্দ হয়। মনে হয় ছেট কোনো বাচ্চা তিনের উপরে লাফায়। তুমি গত রাতে কোনো ঘনবন শব্দ শোনো নাই?’

আমি মিথ্যা করে বললাম, না।

‘আমি কিন্তু শনেছি।’

আমি বলরামের উপর খুব বিরক্ত হলাম। এইসব গল্প বলে ভয় দেখানোর কোনো মানে হয়? ঠিক করলাম ভোরবেলায় তাকে ঢেকে শক্তভাবে ধমক দিয়ে দেবো।

রাতে ঘুমুতে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম লতিফার জ্বর এসেছে। সে কেমন যিষ মেরে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। হারিকেন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমুতে গেলাম। গভোর রাতে ঘূম ভাঙলো। লতিফা আমাকে ঝাঁকাচ্ছে। ঘর অক্ষকার। লতিফা বললো, হারিকেন আপনা-আপনি নিতে গেছে। আমার বড় ভয় লাগতেছে।

আমি হারিকেন জ্বালালাম। আর তখনি ঘনবন শব্দ পেলাম। একবার না, বেশ কয়েকবার।

লতিফা ফিসফিস করে বললো, শব্দ শুনলেন?

আমি জ্বাব দিলাম না। লতিফা কাঁদতে লাগলো।

যতোই দিন যেতে লাগলো লতিফার অবস্থা ততোই খারাপ হতে লাগলো। আজ সে কফিলকে স্বপ্ন দেখে। কফিল তাকে শাসিয়ে যায়। বারবার মনে করিয়ে দেয়—বীচা হওয়ার সাতদিনের মধ্যে সে বাচ্চা নিয়ে নিবে। মনের শাস্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলো।

আমি লতিফাকে তার বাবার বাড়িতে নিষে যেতে চাইলাম। সে রাজি হলো না। প্রয়োজনে সে এইখানেই মরবে কিন্তু বাবার বাড়িতে যাবে না। আমি তার জন্যে ভাবিজ্ঞ-ক্ষয়চের ব্যবস্থা করলাম, বাড়ি বক্সনের ব্যবস্থা করলাম। আমি দরিদ্র মানুষ। তবু একটা কাজের যেয়ের ব্যবস্থা করলাম যেন সে সারাক্ষণ লতিফার কাঁগে থাকে।

কিছুতেই কিছু হলো না।

এক সক্ষ্যাবেলায় বাসায় ফিরে দেখি—লতিফা খুব সাজগোজ করেছে। লাল একটা পাতি পরেছে। পান খেয়ে ঠোট লাল করেছে। বেলী করে চুল বেঁধেছে। কেবলে চার-পাঁচটা

ভবা ফুল। সে পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে। একটু দূরে বলবাম এবং কাঞ্জের মেঝেটা। তারা দুশ্শন ভীত চোখে তাকিয়ে আছে লতিফার দিকে।

আমাকে দেশেই লতিফা খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসি আব থামতেই চাষ না। আমি বললাম, কি হয়েছে লতিফা? লতিফা হাসি ধায়ালো এবং আমাকে হতভম্ব করে দিবে পুরুষের গলায় বললো, মৌলান অসছে। মৌলানাবে অজ্ঞুব পানি দেও। নামাঞ্জের পাটি দেও। কেবলা কোন দিকে দেখাইয়া দাও। টুপি দেও, তসবি দেও।

আমি বললাম, এই রকম করতেছো কেন লতিফা?

লতিফা আবার হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে বললো, ওমা, মেঝেছেলের সংগে দেখি মৌলান কথা বলে ছিঃ ছিঃ ছিঃ। মৌলানার লজ্জা নাই।

আমি আচত্তুল কুরসি পড়া শুরু করলাম।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে লতিফা চিংকার করে বললো, চুপ করো। আমার নাম কফিল। তোর মতো মৌলান আমি দশটা হজম কইবা রাখছি। গোটা কোরান শরীফ আমার মুখ্য। আমার সংগে পাণ্ডা দিবি? আয়, পাণ্ডা দিলে আয়। প্রথম থাইকা শুরু করি . . . হি - হি - হি। ভয় পাইছস? ভয় পাওনেবই কথা। বেশি ভয় পাওনেব দরকার নাই। তোরে আমি কিছু বলবো না। তোর বাচ্চাটাবে শেষ করবো। তুই মৌলান মানুষ, তুই বাচ্চা দিয়া কি করবি? তুই থাকবি মসজিদে। মসজিদে বইস্যা তুই তোর আল্লারে ডাকবি। পুলাপান না থাকাই তোর জন্যে ভালো। হি-হি-হি -।

একটা ভয়ংকর রাত পার করলাম ভাইসাব। সকালে দেখি সব ঠিকঠাক। লতিফা ঘরের কাঞ্জকর্ম করছে। এইভাবে দিন পার করতে লাগলাম। কখনো ভালো, কখনো মদ।

লতিফা যখন আটমাসের পোয়াত্তি তখন আমি হাতে পায়ে ধবে আমাৰ শাশুড়ীকে এই বাড়িতে নিয়া আসলাম। লতিফা ধানিকটা শাস্ত হলো। তবে আগেৰ মতো সহজ স্বাভাবিক হলো না। চমকে চমকে উঠে। রাতে ঘুমাতে পাবে না। ছটফট করে। মাঝে মাঝে ভয়ংকর দৃঢ়স্বপ্ন দেখে। সেই দৃঢ়স্বপ্নে কফিল এসে উপস্থিত হয়। কফিল চাপা গলায় বলে, দেরি নাই, আর দেরী নাই। পুত্রসন্তান আসতেছে। সাতদিনেৰ মধ্যে নিয়ে যাবো। কান্দাকাটি যা কৰার কইবা নেও। ঘুম ভেঙে লতিফা জেগে ওঠে। চিংকার করে কঁদে। আমি চোখে দেখি অন্ধকার। কি করবো কিছুই বুঝি না।

শ্রাবণ মাসেৰ তিন তারিখে লতিফার একটা সন্তান হলো। কি সন্দেশ দে ছেলেটা হলো ভাইসাহেব, না দেখলে বিশ্বাস কৰবেন না। চাপা ফুলেৰ মতো গায়েৰ বজ। টানা টানা চোখ। আমি একশ' রাকাত শোকৱানা নামাজ পড়ে আল্লাহৰ কাছে আমাৰ সন্তানেৰ হ্যায়াত চাইলাম। আমাৰ মনেৰ অস্থিবতা কমলো না।

আঁতুব ঘরেৰ বাইবে একটা বেঞ্চ পেতে রাতে শুয়ে থাকি। আমাৰ স্ত্রীৰ সঙ্গে থাকেন আমাৰ শাশুড়ী আব আমাৰ স্ত্রীৰ দূৰ-সম্পর্কেৰ প্ৰক্ৰিয়াতো বোন। পালা কৰে কেউ না কেউ সাৰাৱাত জেগে থাকি।

লতিফার চোখে এক ফেঁটাও ঘুম নাই। সন্তানেৰ যা। সাবাক্ষণ বাচ্চা বুকেৰ নিচে আড়াল

করে বাখে। এক মুহূর্তের ছন্দে চোখের আড়াল করে না। আমার শাশ্বতী যখন বাচ্চা কোলে
মেন তখনো লতিফা বাচ্চাটাব গমে হাত দিয়ে বাখে যেন কেউ নিয়ে যেতে না পাবে।

ধূয় দিনের দিন কি হলো শুনেন :

ঘোর বর্ষা। সাবাদিন বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গ্যার পৰ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। এরকম বর্ষা
আমি আমার জীবনে দেখি নাই।

লতিফা আমাকে বললো, আইজ রাইতটা আপনে জাগনা থাকবেন। আমার কেমন
জানি লাগতেছে;

আমি বললাম কেমন লাগতেছে?

‘জানি না। একটু পরে পরে শরীর কাঁপতেছে।’

‘তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকো। আমি সাবা রাইত জাগনা থাকবো।’

‘আপনে একটু বলরামবেও খবর দেন। সেও যেন জাগনা থাকে।’

আমি বলরামকে খবর দিলাম। লতিফা বাচ্চাটাবে বুকের নিচে নিয়া শুইয়া আছে। আমি
একমনে আগ্নাহপাকেবে ডাকতেছি। জীবন দেয়ার মালিক তিনি। জীবন নেয়ার মালিকও
তিনি।

রাত তখন কতো আমি জানি না ভাই সাহেব। ঘুমায়ে পড়েছিলাম। লতিফার চিংকারে
ঘূম ভাঙলো। সে আসমান ফাটাইয়া চিংকার করতেছে। আমার বাচ্চা কই গেল। আমার
বাচ্চা কই। দুইটা হারিকেন জ্বলানো ছিলো। দুইটাই নিভানো। পুরা বাড়ি অঙ্ককাব। কাঁপতে
কাঁপতে হারিকেন জ্বলালাম। দেখি, সত্যি বাচ্চা নাই। আমার শাশ্বতী ফিট হয়ে পড়ে
গেলেন।

লতিফা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ছুটে গেলো কুয়াব দিকে।

কুয়াব উপর টিন দিয়া ঢাকা ছিলো। তাকায়ে দেখি টিন সরানো। লতিফা চিংকার করে
বলছে — আমার বাচ্চারে কুয়াব ভিতর ফালাইয়া দিছে। আমার বাচ্চা কুয়াব ভিতরে।
লতিফা লাফ দিয়া কুয়াতে নাঘতে চাইলো। আমি তাকে জড়ায়ে ধরলাম।

ইয়াম সাহেব চুপ করে গেলেন। কপালের ঘাম মুছলেন। আমি বললাম, বাচ্চাটা কি
সত্যি কুয়াতে ছিলো?

‘জি।’

‘আর দ্বিতীয় বাচ্চা। সেও কি এইভাবে ঘাবা যায়?’

‘জি—না জনাব। আমার দ্বিতীয় সন্তান বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে।’

‘সিদ্ধিক সাহেবের ঐ বাড়ি তাহলে আপনি ছেড়ে দেন?’

‘জি। তাতে অবশ্য লাভ হয় না। কফিলেব যন্ত্ৰণা কমে নন। দ্বিতীয় সন্তানটাকেও সে
মারে। জন্মেব চারদিনেব দিন . . .’

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, থাক ভাই আমি শুনতে চাই না। গল্পগুলো আমি সহ
করতে পারছি না।

ইয়াম সাহেবে বললেন, আগ্নাহপাক আবেকট স্টেশন দিতেছেন। কিন্তু এই সন্তানটাকেও
ধীচাতে পারবো না। মনটা বড়ই খাবাপ ভাই সহেম। বড়ই খাবাপ। আমি কতোবাৱ চিংকার
করে বলেছি — কফিল, তুমি আমাবে যেবে ফেলো। আমার সন্তানবে যেবো না। এই সুন্দৰ

দুনিয়া তারে দেখতে সাও।

ইয়াম সাহেব কাঁদতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোব হলো। ইয়াম সাহেব ফজুরের নামাজের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

সেইদিন ভোরেই আমি সফিককে নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম। সফিকের আরো কিছুদিন থেকে কালু বা রহস্য ভেদ করে আসার ইচ্ছা ছিল। আমি তা হতে দিলাম না। ইয়াম সাহেবের সঙ্গে আরো কিছু সময় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

৩

সাধারণত আমি আমার জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্প মিসির আলির সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র বলি। মজার ব্যাপার হচ্ছে — ইয়াম সাহেবের এই গল্প তাঁকে বলা হলো না।

ঢাকায় ফেরার তিমদিনের মাঝায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা মানান কথাবার্তা হলো, এটা বাদ পড়ে গেলো।

দু'মাস পর মিসির আলি আমার বাসায় এলেন। রাতে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলাম। তিনি প্রায় দু'ষটো কাটিয়ে বাড়ি চলে গেলেন — ইয়াম সাহেবের গল্প বলা হলো না। তিনি চলে যাবার পর মনে হলো, ইয়াম সাহেবের গল্পটা তো তাঁকে শোনানো হলো না।

আমি আমার মেয়েকে বলে রাখলাম যে, এরপরে যদি কখনো মিসির আলি সাহেব আমাদের বাসায় আসেন সে যেন আমার কানের কাছে ‘ইয়াম’ বলে একটা চিংকার দেয়। আমার এই মেয়ের স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো। সে যে যথাসময়ে ‘ইয়াম’ বলে চিংকার দেবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

হলোও তাই। অনেকদিন পর মিসির আলি সাহেব এসেছেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করছি, আমার মেয়ে কানের কাছে এসে বিকট চিংকার দিলো। এমন চিংকার যে মেজাজ খাবাপ হয়ে গেলো। মেয়েকে কড়া ধরক দিলাম। মেঝে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, তুমি তো বলেছিলে মিসির চাচু এলে — ‘ইয়াম’ বলে চিংকার করতে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে তো বলিনি। যাও, এখন যাও তো।

মিসির আলি বললেন, ব্যাপারটা কি ?

আমি বললাম, তেমন কিছু না। আপনাকে একটা অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাচ্ছিলাম। একজন ইয়াম সাহেবের গল্প। আপনার সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু গল্পটা বলার কথা মনে থাকে না। মেয়েকে মনে করিয়ে দিতে বলেছি। সে এমন চিংকার দিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে বাঁ কানে কিছু শুনতে পারছি না।

মিসির আলি বললেন, গল্পটা কি বলুন শুনি।

‘আজ থাক। আরেকদিন বলবো। একটু সময় লাগবে। লম্বা গল্প।’

মিসির আলি বললেন, আরেক কাপ চা দিয়ে দিলুম। চা থেঁয়ে বিদেয় হই।

চায়ের কথা বলে মিসির আলির সামনে এসে বসলাম। মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ইয়াম সাহেবের গল্পটা আপনি আমাকে কখনোই বলতে পারবেন না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ?

‘আপনার মন্তিক্ষের একটা অংশ আপনাকে গল্পটা বলতে বাধা দিচ্ছে। যে কারণে অনেকদিন খেকেই আপনি আমাকে গল্পটা বলতে চান অথচ বল হ্য না। আপনার মনে থাকে না। আজ আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া হলো। এবং মনে করিয়ে দেয়ার জন্য আপনি রেগে গেলেন। তার চেয়ে বড় কথা — মনে করে দেবার পকেও আপনি গল্পটি বলতে চাচ্ছেন না। অভ্যন্তর বের করেছেন, বলছেন লম্বা গল্প। আমি নিশ্চিত, আপনার অবচেতন মন চাচ্ছে না — এই গল্প আপনি আমাকে বলুন। আপনার সাব-কনসাস মাইগ্র আপনাকে বাধা দিচ্ছে।’

‘আমার সাব-কনসাস মাইগ্র আমাকে বাধা দিচ্ছে কেন ?’

‘আমি তা বুঝতে পারছি না। গল্পটা শুনলে বুঝতে পারবো। তা আসুক। তা খেতে খেতে আপনি বলা শুরু করুন। আমার সিগারেটও ফুরিয়েছে। কাউকে দিয়ে কয়েকটা সিগারেট আমিয়ে দিন।’

আমি আর কোনো অভ্যন্তরে গেলাম না। গল্প শেষ করলাম। গল্প শেষ হওয়ামাত্র মিসির আলি বললেন, আবার বলুন।

‘আবার কেন ?’

‘মানুষ যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প বলে তখন মূল গল্পটি দ্রুত বলার দিকে ঝোক থাকে বেশি। গল্পের ডিটেইলস—এ যেতে চায় না। একই গল্প দ্বিতীয়বার বলার সময় বর্ণনা বেশি থাকে। কারণ মূল কাহিনী কলা হয়ে গেছে। কখক তখন না কলা অংশ বলতে চেষ্টা করেন। আপনিও তাই করবেন। প্রথমবার শুনে কয়েকটা জিনিস বুঝতে পারিনি। দ্বিতীয়বারে বুঝতে পারবো। শুরু করুন।’

আমি শুরু করলাম, বেশ সময় নিয়ে বললাম।

মিসির আলি বললেন, কবে গিয়েছিলেন মুন্দুলনাড়া ? তারিখ মনে আছে ?

‘আছে।’

আমি মিসির আলিকে তারিখ বললাম। তিনি শাস্তি গলায় বললেন, আপনার তারিখ অনুযায়ী মেয়েটির বাচ্চা এখন হবে কিংবা হয়ে গেছে। আপনি বলছেন দশ মাস আগের কথা। মেয়েটির বাচ্চা হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে যে হত্যা করা হয়েছে সেই সম্ভাবনা মিরাজকেই ভাগেরও বেশি। আব যদি এখনো হয়ে না থাকে তাহলে বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেতে পারে। এখন কটা বাজে দেখুন তো।

আমি বড়ি দেখলাম, নটা বাজে।

মিসির আলি বললেন, রাত সাড়ে দশটায় ময়মনসিংহে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে। চলুন ইঙ্গো হই।

‘সত্ত্ব যেতে চান ?’

‘অবশ্যই যেতে চাই। আপনার অসুবিধা থাকলে কিভাবে যেতে হবে আমাকে বলে দিন। আমি ঘুরে আসি।’

‘আমার অসুবিধা আছে। তবু যাবো। এখন শুনুন তো স্থীর কফিলের ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করছেন ?’

‘না।’

‘আপনার ধারণা বাচ্চাগুলোকে খুন কবা হয়েছে?’

‘তা তো বটেই।’

‘কে খুন করেছে?’

মিসির আলি সিগাবেট ধরাতে ধ্রাতে বললেন, কে খুন করেছে তা আপনিও জানেন। আপনার সাব-কনসাস মাইগু জানে। জানে বলেই সাব-কনসাস মাইগু গল্পটি বলতে আপনাকে বাধা দিচ্ছিলো।

‘আমি কিছুই জানি না।’

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, আপনার সাব-কনসাস মাইগু জানে কিন্তু সে এটি আপনার কনসাস মাইগুকে জ্ঞানায়নি বলেই আপনার মনে হচ্ছে আপনি জানেন না।

আমি বললাম, কে খুন করেছে?

‘লতিফা। দুটি বাচ্চাই সে মেরেছে। তৃতীয়টিও মারবে।’

‘কি বলছেন এসব?’

‘চলুন রওনা হয়ে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে যেতে যেতে ব্যাখ্যা করবো।’

মিসির আলি বললেন, লতিফা যে পুরো ঘটনাটা ঘটাচ্ছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় শুরুতেই, যখন ইমাম সাহেব আপনাকে বলেন কিভাবে ঝৌন কফিল তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিলো।

পুরানো ধরনের মসজিদ, একটামাত্র দরজা। এই ধরনের মসজিদে বসে থাকলে বাইবের চিংকার শোনা যাবে না। ভেতর থেকে চিংকার কবলেও বাইবের কেউ শুনবে না। কাবণ সাউণ্ড ওয়েভ চলার জন্য মাধ্যম লাগে। মসজিদের দেয়াল সেখানে বাধা মতো কাজ করছে।

আপনি এবং ইমাম সাহেব মসজিদে ছিলেন। ইমাম সাহেব একসময় স্ত্রীর ঝোঁজ নিতে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, লতিফা খুব চিংকার করছে। তাই না?

‘ঝি তাই।’

‘মসজিদের ভেতরে বসে সেই চিংকার আপনি শুনতে পাননি। তাই না?’

‘ঝি।’

‘অথচ ইমাম সাহেব যখন আগুন দেখে ভয়ে চেঁচালেন, ‘বাঁচাও বাঁচাও’। তখন লতিফা পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো। প্রথমত ইমাম সাহেবের চিংকার লতিফার শোনার কথা নয়। দ্বিতীয়ত শুনে থাকলেও লতিফা কি করে বুঝলো আগুন লেগেছে? সে পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো কেন? ‘আগুন, আগুন’ বলে চিংকার করলেও আমরা চিংকার শুনে প্রথমে খালি হাতে ছুটে আসি, তারপর পানির বালতি আনি। এটাই স্বত্ত্বার্থ। এই মেয়েটি শুকতেই পানির বালতি নিয়ে ছুটে এসেছে। কারণ পানির বালতি অতুব কাছে রেখেই সে আগুন ধৰিয়েছে। আমার এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?’

‘হচ্ছে।’

‘প্রথম শিশুটি মারা গেলো। শিশুটিকে ফেলা হলো কূয়ায়। এই খবর মেয়েটি জানে।

কারণ মে পাগলের মতো ছুটে গেছে কুয়ার দিকে — অন্য কোথাও নয়। তার বাচ্চাটিকে কুয়াতে ফেলা হয়েছে এটা সে জ্ঞানলো কিভাবে? জ্ঞানলো কারণ সে নিজেই ফেনেছে। এই ঘৃণ্ণন আপনাব কছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?’

‘হ্যা, হচ্ছে।’

‘আপনাকে কি আরো যুক্তি দিতে হবে? আমার কাছে আরো ছোট খাটো যুক্তি আছে।’

‘আর লাগবে না। শুধু বলুন কুয়ার উপরের টিনে ঝনঝন শব্দ হতো কেন? যে শব্দ ইয়াম সাহেব নিজেও শুনেছেন।’

‘কুয়ার টিনটা না দেখে বলতে পারবো না। আমার ধারণা বাতাসে টিনটা কাঁপে, ঝনঝন শব্দ হয়। দিনের বেলায় এই শব্দ শোনা যায় না, কারণ আশেপাশে অনেক ধৰনের শব্দ থাকে। রাত যতেওই গভীর হয় চারপাশ নীরব হতে থাকে। সামান্য শব্দই বড় হয়ে কানে আসে।’

‘আপনার এই যুক্তিও গ্রহণ করলাম। এখন বলুন লতিফা এমন ভয়ংকর কাণ্ড কেন করছে?’

‘মেয়েটা অসুস্থ। মনোবিকার ঘটেছে। ইয়াম সাহেব লোকটি তাদের আশ্রিত। তাদের পরিবারে চাকর-চাকরবা যে কাজ করে সে তাই করতো। মেয়েটি ভাগ্যের পরিহাসে এমন একজন মানুষের প্রেমে পড়ে যায়। প্রচণ্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। পরিবাবের সবার কাছে ছোট হয়। অপমানিত হয়। এতো প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিলো না। তার মনোবিকার ঘটে। পোষাকী অবস্থায় মেয়েদের হরমোনাল ব্যালান্স এডিক-ওডিক হয়। সেই সময় মনোবিকার তীব্র হয়। মেয়েটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মেয়েটি দরিদ্র ইয়ামকে বিয়ে করে কঠিন মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছে। একই সঙ্গে সে লোকটিকে প্রচণ্ড ভালোবাসে আবাব প্রচণ্ড ঘণ্টাও করে। কি ভয়াবহ অবস্থা।’

‘মেয়েটি ইয়ামকে প্রচণ্ড ঘণ্টা করে এটা কেন বলছেন?’

‘ইয়ামতি পেশা মেয়েটির পছন্দ নয়। পছন্দ নয় বলেই মেয়েটি কফিলের গলায় বলেছে — ইয়াম আসছে। অজুর পানি দে, জায়নামাজ দে, কেবলা কোনদিকে বলে দে। এক ধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করছে।’

‘মনোবিকার এমন ভয়াবহ রূপ নিলো কেন? সে নিজের বাচ্চাকে হত্যা করছে।’

‘বড় ধরনের বিকারে এরকম হয়। সে নিজেকে ধৰ্মস করতে চাইছে। নিজের সন্তান হত্যার মাধ্যমে সেই ইচ্ছারই অংশবিশেষ পূর্ণ হচ্ছে। আরো কিছু থাকতে পারবে। না দেখে বলতে পারবো না।’

ধূমুলনাড়া গ্রামে সন্ধ্যার পর পৌছলাম। পৌছেই পুরু পেলাঘ পাঁচদিন হয় ইয়াম সাহেবের একটি কন্যা হয়েছে। কন্যাটি ভালো আছে। বড় ধরনের স্বত্তি বোধ করলাম।

ইয়াম সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম মন্ত্রজ্ঞদে। তিনি আমাদের দেখে বড়ই অবাক হশ্নেন। আমি বললাম, আপনার শ্বাস কেমন অছেন?

ইয়াম সাহেব বিক্রিত গলায় বললেন, ভালো না। খুব খারাপ। কফিল তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। কফিল বলেছে, সাতদিনের মাথায় মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। খুব কষ্টে আছি ভাই সহেব। আপ্লাইপাকের কাছে আমার জন্য খাস দিলে একটু দেয়া করবেন।

আমি বললাম, আমি আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। উনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা কলবেন।

ইয়াম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

‘স্বাতে আপনার বাচ্চাটা ভালো থাকে। সুস্থ থাকে। উনি খুব বড় একজন সাইকিয়াটিস্ট। অনেক কিছু বুঝতে পারেন। যা আমরা বুঝতে পারি না। উনার কথা শুনলে আপনাদের মনল হবে। এই জন্যেই উনাকে এনেছি।’

‘অবশ্যই আমি উনার কথা শুনবো। অবশ্যই শুনবো।’

ইয়াম সাহেব আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে অনেক লোকজন ছিল। তাদের সরিয়ে দেয়া হল।

মিসির আলি বললেন, আমি কিছু কথা বলব যা শুনতে ভাল লাগবে না তবু দয়া করে শুনুন।

লতিফা চাপা গলায় বললো, আমার সাথে কি কথা?

‘আপনার বাচ্চাটির বিষয়ে কথা। বাচ্চাটি যাতে বেঁচে থাকে, ভাল থাকে, সে জন্যেই আমার কথা শুনি আপনাকে শুনতে হবে।’

লতিফা তার স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, বলেন কি বলবেন।

মিসির আলি খুবই নিরাসক গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। কথা বলার সময় একবারও লতিফার দিকে তাকালেন না। লতিফা তার শিশুকে বুকের কাছে নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মাথায় লম্বা ঘোমটা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে তার তীব্র চোখের দৃষ্টি নজরে আসছে। ইয়াম সাহেব তার স্ত্রীর পাশে বসে আছেন। মিসির আলির ব্যাখ্যা যতোই শুনছে ততোই তাঁর চেহারা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

মিসির আলি কথা শেষ করে লতিফার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি আমার ব্যাখ্যা বিশ্বাস করলেন?

লতিফা জবাব দিলো না। মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিলো। কি সুন্দর শাস্তি মুখের চোখের তীব্রতা এখন আর নেই। মনে হচ্ছে অশ্রু টেলমল করছে।

মিসির আলি কঠিন গলায় বললেন, আমার ব্যাখ্যা আপনি বিশ্বাস না করজ্ঞও শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার মঙ্গলের জন্য শিশুটিকে আপনি অনেয়ের কাছে দিন। সে যেন কিছুতেই আপনার সঙ্গে না থাকে। আমার যা বলবার বললাম, বাকিটা আপনার ব্যাপার। আচ্ছা, আজ তাহলে যাই। আমরা রাতেই রওনা হবো। নৌকা ঠিক করা আছে।

আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, মিসির আলি সাহেব আপনার কি যদে হয় মেয়েটি আপনার কথা বিশ্বাস করেছে?

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, না করবেন। একটি বিশ্বাস করার কারণেই তার দ্রুত রোগমুক্তি ঘটবে। আমার ধারণা ঘেষেটি নিজেও খালিকটা হলেও এই সন্দেহই

করছিলো। যেয়েটি অসন্তুষ্ট বৃক্ষিমঙ্গী। চলুন রঙনা দেয়া ষাক। এই গ্রামে রাত কাটিতে চাই না।

আমি বললাম, ইয়াম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে যাবেন না?

‘না। আমার কাজ শেষ। বাকিটা ওরা দেখবে।’

রঙনা হবার আগে আগে ইয়াম সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। শিশুটি তাঁর কোলে। তিনি বললেন, লতিফা মেয়েটাকে দিয়ে দিয়েছে। সে খুব কাঁদতেছে। আপনার সঙ্গে কথা কলতে চায়। যেহেরবাবী করে একটি আসেন।

আমরা আবার ঢুকলাম। বিস্মিত হয়ে দেখলাম লতিফা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, আপনি কি কিছু বলবেন?

লতিফা কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমার আপনার ভালো করবে। আমার আপনার ভালো করবে।

‘আপনি কোন রকম চিঞ্চা করবেন না। আপনার অসুখ সেরে দেছে। আর কোনদিন হবে না।’

লতিফা তার স্বামীর কানে কানে কি ধেন বললো।

ইয়াম সাহেব বিশ্বত গলায় বললেন, জনাব কিছু মনে করবেন না। লতিফা আপনারে একটু ঝুইয়া দেখতে চায়।

মিসির আলি হাত বাড়িয়ে দিলেন। লতিফা দুঃখাতে সেই হাত জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

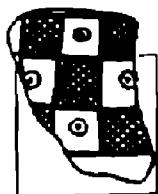
নৌকায় উঠছি।

ইয়াম সাহেব আমাদের তুলে দিতে এলেন। নৌকা ছাড়ার আগমুহূর্তে নিচু গলায় বললেন, তাই সাহেব আমি অতি দরিদ্র মানুষ, আপনাদের যে কিছু দিবো আমারহ্যাপক আমাকে সেই ক্ষমতা দেন নাই। এই কোরান শরীফটা আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গী। যখন মন খুব খারাপ হয় তখন পড়ি — মন শাস্ত করি। আমি খুব খুশি হবো যদি কোরান মজিদটা আপনি মেন। আপনি নেবেন কিনা তা অবশ্য জানি না।

মিসির আলি বললেন, অবশ্যই নেবো। খুব আনন্দের সঙ্গে নেবো।

‘ভাই সাহেব, আমার মেয়েটার একটা নাম কি আপনি রাইখা যাইবেন?’

মিসির আলি হাসি মুখে বললেন, হ্যাঁ যাবো। আপনার মেয়ের নাম বাল্লাম লাবণ্য। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এই নামের একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। মেয়েটা আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয়নি। মাঝে মাঝেই মেয়েটার কথা আমার মনে হয়। মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভাই যাই।



কবি

টাউন প্রসের মালিক সিরাজুল ইসলাম বাগী রাগী মুখ কবে বসে ছিলেন। তাঁর রাগের অনেকগুলি কাবণ ছিল। প্রফ বিড়র জোবেদ আলী এখনো এসে পৌছায়নি। মেশিনম্যান কাজ ছাড়া বসে আছে। তাছাড়া আকাশের অবস্থা ভাল নয়। ঘড়ি-বৃষ্টি হতে পারে। ঘড়ি-বৃষ্টি হলে সিরাজুল ইসলাম সাহেবকে বড়ি ফিরে যেতে হবে। আজ তাঁর ধূব শখ ছিল বিস্তির ওখানে বাত কাটাবেন। তিনি মাদে একবার বিস্তির ওখানে কিছুটা সময় থাকেন। এই মেয়েটি ভল। বাজে ঝামেলা করে না। এই বয়সে বাজে ঝামেলা তাঁর সহ্য হয় না।

বাত আটোব দিকে সত্তি সত্তি চেপে বৃষ্টি এল। তার কিছুক্ষণ পর ভিজতে ভিজতে জোবেদ আলী এসে উপস্থিত।

একটু দেবী হয়ে গেল ইসলাম সাহেব, মেয়েটার হুর।

সিরাজুল ইসলাম উত্তর দিলেন না। তিনি অন্য কথা ভাবছিলেন।

ডাক্তাব গাদা খানিক অশুধ দিয়েছে।

তাই নাকি?

জ্ঞি।

অসুখটা কি?

জোবেদ আলী দীর্ঘ সময় নিয়ে অসুখ সম্পর্কে বলতে লাগল।

সিরাজুল ইসলাম সাহেবের শোনার আগ্রহ ছিল না। তবু তিনি আগ্রহের একটা ভাব চোখে-মুখে ফুটিয়ে রাখলেন। জোবেদ আলী বলল, আজ একটু তাড়াতাড়ি বাসায় যাব স্যার।

আবে সর্বনাশ কি বলেন। কাল সকালে ডেলিভারী দিতে হবে। পাতি দুইবার তাগাদা দিয়ে গেছে। চা খান, চা খেয়ে বসে যান।

জোবেদ আলী বসে গেল, লোকটি প্রফ দেখার কাজে ওন্তাদ বিশেষ। নটর অঞ্জেল এক ফর্মার মত দেখা হয়ে গেল।

জোবেদ আলী।

জ্ঞি স্যাব।

কি মনে হয়, বৃষ্টি ধরবে?

বলা তো মুশকিল।

মুশকিল হবে কেন? বৃষ্টি-বাদলা নিয়েই তো আপনাদের কারবাব — কবি মানুষ।

জোবেদ আলীর মুখে অস্পষ্ট একটা হাসিব বেখা দেখাবেন।

BanglaBook.org

আপনারা আছেন সুখে। বৃষ্টির মত একটি বাজে কামলা নিয়েও লিখে ফেলেন গান্ধার্য।

১৯৮৬ আলীব মুখের হার্ড স্পট হল সিবজুল ইসলাম লেকটরে সে মনেপ্রাণে অপূর্ব করে। কিন্তু এই একটি লোকই তাকে কবি বলে খোচা দেয়। খোচাটিও কড় মধুর ঘনে হয়।

স্যাব, একটু সকাল সকাল যাওয়া দরকার। মেয়েটা স্যাব —

যাবেন যাবেন, কতক্ষণ আর লাগবে? শেষ করে ফেলেন। বানানগুলি দেখবেন:

জোবেদ আলী গভীর মনোযোগে বানান দেখে। সিরাজুল ইসলাম দেখেন বৃষ্টি। মাসের দিশের বিশেষ ফুর্তির দিনগুলিতে বৃষ্টি-বাদলা হয় কেন এই বহস্যরে তিনি যীমাংসা করতে পারেন না। তাঁর কাছে জগতের অমীমাংসিত রহস্যের সংখ্যা ক্রমেই বাঢ়তে থাকে।

বিস্তি মেয়েটির গায়ের রঙ কালো। কালো মেয়েগুলি সাধারণত মায়াবতী হয়। একটি কালো মায়াবতী যুবতীর জন্যে তার এক ধরনের ক্ষুধা বোধ হয়। তাঁর শ্রীর গায়ের রঙ ফর্সা। দাক্ষণ ফর্সা। শুধু গায়ের বঙ্গের জন্যে তার সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যায়। মেয়েটির উচু দাঁত তখন চোখে পড়েনি। কিংবা দাঁত হয়ত সে সময় উচু ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দাঁত আরো উচু হচ্ছে। এবং গায়ের রঙ হচ্ছে আরো সাদা। এখন তাকে শ্রেতী বেগীর মত লাগে।

স্যাব বাকিটা কাল সকালে দেখে দিব।

আরে পাগল নাকি? সকালেই পাটি আসবে। শেষ করে ফেলেন। কতক্ষণ আর লাগবে? চা খাবেন?

ন্তৃ না।

খান খান। এই চা দে তো। তাবপৰ কবি সাহেব নতুন কবিতা কি লিখলেন?

একটা ছেটি লিবিকের মত লিখলাম গত বাতে।

বলেন কি?

শুনবেন স্যাব?

থাক থাক কাজ করেন। কাজের সময় কাব্যচর্চা ঠিক না।

জোবেদ আলী পুফের উপর চোখ রেখে অস্পষ্ট স্ববে বলল, ‘দেশের মাউজেট ছাপা হবে। তাই নাকি?’

ন্তৃ। সম্পাদক সাহেব খুব প্রশংসা করলেন।

ভাল ভাল। এইবার বই বের করে ফেলেন।

বলতে বলতে সিরাজুল ইসলামের মনে হল বৃষ্টি ধরে আসছে, সিরাজুল ইসলাম বক্তের যথে এক ধরনের চঞ্চলতা অনুভব করলেন। বিস্তি মেয়েটি কথা বলে টেনে টেনে। যশোর-টশোরের দিকে বাড়ি নিশ্চয়ই। তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি। এই জাতীয় মেয়েদের সঙ্গে বাড়তি খাতির রাখা ঠিক না। দূরে দূরে থাকতে চায়।

জোবেদ আলী কাজ শেষ করে উঠে পড়ল। এবং মুখ কালো করে মাথা চুলকাতে লাগল। এই ভঙ্গিটি সিরাজুল ইসলামের চেনা। কাজেই তিনি ভাবী গলায় বললেন, পাটির কাছ থেকে আদায়পত্র কিছু হয় নাই। বিজ্ঞেস তুলে দিতে হবে, বুঝলেন?

দশটা টাকা হবে? মেয়েটা কলা নিয়ে যেতে বলেছিল।

সিরাজুল ইসলাম অপ্রসম্ভ মুখে একটা নেট বের করে দিলেন। মাসের মাঝামাঝি টাকা দিতে তাঁর ভাল লাগে না।

যাই স্যার।

সিরাজুল ইসলাম জবাব দিলেন না। তাঁর মুখ অপ্রসম্ভ। কারণ বড় বড় ফেঁটিয় আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

জ্ঞাবেদ আলী বাসায় ফিরে দেখেন মেয়ের জ্বর কমে গিয়েছে। মেয়ে অপেক্ষা করছে বাবার জন্যে। কলা এলে দুধ—কলা দিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু রাত বেড়ে গিয়েছিল। কলা পাওয়া যায়নি। জ্ঞাবেদ আলীর বেশ আরাপ লাগল।

কাল সকালে কলা নিয়ে আসব।

আচ্ছা।

সবরি কলা না সাগর কলা?

যেটা তোমার ইচ্ছা।

ঠিক আছে।

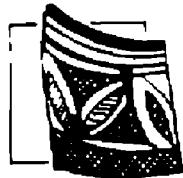
জ্ঞাবেদ আলী খেয়ে—দে়স্তে তার খাতা নিয়ে বসল। স্ত্রীর ঘৃত্যার পর এই একটা সুবিধা হয়েছে, গভীর রাতে বই—খাতা নিয়ে বসলেও কেউ কিছু বলে না।

ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। এ রকম বড়—বৃষ্টির রাত ঘূমিয়ে কাটানোর কোন ঘানে হয় না।

জ্ঞাবেদ আলীর মেয়েটি ঘুমাল না। তার জ্বর আসছিল। সে কাঁধা গায়ে দিয়ে চোখ বড় বড় করে বাবাকে দেখতে লাগল। একবার ফিসফিস করে ডাকল, ‘বাবা’। জ্ঞাবেদ আলী শুনতে পেলেন না। তাঁর মনে অস্তুত সুন্দর একটা লাইন এসেছে — “কি সুন্দর বৃষ্টি আজ রাতে!” অন্য লাইনগুলি আব মনে আসছে না। এই একটি লাইনই ঘূরেফিরে আসছে। গভীর আবেগে তাঁর চোখ ভিজে উঠল।

মেয়েটির জ্বর বাড়ছে। সে আবার ডাকল — বাবা। বাইবে ঝড়—বৃষ্টির শব্দে সে ডাক চাপা পড়ে গেল। মেয়েটি জ্বরতন্ত্র চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার কবি বাবার চোখ। দিয়ে পানি পড়ছে। সে কিছুই বুঝতে পারল না। শিশুরা অনেক কিছুই বুঝতে পারে।
অনেক কিছুই বুঝতে পারে না।

BanglaBook.org



রহস্য

রহস্যজাতীয় ব্যাপারগুলিতে আমার তেমন বিশ্বাস নেই। তবু প্রায়ই এরকম কিছু গল্প-টিপ্প শুনতে হয়। গত মাসে যিকাতলাৰ এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন, তাঁৰ ঘৰে একটি তক্ক আছে — সেটি রোজ রাত ১ টা ২৫ মিনিটে তিনবাৰ ডাকে। আমি বল কষ্ট হাসি সামলালাম। এরকম সময়নিষ্ঠ তক্ক আছে নাকি এ যুগে? ভদ্রলোক আমার নির্বিকার ভঙ্গি দেখে ফললেন, কি ভাই বিশ্বাস কৰলেন না?

ঞ্জি না।

এক রাত থাকেন আমার বাসাৰ। নিজেৰ চোখে দেখেন তক্কটা। ঘড়ি ধৰে বসে থাকবেন। দেখবেন ঠিক ১ টা ২৫ মিনিটে তিনবাৰ ডাকবে।

আৱে দূৰ, কি যে বলেন।

ভদ্রলোক মুখ কালো কৰে উঠে গোলেন। চারদিন পৰ তাঁৰ সঙ্গে আবাৰ দেখা। পৃথিবীটা এৱকম যাৰ সঙ্গে দেখা হবাৰ তাৰ সঙ্গে দেখা হয় না। ভুল মানুষেৰ সঙ্গে দেখা হয়। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক গঞ্জীৰ মুখে বললেন, আপনি কি দৈনিক বাংলাৰ সালেহ সাহেবকে চেনেন?

ঝ্যাচিনি।

তাঁকে বাসাৰ নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি নিজেৰ কানে শুনেছেন — বলেছেন একটা নিউজ কৰবেন।

ভালই তো। নিউজ হবাৰ মতই খবৰ।

আপনি আসেন না ভাই, থাকেন এক রাত। নিজেৰ কানে শুনবেন।

আমাকে শোনালৈ কি হবে?

আৱে ভাই, আপনাৱা ইউনিভার্সিটিৰ চিচার। আপনাদেৱ কথাৰ একটা আলাদা দাম।

তাই নাকি?

আপনাৱা একটা কথা বললে কেউ ফেলবে না।

এই জিনিসটা নিয়ে খুব হৈ-চৈ কৰছেন মনে হচ্ছে।

না, হৈ-চৈ কোথায়? অনেকেই অবশ্যি শুনে গেছেন। বাংলাদেশ চিকিৎসাৰ ক্যামেৰাম্যান নজুল হৃদাকে চেনেন?

ঞ্জি না।

উনিও এসেছিলেন। খুব মাইডিয়াৰ লোক। আপনি সমস্ত না।

আচ্ছা ঠিক আছে, একদিন যাওয়া যাবে।

ভদ্রলোকেৰ চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু মুখভঙ্গি কৰে হাসলেন। টেনে-টেনে বললেন, চলেন চা খাই।

না, চা খাব না।

আরে ভাই, আসেন না। প্রফেসর ঘনুম, আপনাদের সঙ্গে থাকটা ভাগ্যের ব্যপার।
ভদ্রলোক হা-হা করে হাসতে লাগলেন। যেতে হল চায়ের দোকানে।

চায়ের সঙ্গে আব কিছু খাবেন? চপ?

না।

আরে ভাই খান না। এই এদিকে দুটো চপ দে তো। এখন ভাই বলেন, কবে যাবেন?
আপনার সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা হয়। বলে দেব একদিন।

চা খেতে-খেতে ভদ্রলোক ডিউয়ি একটি রহস্যের কথা শুন করলেন। মাইনটিন
সিরিটিতে তিনি বরিশালের পিরোজপুরে থাকতেন। তাঁর বাসার কাছে একটা বিরাট কাঁঠাল
গাছ ছিল। অমাবস্যার রাতে নাকি সেই কাঁঠাল গাছ থেকে কামার শব্দ ভেসে আসত। আমি
গাঁষ্ঠীর হয়ে বললাম, সেই কামারও কি কোন টাইম ছিল? নিদিটি সময়ে কাদত? আপনার
তক্ষকের মত?

ভদ্রলোক আহত শব্দে বললেন, আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

বিশ্বাস করব না কেন?

আমি কামার শব্দ গোটাটা টেপ করে রেখেছি। একদিন শোনাব আপনাকে।
ঠিক আছে।

বরিশালের ডিসি সাহেবও শুনেছেন। চেনেন উনাকে? আসগর সাহেব। সি এস পি। শুব
খানানী ফ্যামিলি।

না, চিনি না।

ডিসি সাহেবের এক ভাই আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকে। বিরাট অফিসার।

ভাই বুঝি?

হ্যাঁ। উনার বাসায় একদিন গিয়েছিলাম। শুব খাতির-যত্ন করলেন। গুলশানে বাস। তিন
তলা। উনি থাকেন এক তলায়। ওপরের দুটো তলা ভাড়া দিয়েছেন।

ভদ্রলোক আমার প্রায় এক ঘণ্টা সময় নষ্ট করে বিদায় হলেন। আমার যায়াই লাগল।
ইন্ডিয়ার ফার্মে সামান্য একটা চাকরি করেন। দেখেই বোৰা যায় অভাবে পর্যবেক্ষণ। চোখের
দৃষ্টি ভরসাহারা। বয়স এখনো হয়ত ত্রিশ হয়নি কিন্তু বুড়োটো দেখায়। বিচ্ছিন্ন চরিত্র।

মাসখানেক তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল না। তাঁর প্রধান কারণ, যে সব জায়গায় তাঁর
সঙ্গে আমার দেখা হবার সম্ভাবনা সে সব জায়গা আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করেছি। নিউ
মার্কেটে আজ্ঞার জাম্বুগাতিতে যাই না। কি দরকার আমেলা বাড়িয়ে? এই লোকটি পিছিল
পদার্থ, সে গায়ের সঙ্গে সেটে যাবে। আর ছাড়ানো যাবে না। কিন্তু শুব দেখা হল। একদিন
শুনলাম সে ইউনিভার্সিটি ক্লাবে এসে ঘোঁজ নিছে। ক্লাবের মেম্বাৰ কলল, গত কিছুদিন ধৰে
নাকি সে নিয়মিতই আসছে। কি মুসিবত!

একদিন আর এড়ানো গেল না। ভদ্রলোক বাসায় প্রেস হাউজের।

কি ভাই, আপনি তো আব এলেন না।

কাজের ব্যস্ততা . . .

আজ আপনাকে নিতে এসেছি।

সে কি ?

কবি শামসুল আলম সাহেবও আসবেন।

তাই বুঝি ?

ছি। চিনেন তো শামসুল আলম সাহেবকে ? দুটো কবিতার বই বেঁয়িয়েছে। ‘পাখির পালক’ আর ‘অঙ্ককার জ্যেষ্ঠা’।

তাই বুঝি ?

ছি। আমাকে দুটো বই-ই দিয়েছেন। খুবই বক্ষ মানুষ। বাড়ি হচ্ছে আপনার ময়মনসিংহ, নেতৃকোনা।

ও।

উনার ছেট ভাইও গল্প-টল্প লেখেন। আরিফুল আলম।

গেলাম তাঁর বাসায়। খিকাতলার এক গলিতে ঘুপসি মত দুকানদার বাড়ি। আমার মেজাজ খুবই খারাপ। রাত দেড়টা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে সময়নিষ্ঠ তক্ককের ডাক শোনার জন্যে। কত রকম যত্নণ যে আছে পথিবীতে !

ভদ্রলোক আমাকে ঘরে বসিয়ে অতি ব্যক্তিগত সঙ্গে ভেতরে চলে গেলেন। বসার ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। মহিলার হাতের সফত্ত স্পর্শ আছে। ভদ্রলোক বিবাহিত জ্ঞানতাম না। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথনো কথা হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী ঘরে এসে ঢুকলেন। অল্প বয়েসী তরুণী এবং অসন্তোষ কল্পসী। আমি প্রায় হকচকিয়ে গেলাম।

আমার স্ত্রী লীনা। আর লীনা, উনি হ্যায়ন আহমেদ। এর কথা তো তোমাকে বলেছি। উনি লেখেন-টেখেন। ছাপা হয়।

লীনা হ্যাসিমুখে বলল, ছি, আপনার কথা প্রায়ই বলে।

লীনা একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।

লীনা চলে গেল ভেতরে। ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, লীনার গল্প-উপন্যাস লেখার শখ আছে। কয়েকদিন আগে সাপ নিয়েও একটা গল্প লিখেছে। মারাত্মক গল্প ভাই। আপনাকে পড়ে শোনাতে বলবো। আমি বললে পড়বে না। আপনিও কাইডলি একটু বলবেন। রিকোয়েস্ট করবেন।

আমি বললাম, শুণী মহিলা তো।

ভদ্রলোকের চোখ-মূখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তা ভাই, কথাটা অস্বীকার করব না। গানও জ্বানে। নজরল গীতি ভল গায়। বাড়িতে চিচার রেখে শিখেছে।

তাই নাকি ?

ছি, শোনাবে আপনাকে। একটু প্রেসার দিতে হবে জাব কি ? আপনি একটু রিকোয়েস্ট করলেই শোনাবে। কাইডলি একটু রিকোয়েস্ট করবেন।

ঠিক আছে, করব।

চা এসে পড়ল। চায়ের সঙ্গে কড়া জাতীয় ফলিস। কেশ খেতে। আমি বললাম, কিসের বড়া এগুলি ? ডালের নাকি ?

ভদ্রলোক উচ্চস্বরে হাসলেন, নাবে ভাই, ফুলের বড়া। হা-হা-হা। কত রকম অস্তুত
যামা যে লীনা জানে। মাঝে মাঝে এত সারপ্রাইজভ হই। খেতে কেমন হয়েছে বলেন? চমৎকার না?

ভাল, বেশ ভাল।

আরেক দিন আসবেন, চাইনীজ সূপ খাওয়াবো। চিকেন কর্ন সূপ। চাইনিজ-বেঙ্গারের
চেয়ে যদি ভাল না হয় তাহলে কান কেটে ফেলবেন। হা-হা-হা। থাই সূপও জানে।

আমি যেয়েটির লেখা একটি ছেটিগাল্প শুনলাম। দু'টি কবিতা শুনলাম। তিসি নজরুল
গীতি শুনলাম। ভদ্রলোক মুঝ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন। বারবার বললেন, ইশ শামসুল
আলম সাহেব আসলেন না। দাক্ষ মিস করলেন, কি বলেন ভাই?

রাত এগারোটির দিকে বললাম, তাহলে আজ উঠি?

তক্ককের ডাক শুনবেন না?

আরেক দিন শুনব।

আচ্ছা, ঠিক আছে। ভুলবেন না যেন ভাই। আসতেই হবে।

ভদ্রলোক আমাকে এগিয়ে দিতে এলেন। রাস্তায় নেমেই বললেন, আমার স্ত্রীকে কেমন
দেখলেন ভাই?

শুব শুণী মহিলা।

ভদ্রলোকের চোখ-মূখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ধরা গলায় বললেন, বাদরের গলায় মুক্তার
মালা। ঠিক না ভাই?

আমি কিছু বললাম না। ভদ্রলোক কাঁপা গলায় বললেন, গরীব মানুষ, স্ত্রীর জন্যে
কিছুই করতে পারি না। কিন্তু এইসব নিয়ে লীনা মোটেই যাথা যামায় না। বড় ফ্যামিলির মেয়ে
তো। ওদের চালচলনই অন্য রকম। আমরা শুব সুধী।

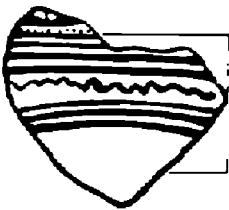
আমি রিকশায় উঠতে উঠতে বললাম, শুব ভাগ্যবান আপনি।

ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন। যেন আবেগে কেঁদে ফেলবেন।

ভাই, আরেক দিন কিন্তু আসতে হবে। তক্ককের ডাক শুনতে হবে। আসবেন তো?
পীজ। লোকজন এলে লীনা শুব খ্রী হয়।

তক্ককের ডাকের মত কত রহস্যময় ব্যাপারই না আছে পৃথিবীতে।

BanglaBook.org



বীনার অসুখ

বীনার বহস এক্ষু।

সে লালযাটিয়া কলেজে বি.এ. সেকেও ইয়ারে পড়ত। বীনার মামা ইদরিশ সাহেব একদিন হঠাৎ বললেন, বীনা তোর কলেজে যাবার দরকার নেই। বাসায় থেকে পড়াশোনা কর। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিলেই হবে। কলেজে আজকাল কি পড়াশোনা হয় তা তো জানাই আছে। যাওয়া না যাওয়া একই।

বীনা ঘাড় নেড়ে ক্ষণ স্বরে বলল, ছি আচ্ছা।

মামার কথার উপর কথা বলার সাহস বীনার নেই। তার পড়াশোনার যাবতীয় খরচ মামা দেন। গত বছর গলার একটা চেন বানিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া তার বিয়ের কথা হচ্ছে। বিয়ে যদি ঠিকঠাক হয় সেই খরচও মামাকেই দিতে হবে। বীনার বাবা প্যারালিসিস হয়ে দেশের বাড়িতে পড়ে আছেন। তাঁর পক্ষে একটা টাকাও খরচ করা সম্ভব না। তিনি সবার কাছ থেকে টাকা নেন। কাউকে কিছু দেন না।

ইদরিশ সাহেব বললেন, বীনা, তুই আমাকে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দে। আর শোন, কলেজে না—যাওয়া নিয়ে মন-টেন খারাপ করিস না। মন খারাপের কিছু নাই।

‘ছি, আচ্ছা মামা।’

বীনা শরবত আনতে চলে গেল। তার মনটা অসম্ভব খারাপ। কলেজ বক্স করে দেবার কোন কারণ সে বুঝতে পারছে না। জিঞ্জেস করার সাহসও নেই। দিনের পর দিন স্বরে বসে থেকেই বা সে কি করবে? শরবত বানাতে বানাতে তার মনে হল — হয়ত তার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। গফরগাঁয়ের ঐ ছেলে শেষ পর্যন্ত হয়ত রাজি হয়েছে। হয়ত ওরা বলেছে— মেঝেকে কলেজে পাঠাবেন না। বিয়ে ঠিকঠাক হলে ছেলেপক্ষের লোকজন অনুত্ত শৃঙ্খল দিয়ে দেয়।

গফরগাঁয়ের ঐ ছেলেটাকে বীনার একেবারেই পছন্দ হয়নি। কেমন হ্যাম পশু পশু চেহারা। সোফার বসেছিল দুই হাতুতে দু' হাত রেখে। মুখ একটু হা হয়ে ছিল। সেই হা- করা মুখের ভেতর কালো কূচকূচে জিহ্বা। বীনার দিকে এক পলক আন্তরেই বীনার বুক ধৰ্ক করে উঠল। মনে হল একটা পশু জিভ বের করে বসে আছে। তার নাকে বাঁধাল গজ্জও এসে লাগল। গজ্জ ঐ লোকটার গা থেকে আসছিল। টক দৃশ্য পোড়া কাঠের গজ্জ একত্রে মেশালে যে রকম গজ্জ হয় সে রকম একটা গজ্জ। গা ক্ষমন ক্ষিমখিম করে।

লোকটা তাকে কোন প্রশ্ন করল না। শুধু প্রিমিটিভ চোখে অকিয়ে রইল। বীনার একবার মনে হল, লোকটার চোখে হয়ত পাতা নেই। সাপের মেঘন চোখের পাতা থাকে না সে রকম। লোকটার সঙ্গে বয়স্ক যে দুজ্জন যানুষ এসেছিলেন তারা অনবরত কথা বলতে লাগলেন।

একজন বীনাকে ডাকতে লাগলেন — আচি। চুল-দাঢ়ি পাকা বস্ত্রস্ক একজন লেক যদি আচি ডাকে তখন ভয়ংকর রাগ লাগে। কোন কথারই জবাব দিতে হচ্ছা করে না। বীনা অবশ্যি সব প্রশ্নের জবাব দিল। কারণ, যামা তার পাশেই বসে আছেন। যামা বসেছেন সোফার ডানদিকে, সে বাঁ দিকে। প্রশ্নের জবাব না দেয়ার কোন উপায়ই নেই।

‘তারপর আচি ব্রিটাকুর কত সনে নোকেল পুরস্কার পান তা জানা আছে?’

‘হ্বি না।’

‘উনিশশ’ তের। অবশ্যি উনি উনিশশ’ তেরতে না পেয়ে উনিশশ’ একত্রিশে পেলেও কিছু যেত আসত না। তবু তারিখটা জানা দরকার। এটা হচ্ছে জ্ঞানকেল মলেজ। মেয়েরা শুধু রাঙাবাঙ্গা করবে তা তো না — তাদের পৃথিবীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাও তো জানতে হবে। কি বলেন আচি?’

‘হ্বি।’

‘আচি, আপনি খবরের কাগজ পড়েন?’

‘না।’

‘এইটা হচ্ছে মেয়েদের একটা কমন দোষ। কোন মেয়ে খবরের কাগজ পড়েন না। আপনি কেন খবরের কাগজ পড়েন না, না পড়ার কারণটা কি আমাদের একটু বলুন তো আচি?’

বীনা কিছু বলল না। যামা পাশে বসে আছেন এই ভয়েই বলল না — কারণ যামা খবরের কাগজ রাখেন না বলেই খবরের কাগজ পড়ে না। এই তথ্যটা তাদের জানান নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। যামা রাগ করবেন।

ইদরিশ সাহেব বললেন, মা বীনা ইনাদের চা-মিটি দাও। চার-পাঁচ জাতের মিটি টেবিলে সাজান। বীনা প্লেটে উঠিয়ে উঠিয়ে সবার দিকে এগিয়ে দিল। লোকটাকে যখন দিতে গেল তখন লোকটা অসুস্থ এক ধরনের শব্দ করল। থাবার মত বিশাল হাত বাড়িয়ে মিটির থালা নিল। বীনা লক্ষ্য করল লোকটির আঙুলের নখ কালচে ধরনের। নখের মাথা পাখির নখের মত ছুচাল। বীনার গায়ে সত্যি সত্যি কঁটা দিয়ে উঠল। সে মনে মনে বলল, আঘা এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে। আঘা এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে।

লোকটা বীনাকে পছন্দ করল কি করল না কিছুই বোঝা গেল না। ইদরিশ সাহেবের প্রসঙ্গে বাসার কারো সঙ্গেই কোন আলাপ করলেন না। ইদরিশ সাহেবের এই হল স্বভাব। বাসার কারোর সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন না। নিজে থা ভাল বুঝাবেন তাই করবেন।

এই যে তিনি আজ বীনার কলেজে যাওয়া বন্ধ করলেন — এর কারণ তিনি কাউকে বলবেন না। ইদরিশ সাহেবের জীবনের মূলমত্ত্ব হচ্ছে, নারী জাতিয় সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে আলাপ না করা। নারী জাতির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অভিজ্ঞানের ফল এটাই — সময় নষ্ট। কী দরকার সময় নষ্ট করে?

ইদরিশ সাহেবের বাসায় তিনি ছাড়া সবই মেয়ে স্বামৈলিয়ে সাতজন মেয়ে। ইদরিশ সাহেবের স্ত্রী, চার কল্যা, তাঁর এক ছোট বেল এবং কাছের একটি মেয়ে। তাঁর বাসায় দুটা বিড়াল থাকে। এই বিড়াল দুটিও মেয়ে বিড়াল। স্বচ্ছত কারণেই ইদরিশ সাহেব বাসায় যতক্ষণ

থাকেন যন্মরা হয়ে থাকেন। চারদিকে মেঝেজাতি নিষে বাস করতে তাঁর ভাল লাগে না। তিনি তাঁর ব্যবসা, তাঁর পরিকল্পনা কিছুই কাউকে বলেন না।

দিন পনেরো বীনার খূব ভয়ে ভয়ে কাটিল। কে জানে হয়ত লোকটা তাকে পছন্দ করে ফেলেছে। তার চেহারা এমন কিছু খারাপ না, পছন্দ করতেও পারে। ক্ষণ মেটামুটি যস্তা। ঢোখ দুটা যারামায়া, লম্বা হালকা-পাতলা শরীর। সাজলে তাকে ভালই দেখায়। পছন্দ করে ফেললে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বীনা বেশ কয়েকবার লজ্জার মাথা খেয়ে তার মাঝেকে জিজ্ঞেস করেছে, মামী, মামা কি কিছু বলেছে?

বীনার মাঝি হাসিনা পৃথিবীর সরলতম মহিলা। অতি সহজ কথাও তিনি বুঝেন না। একটু ঘূরিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে এফনভাবে তাকান যে, মনে হয় আঁখে জলে পড়েছেন। বীনার সহজ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন — কিসের কথা রে?

‘এ যে শুভ্রবারে যে আসল?’

‘কে আসল শুভ্রবারে?’

‘তিনজন লোক আসল না?’

‘তিনজন লোক আবার কখন আসল?’

‘বিয়ের আলাপ নিয়ে আসল না?’

‘ও আচ্ছা — মনে পড়েছে। না, কিছু বলে নাই। তোর মামা কি কখনো কিছু বলে? হঠাৎ একদিন শুনবি বিয়ের দিন-তারিখ হয়ে গোছে। তোর মামা আগে-ভাগে কিছু কলবে? কোনদিন না।’

মাসখানেক কেটে যাবার পরেও বীনার ভয় কাটিল না। মামা তাকে কোন কারণে ডাকলেই মনে হত এই বুঝি বলবেন, বীনা তোর বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেললাম। শ্রাবণ মাসের বার, যক্ষলবার। তুই তোর বাবাকে চিঠি লিখে দে।

বীনা আতঙ্কে আতঙ্কেই ভয়াবহ কিছু দৃশ্যপুরুষের প্রতিটিতে তার বিয়ে হয় সুন্দর একটা ছেলের সঙ্গে। বাসরঘরে সে আর ছেলেটা থাকে আর সবাই চলে যায়। লজ্জায় সে মাথা নিচু করে থাকে। তখন তার স্বামী আদুরে গলায় বলে — লজ্জায় দেখি যরে যাচ্ছ। এই, তাকাও না আমার দিকে। তাকাও। সে তাকায়। তাকাতেই তার গাম্ভীর্য হয়ে যায়। মানুষ কোথায়, একটা কুকুরের মত পশ্চ থাবা গেড়ে বসে আছে। হঁকে মুখের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। পশ্চটার মূখ ছুঁচাল। তার গা থেকে টক দৈ আর পেঁড়া কাটের পশ্চ ভেসে আসছে। স্বপ্নে মানুষ গঁজ পায় না। কিন্তু বানা এই জাতীয় স্বপ্নে গঁজ পেত। স্বীকৃত কৃতগৃহেই এক সময় ঘূর ভেঙ্গে যেত।

প্রায় দেড়মাস এ রকম আতঙ্কে কাটিল। তারপর আতঙ্ক হঠাৎ করেই কেটে গেল। কারণ ইদেরিশ সাহেব এক ছুটির দিনের দুপুরে ভুজ থেকে থেকে বললেন, বিয়েটা ভেঙ্গে দিলাম।

হাসিনা কললেন, কার বিয়ে ভেঙ্গে দিলে?

বীনার, এই যে তিনজন এসেছিল শুভ্রবারে। শুধু চাপাচাপি করছিল : মেয়ে না-কি তাদের শুধু পছন্দ। ওদের বাড়ির অবস্থা ভাল। গফরগাঁওয়ে কাপড়ের ব্যবসা আছে। গ্রামের বাড়িতে ধান-ভঙ্গা কল দিয়েছে। বড় বড় আজুয়ায়হজ্জন।'

'তাহলে বিয়ে ভেঙে দিলে কেন!'

'ছেলের গায়ে বিশ্বী গুৰু। ঘোড়ার আস্তাবলে গেলে যেমন গুৰু পাওয়া যায় সেই রকম। যে কব্বার এই ছেলে আমার কাছে এসেছে এরকম গুৰু পেয়েছি। কি দুরকার?'

হাসিনা দৃঢ়বিত মূখ করে বললেন, আহা গঙ্গের জন্যে বিয়েটা বাতিল করে দিলে। ভালমত সাবান দিয়ে গোসল দিলেই তো গুৰু চলে যায়।

ইদরিশ সাহেব কড়া গলায় কলমেন, যা বৈধ না তা নিয়ে কথা বলবে না। তুমি রোজ গিয়ে গোসল করিয়ে আসবে না-কি? মেয়েছেলের যতো থাকবে। সব কিছুর মধ্যে কথা বলবে না।

'রাগ করছ কেন? রাগ করার মত কি বললাম?'

'চুপ। আর একটা কথাও না।'

ইদরিশ সাহেবের দুর্ব্যবহারে হাসিনা কাঁদতে বসেন তবে বীনার আনন্দের সৌমা থাকে না। যাক শেষ পর্যন্ত শোকটির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না। যামার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বীনার মন ভরে যায়। যামা কথা না বললেও মানুষ খারাপ না। কে জানে এই ষে তাকে কলেজে যেতে নিষেধ করেছেন এরও কোন ভাল দিক নিশ্চয়ই আছে। যামা যদি শুধু কারণটা বলত। কিন্তু যামা বলবে না। অস্তুত মানুষ।

নিতান্তই আকস্মিকভাবে বীনা তার কলেজ বন্ধ হবার রহস্য জ্ঞেনে ফেলল।

ইদরিশ সাহেব বীনার বাবাকে চিঠিতে কারণটা জানিয়েছেন। খামে ভরার আগে এই চিঠি বীনা পড়ে ফেলল।

পাকজনাবেশু

দূলাভাই,

আমার সামাজ জানিবেন। পর সমাচার এই যে, বীনার কলেজে যাওয়া একটি বিশেষ কারণে বন্ধ করিতে হইয়াছে। বীনা ইহাতে কিঞ্চিৎ মনে কষ্ট পাইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য উপায় দেখিলাম না। এখন আপনাকে কারণ বলিতেছি।

জ্ঞাবেদ আলী নামক গফরগাঁওয়ের জনৈক যুবকের সহিত বীনার কিন্তুইর আলাপ হইয়াছিল। পাত্রপক্ষের বিশেষ করিয়া পাত্রের বীনাকে শুবই পছন্দ হইয়াছিল। একটি বিশেষ কারণে বিবাহের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিতে হইয়াছে। এখন কিছু সমস্যা দেখা দিয়াছে। উক্ত জ্ঞাবেদ আলী প্রায়শই বীনাকে অনুসরণ করিয়া কলেজ প্রয়োগ করে নাই। আজকালকার জ্ঞেনের মতিগতির কোন ঠিক নাই। একবার যদি এ্যাসিড জাতীয় কিছু দেয় তাহা হইলে সব্বাস্ত্রের কোন শেষ থাকিবে না। যাহা হউক আপনি তাহার বি.এ. পরীক্ষা নিয়া কেবল চাষ্টা করিবেন না। আমি কলেজের প্রিস্প্যালের সহিত আলাপ করিয়াছি। তিনিশ বলিয়াছেন কোন অসুবিধা হইবে না।

আগেকার মত কলেজগুলি পার্সেন্টেজ নিয়া বামেলা করে না। আপনার শব্দীরের হাল অবস্থা এখন কি? শ্রীবেষ যত্ন নিবেন। বীনাকে লইয়া অথবা চিন্তাপ্রস্ত হইবেন না।"

চিঠি পড়ে বীনার গা কাঁপতে লাগল। কি সর্বনাশের কথা! ঐ লোক তার পেছনে পেছনে ঘায়। কৈ সে তো একদিনও টেব পায়নি। আর তার মাঝার কি উচিত ছিল না ঘটনাটা তাকে জ্ঞানান? সে এখন কলেজে ঘাষে না ঠিকই কিন্তু অন্য জ্ঞানগায় তো ঘাষে। আগে জ্ঞানলে ডাও যেত না। ঘরে বসে থাকত। অবশ্যই মাঝার উচিত ছিল ঘটনাটা তাকে জ্ঞানান।

বীনাকে খুব বুদ্ধিমত্তা মেয়ে কলা ঠিক হবে না। সে যদি বুদ্ধিমত্তা মেয়ে হত তাহলে চট করে বুকে ফেলত তাকে ঘটনাটা জ্ঞানানোর জন্মেই ইদরিশ সাহেব খামে ভরার আগে চিঠিটা দীর্ঘ সময় টেবিলে ফেলে রেখেছিলেন। এই জাতীয় ভূল তিনি কখনো করেন না।

বীনা বাড়ি থেকে বের হওয়া পুরোপুরি বক্ষ করে দিল। আগের ভবের স্বপ্নগুলি আবার দেখতে লাগল। এবারের স্বপ্নে আরো সব কুৎসিত ব্যাপার ঘটতে লাগল। এমন হল যে, ঘুমতে পর্যন্ত ভয় লাগে।

হাসিনা বললেন, কি হয়েছে তোর বল তো?

বীনা ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলে, কই কিছু হয়নি তো?

'তুই তো শুকিয়ে চটি ঝুতা হয়ে যাচ্ছিস। তোর তো আর বিয়েই হবে না। এরকম শুকনো মেঝেকে কে বিয়ে করবে বল? গায়ে গোশত না থাকলে ছেলেরা মেঝেদের পছন্দ করে না। ছেলেগুলি হচ্ছে বদের বদ। খাটা মারি এদের মুখে।'

বীনার কন্দীজীবন কাটতে লাগল। মেঝেরা যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে খুব সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বীনাও খাপ খাইয়ে নিল। সারাদিন তিনি কামরার ঘরেই সময় কাটে। বাইরের বারান্দায় ভুলেও ঘায় না। বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তার অনেকটা চোখে পড়ে। তার ভয় বারান্দায় দাঁড়ালে যদি লোকটাকে দেখে ফেলে। এত সাবধানতার পরও একদিন দেখা হয়ে গেল। বারান্দায় কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে। হাসিনা বললেন, বৃষ্টি এসেছে, কাপড়গুলি নিয়ে আয় তো বীনা। বীনা কাপড় আনতে নিয়ে পাথরের মত জ্বরে গেল। বাড়ির সামনের রাস্তাটার অপর পাশে জ্বরুল গাছের নিচে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে বীনার দিকে। মুখ হা হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে আনিকটা কুঁজো হয়ে। বীনাকে দেখিছে সে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে এপাশে চলে এল। হাত ইশারা করে কি যেন বলল। বীনা চিঙ্কার করে ঘরে ঢুকল। ফ্রটাখানেকের মধ্যে তার জ্বর উঠে গেল একশ' তিনি।

হাসিনা বললেন, এটা কেমন কথা। লোকটা তো বাসও না, ভালবাসও না। তাকে দেখে এত ভয় পাওয়ার কি আছে?

বীনা বিড়বিড় করে বলল, আমি জ্ঞানি না মাঝী। কেন এত ভয় লাগছে আমি জ্ঞানি না। আপনি আমাকে ধরে বসে থাকেন। কেমন যেন লাগছে মাঝী।

ইদরিশ সাহেব সজ্জাবেগো ঘরে ফিরে সব শুনলেন। কাটকে কিছুই বললেন না। সহজ ভঙ্গিতে খাওয়া-সাওয়া করলেন। বড় মেঝেকে জ্বর মেঝে মেঝে মিলেন। রাত সাড়ে নটার সময় বললেন, একটা সৃষ্টিকেসে বীনার কাপড় গুছিয়ে দাও তো। ক্লিন এপারোটায় বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস। বীনাকে দেশের বাড়িতে রেখে আসি।

হাসিনা হস্তস্থ হয়ে কলালেন, আজ রাতে ?

ইদরিশ সাহেব বিরক্ত প্রায় কলালেন, আজ রাতে নয় তো কি পৰশু রাতে না-কি ?
জ্বোবেদ হারামজ্জাদা বড় বিরক্ত করছে। আমি আরো কয়েকদিন দেখেছি।

‘আজ রাতে যাওয়ার দরকার কি, কাল যাও !’

‘কাল যেতে পারলে আজ যেতে অসুবিধা কি ? তোমরা যেমে মানুষরা যা বোঝ না শু
সেটা নিয়ে কথা কল। কাপড় শুচিয়ে দিতে বলেছি শুচিয়ে দাও !’

‘বীনার জ্বর !’

‘জ্বরের সঙ্গে কাপড় গোছানোর সম্পর্ক কি ? কাপড় তো ভূমি গোছাবে। তোমার গায়ে
তো জ্বর নেই !’

হাসিনা কাপড় শুচিয়ে দিলেন। তার স্বামীকে তিনি চেনেন। কথাবার্তা বলে লাভ হবে
না। ‘বীনা একশ’ দুই পয়েন্ট ফাইভ জ্বর মিসে বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস উঠল। বাড়িতে পৌছতে
পৌছতে সেই জ্বর বেড়ে হল একশ’ চার পয়েন্ট ফাইভ।

ইদরিশ সাহেব ছুটি নিয়ে যাননি। বীনাকে রেখে পরদিনই তাঁকে চলে আসতে হল। বীনা
সপ্তাহানিক জ্বরে ভোগে কঁকালের মত হয়ে গেল। মুখে রুটি নেই। যা খায় তাই বমি করে
ফেলে দেয়। রাতে ঘুম হয় না। প্রায় রাতই জেগে জেগে কাটিয়ে দেয়। চোখের পাতা এক
হলেই ভয়ঃকর সব স্বপ্ন দেখে।

এই সময় তার ভয়ের অসুখ হয়। সারাক্ষণই ভয় লাগে। কোন কারণ ছাড়াই বাতাসে
জ্বানালার পাট নড়ে উঠল — বীনার হসপিণ্ড লাফাতে শুরু করে। সে আতঙ্কে অস্ত্রিংহ হয়ে
যায়। প্রচণ্ড ঘাম হয়।

বীনাদের এই বসতবাড়িটা খুবই পুরানো। বীনার দাদা এক হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে
খুব সন্তান এই বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। অনেকখানি জ্বায়গা নিয়ে বাড়ি। পূরো জ্বায়গাটা
দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সংস্কারের অভাবে দেয়াল জ্বায়গায় জ্বায়গায় ভেঙে পড়েছে। দোতলার
ঘরের বেশির ভাগই ব্যবহারের উপযোগী নয়। একতলার তিনটা ঘর শুধু ব্যবহৃত হয়।
দূতলার ঘর তালাবক্ষ থাকে।

একটা ঘরে বীনার বাবা এমদাদ সাহেব থাকেন। প্যারালাইসিসের কারণে এই ঘর থেকে
বের হবার তাঁর কোন উপায় নেই। অন্য একটা ঘরে বীনা এবং বীনার দূর-সম্পর্কের মামী
ঘরিয়ম থাকেন। ঘরের কাজকর্ম করার জন্যে বাতাসী নামের কমবয়েসী একজন মেয়ে থাকে।
তার চোখে অসুখ আছে। রাতে সে কিছুই দেখে না।

বাড়িতে মানুষ কলতে এই চারটি প্রাণী। সজ্জার পর থেকেই বীনার ভয় ভয় করে।
দোতলার বারান্দায় কিসের যেন শব্দ হয়। মনে হয় খড়ম প্লেট কেট যেন হাঁটে। বীনা জানে
ইদুর শব্দ করছে — তবু তার ভয় কাটে না। দূর্বল নাত্তের কারণেই হয়ত আতঙ্কে তার
শরীর কাঁপতে থাকে। সে ফিসফিস করে বলে — কিসের শব্দ মামী ?

মামী ঘরের কাজ করতে করতে নির্বিকার প্রায় গুলেন — জানি না।

‘মনে হয় ইদুরের শব্দ তাই না মামী ?’

‘হইতেও পারে।’

'অন্য কিছু কি ?'

'সহজ্য কেলাম এরার নাম নেওন নাই মা। খারাপ বাতাস হইতে পারে।'

'খারাপ বাতাস ?'

'কতদিনের পুরানো বাড়ি। উপরের ঘরগুলান খালি পইড়া থাকে। কেউ বাসি দেয় না। ঘরে বাসি না দিলে খারাপ বাতাসের আনাগোনা হয়।'

'বাতি দেয় না কেন ? বাতি দিলেই তো হয়। কাল থেকে রোজ সক্ষায় বাতি দিবেন মাঝি !'

'আইছা দিমুনে। অখন ঘূমাও !'

বীনা শুয়ে থাকে। ঘূম আসে না। রাত যতই বাড়তে থাকে দোতলার শব্দ ততই বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় বীনার বাবার গোঙানি। গভীর রাতে তিনি হাঁটুর ব্যথায় গোঙানির মত শব্দ করেন। সেই শব্দও বীনার কানে অমানুষিক শব্দ বলে মনে হয়। যেন বীনার বাবা নয় অন্য কেউ শব্দ করছে। সেই অন্য কেউ মানুষগোত্রীয় নয়। এক ধরনের চাপা হাসিও শোনা যায়।

বীনাদের স্নানঘর মূল ঘর থেকে অনেকটা দূরে। স্নানঘর বীনার খুব প্রিয়। শ্যাওলা ধরা দেয়াল ঘেরা ছোট চারকোণা একটা জ্বায়গা। ভেতরে চৌবাচ্চা আছে। স্নানঘরের ছাদটা ছিল তিনের। গত আশ্বিন মাসের ঝড়ে টিনের ছাদ উড়ে গেছে। সেই ছাদ আর ঠিক করা হয়নি। গোসলের সময় মাথার উপর থাকে খেলা আকাশ। ঠিক দুপুর বেলায় সূর্যের ছায়া পড়ে চৌবাচ্চার পানিতে। মগ দুবালেই চৌবাচ্চা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে চারদিকের সবুজ দেয়ালে। বীনার বড় ভাল লাগে। দুপুর বেলা বীনার অনেকখানি সময় এই গোসলখানায় কেটে যায়। রোজই মনে হয় গ্রামের বাড়িতে এসে ভালই হয়েছে। রাতের তীব্র আতঙ্কের কথা তখন আর মনে থাকে না।

এক দুপুর বেলায় এই গোসলখানাতেই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটল। বীনা গোসল করছে। চারদিক সুনসান নীরবতা। ঘন নীল আকাশের ছায়া পড়েছে চৌবাচ্চায়। বীনার চমৎকার লাগছে। শরীরটা আগের মত দুর্বল লাগছে না। সে আপন মনে খানিকক্ষণ গুরু শুন করল।

বীনা মাথায় পানি ঢালল। ঠাণ্ডা পানি। শরীর কেঁপে উঠল। আর তখনি সে অস্ত একটা গুরু পেল। অস্ত হলেও গুরু চেনা, এই গুরু সে আগেও পেয়েছে। বীনা আস্তুকি অভিভূত হয়ে পড়ল। নির্জন গোসলখানায় এই গুরু এল কোথেকে ? পোড়া কাটকমালায় সঙ্গে মেশা নষ্ট দূধের মিশ্র গুরু। বীনা মগ ছুড়ে ফেলে গোসলখানার দরজায় আস্তুকি পড়ল। দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যেতে হবে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা যাবে না। এক মুহূর্তও না।

আশ্চর্যের ব্যাপার। বীনা দরজা খুলতে পারল না। ছিটকিনি নামান হয়েছে। বীনা প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে অথচ দরজা এক চুলও নড়েছে না। যেন কেউ তাকে আটকে ফেলেছে। বীনা চিংকার করবার চেষ্টা করল। ধাক্কা দিচ্ছে শব্দ বেরল না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা তো নড়লই না। কোন শব্দ পর্যন্ত হল না। অথচ ঘরে অন্য এক রকম শব্দ হচ্ছে। যেন কি একটা পড়েছে চৌবাচ্চায়। টুপটাপ শব্দ। বৃষ্টির ফেঁটার মত।

‘কি পড়ছে?’

‘কিসের শব্দ হচ্ছে?’

বীনা হতভস্য হয়ে দেখল টকটকে লালবর্ণের বক্ত পড়ছে চৌবাচ্চাব। চৌবাচ্চার পানি ক্রমেই খোলা হয়ে উঠছে। কেউ-একজন খোলা ছাদে বসে আছে। রক্ত পড়ছে তার গা থেকে।

বীনা সেই দৃশ্য দেখতে চাব না। সে কিছুতেই উপরের দিকে তাকাবে না। সে জানে উপরের দিকে তাকালেই ভয়ংকর কিছু দেখবে। এমন ভয়ংকর কিছু যা ব্যাখ্যার অতীত, অভিজ্ঞতার অতীত।

তারী, প্লেঘা-জড়িত স্বরে কেউ-একজন খোলা ছাদে বসে আছে। রক্ত পড়ছে তার গা থেকে। ডাকল — বীনা, ও বীনা। শব্দ উপর থেকে আসছে। কেউ-একজন বসে আছে গোসলখানার দেয়ালে। যে বসে আছে তাকে বীনা চেনে। না দেখেও বীনা বলতে পারছে কে বসে আছে।

‘ও বীনা, বীনা।’

বীনা তাকাল। ঈয়া, ঐ লোকটিই বসে আছে। তবে লোকটির মুখ পশুর মত নয়। মায়া মাখা একটি মুখ। বড় বড় চোখ দ্বিতীয় বিষণ্ণ ও কালো। লোকটি পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পা দুটি অস্বাভাবিক — ধ্যাতলান। চাপচাপ রক্ত সেই ধ্যাতলান পা বেয়ে চৌবাচ্চার জলে পড়ছে। লোকটি ভারী প্লেঘাজড়িত স্বরে ডাকল — বীনা, ও বীনা।

বীনা আন হারাল।

তার জ্ঞান ফিরল তৃতীয় দিনে জামালপুর সদর হাসপাতালে। চোখ যেলে দেখল আরো অনেকের সঙ্গে বিছানার পাশে ইদরিশ সাহেব বসে আছেন। তাঁকে টেলিগ্রাম করে আনান হয়েছে।

ইদরিশ সাহেব গভীর যমতার সঙ্গে বললেন, কি হয়েছে রে মা?

বীনা ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, ভয় পেয়েছি মাঘা।

ইদরিশ সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ভয় পাবারই কথা। ঐ জংলা বাড়িতে আমি নিজেই ভয় পাই, আর তুই পাবি না? এখানে থাকার দরকার নেই। চল আমার সঙ্গে ঢাক্কায়। ঢাক্কায় গিয়ে আবার কলেজে যাওয়া-আসা শুরু কর। ঐ ছেলে আর তোকে বিরক্ত করবাবে না। বেচারা ট্রাক এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

বীনা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

ইদরিশ সাহেব নিজের মনেই বললেন, পায়ের উপর দিয়ে ট্রাক চলে গোজল। দুটা পাই ছাতু হয়ে গেছে। হাসপাতালে নেয়ার আঠারো ঘণ্টা পরে মারা গেছে। ব্যবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। না গেলে অস্ত্রস্তা হয়।

ইদরিশ সাহেব খালিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ক্ষেত্ৰটা খারাপ ছিল না। বুঝলি? খামোকাই আজেবাজে সন্দেহ করেছি। অতি ভদ্র ছেলে তোর কথা জিজ্ঞেস কৱল। বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস কৱল।

বীনার খুব ইচ্ছা কৱল বলতে — আমার কথা কি জিজ্ঞেস কৱল মাঘা? সে বলতে পারল না।

ইদবিশ সাহেব বললেন, ছেলেটার এ্যাকসিডেন্টের খবর তার অঞ্জলে পৌছামাত্র সেখানের সব লোক এসে উপস্থিতি। হাজার হাজার মানুষ। হাউমাউ করে কাঁচে। দেখবার মত একটা দশ্য। বুঝলি বীনা, আমরা মানুষের বাইরেরটাই শুধু দেখি। অস্তর দেখি না। এটা শুবই আফসোসের ব্যাপার। তোর ঘাতে ভাল বিষ্ণে হয় এই জন্যে আমাকে কিছু টাকাও দিয়ে গেছে। না করতে পারলাম না। একটা মানুষ যারা যাচ্ছে, কি করে 'না' বলি। ঠিক না?



অয়েময়

বদরুল আলয় সাহেব তারাবীর নামাজ পড়তে থাবেন — কি মনে করে যেন বাংলা ঘরে উকি দিলেন। ঘর অঙ্ককার। অথচ তিনি সঞ্চ্যাবেলায় ঘাগরেবের নামাজে দাঁড়াবার আগেই বলেছিলেন বাংলা ঘরে যেন বাতি দেয়া হয়। এবা কেউ কথা শোনে না। রাগে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। ইদানীং তাঁর এই সমস্যা হয়েছে, বেগে গেলে শরীর কাঁপে।

বাংলা ঘরে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। বিকট দুর্গঞ্জ। মানুষের শরীর পচে গেলে এমন ভয়াবহ ব্যাপার হয় কে জ্ঞানত। দুর্গঞ্জ নাকের ভিতর দিয়ে ধ্যাঁৎ করে যাথায় চলে যায়। মাথা ধ্যাঁবিয় করে। তাবপরই বমিবিয় ভাব হয়। বদরুল আলম সাহেব ঝুঁমাল দিয়ে নাক ঢাকলেন। ঘরে ঢোকার আগেই ঢাকা উচিত ছিল। দেবি হয়ে গেছে। তাঁর মেজাজ আরো খারাপ হল। বাংলা ঘরে ঢোকা উচিত হয়নি। কিছুক্ষণ আগে ভাত খেয়েছেন, খাবার-দাবার বমি হয়ে যেতে পারে। তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন এখন ভাত না দিতে। তারাবী পড়ে থাবেন। এটা শুনল না। কেউ আঙ্ককাল তাঁর কথা শুনছে না।

তিনি নাকে ঝুঁমাল চাপা দিয়েই ডাকলেন — এ্যাই, এ্যাই।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মরে গেছে না—কি? আশ্চর্য, একটা মানুষ অর্ধেকটা শরীর পচে গেছে তবু মরার নাম নেই। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, হাসপাতালে রেখে কি করবেন। বড়জোর দুই দিন, বাড়িতে নিয়ে যান। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজ্ঞনের মাঝখানে আরাম করে মরবে।

আর গাধাগুলি তাকে নিয়ে এসে তাঁর বাংলা ঘরে শুইয়ে দিয়েছেন ফলী যত্নগা। এটা কি তাঁর বাড়িবর? গাধাগুলির সাহস দেখে তিনি স্তুতিত। বাংলা ঘরে দুশ কাজে ব্যবহৃত হয়। লোকজ্ঞ আসে। সেখানে আধা পচা মানুষ এনে শুইয়ে দিল। বিকট গক্ষে বাংলা ঘরের ত্রিসীমানায় এখন কেউ যেতে পারে না। নাড়িভুঁড়ি উল্টে স্বাস্থ্য

তিনি আরো উচু গলায় ডাকলেন — এ্যাই, এ্যাই।

কোন জবাব পাওয়া গেল না। তিনি কিছুক্ষণ বাঁচিপেতে রইলেন। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও আসছে না। নড়াচড়ার শব্দও নেই। যারা গেছে যোধ হয়। আশ্চর্য এই বাড়ির লোকজ্ঞনের কাণ্ডজ্ঞান। এখন মরে তখন মরে একটা মানুষ, তাঁর ঘরে সঞ্চ্যাবেলা বাতি দেয়নি। অথচ তিনি

নিজে জায়নামাজে দাঢ়াবাব আগে বলেছেন যেন বাতি দেয়া হয়। ফতুক্ষণ আগে মরেছে কে জানে। অস্কার ঘর, কে জানে শিয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গিয়ে হস্তো খেয়ে ফেলেছে।

তিনি নাক থেকে কমাল সবাতেই ভক্ত করে আরও খানিকটা গহ্ন ঢুকে গেল। তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না। দেয়াশ্লাইয়ের কাঠি ধরালেন। ঘর খানিকটা আলো হল।

না যরেনি। পিট পিট করে তাকাচ্ছে। ডাঙ্গার বলে দিয়েছে দুদিনের বেশি টিকিবে না। আজ হল তের দিন। আজকাল ডাঙ্গারগুলির কি রকম বিদ্যা-বুদ্ধি। যে কুগীর দুদিন বাঁচার কথা সে তের দিন বাঁচে কি করে?

বদরুল আলম সাহেব বললেন, বেঁচে আছে?

ইউনুস বলল, হ্যে আছি।

মখন গ্যাই বললাম, তখন কথা বললে না কেন?

ইউনুস জবাব দিল না। সে কথা বলেনি ভয়ে। বদরুল আলম সাহেবকে সে বড় ভয় পায়। তাছাড়া সে এই বাড়ির কামলাও না। সে কাঞ্জ করত পুব-পাড়ায়। তারা তাকে রাখতে রাজি না হওয়ায় সবাই মিলে এই বাড়িতে রেখে গেছে। বদরুল আলম সাহেবও রাখতে রাজি হননি। দুদিনের বেশি টিকিবে না শুনে কিছু বলেননি। তাছাড়া রমজান মাস।

বদরুল আলম সাহেব রাগী গলায় বললেন, ঘরে বাতি দেয় নাই?

দিছিল, নিভ্যা গেছে।

কূপীর বাতি। বাতাসে নিভে যাওয়ারই কথা। বাংলা ঘরে এখন কেউ আসে না, কাজেই আরিকেন দেয়া বিপজ্জনক। চোর এসে নিয়ে যাবে। এই লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে, কিছু করতে পারবে না।

ভাত দিয়েছে?

হ্যে দিছে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

ঘর থেকে বেরুবাব আগে তিনি আবার কূপী হ্যেলে দিয়ে গেলেন। যতক্ষণ থাকে থাকুক।

মসজিদে সবাই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তিনি যাওয়ামাত্র তারাবার নামাজ শুরু হল। নামাজ শেষ হতে তেমন সময় লাগল না কিন্তু দোয়া আর যেন শেষ হতেই চায়না এক দোয়ায় বাংলা, উর্দু, আরবী, নানান ভাষা। এই মৌলানা সাহেবের চাকরি এখনো স্থায়ী হয়ে আছে। রমজান মাসে তাঁর কাজকর্ম দেখে তারপর স্থায়ী করা হবে তেমন কথা হয়েছে।

ব্যাটো সে কারণেই দোয়ার মাধ্যমে কাজকর্ম দেখাচ্ছে। দোয়ার প্রয়ায়ে আবার ফুপিয়ে ফুপিয়ে কামা। বড়ই বিরক্তিকর।

বদরুল আলম সাহেব ঠিক করে রাখলেন আজ মৌলানাকে স্বত্ত্বাক্তা কথা বলবেন। তিনি মসজিদ কমিটির সভাপতি। তাঁর পক্ষে এইসব বলা ভাল দেখায় না, তবু বলতে হবে। মানুষের কাজকর্ম আছে। সারাবাত জেগে দোয়া পড়লে জেগে থাবে না। মৌলানা সাহেব দোয়ার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন — ওগো পেয়ারা নবীর পেয়ারা দোক্ত, তোমার কাছে হ্যাত না তুললে আমরা কার কাছে হাত তুলব? কারণ তুমি নিজেই তো ক্ষেত্রান মসজিদে বলেছ —

‘মারাদ্বাল বাহরাইনি ইয়ালতাক্তিইয়া-ন’

অর্থাৎ — তিনি বহুমান রেখেছেন দুটি কিশোর জলরাশিকে . . .

বাইনছ্মা-বারযাত্ৰু

অর্থাৎ — তাদের দুয়োর মাঝে রয়েছে কুদুরতী পর্দা . . .

বদরুল আলম সাহেবের বিরক্তির সৌমা রইল না ।

আজ রাতে দোয়া মনে হচ্ছে শেষ হবে না । মৌলানাকে সাবধান করে দিতে হবে । কিন্তু না বলায় লাই পোয়ে যাচ্ছে ।

দোয়া শেষ হল বদরুল আলম সাহেব গাঢ়ীর গলায় বললেন, মৌলানা সাহেব আপনার সংগে একটা কথা ছিল । তাঁর গলার স্বরেই মৌলানা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল । তিনি কি বলবেন তা না শুনেই বলল, আপনের কথা মত আমি গেছিলাম । সে রাজি হয় না । এই কাজ তো জবরদস্তিতে হয় না । যদি বলেন আইজ না হয় আরেকবাৰ যাব ।

আপনে কিসের কথা বলতেছেন ?

আপনে ষে কলছিলেন তওবা কৰাইতে । তওবা কৰতে রাজি হয় না ।

এতক্ষণে বদরুল আলম সাহেবের মনে পড়ল । মৌলানাকে গত সপ্তাহে বলেছিলেন যেন ইউনুসকে দিয়ে তওবা কৰানো হয় । একবাৰ তওবা কৰে ফেললে তিনিদিনের ভেতৰ ঘটনা ঘটে যায় । তাঁর ধাৰণা ছিল, মৌলানা তওবা কৰিয়েছে । এখন দেৱা যাচ্ছে তওবা কৰায়নি ।

তওবা কৰতে চায় না কেন ?

ভয় পায় । ভৱতে চায় না ।

তওবার সাথে বাঁচা-মৰার কী সম্পর্ক ? জন্ম-মৃত্যু তো আল্লাহ'ব হাতে । আপনি এখনি চলেন । তওবা কৰিয়ে দেন । আমি সামনে থাকলে অৱাঞ্জি হবে না ।

কি আজ্ঞা ।

তাছাড়া এখন মৃত্যু হলে তা তার জন্যে শুভ । রমজান মাসে মৃত্যু সরাসরি জামাতের দৰজা — কি বলেন আপনারা ?

সবাই ইঁয়া-সূচক মাথা নাড়ল । একজন বলল, এর জন্য আপনি যা কৰছেন তা বাপ-মাও কৰত না । বাপ-মা'ৰ অধিক কৰছেন আপনি ।

বদরুল আলম সাহেব উদাস গলায় বললেন, আমি তো কৰার কেউ না । যার কৰার তিনিই কৰেন । আমরা হলাম উপলক্ষ । ঐ দিন মিয়া বাড়িৰ কূদুস সাহেব আসছিলেন । তিনি বললেন, আপনি কৰছেন কি ? অৱে অন্য কোনোলৈ ফালায়ে দিয়ে আসেন । আমি বললাম, রমজান মাসে এই বক্তব্য কথা মুখে আনবেন না কূদুস সাহেব ।

ইউনুসকে এক ধৰ্মক দিতেই সে তওবা কৰতে রাজি হয়ে গেল । মৌলানা সাহেব বললেন, এইবাৰ আল্লাহপাক তোমাকে আজ্ঞাব থেকে মুক্তি দিবেন । তাছাড়া তুমি এখন সাত দিনের শিশুৰ মত পবিত্র । সরাসরি জামাতে দাখিল হবে । বুঝতে পারলা ?

বুঝে পারছি ।

কারো উপরে কোন দাবি-দাওয়া রাখবে না । দাবি-দাওয়া তুইল্যা নাও ।

বুঝে-আজ্ঞা ।

কললে তো হবে না । বল কারো উপরে কোন দাবি-দাওয়া নাই ।

কারো উপরে কোন দাবি-দাওয়া নাই ।

মৌলানা সাহেব থাকেন মসজিদে। মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে মসজিদের পাশেই একটা ঘর তুলে দেওয়ার কথা। এখনো তোলা হয়নি। সবই অবশ্য নির্ভর করছে বদরুল আলম সাহেবের উপর। তিনি একবার হ্যাঁ বললেই হয়। মৌলানা সাহেব মসজিদে যাবার আগে বদরুল আলম সাহেবের সৎগে দেখা করে গেলেন। বদরুল আলম সাহেব বললেন, তওবা ঠিকঠাক হয়েছে?

ছি।

অবস্থা কি দেখলেন?

সমস্ত ঘনিয়ে আসছে। তওবার পরে তিনি দিনের বেশি টিকে না। তবে এ তাও ঠিকবে না। হয়েছে কি?

জানি না। শরীর পচে যাচ্ছে এইভো দেখি। গঙ্গে ধাকা মুশকিল। এদিকে সাতাশ রোজায় মেঝে, মেঝে-জামাই আসতেছে।

মৌলানা দৃঢ় হয়ে বলল, এ এক দুই দিনের বেশি নাই।

তওবা পড়ানোর চতুর্থ দিনেও দেখা গেল ইউনুস বেঁচে গেছে। প্রশ্ন করলে চি-চি করে জবাব দেয়। তবে অবস্থা যে খুব খারাপ তা বোধ যায়। আগে শরীরের পচা দুর্গংক বাংলা ঘরের আশেপাশেই সীমাবন্ধ ছিল — এখন তা ভেতর বাড়ি পর্যন্ত গেছে।

সেনিটারী ইস্পেষ্টারের পরামর্শে ঘরের চারদিকে প্রচুর ফিনাইল দিয়েছেন, তাতেও গঙ্গ যাচ্ছে না। তাছাড়া বাংলা ঘরের চারপাশে এখন শিয়াল ঘূরাফিরা করে। মানুষ-পচা গঙ্গের আকর্ষণ এড়াতে পারে না।

বদরুল আলম সাহেব নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দেখতে গেলেন, কি বে অবস্থা কি?

ক্ষেত্রে ভাল।

ভাল হলেই ভাল।

বাইতে বড় ভয় লাগে।

ভয় লাগে কেন?

কি যেন চাইরপাশে ঘূরাফিরা করে। চড়ক্ষে দেখি না, খালি কথা শুনি।

মৌলানা সাহেব এসব শুনে বললেন, সময় ঘনায়ে আসছে। আজরাইল চাইরপাশে ঘূরাফিরা করে।

মৌলানার উপর বিরক্তিতে বদরুল আলম সাহেবের গা ছলে যায়। কি আর কথা, আজরাইল ঘূরাফিরা করে। ব্যাটা তওবাটা ঠিকফত পড়িয়েছে কি-না কে জানে!

মৌলানা সাহেব?

ছি।

তওবা কি ঠিকঠাক পড়ানো হয়েছে?

ছি — তা হইছে।

দেখেন আরেকবার পড়াবেন কি-না। কষ্ট পাচ্ছে এই জন্মে বলতেছি, অন্য কিছু না।



আইজ আরেকবার পড়ায়ে দিব। কোন অসুবিধা নাই। তওবা দিনের মধ্যে দুইবারও পড়ানো যায়। কোন অসুবিধা নাই। এই প্রসংগে রসূলামাহ্র একটা হাদিস আছে। পেরারা নবী বলছেন . . .

আচ্ছা থাক। আরেকদিন শুনব।

মৌলানা সাহেব বললেন, অনেক সময় মনের মধ্যে কোন আফসোস থাকলে জব বাইর হইতে চায় না। জিজ্ঞেস কইরা দেখা দরকার কিছু খাইতে চায় কি-না। কাউরে দেখতে চায় কি-না।

আচ্ছা এটা খোজ নিব।

দ্বিতীয়বার তওবা কথা শুনে ইউনুস কেশ অবাক হল। চি-চি করে বলল, একবার তো করছি। তওবার পরে কোন পাপ কাজ করি নাই।

মৌলানা সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, নাফরমানী কথা বলবা না। পাপ কাজ করছ কি কর নাই তার বিচার তোমার উপরে না, আল্লাহ পাকের উপরে।

আবার তওবা পড়ানো হল। বদরুল আলম সাহেব তওবা পড়ানোর শেষে খোজ নিতে এলেন, কি-রে শইল কেমন?

ছে ভাল।

কিছু খাইতে মনে চায়?

ছে না।

মনে চাইলে বল।

তেঁতুলের পানি দিয়া ভাত খাইতে মনে চায়।

ভাকে তেঁতুলের পানি দিয়ে ভাত খেতে দেয়া হল। ভাত খাওয়া শেষ হবার সংগে সংগেই শ্বাসকষ্ট শুরু হল। বুক হাপরের মত উঠানামা করছে। চোখ মনে হয় বের হয়ে আসছে। বদরুল আলম সাহেব মৌলানাকে খবর দিয়ে রাখলেন। ভালমন্দ কিছু হলে দিনের মধ্যেই দাফন-কাফন শেষ করতে হবে।

দিনে কিছুই হল না। রাতে শ্বাসকষ্ট মনে হল খানিকটা কমে এসেছে।

মৌলানা সাহেব ঘুমুতে গেলেন। যাবার আগে বদরুল আলম সাহেবকে বলে গেলেন, আরো একটা দিন দেখতে হবে।

বদরুল আলম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, আর একদিন পরে কি?

অমাবস্যা লাগতেছে। অমাবস্যার টান সহ্য হবে না।

বদরুল আলম সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, একদিকে বলেন আজরাইলের কথা, আরেকদিকে বলেন অমাবস্যার কথা। আজরাইল কি পৃশ্নম-অবস্যা দেখে ঘুরাফিরা করে?

অমাবস্যার বাতে ইউনুসের অবস্থা খুবই খারাপ হল। শুকনের ভেতর থেকে পো-গো শব্দ বেরুচ্ছে। মুখে ফেনা ভাঙছে। রাত যে কাটবে না তা আজোবাই যাচ্ছে। বদরুল আলম সাহেবের স্ত্রীও শাড়ির আঁচলে মুখ চেপে এক সঁজু ইউনুসকে দেখে গেলেন। খাবার প্লেটে পড়ে আছে। ইউনুস ছুঁয়েও দেখেনি। তিনি বললেন, এর মুখে তোমরা পানি দাও, দেখছ না ঠোট চাটিতেছে। আহারে!

ভোরবেনা বদরুল আলম সাহেব হেঁজ নিতে গেলেন।
কী বে অবস্থা কি ?
ইউনুস চি চি ক'ব বলল, ক্ষে ভজ
শ্বাসকষ্ট নাই ?
জ্বে না।

বদরুল আলম সাহেবের মুখ গঞ্জীর হয়ে গেল। ইউনুস কলল, রাইতে একটা শিয়াল
চুকছিল। পাও হাতে কাশড় দিছে। আইজ আপনে বইল্যা দিবেন হাতের কাছে যেন একটা
লাঠি দেয়। আর একটা হারিকেন।

বদরুল আলম সাহেব কিছুই বললেন না। তা'র মেজাজ রোজার সময় এমনিতেই ঢ়া
থাকে। আজ সেই মেজাজ আকাশে চড়ে গেল।

তিনি ইফতারির সময় মজনুকে বলে দিলেন, ইউনুসের হাতের কাছে যেন একটা লাঠি
দেয়। আর একটি হারিকেন। মজনু এ বাড়ির কামলা। তা'র উপর দায়িত্ব ইউনুসকে
খাবার-দাবার দিয়ে আসা। এই কাজটা তা'র খুবই না-পছন্দ, কারণ ইউনুস এখন আর নিজে
নিজে খেতে পাবে না। খাবার মুখে তুলে দিতে হয়। ঘেঁঘায় মজনুর বমি আসার উপক্রম হয়।

মজনু বলল, ইউনুস হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

বদরুল আলম সাহেব তাকালেন। কেন বজ্জাত সেটা শুনতে চান।

মজনু বলল, মৌলানা সাব যে দুই-দুইবার তওবা করাইলেন, কোনবারই এই হারামজাদা
তওবা করে নাই। মৌলানা সাব তারে যে কথা বলছেন, হে মনে মনে উচ্চা কথা বলেছে।

তোকে বলেছে কে ?

হে মিজেই বলেছে। তওবা করলে জ্বেন শেষ এই জন্য।

বলিস কি ?

হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

মাগরেবের নামাজের পর বদরুল আলম সাহেব ইউনুসকে দেখতে গেলেন। ইউনুসের
হাতের কাছে লাঠি। হারিকেন জ্বলছে।

কিরে তুই না-কি তওবা করস নাই ?

ইউনুস চূপ করে রইল।

ক্যান করস নাই ? আঞ্চাহর সাথে মশকরা ? হারামজাদা, তুই তো বিরাট বদ
ইউনুস ক্ষীণ স্বরে বলল, মরতে চাই না।

দীর্ঘ সময় বদরুল আলম সাহেব ইউনুসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর একটা পা ফুলে
ফোল বালিশের মত হয়ে গেছে। এই পায়েই বোধ হয় শিয়াল কামড়চুক্ক।

ইউনুস বলল, আপনে যদি বলেন তাইলে আরেকবার ঠিকস্ত তওবা করি।

থাক, তাব আর দরকার নাই। তোর যখন অতই বাঁচমের পথ, দেখি একটা চেষ্টা কইয়া।
চল, তোরে ময়মনসিং নিয়া যাই। দেখি কি অবস্থা ।

ইউনুস মনে হয় কঢ়াগুলি ঠিক বুঝতে পারে মাঝেয়া-লাগা চোখে তাকিয়ে থাকে।

বদরুল আলম সাহেব রাতেই মহিয়ের গাড়ির ঝুঁত্বা করেন। প্রথমে যেতে হবে
নেত্রকোনা, নেত্রকোনা থেকে ময়মনসিংহ। সেখনে ডাঙ্কারু জবাব দিলে নিতে হবে তাকা।

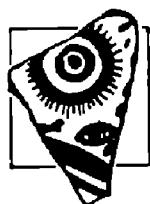
মহিমের গাড়ি রওনা হল রাত আটটায়। অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে অবাক করে দিষ্টে
তিনিও সংগে চললেন। অনেক দোড়াদোড়ি ছেটাছুটির ব্যাপার আছে। ছেলে— ছেকেবাদেব
উপর ভরসা করা যায় না।

ইউনুস ?

জ্বে !

যুলে থাক। হাল ছাড়িস না, আমি আছি।

ইউনুসের ঢোখ দিয়ে পানি পড়ে। সে প্রাণপণে যুলে থাকতে চেষ্টা করে। মহিমের গাড়ি
দ্রুত এগিয়ে যায়।



সঙ্গীনী

মিসির আলি বললেন, গচ্ছ শুনবেন না—কি ?

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত ফস হয়নি। দশটাৰ যত বাজে। বাসায় ফেরা
দৱকাৰ। আকাশেৰ অবস্থাও ভাল না। গুড়গুড় কৰে মেৰ ডাকছে। আষাঢ় মাস। যে কোন
সময় বৃষ্টি নামতে পাৰে।

আমি বললাম, আজ্জ থাক। আৱেকদিন শুনব। রাত অনেক হয়েছে। বাসায় চিন্তা
কৰবে।

মিসির আলি হেসে ফেললেন।

আমি বিশ্বিত হয়ে বললাম, হাসছেন কেন ?

মিসির আলি হাসতে হাসতেই বললেন, বাসায় কে চিন্তা কৰবে ? আপনার স্ত্রী কি
বাসায় আছেন ? আমাৰ তো ধাৰণা তিনি রাগ কৰে বাচ্চাদেৱ নিয়ে বাবাৰ বাড়িতে চলে
গেছেন।

মিসির আলিৰ পৰ্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সামান্য সূত্র ধৰে সিদ্ধান্তে চলে যাবাৰ প্ৰায়
অলৌকিক ক্ষমতাৰ সঙ্গে আমি পৱিত্ৰিত। তবুও বিশ্বিত হলাম। আমাৰ স্ত্রীক সঙ্গে আজ
দুপুৰেই বড় ধৰনেৰ ঝগড়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় সে সুটকেস গুছিয়ে সুন্দৰ বাড়ি চলে গেছে।
একা একা খালি বাড়িতে থাকতে অসহ্য বোধ হচ্ছিল বলে মিসির আলিৰ কাছে এসেছি। তবে
এই ঘটনাৰ কিছুই বলিনি। আগ বাড়িয়ে পাৰিবাৰিক ঝগড়াৰ কুপোতলে বেড়ানোৰ কোন মানে
হয় না।

আমি সিগারেট ধৰাতে ধাৰাতে বললাম, ঝগড়া হয়েছে কুপোতলেন কি কৰে ?

‘অনুমানে বলছি।’

‘অনুমানটাই বা কি কৰে কৰলেন ?’



‘আমি লক্ষ্য করলাম, আপনি আমার কাছে কোন কাজে আসেননি। সময় কাটিতে এসেছেন। গল্প করছেন এবং আমার গল্প শুনছেন। কেন কিছুতেই তেমন আনন্দ পাচ্ছেন না। অর্থাৎ কেন কারণে মন বিক্ষিপ্ত। আমি বললাম, ভাবী কেমন আছেন? আপনি বললেন, ভাল। কিন্তু বলার সময় আপনার মূখ লঠিন হয়ে গেল। অর্থাৎ ভাবীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমি তখন নিশ্চিত হ্রাস ঘন্টে বললাম, আমার সঙ্গে চারটা ভাত খান। আপনি রাজি হয়ে গেলেন। আমি ধরে নিলাম — রাগারাগি হয়েছে এবং আপনার স্ত্রী বাসায় নেই। আপনার একা একা লাগছে বলেই আপনি এসেছেন আমার কাছে। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্যে শার্লক হোমস হতে হয় না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিঞ্চা করলেই বুঝা যায়।

আমি কিছু বললাম না। মিসির আলি বললেন, চা চড়াচ্ছি। চা খেয়ে গল্প শুনুন। তারপর এইখানেই শুয়ে শুমিয়ে পড়ুন। খালি বাসায় একা একা রাত কাটিতে ভাল লাগবে না। তাছাড়া বৃষ্টি নামতে পাবে।

‘এটাও কি আপনার লজিক্যাল ডিডাকশান?’

‘না — এটা হচ্ছে ইইসফুল থিংকিং। গরমে কষ্ট পাচ্ছি — বৃষ্টি হলে জোবন বাঁচে। তবে বাতাস ভারী, বৃষ্টির দেরি নেই বলে আমার ধারণা।’

‘বাতাসের আবার হাঙ্কা-ভারী কি?’

‘আছে। হাঙ্কা-ভারীর ব্যাপার আছে। বাতাসে জলীয় বাস্পের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় বাতাস হয়ে ভারী। সেটা আমি কুবতে পারি মাথার চুলে হাত দিয়ে। জলীয় বাস্পের পরিমাণের উপর নির্ভর করে মাথার চুল নরম বা শক্ত হয়। শীতকালে মাথার চুলে হাত দিয়ে দেখবেন এক রকম, আবার গরম কালে যখন বাতাসে হিউমিডিটি অনেক বেশি তখন অন্যরকম।’

‘আমার কাছে তো সব সময় এক রকম লাগে।’

মিসির আলি ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন। ভাবটা এ রকম যেন এরচে মজার কথা আগে শুনেননি। আমি বোকার মত বসে রইলাম। অস্বস্তিও লাগতে লাগল। খুব বুকিমান মানুষের সঙ্গে গল্প করার মধ্যেও এক ধরনের অস্বস্তি থাকে। নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়।

মিসির আলি স্টোভে চায়ের পানি বসিয়ে দিলেন। শো-শো শব্দ হতে লাগল। এই যুগে স্টোভ প্রায় চোখেই পড়ে না। মিসির আলি এই বস্তু কোথেকে জ্বোগাড় করেছেন কে জানে। কিছুক্ষণ পরপর পাস্প করতে হয়। অনেক যন্ত্রণা।

চায়ের কাপ হাতে বিছানায় এসে বসামাত্র বৃষ্টি শুরু হল। তুমুল বর্ষণ। মিসির আলি বললেন, আমার বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না কেন জানেন?

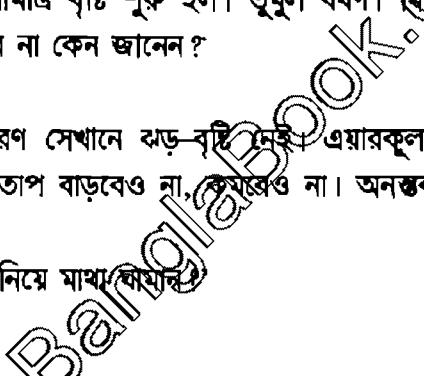
‘জানি না।’

‘বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না কারণ সেখানে ঝড়-বৃষ্টি দেখি। এয়ারকুলার বসানো একটা ঘরের মত সেখানকার আবহাওয়া। তাপ বাড়বেও না, কমবেও না। অনন্তকাল একই থাকবে। কোন মানে হয়?’

‘আপনি কি বেহেশত-দোজ্জ্ব এইসব নিয়ে মাথায় কায়ন?’

‘না যামাই না।’

‘সৃষ্টিকর্তা নিয়ে মাথা ধামান?’



‘হ্যা ঘায়াই। খুব চিন্তা করি, কোন কূল কিনারা পাই না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগুষ্ঠ কি বলে জানেন? বলে — সৃষ্টিকর্তা বা দৈশ্বর পারেন না এমন কিছুই নেই। তিনি সব পারেন। অথচ আমার ধারণা তিনি দুটা জিনিস পারেন না যা মানুষ পাবে।’

‘আমি অবাক হয়ে বললাম, উদাবহণ দিন।’

‘সৃষ্টিকর্তা নিজেকে ধর্মস করতে পারেন না। মানুষ পারে। আবার সৃষ্টিকর্তা জ্ঞাতীয় একজন সৃষ্টিকর্তা তৈরি করতে পারেন না। মানুষ কিন্তু পারে, সে সন্তানের অন্ধ দেয়।’

‘আপনি তাহলে একজন নাস্তিক?’

‘না আমি নাস্তিক না। আমি খুবই আস্তিক। আমি এমন সব রহস্যময় ঘটনা আমার চারপাশে ঘটতে দেখেছি যে বাধ্য হয়ে আমাকে আস্তিক হতে হয়েছে। ব্যাখ্যাতীত সব ঘটনা। যেমন স্বপ্নের কথটাই ধরন। সামান্য স্বপ্ন অথচ ব্যাখ্যাতীত একটা ঘটনা।’

‘ব্যাখ্যাতীত হবে কেন? ফ্রয়েড তো চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন বলে শুনেছি।’

‘যোটেই চমৎকার ব্যাখ্যা করেন নি। স্বপ্নের পূরো ব্যাপারটাই তিনি অবদমিত কামনার উপর চাপিয়ে দিয়ে লিখলেন — *Interpretations of dream*; তিনি শুধু বিশেষ এক ধরনের স্বপ্নই ব্যাখ্যা করলেন। অন্যাদিক সম্পর্কে চূপ করে বইলেন। যদিও তিনি খুব ভাল করে জ্ঞানতেন মানুষের বেশ কিছু স্বপ্ন আছে যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি এই নিয়ে প্রচুর কাজও করেছেন কিন্তু প্রকাশ করেননি। নষ্ট করে ফেলেছেন। তাঁর ছাত্র প্রফেসর জাঁ কিছু কাজ করেছেন — মূল সমস্যায় পৌছতে পারেন নি। বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কিছু কিছু স্বপ্ন মানুষ কেন দেখে তা বলা যাচ্ছে না। যেমন একটা লোক স্বপ্ন দেখল — হঠাৎ মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা খুলে পড়ে গেল। স্বপ্ন দেখার দুদিন পর দেখা গেল সত্যি সত্যি সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে গেছে। এই ধরনের স্বপ্নকে বলে প্রিকগনিশন ড্রিম (Precognition dream)। এর একটিই ব্যাখ্যা — স্বপ্নে মানুষ তাৎক্ষণ্যে দেখতে পাচ্ছে। যা সন্তুষ্য নয়। কাজেই এ জ্ঞাতীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যাতীত।’

আমি বললাম, এমনো তো হতে পারে — যে কাকতালীয় ভাবে মিলে গেছে।

‘হতে পারে। প্রচুর কাকতালীয় ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটছে। তবে কাকতালীয় ব্যাপারগুলিকেও একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রযোবিলিটির ভেতর থাকতে হবে। Precognition dream-এর ক্ষেত্রে তা থাকে না।’

‘বুঝতে পারছি না।’

‘বোঝানো একটু কঠিন। আমি বরং স্বপ্ন সম্পর্কে গল্প বলি — শুনতে চান?’

‘বলুন শুনি — ভৌতিক কিছু?’

‘না — ভৌতিক না — তবে রহস্যময় তো বটেই। আরেক সফ্ট চাহিয়ে যাক।’

‘হোক।’

‘কি ঠিক করলেন? থেকে যাবেন? বৃষ্টি কিন্তু বাড়ে।’

আমি থেকে ঘাওয়াই ঠিক করলাম। মিসির আলি চান নিয়ে বিছনায় পা তুলে বসলেন। গল্প শুরু হল।

“ছোটবেলোয় আমাদের বাসায় ‘খাবনামা’ নামে একটা স্বপ্ন তথ্যের বই ছিল। কোন স্বপ্ন দেখলে কি হয় সব ঐ বইয়ে লেখা। আমার মা ছিলেন বহুটার বিশেষ ভক্ত। ঘূম থেকে উঠেই কলতেন, ও মিসির বহুটা একটু দেখ তো। একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের মানে কি বল।

‘আমি বই নিয়ে বসতাম।’

‘দেখ তো বাবা গুরু স্বপ্ন দেখলে কি হয়।’

আমি বই উল্টে জিঞ্জেস করলাম, কি রঙের গুরু মা? সাদা না কালো?

‘এই তো মুস্কিলে ফেললি, সাদা না কালো খেয়াল নেই।’

‘সাদা রঙের গুরু হলে — ধনলাভ। কালো রঙের গুরু হলে — বিবাদ।’

‘কার সঙ্গে বিবাদ? তোর বাবার সাথে?’

‘লেখা নাই তো মা।’

মা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। স্বপ্ন নিয়ে চিন্তার তাঁর কোন শেষ ছিল না। আর কত বিচ্ছিন্ন স্বপ্ন যে দেখতেন! একবার দেখলেন — দুটা অঙ্ক চতুর্থ পাখি। খাবনামায় অক্ষ চতুর্থ পাখি দেখলে কি হয় লেখা নেই। কবুতর দেখলে কি হয় লেখা আছে। মা’র কারপেই খাবনামা ঘাঁটতে ঘাঁটতে একসময় পুরো বহুটা আমার মুখস্ত হয়ে গেল। স্বপ্ন-বিশারদ হিসেবে আমার নাম রংটে গেল। যে যা দেখে আমাকে এসে অর্থ জিঞ্জেস করে। এই করতে গিয়ে জানলাম কত বিচ্ছিন্ন স্বপ্নই না মানুষ দেখে। সেই সঙ্গে মজার মজার কিছু জিনিসও লক্ষ্য করলাম। যেমন অসুস্থ মানুষরা সাধারণত বিকট সব দৃশ্যস্বপ্ন দেখে। বোকা মানুষদের স্বপ্নগুলি হয় সরল ধরনের। বুদ্ধিমান মানুষরা খুব জটিল স্বপ্ন দেখে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা একটা স্বপ্ন প্রায়ই দেখে — সেটা হচ্ছে কোন একটি অনুষ্ঠানে সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উপস্থিত হয়েছে। সবার গায়ে ভাল পোশাক-আশাক। শুধু সেই পুরোপুরি নগ্ন। কেউ তা লক্ষ্য করছে না।’

মিসির আলি সাহেব কথা বক্ত করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই জাতীয় স্বপ্ন কি আপনি কখনো দেখেছেন?

‘আমি বললাম, না। একটা স্বপ্নই আমি বাববার দেখি — পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিতে বসেছি। খুব সহজ প্রশ্ন, সবগুলির উত্তর আমার জানা। লিখতে গিয়ে দেখি কলম দিয়ে কালি বেরহচে না। কলমটা বদলে অন্য কলম নিলাম, সেটা দিয়েও কালি বেরহচে না। এদিকে ঘণ্টা পড়ে গেছে।’

‘এই স্বপ্নটাও খুব কমন। আমিও দেখি। একবার দেখলাম বাংলা পরীক্ষা — খুলুদিয়েছে অংকের। কঠিন সব অংক। বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উঠার অংক। একটা বাঁদরের জায়গায় দুটা বাঁদর। একটা খানিকটা উঠে অন্যটা তার লেজ ধরে টেনে মিচে নামায় — খুবই জটিল ব্যাপার। বাঁশের সবটা আবার তৈলাক্ত না, কিছুটা তেল ছাড়া।’

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, সত্যিই কি এমন স্বপ্ন দেখেছেন?

‘জি-না — ঠাট্টা করে বলছি — জটিল সব অংক ছিল এইভূক মনে আছে। যাই হোক ছোটবেলো থেকেই এইসব কাবণে স্বপ্নের দিকে আমি ঝুঁকলাম। দেশের বাইরে যখন প্যারাসাইকোলজী পড়তে গেলাম তখন স্পেশাল ট্রাইব নিলাম ‘ট্রাইব। ট্রীয় ল্যাবোরেটরীতে কাজও করলাম। আমার প্রফেসর ছিলেন ডঃ সইয়ে হান। দৃশ্যস্বপ্নের ব্যাপারে যাঁকে পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। দৃশ্যস্বপ্ন এ্যানালিসিসের তিনি একটা টেকনিক বের করেছেন

— যার নাম সুইন হার্ন এ্যানালিসিস। সুইন হার্ন এ্যানালিসিসে ব্যাখ্যা করা যায় ন এমন সব দৃঢ়স্বপ্নের একটা ফাইল তাঁর কাছে ছিল। সেই ফাইল তিনি তাঁর পাঞ্জুয়েট ছাত্রদের দিতেন না। আমাকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন সম্ভবত, সে কাবণেই সেই ফাইল ঘাঁটির সুযোগ হয়ে গেল। ফাইল পড়ে আমি হতভুর্ব। ব্যাখ্যাত্তি সব ব্যাপার। একটা উদাহরণ দেই — নিউ ইংল্যাণ্ডের একটি তেইশ বছর বয়েসী মেয়ে দৃঢ়স্বপ্ন দেখা শুরু করল। তার নাভীমূল থেকে একটা হাত বের হয়ে আসছে। স্বাভাবিক হাতের চেয়ে সরু — লম্বা লম্বা আঙুল। হাতটার রঙ নীলচে — খুব তুলতুলে। দৃঢ়স্বপ্নটা সে প্রায়ই দেখতে লাগল। প্রতিবারই স্বপ্ন ভাঙতো বিকট চিন্কারে। তাকে ড্রীম ল্যাবোরেটরীতে ভর্তি করা হল। প্রফেসর সুইন হার্ন কৃতিগীর মনোবিজ্ঞেষণ করলেন। অস্বাভাবিক কিছুই পেলেন না। মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেয়া হল নিউ ইংল্যাণ্ড। তার কিছুদিন পর মেয়েটি লক্ষ করল তার নাভীমূল ফুলে উঠেছে — এক ধরনের নল য্যালিগন্যান্ট গ্রোথ হচ্ছে। এক মাসের মধ্যে সেই টিউমার মানুষের হাতের আকৃতি ধারণ করল। টিউমারটির মাঝায় মানুষের হাতের আঙুলের মত পাঁচটি আঙুল . . . ”

আমি মিসির আলিকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ভাই এই গল্পটা থাক। শুনতে ভাল লাগছে না। মেমা লাগছে।

‘মেমা লাগার মতই ব্যাপার। ছবি দেখলে আরো ঘেঁষা লাগবে। মেয়েটির ছবি ছাপা হয়েছে নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নাল অব মেডিসিনে। ছবি দেখতে চান?’

‘জ্ঞি-না।’

‘পি-এইচ. ডি. প্রোগ্রামে শিয়েছিলাম, পি-এইচ. ডি. না করেই ফিরতে হল। প্রফেসরের সঙ্গে যামেলা হল। যে লোক আমাকে এত পছন্দ করতো সে-ই বিষ নজরে দেখতে লাগলো। এম. এস. ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম টিচিং-এর একটা ব্যবস্থা হল। ছাত্রদের এবনরমাল বিহেভিয়ার পড়াই। স্বপ্ন সম্পর্কেও বলি। স্বপ্নের সঙ্গে মানুষের অস্বাভাবিক আচরণের একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করি। ছাত্রদের বলি, তোমরা যদি কখনো কোন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখ তাহলে আমাকে বলবে।

ছাত্ররা প্রায়ই এসে স্বপ্ন বলে যায়। ওদের কোন স্বপ্নই তেমন ভয়ংকর না। স্বপ্ন তাড়া করছে, আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে — এই জাতীয় স্বপ্ন। আমার ইচ্ছা ছিল দৃঢ়স্বপ্ন নিয়ে গবেষণার কিছু কাজ করব। সেই ইচ্ছা সফল হল না। দৃঢ়স্বপ্ন দেখছে এমন লোকজনই পাওয়া গেলো না। আমি গবেষণার কথা যখন ভুলে গেলাম তখন একজন লোকমান ফরিদ।

লোকমান ফরিদের বাড়ি কৃমিলার নবীনগঠে, যেসে তিশ-পঁয়ত্রিশ। শিপিং করপোরেশনে মোটামুটি ধরনের ঢাকরি করে। দু'কামরার একটা বাড়ি ভাড়া করেছে কাঁঠাল বাগানে। বিয়ে করেনি, তবে বিয়ের চিঞ্চা-ভাবনা করেছে তার এক মাসাতো বোনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। মেয়েটিকে তার পছন্দ ম্যান তবে অপছন্দের কথা সে সরাসরি বলতেও পারছে না। কারণ তার এই মাস কাঁচে পড়াশোনা করিয়েছেন।

ছেলেটি এক সক্ষ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি তাকে দেখে চমকে উঠলাম। মুখ পাত্রের বর্ণ, মৃত মানুষের চোখের মত ভাবলেশহীন চোখ। যৌবনের নিজস্ব যে জ্যোতি মুক্ত-যুবতীর চোখে থাকে তার কিছুই নেই। ছেলেটি হাঁটছে খুড়িয়ে খুড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরপরই চমকে উঠেছে। সে ঘরে চুক্তেই বিনা ভূমিকায় বলল, স্যার আপনি আমাকে বাঁচান।

আমি ছেলেটিকে বসালাম। পরিচয় নিলাম। হাত্কা কিছু কাথাবার্তা বলে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম। তাতে খুব লাভ হল বলে মনে হল না। তার অস্থিবতা কমল না। লক্ষ, করলাম, সে স্থির হয়ে বসতেও পারছে না। খুব নড়াচড়া করছে। আমি বললাম, তোমার সমস্যাটা কি?

ছেলেটি ক্রমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে প্রায় অস্পষ্ট গলায় কলালো, স্যার আমি দৃঢ়স্বপ্ন দেখি। তফসিল দৃঢ়স্বপ্ন।

আমি কললাম, দৃঢ়স্বপ্ন দেখে না এমন মানুষ তুমি খুঁজে পাবে না। সাপে তাড়া করছে, বাঘে তাড়া করছে, আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া — এগুলি খুবই কমন স্বপ্ন। সাধারণত হজরমের অসুবিধা হলে লোকজন দৃঢ়স্বপ্ন দেখে। ঘুমের অসুবিধা হলেও দেখে। তুমি শুধু আছ, মাথার নিচ থেকে বালিশ সরে গেল — তখনো এরকম স্বপ্ন তুমি দেখতে পাব। শারীরিক অস্বস্তির একটা প্রকাশ ঘটে দৃঢ়স্বপ্নে। আগুনে পোড়ার স্বপ্ন মানুষ কখন দেখে জান? যখন পেটে গ্যাস হয় সেই গ্যাসে বুক ঝালাপোড়া করে, তখন সে স্বপ্ন দেখে — তাকে দ্রুলস্ত আগুনে ফেলে দেয়া হচ্ছে।

‘স্যার আমার স্বপ্ন এ রকম না অন্য রকম।’

‘ঠিক আছে, গুছিয়ে বল। শুনে দেখি কি রকম।’

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে কথা শুরু করল। মুখস্থ বলে যাবার মত বলে যেতে লাগলো। মনে হয় আগে থেকে ঠিকঠাক করে এসেছে এবং অনেকবার বিহার্সেল দিয়েছে।

কথা বলার সময় একবারও আমার চোখের দিকে তাকাল না। যখন প্রশ্ন করলাম তখনো না।

‘প্রথম স্বপ্নটা দেখি বুধবার রাতে। এগারোটার দিকে ঘুমুতে গেছি। আমার ঘুমের কোন সমস্য নেই। শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়তে পারি। সে রাতেও তাই হল। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নটা দেখেছি।’

‘কি করে বুঝলে শোয়ামাত্র স্বপ্ন দেখেছ? ’

‘জেগে উঠে ঘড়ি দেখেছি, এগারোটা দশ।’

‘স্বপ্নটা বল।’

আমি দেখলাম খোলামেলা একটা মাঠের মত জায়গা। খুব বাতাস বহুচে। শৌকশৌকি শব্দ হচ্ছে। রীতিমত শীত লাগছে। আমার চারদিকে অনেক মানুষ কিন্তু ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এদের কথা শুনতে পাচ্ছি। হাসির শব্দ শুনছি। একটা বাচ্চা ছাল কাঁদছে তাও শুনছি। বুড়ামত একটা লোকের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে কিন্তু কাউকে আবছ ভাবেও দেখতে পাচ্ছি না। একবার মনে হল আমি বোধ হয় অঙ্ক হয়ে গেছি। চারদিকে খুব তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম — মাঠ দেখতে পাচ্ছি, কুয়াশা দেখতে পাচ্ছি — কিন্তু মানুষজন দেখছি না অথচ তাদের কথা শুনছি। হঠাৎ ওদের কথাবার্তা সব থেমে গোলো। বাতাসের শৌ—শৌ শব্দও বৰ্জ হয়ে গেল। মনে হল কেউ যেন এসেছে। তাঙ্গু ভয়ে সবাই চূঁপ করে গেছে। আমার নিজেরো প্রচণ্ড ভয় লাগলো। এক ধরনের অঙ্ক ভয়।

তখন শ্লেষ্যা-জড়িত ঘোটা গলায় কে-একজন বললো, ছেলেটি তো দেখি এসেছে।
মেয়েটা কোথায় ?

কেউ জ্বাব দিল না। খানিকক্ষণের জন্যে বাঢ়া ছেলেটির কাম্মা শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে
খেমেও গেল। যনে হল কেউ ফেন তার মুখে হাত চাপা দিয়ে কাম্মা বন্ধ করার চেষ্টা করছে।
ভারী গলার লোকটা আবার কথা বললো, মেয়েটা দেরি করছে কেন ? কেন এত দেরি ?
ছেলেটিকে তো বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। এর ঘূম পাতলা হয়ে এসেছে। ও জেগে যাবে।

হঠাতে চারদিকে সাড়া পড়ে গেলো। এক সঙ্গে সবাই বলে উঠলো — এসেছে, এসেছে,
মেয়েটা এসেছে। আমি চমকে উঠে দেখলাম আমার পাশে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব
রোগা একটা মেয়ে। অসন্তুষ্ট ফর্সা, বয়স আঠারো-ডিনিল। এলোমেলো-ভাবে শাড়ি পরা।
লম্বা চুল। চুলগুলি ছেড়ে দেয়া, বাতাসে উড়ছে। মেয়েটা ভয়ে থর-থর করে কঁপছে। আমি
অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছি। সে অসংকোচে আমার হাত ধরে কঁপা গলায়
বলল, আমার ভয় করছে। আমার ভয় করছে।

আমি বললাম, আপনি কে ?

সে বলল, আমার নাম নারণিস। আপনি যা দেখছেন তা স্বপ্ন। ভয়ংকর স্বপ্ন। একটু
পরই বুঝবেন। আগে এই স্বপ্নটা শুধু আমি একা দেখতাম। এখন মনে হয় আপনিও দেখবেন।

মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। আতঙ্কে অস্ত্রিং হয়ে আমার গা ধৈঁধে দাঁড়াল। কাঁদতে
কাঁদতেই বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার ভয় লাগছে বলেই আমি এভাবে
দাঁড়িয়ে আছি। এরা প্রতিমাসে একবার করে আমাকে এই স্বপ্নটা দেখায়।

আমি বললাম, এরা কারা ?

‘জানি না। কিছু জানি না। আপনি থাকার কেন জানি একটু ভরসা পাচ্ছি। যদিও জানি
আপনি কিছুই করতে পারবেন না। কিছুই না, কিছুই না কিছুই না . . .’

মেয়েটি হাঁপাতে শুরু করল আর তখন সেই ভারী এবং শ্লেষ্যা জড়ানো কষ্ট চিৎকার
করে বললো, সময় শেষ। দৌড়াও, দৌড়াও, দৌড়াও . . .।

সেই চিৎকারের মধ্যে ভয়ংকর পৈশাচিক কিছু ছিল। আমার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু
থরথর করে কাঁপতে লাগলো। চোখের সামনে কৃয়াশা কেটে যেতে লাগলো। চারদিকে তীব্র
আলো। এত তীব্র যে চোখ ধাঁধিয়ে যায় — যাদের কথা শুনছিলাম অথচ দেখতে পাইলাম না
; এই আলোয় সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম — এরা এরা এরা . . .

‘এরা কি ?’

এরা মানুষ না, অন্য কিছু — লম্বাটে পশুর মত মুখ, হাত-পা মানুষের মত। সবাই নয়।
এরা অস্তুত এক ধরনের শব্দ করতে লাগলো। আমার কানে বাজতে লাগলো — দৌড়াও
দৌড়াও, . . . আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম। আমাদের পেছনে সেই জন্তুর মত ঘানুষগুলি ও
দৌড়াচ্ছে।

আমরা ছুটছি মাঠের উপর দিয়ে। সেই মাঠে কেন ফাস নেই। সমস্ত মাঠময় অযুত
নিযুত লক্ষ কোটি ধারালো ট্রেড সারি সারি সাজামোঃ। সেই ব্যেতে আমার পা কেটে ছিম্বিম
হয়ে যাচ্ছে — তীব্র তীক্ষ্ণ ঘন্টণা। চিৎকার করে উঠলাম, আর তখনি ঘূম ভেঙে গেলো। দেখি
ঘামে সমস্ত বিছনা ভিজে গেছে।

‘এই তোমার স্বপ্ন ?’

‘জি ।’

‘দ্বিতীয় স্বপ্ন কখন দেখলে ?’

‘ঠিক একমাস পর ।’

‘সেই মেয়েটিও কি দ্বিতীয় স্বপ্নে তোমার সঙ্গে ছিল ?’

‘জি ।’

‘একই স্বপ্ন ? না — একটু অন্য রকম ?’

‘একই স্বপ্ন ।’

‘দ্বিতীয়বারও কি তুমি মেয়েটির হাত ধরে দৌড়ালে ?’

‘জি ।’

‘প্রথমবার যেমন তাব সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল ? দ্বিতীয়বারও হল ?’

‘জি ।’

‘দ্বিতীয়বারও কি মেয়েটি পরে এসেছে ? তুমি আগে এসে অপেক্ষা করছিলে ?’

‘আমি — দ্বিতীয়বারে মেয়েটি আগে এসেছিল। আমি পরে এসেছি।’

‘দ্বিতীয়বারের স্বপ্ন তুমি রাত কঢ়ায় দেখেছো ?’

‘ঠিক বলতে পারব না তবে শেষরাতের দিকে। ঘূর্ম ভাঙার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আজান হল।’

‘দ্বিতীয়বারও স্বপ্নে মোটা গলার লোকটি কথা বলল ?’

‘জি ।’

লোকমান ফকির রুমালে কপালের ঘাম মুছতে লাগলো। সে অসভ্য ঘামছে। আমি বললাম, পানি খাবে ? পানি এনে দেব ?

‘জি স্যার, দিন।’

আমি পানি এনে দিলাম, সে এক নিঃশ্বাসে পানি শেষ করে ফেলল। আমি বললাম, স্বপ্ন ভাঙার পর তুমি দেখলে তোমার দুটি পা-ই ত্রাড়ে কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে — তাই না ?

লোকমান হতভস্য হয়ে বললো, জি স্যার। আপনি কি করে বুঝলেন ?

‘তুমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরে ঢকলে সেখান থেকে অনুমান করেছি। তাছাড়া তোমার পা স্বপ্ন দেখার পর কেটে যাচ্ছে বলেই স্বপ্নটা ভয়ংকর। পা যদি না কাটিতো তাহলে স্বপ্নটা ভয়ংকর হত না বরং একটা মধুর স্বপ্ন হত। কারণ স্বপ্নে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হচ্ছে যে তোমার গা ধৈঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আঠারো উনিশ-বছরের কৃপকৃতী একটি মেয়ে, হাত ধরে তোমার সঙ্গে দৌড়াচ্ছে।’

আমার কথার ঘাঁথানেই লোকমান ফকির পায়ের জুতা মুলে ফেললো, মোজা খুলল। আমি হতভস্য হয়ে দেখলাম পায়ের তলা ফালা ফালা ক্ষেত্রে কঢ়া। এমন কিছু সত্যি সত্যি ঘটতে পারে আমি ভাবিনি।

লোকমান কীথ গলায় বলল, এটা কি করে হয় স্যার ?

‘আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে স্বপ্নে ব্যাপারে পড়াশোনা যা করেছি তার থেকে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি — Invert reaction বলে একটা ব্যাপার আছে। ধর

তোমার একটা আঙ্গুল পুড়ে গেল — সেই খবর স্মায়ুর মাধ্যমে যখন তোমার মন্ত্রিকে পৌছবে তখন তুমি তীব্র ব্যথা পাবে। Invert reaction-এ কি হয় জান? আগে মন্ত্রিকে আঙ্গুল পেড়ার অনুভূতি পায়, তরপর সেই খবর আঙ্গুল পৌছে —। তখন আঙ্গুলটি পোড়া পোড় হয়ে যেতে পারে। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটা হয় মন্ত্রিকে। সেখান থেকে Invert reaction-এ শরীরে তার প্রভাব পড়তে পারে।

এক লোক স্বপ্নে দেখতো তার হাতে কে যেন পিন ফুটাচ্ছে। ঘূর্ম ভাঙ্গার পর তার হাতে সত্ত্ব সত্ত্ব পিন ফেটির দাগ দেখা যেত। তোমার ক্ষেত্রেও হয়ত তাই ঘটেচ্ছে। তবে এমন ভয়াবহ ভাবে পা কঠিন। Invert reaction-এ সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।'

'তাহলে কি?'

'আমি বুঝতে পারিছ না।'

লোকমান ক্লান্ত স্বরে বলল, এক মাস পর পর আমি স্বপ্নটা দেখি। কারণ পায়ের ঘাণ শুকাতে এক মাসে লাগে।

আমি লোকমান ফকিরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, তুমি এখন থেকে একটা কাজ করবে — ঘুমুতে যাবে জুতা পায়ে দিয়ে। স্বপ্নে যদি তোমাকে দৌড়াতেও হয় — তোমার পায়ে থাকবে জুতা। ক্লেড তোমাকে কিছু করতে পারবে না।

'সত্ত্ব বলছেন?'

'আমার তাই ধারণা। আমার মনে হচ্ছে, জুতা পরে ঘুমলে তুমি স্বপ্নটাই আর দেখবে না।'

লোকমান ফকির চলে গেল। খুব ভরসা পেল বলে মনে হল না। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম, এক মাস পর স্বপ্ন দেখা হয়ে গেলে সে যেন আসে। সে এল দেড় মাস পর।

তার মুখ আগের চেয়েও শুকনো। চোখ ভাবলেশহীন। অর্থাৎ মানুষের মত হাঁটছে। আমি বললাম, স্বপ্ন দেখেছে?

'জ্ঞি-না।'

'জুতা পায়ে ঘুমুচ্ছে?'

'জ্ঞি স্যার। জুতা পায়ে দেয়ার জন্যেই স্বপ্ন দেখছি না।'

আমি হাসিমুখে বললাম। তাহলে তো তোমার রোগ সেরে গেল। এত মন খারাপ (ক্লেড)? মনে হচ্ছে বিরাট সমস্যায় পড়েছে। সমস্যাটা কি?

লোকমান নিচু গলায় বলল, যেয়েটার জন্যে মন খারাপ স্যার। বেচারী একী একা স্বপ্ন দেখেছে। এত ভাল একটা মেয়ে কষ্ট করছে। আমি সঙ্গে থাকলে সে একটু ভরসা পায়। নিজের জন্যে কিছু না। যেয়েটার জন্যে খুব কষ্ট হয়।

লোকমানের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সে বলে কি?

'স্যার আমি ঠিক করেছি। জুতা পরব না। যা হয়ের হয়ে। নারাসিসকে একা একা যেতে দেব না। আমি থাকব সঙ্গে। যেয়েটার জন্যে আমার জুন কষ্ট হয় স্যার। এত চমৎকার একটা মেয়ে। আমি স্যার থাকব তার সঙ্গে।'

'সেটা কি ভাল হবে?'

‘ছি স্যাব, হবে। আমি তাকে ছাড়া বাঁচব না।’

‘সে কিন্তু স্বপ্নের একটি মেয়ে।’

‘সে স্বপ্নের মেয়ে নয়। আমি যেমন, সেও তেমন। আমরা দুজন এই পথিবীতেই বাস করি। সে হয়ত ঢাকাতেই কোন-এক বাসায় থাকে। তার পায়ে ক্লিন্ডের কাটা। আমি যেমন সারাঙ্গ তার কথা ভাবি, সেও নিশ্চলই ভাবে। শুধু আমাদের দেখা হয় স্বপ্নে।’

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, গচ্ছাটি এই পর্যন্তই।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, এই পর্যন্ত মানে? শেষটা কি?

‘শেষটা আমি জানি না। ছেলেটি ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে একবার এসেছিল। সে বলল, জুতা খুলে ঘুমানো যাইছে সে আবার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে মেয়েটির দেখা পায়। তারা দুজন খানিকক্ষণ গচ্ছ করে। দুজন দুজনকে জড়িয়ে থবে কাঁদে। এক সময় — মানুষের মত অঙ্গগুলি চেঁচিয়ে বলে — দৌড়াও, দৌড়াও। তারা দৌড়াতে শুরু করে।

‘ছেলেটি আপনার কাছে আর আসেনি?’

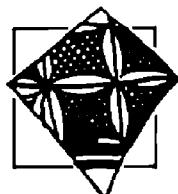
‘জি-না।’

‘ছেলেটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?’

‘না, জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। ছেলেটি জানে জুতা পায়ে ঘুমুলে এই দৃঢ়স্বপ্ন সে দেখবে না, তারপরেও জুতা পায়ে দেয় না। কারণ মেয়েটিকে একা ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেমের ক্ষমতা যে কি প্রচণ্ড হতে পারে প্রেমে না পড়লে তা বুঝা যায় না। ছেলেটির পক্ষে এই জীবনে তার স্বপ্ন সঙ্গীর মায়া কাটানো সম্ভব না। সে বাকি জীবনে কখনো জুতা পায়ে ঘুমুবে না। সে আসলে দৃঢ়স্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি চায় না। দৃঢ়স্বপ্ন হলেও এটি সেই সঙ্গে তার জীবনের মধ্যৱত্তম স্বপ্ন।’

‘আপনার কি ধারণা নারগিস নামের কোন মেয়ে এই পথিবীতে সত্যি সত্যি আছে?’

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, আমি জানি না। রহস্যময় এই পথিবীর খুব কম রহস্যের সঙ্কান্ত আমি জানি। তবে মাঝে মাঝে আমারো কেন জানি এই মেয়েটির হাত ধরে একবার দৌড়াতে ইচ্ছা করে —। আরেক দফা চা হবে? পানি কি গরম করব?



অংক শ্লোক

পাখির ডাকে যে সত্যি সত্যি ঘূম ভাঙতে পারে এই শব্দে আমার ছিল না। শহরে পাখি তেমন নেই আর থাকলেও তারা সম্ভবত ভোরবেলয় এতে-ডাকাডাকি পাছদ করে না।

ভাটি অঞ্চলে এসে প্রথম পাখির ডাকে ছেঁসে উঠলাম এবং বেশ হকচকিয়ে গেলাম। নানান ধরনের পাখি যখন এক সংগে ডাকাডাকি করতে থাকে তখন খুব যে মধ্যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা নয়। আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললাম, ব্যাপার কি? কিসের হৈ চৈ?

আমার বঙ্গু করিম শূমগুম গলায় বলল, পাখি ডাকছে। এরা বড় যন্ত্রণা করে। তুই চাদরে মুখ ঢেকে শুয়ে থাক।

করিমের সংগে গত বাতে এই অঞ্চলে এসে পৌছেছি। আমি ঘবকোণা ধ্বনের মানুষ। বেড়াতে পছন্দ করি যদি বেড়ামেটা খুব আরামের হয়। দুদিন নৌকায় করে, জীবন হাতে নিয়ে হাওর পাড়ি দেয়ার ব্যাপারে আমার উৎসাহ কম। করিম বলতে গেলে জ্ঞাব করে আমাকে নিয়ে এসেছে। তার একটাই কথা, তোর লেখালেখিতে সুবিধা হবে। দুএকটা চরিত্রও পেয়ে যেতে পারিস। কিছুই বলা যায় না।

কোথাও বেড়াতে শিয়ে চরিত্র খোঝা আমার স্বভাব না। ঢাকা ছেড়ে বাইরে গেলেই মানুষের চেয়ে প্রকৃতি আঘাতে অনেক বেশি টানে। মানুষ তো সব সময় দেখছি, প্রকৃতি দেখার সুযোগ কই। যেখানেই যাই প্রচুর বই সংগে নিয়ে যাই। আমি লক্ষ্য করেছি নতুন পরিবেশে আরামদায়ক আলস্যে বই পড়ার মত মজা আর কিছুতেই নেই। হট করে কেউ বেড়াতে আসবে না, বিকট শব্দে টেলিফোন বেজে উঠবে না। চেনা জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অন্য রকম আনন্দ আছে। একে বোধ হয় বলে শিকল ছেড়ার আনন্দ।

করিম আঘাতে বলেছিল, তোকে দোতলা দালানের বিবাট একটা ঘর ছেড়ে দেব। সামনে বিশাল বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখবি বিশাল হাওর। ঘাটে পানসি নৌকা থাকবে, মাঝি থাকবে। যখন ইচ্ছা নৌকায় চড়ে বসবি। আমি তোকে মোটেও বিরক্ত করব না। তুই থাকবি তোর মত।

মোটামুটি লোভনীয় একটা ছবি তুলে ধরল তবে এও বলল, প্রকৃতি দেখতে প্রথম কয়েকদিন তোর ভাল লাগবে তারপর বোর হয়ে যাবি। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। দৃশ্যের কোন ভেবিয়েশন নেই। অবশ্যি কোনমতে এক সপ্তাহ কাটাতে পারলে দেখবি নেশা ধরে গেছে। তখন আব যেতে মন চাইবে না।

করিমের সব কথাই ঘিল গেল। অষ্টম দিনে আমাদের ঢাকা ফেবার কথা। আমি কলাম, আরো কয়েকটা দিন থেকে যাই। করিম বলল, যতদিন ইচ্ছা থাক। আমি এই ফাঁকে আমার মামার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। একটা হাওর পরেই আমার মামার বাড়ি। তোকে নিতে চাচ্ছি না। কারণ আমি মামার বাড়ি যাচ্ছি ঝগড়া করার জন্যে। তুই থাক এখানে।

আমি থেকে গেলাম।

দিনের বেশির ভাগ সময় কাটতে লাগল পানসি নৌকায়। বিশাল নৌকা^(১) নৌকার ভেতরই গোসলখানা এবং বাথরুম। নৌকার ছাদে শুয়ে থেকে দূলতে দূর্বল আকাশ দেখা যায়। এক সময় মনে হয় আমি স্ত্রি হয়ে আছি, আকাশ দূলছে। অপার্যব অনুভূতি, দালান-কোঠার শহরে এই অনুভূতি কল্পনা করা সম্ভব নয়।

এক বিকেলে নৌকার ছাদে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভঙ্গল সক্ষ্যা মেলানোর পর। উঠে বসতেই ভারী গলায় কে যেন বলল, ভাই সাহেব কেমন আছো? আপনার সংগে দেখা করার জন্যে আসছি। আমার জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি। আমি প্রাচিপাড়া মডেল হাই স্কুলের অংকের শিক্ষক। আপনি অসময়ে নিম্নায়ন ছিলেন। এটা স্বাস্থ্যের জন্যে হালিকর। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। ঘুম ভঙ্গতেই উপদেশ শুনতে কারোরই ভাল লাগার কথা না। শিক্ষক সম্প্রদায়ের স্বভাব হচ্ছে যখন-তখন উপদেশ দিয়ে বেড়ানো।

ভদ্রলোক আপোব চেয়েও ভাবী গলায় বললেন, আপনার বিনা অনুমতিতে একটা কার্য করেছি। নৌকার মাঝিকে চা বানাতে বলেছি। নিজে এক পেয়ালা ধেয়েছি। এখন আপনার সংগে আবেক পেয়ালা খাব। যান, মূখ ধূয়ে আসুন। শহরের বেশির ভাগ লোক মূখ না ধূয়ে চা খায়। স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর। স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর বিষয়গুলি যিনি এত ভাল জ্ঞানেন তার স্বাস্থ্য খুব ভাল দেখলাম না। রোগ কাঠি। মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাঢ়ি। যক্ষ্যা রূগীর চোখের মত উজ্জ্বল চোখ। বয়স পঞ্চাশের উপরে। পায়জ্বায়ার উপর কালো রংগের পাঞ্চাবী।

আমি বললাম, আপনি কি কোন বিশেষ কাজে এসেছেন — না এমি গচ্ছ-গুজব করতে এসেছেন ?

কাজে এসেছি। গচ্ছ-গুজব করে নষ্ট কৰার সময় আমার নাই। আপনারও নিশ্চয়ই নাই। লোকমুখে শুনেছি, আপনি গচ্ছ-উপন্যাস লেখেন। অবশ্য পড়া হয় নাই। সময়ের বড়ই অভাব।

একবাব ভাবলাম, বলি আমাদের কাজের অভাব আছে। সময়ের অভাব নেই। আমাদের সবার অঙ্গে সময়। বললাম না। কথাবার্তা বলে এই মানুষটিকে প্রশ্ন দেয়া যিক হবে না। শিক্ষক শ্রেণীর কেউ কথা বলার প্রশ্ন পেলে অনবরত কথা বলবে। ফরিদপুরে একবাব এমন একজনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তিনি সংক্ষ্যাবেলায় কথা শুরু করলেন। একনাগাড়ে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বললেন। কেউ কিছু বলতে গেলেই হাত তুলে বলেন, এক মিনিট। আমি আমাব কথাটা শেষ করে নেই। তারপৰ যা বলার বলবেন।

এই জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি.ও সেই ধরনের কোন মানুষ কি-না কে জানে।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, আপনি কি সিগারেট ধান মাস্টার সাহেব ?

তিনি বিরক্তমুখে বললেন, স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর জিনিস পরিহার করি। চা পরিহার করতে পারি নাই। লেখালেখি করি এই জন্যে চা-টা প্রয়োজন হয়।

আমি অত্যন্ত শক্তিকর্ত বোধ করলাম।

অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি গ্রামে-গঞ্জে যে সব লেখক আছেন তাঁরা শহরের শ্রেণী পেলে সহজে ছাড়েন না। জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেন।

জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি. বললেন, আমি কাব্যচর্চা করি।

আমি চূপ করে রইলাম। এই সব ক্ষেত্রে উৎসাহসূচক কোন কথাই বলা উচিত নাই।

আপনার মনে হয়ত প্রশ্নের উদয় হয়েছে অংকের শিক্ষক হয়ে কাব্যচর্চা কেন করি।

আমার মনে এই জাতীয় কোন প্রশ্নের উদয় হয়নি। অংকের শিক্ষক কাব্যচর্চা করতে পারবেন না এমন কোন কথা নেই।

সঠিক বলেছেন। তবে আমি প্রথাগত কবি নই। আমি মেটে পাটিগণিত কাব্যে রূপান্তরিত করছি।

বলেন কি ?

আপনি হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেই। পাটিগণিতের একটি অংক আছে এই রকম, ক একটি কাজ পঞ্চম। দিনে সম্পন্ন করিতে পারে। খ সেই কাজ ৩০ দিনে সম্পন্ন করে। ক ও খ মিলিত তাবে সেই কাজটি কতদিনে সম্পন্ন করিবে ? এই অংকটি আমি কাব্যে রূপান্তরিত করেছি। আপনি কি শুনবেন ?

অবশ্যই শুনো।

জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি. গন্তীর স্বরে আবৃত্তি কবলেন :

করিম রহিম ছিল সহোদর ভাই
করিমের ষে শক্তি রহিমের তা নাই।
করিম যে কর্ম মাত্র পনেরো দিনে করে
সেই কর্ম রহিম করে এক মাস ধরে।
এখন বালকগণ চিন্তা কর ধীরে,
দুই ভাতা সেই কর্ম কর্তব্যে করে।

আমার মুখে কোন কথা জোগাল না। অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রহিলাম।

ভাইসাব কেমন লাগল ?

ছিঁ ভাল।

অস্তর থেকেই বলছেন তো ?

অস্তর থেকেই বলছি।

শুনে প্রীত হলাম। আরেকটা শুনুন চৌবাচ্চার অংক। আবৃত্তি করব ?

ছিঁ করুন।

চৌবাচ্চা ছিল এক প্রকাণ্ড বিশাল
দুই নলে পানি আসে সকাল, বিকাল।
এক নলে পূর্ণ হতে কুড়ি মিনিট লাগে
অন্য নলে পূর্ণ হয় না অর্ধেকটার আগে ।।
চৌবাচ্চা পূর্ণের সময় করহ নির্ণন।
দুই নল খুলে দিলে লাগবে কৃক্ষণ ?

আমি নিজের বিশ্বয় গোপন করে বললাম, এ জাতীয় কবিতা মোট কর্তৃগুলি লিখেছেন ?

তিনি হাজার ছয়শত এগারোটা শ্লেষা হয়েছে। এইসব কবিতার আমি নাম দিয়েছি অংক শ্লোক। পরিকল্পনা আছে দশ হাজার পূর্ণ করে পুস্তকাকারে ছাড়ব।

আমি নিতান্ত আনাড়ির মত বললাম, এতে লাভ কি হবে।

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, লাভ কি হবে তাও ব্যাখ্যা করতে হবে? আজ-জাতীয়দের মধ্যে অংকভীতি প্রবল। কবিতায় সে অংকগুলি পড়লে ভীতি দূর হবে। আজ জাড়া মেধাবী ছ্যাত্রী অংকগুলি মুখস্থ করে ফেলতে পারবে। পারবে না ?

হ্যাঁ পারবে।

বাঁদরের শ্লোকটা শুনুন। তৈলাঙ্গ বাঁশ ও বাঁদরের শ্লোক। আমার গ্রন্থে শ্লোক নামার দুহাজার তিনি :

একটি বাঁদর ছিল
দুটি প্রকৃতির
তৈলাঙ্গ বাঁশ দেখে
হয়ে গেল স্থির ॥

BanglaBook.org

বঁশ বেয়ে উপরে সে উঠিবার চায়,
পিছিলতার কাবণে পড়ে পড়ে যায় ।।
এক মিনিট বেচার উঠে ষতধানি
অর্থপথ নেমে যায় পরাভু মানি
বঁশ দশ কুড়ি ফিট লম্বা যদি হয়
উপরে উঠিবার সময় করছ নির্ণয় ।।

আবৃত্তি শেষ করে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত গলায় বললেন, উঠলাম। আপনাকে
আর বিরক্ত করব না।

বসুন আবেকটু।

জ্ঞানা, সময় অস্প — কাজ প্রচুর। দোয়া করবেন যেন কাজটা শেষ করে যেতে পারি।
বেশিদিন বাঁচব না। আপনি করিমের বক্তু। তাকে আমার কথা বলবেন। বললেই সে চিনবে।
স্নায়ালিক্য।

ভদ্রলোক আমাকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নৌকা থেকে নেমে গোলেন।
নিজে ছোট্ট ডিঙি নৌকার মত নৌকা নিয়ে এসেছিলেন। অঙ্ককারে শুধুমাত্র নক্ষত্রের আলো
সম্বল করে নৌকা ভাসিয়ে দিলেন।

আমার নৌকার মাঝি বলল, ইনার নাম পাগলা মাস্টার। একলা একলা থাকে। রাইতদিন
বিড়বিড় কইরা কি যেন বলে। আঙ্কাইর রাইতে একলা একলা নাও নিয়া ঘূরে।

ছেলেপুলে নাই?

একটাই মেয়ে ছিল, মইরা গেছে।

আমি লোকটির প্রতি এক ধরনের মমতা অনুভব করলাম। ভুল কাজে জীবন উৎসর্গ
করে দেয়ার অনেক নজির আছে। ইনিও তেমন একজন। এদের মমতা দেখানো চলে ; এর
বেশি কিছু না।

করিম এল তার পরদিন।

তাকে জালালুদ্দিন বি.এ. বি.টি.-র কথা জিজ্ঞেস করতেই বলল, তোর কাছে
এসেছিলেন না—কি ? তাঁকে কি ডাকা হত জানিস ? মুসলমান যাদব। অংকের জাহাজ ছিলেন।
যে কোন পাটিগণিতের অংক মুখে মুখে করতে পারতেন।

এখন পারেন না ?

পারেন বোধ হয়। তবে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দিনরাত কবিতা-টবিজ-ল্রেখেন—অংকে
শ্লোক। মেয়েটা মারা যাবার পর মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। খুব আদরের যেয়েট ছিল। নাইনে
পড়তো। অংকে কঁচা ছিল বলে বাবার কাছে খুব বকা খেত। যেয়েট বাবাকে অসম্ভব ভয়
করতো। মেয়েটা মরবার আগে বাবাকে বলল, এখন তোমাকে কেন জানি ভয় লাগছে না
বাবা। আগে ভয় লাগতো। অংক ভয় লাগতো সেই সঙ্গে তোমাকেও লাগতো। এখন একটুও
ভয় লাগছে না।

মেয়েটার মৃত্যু স্যারকে খবুই এফেষ্ট করে। সিঁড়িয়ে একটৈ চিঞ্চা তুকে যায় — কি কুরে
ছাত্রদের অংকভীতি দূর করা যায়। আস্তে আস্তে মাথাটাই খারাপ হয়ে যায়। ঢাকায় যাবার
আগে তোকে একদিন নিয়ে যাব স্যারের কাছে।

গেলায় একদিন উন্নার সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে চিনতে পারলেন। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত ব্যবহার্তা কলেন। খুব অস্ত্রহ করে অংক শ্লোকের বিশাল খাতা এনে দেখালেন। গাঢ় হ্রবে বললেন, গ্রন্থটির নাম বেশেছি — ‘নৃকুন্ন নাহার’। আমার কন্যার নামে নাম। বেচারীর বড় অংকভীতি ছিল। শোপনে কাঁদতো। বইটা আরো পনেরো বছর আগে যদি লিখতে পারতাম . জ্বালানুদ্ধিন্দি সাহেবের চোখ দিয়ে টপ- টপ করে পানি পড়তে লাগল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন। আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলাস্বর কলালেন, একটু দোয়া রাখবেন। কাজটা যেন শেষ করতে পারি।



বান

মাঝরাতে বাতাসীর ভয়ার্ত গলা শোনা গেল — ও রহমান, ও রহমান।

রহমান তার আগেই জেগেছে। সে জ্বাব দিল না। কান পেতে শুল। কলকল করে ঘরে পানি তুকছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে নদীর ঝোঁ-শোঁ আওয়াজ আসছে। বাতাসী হাহকার করে উঠল, পানি আসে ও রহমান।

রহমান ঘরার মত পড়ে রাইল যেন সে কিছুই শুনতে পাচ্ছ না।

ও রহমান, ওরে রহমান।

রহমান ঠাণ্ডা গলায় ধমক দিল, প্যান প্যান করবা না। কৃপী স্বালো। খামাখা চিঙ্গাইও না।

পানি আসে যে রহমান।

আসুক।

বাতাসী কাষার মত শব্দ করে। রহমান শক্ত ধমক লাগায়, খবরদার কানবা না। ভুঁসাগে না।

কৃপী জ্বালাতে গিয়ে বাতাসীর হাত কাঁপে। বুকের মধ্যে ধক্ধক শব্দ শয় কৃপী জ্বালানোও মুশকিল। দেয়াশ্লাইয়ের কাঠি বারবার নিভে যায়। কৃপীর জ্বালাতে আলোয় বাতাসী দেখতে পায় রহমান চুপচাপ বসে আছে চৌকিতে। তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে যেখানে ঘোলাতে পানি ক্রমে ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাতাসী চেঁচিয়ে উঠল, পৃতিরে ডাক দে রহমান। আবাগীর বেতি এখনো দ্ব্যায়।

তুমি চুপ থাকো। খামাখা চিঙ্গানী।

বাতাসী চুপ করে যায়। দরজা খুলতেই হ্যাওয়ায় দুধ কাঁয়ে কৃপী নিভে যায়। ছপছপ শব্দ করে রহমান উঠানে নেমে পড়ে। হৃষ্টযুটি অক্ষমতা প্রায়দিকে। একটানা বৃষ্টি পড়ছে। নদীর পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাড়িরগুলি জেগে উঠেছে। দূরে দূরে কৃপীর আলোর ব্যন্তি নাড়াচাড়া চোখে পড়ে। যাকে মাঝেই শোনা যাচ্ছে একজন আরেকজনকে গলা ফাটিয়ে

ডাকছে — কলিয় ভাই ও কলিম ভাই। একজন ডাকলেই সাড়া দিচ্ছে অনেকটা
জ্বায়গা জুড়ে হই হই শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে।

অঙ্ককরে দাঙ্গিয়ে থেকে রহমান হাক পাড়ে —

কৃপী ধৰাও গো মা, কেন্দৰ মত চাইয়া ধাইক্য না।

কৃপী হাতে বাইরে আসতেই আবাব ফস করে কৃপী নিভে যায়।

রহমান গাল পাড়ে, আরে বেকুব বেটি বুক্ষি-শুক্ষি ছটাকটাও নাই।

দুপছপ শব্দ তুলে হাতড়ে হাতড়ে রহমান এগোয়। পানি এর মধ্যেই ইটু ছাপিয়ে
উঠেছে। গোয়াল ঘর অনেকটা নীচুতে। গুরু দুটির গলার দড়ি কেটে দেয়া উচিত। কোন
সাড়া-শব্দ আসছে না। কে জানে কেন। এর মধ্যেই ডুবে মরেছে নাকি ?

ঘরের ভেতর পুতি জেগে উঠেছে। পুতি সুমায় তাৰ দাদীৰ সঙ্গে। সেও জেগে উঠে
চেঁচাতে শুরু কৰেছে, ও দাদী ও দাদী।

পুতি কি হইছে ? ও পুতি কি হইছে ?

পুতি বলল, বান ডাকছে গো দাদী।

বুড়ি কানে শুনতে পায় না। সে কিছুই বুঝল না। পুতির ছেটি ভাই কাদের আলী নেংটো
হয়ে ঘুমিয়েছিল। বহু ডাকাডাকি করেও পুতি তাৰ ঘূঘ ভাঞ্চাতে পারল না।

বাইরে থেকে রহমান বলল, মূরগী কষটা বেবাক মরছে গো মা।

গুরুর দড়ি কাটছস বাপধন ?

হ। কাটছি।

তষ দেৱী কৰস ক্যান ?

আইতাছি।

পুতি ঘরের আঞ্চিনায় এসে দাঢ়ায়। ভয়ে ভয়ে বলে, পানি কদুৰ ভাইজান ?

বুক পানি। জৰুৰ টান।

রহমানকে দেখতে পেয়ে বধিৰ দাদী গলা ছেড়ে কেঁদে উঠে। রহমান বিৰক্ত হয়ে বলে,
কি হইছে ?

পুতি আমারে গাল পাড়ে রহমান।

দুঃখৰী খালি বাজে বামেলা।

পুতি আমারে হাত দিয়া টেলা দিছে।

রহমান উন্তু না দিয়ে সুমন্ত কাদের আলীৰ গালে প্ৰচণ্ড একটা চড় কৰিয়ে দিয়ে।

হারামজাদা এখনো ঘূমায়, পানিতে সব নিল।

বুড়ি ঘ্যানঘ্যান কৰে, পুতিৰে একটা চড় দে, ও রহমান, পুতি আমাৰে গাইল দিছে।

কাদের আলী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পানিৰ দিকে। কাঁসতেও ভুলে যায়। রহমানেৰ
দাদী ঘোকলা মুখে পান চিবোয়।

রহমান তাৰ মায়েৰ দিকে পেছন ফিরে তামাক জান্ত। অনেকটা রাত পড়ে আছে
সাধনে। ভোৱ না হওয়া পৰ্যন্ত যাওয়া থাবে না কেঁজে কিন্তু পানি যে হারে বাড়ছে কৃতক্ষণ
চৌকিৰ উপৰ বসে থাকা যাবে কে জানে।

ও রহমান জাগন আছ ? ও রহমান।

রহমান ঝুকা রেখে বেরিয়ে এল। কলা গাছের ডেলায় করে হাসু চাচা এসেছেন। তাঁর ছেটি ছেলেটাও সঙ্গে আছে। ভিজে চূপসে গেছে দুঃখনেই। হাসু চাচা ফ্যাসফ্যাস গলায় বললেন, রহমান জিনিস-পত্তন গোছগাছ কইবা রাখ। পানি আরো বাড়ব। আমি নৌকা আনতে যাই। রাইতে রাইতে বেবাক মানুষ রেল সড়কও তুলন লাগবো।

রহমান বলল, তামুক থাইবেন চাচা?

নাহ। করিম মনে লয় বানে ভাইস্যা গেছে। তনছস?

নাহ। হনি নাই।

তার বউটা খুব চিমাইতেছে।

এটু তামুক খান চাচা।

নাহ যাই। তোমা জিনিসপত্র ঠিকঠাক কর।

বাতাসী ও পুতি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ছেটি ছেটি পুটলি তৈরি করতে থাকে। রহমান চৌকির উপর চুপচাপ বসে থাকে। তার দৃষ্টি নিরাসক যেন কোন কিছুর সঙ্গেই তার কোন যোগ নেই। ঘরের ভেতরের পানি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। পুতির চোখে জল টিলটিল করে। নিচু গলায় বলে, বড় ডর লাগে ভাইজান।

ডর লাগবের কিছু নাই। কাম কর।

কোমর ছাপিয়ে পানি উঠে আসবাব পরই সবাইকে নিয়ে চালে উঠে রহমান। বৃষ্টিও তখন নাযে জ্বারেসোরে। রহমানের দাদী গলা ছেড়ে কাঁদতে বসে।

ও রহমান ভিজলায যে বে।

বৃড়ির সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদে কাদের আলী।

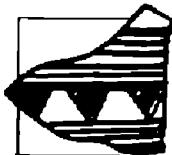
বাতাসী আকেপের সূর বের করে, ধান-চাউল সব গেল বে, ও রহমান। ও বাপধন।

রহমান ধমক লাগায়, খবরদার প্যান প্যান করবা না।

অঙ্ককার রাত। অঝোরে পড়ে বৃষ্টি। চারদিকে ফুলে-ফুঁপে উঠছে রাত্রির মতই অঙ্ককার জলরাশি। দূরে দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাত্তিঘর থেকে চিৎকার ও কোলাহল শোনা যাচ্ছে। নদীর শৌ-শৈৰ্ষী আওয়াজের সঙ্গে সে কোলাহল মিশে অন্তু শব্দ হয়।

মোতের প্রবল টানে রহমানের বহুদিনের পুরানো চালাঘর নড়বড় করে কাঁপে। ভয়-পাওয়া গলায় পুতি ভাকে, ভাইজান ও ভাইজান।

রহমানের দাদী ভাঙা গলায় বলে, ও দাদা বড় শীত লাগে। এবং এক সময় পুতি শুনতে পায় তার ছাবিকশ বছরের জ্বোয়ান দাদা ছেলেমানুষের মত কাঁদছে। তার বড় হৃষি করে সে দাদার পাশে বসে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। দাদাকে তারা সবাই বড় ভয় কার।



শুনেছিস ছেটিন

অনেক রাতে ষেতে বসেছি, যা ধরা গলায় বললেন, ‘খবর শুনেছিস ছেটিন ?’

‘কি খবর ?’

‘পরী এসেছে।’

আমি অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। যা থেমে থেমে বললেন, পরীর একটি মেয়ে হয়েছে।’

মায়ের চোখে এইবার দেখা গেল জল। আমি বললাম, ‘ছিঃ যা, কাদেন কেন ?’

যা সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, ‘না কাদি না তো ; আর দুটি ভাত নিবি ?’

আমি দেখলাম যার চোখ ছাপিয়ে টিপটিপ করে জল পড়ছে। মায়েরা বড় দৃঢ় পুষ্প রাখে।

ছবছর আগের পরী আপাকে ভেবে আজ কি আর কাঁদতে আছে ? হাত ধূতে বাইরে এসে দেখি ফুটফুটে ঝ্যোৎস্না নেমেছে। চারদিকে কি চমৎকার আলো। উঠোনের লেবু গাছের লম্বা কোমল ছায়া সে আলোয় ভাসছে। কতদিনের চেনা ঘর-বাড়ী কেমন অচেনা লাগছে আজ।

বারান্দায় ইঞ্জি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন আমার অঙ্ক বাবা। তাঁর পাশে একটি শূন্য টুল। ঘরের সমস্ত কাঙ্গ সেরে আমার যা এসে বসবেন সেখানে। ফিসফিস করে কিছু কথা হবে। দুজনেই তাকিয়ে থাকবেন বাইরে। একজন দেখবেন উধাল-পাতাল ঝ্যোৎস্না, ‘অন্যজন অঙ্ককার।

বাবা মদু স্বরে ডাকলেন, ছেটিন, ও ছেটিন ! আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি তাঁর অঙ্ক চোখে তাকালেন আমার দিকে। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, পরী এসেছে শুনেছিস ?

‘শুনেছি।’

‘আজ্ঞা যা।’

আজ আমাদের বড় দুঃখের দিন। পরী আপা আজ এসেছেন। কাল খুব স্তোরে তাদের বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়ত দেখা যাবে তিনি হাসি-হাসি মুখে শিশুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। শিশুল তুলো উড়ে এসে পড়ছে তাঁর চোখে-মুখে। আপাকে দেখে হয়তো খুশী হবেন। হয়তো বা হবেন না। পরী আপাকে বড় দেখতে আছে করে।

আমরা খুব দৃঢ় পুষ্প রাখি। হঠাৎ হঠাৎ এক একদিন আমাদের কত পুরানো কৃত্তি মনে পড়ে। বুকের ভেতর আচমকা ধাক্কা লাগে। চোখে জল এসে পড়ে। এমন কেন আমরা ?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, আমার যা হাত ধূতে কল্পনারে যাচ্ছেন। মাথার কাপড় ফেলে

তিনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর আনেক সময় নিয়ে অঙ্গু করলেন। এক সময় এসে বসলেন শূন্য টুলটায়। বাবা ফিসফিস করে বললেন, খাওয়া হয়েছে তোমার?

‘হ্যাঁ। তোমার বুকে তেল ঘালিশ করে দেব?’

‘না।’

‘সিগারেট খাবে? দেব ধরিয়ে?’

‘না।’

তারপর দুঃখনে মিথ্যে বসেই রইলেন, বসেই রইলেন। লেবু গাছের ছায়া ত্রমশ ছেট হতে লাগলো। এত দূর থেকে বুঝতে পারছি না কিন্তু মনে হচ্ছে আমার মা কাঁদছেন। বাবা তাঁর শীর্ণ হাতে মার হাত ধরলেন। কফ-জ্বর অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কাঁদে না, কাঁদে না।

বাবা তাঁর বৃক্ষ শ্রীকে আজ আবার তিরিশ বছর আগের মত ভালবাসুক। আমার মার আজ বড় ভালবাসার প্রয়োজন। আমি তাঁদের ভালবাসার সুযোগ দিয়ে নেমে পড়লাম রাস্তায়। মা ব্যাকুল হয়ে ডাকলেন, কোথায় যাস ছেটিন?

‘এই একটু হাঁটবো রাস্তায়।’

‘দেরী করবি না তো।’

‘না।’

মা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, ছেটিন তুই কি পরীদের বাসায় যাচ্ছিস?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বললেন, যেতে চায় যাক না। যাক।

রাস্তাঘাট নির্জন। শহরতলীর মানুষরা সব সকাল সকাল মুমিয়ে পড়ে। তারস্বরে খিখি ডাকছে চারপাশে। গাছে-গাছে নিশি পাওয়া পার্বীদের ছটফটানি। তবু মনে হচ্ছে চারপাশ কি চুপচাপ।

রাস্তায় চিনির মত সাদা ধূলো চিকমিক করে। আমি একা একা হাঁটি। মনে হয় কত যুগ আগে যেন অন্য কোন জন্মে এখন জ্যোৎস্না হয়েছিল। বড়দা আর আমি শিশোছিলাম পরী আপাদের বাসায়। আমার লাঞ্ছুক বড়দা শিমুল গাছের আড়াল থেকে মনুস্বরে ডেকেছিলেন, পরী, ও পরী।

লঠিন হাতে বেরিয়ে এসেছিলেন পরার মা। হাসিমুখে বলছিলেন,

‘ওমা তুই? কবে এলি রে? কলেজ ছুটি হয়ে গেল?’

‘ভাল আছেন খালা? পরী ভাল আছে?’

খবর পেয়ে পরী হাওয়ার মত ছুটে এসেছিলো ঘরের বাইরে।

এক পলক তাকিয়ে মুশ্তি বিস্ময়ে বলেছিল, ইশ! কত দিন পূর্ব কলেজ ছুটি হল আপনার।

আমার মুখচোরা লাঞ্ছুক দাদা ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন — পরী তুমি ভাল আছো?

‘হ্যাঁ। আপনি কেমন আছেন?’

‘ভাল। তোমার জন্য গল্পের বই এনেছি পরী।’

এসব কোন জন্মের কথা ভাবছি! হাঁটিতে হাঁটিয়ে মনে হচ্ছে — এসব কি সত্যি সত্যি কখনো ঘটেছিল? একজন বৃক্ষ মা একজন অজ্ঞ বাবা — এরা ছাড়া কোন কালে কি কেউ ছিল আমার?

পরী আপার বাড়ীৰ সামনে থমকে দাঁড়ালাম। খোলা উঠেনে চেয়াৰ পেতে পরী আপা চূপচাপ বসে আছেন। পাশে একটি শৃণ্য চেয়াৰ। পরী আপার বৰ হয়তো উঠে গেছেন একটু আগে। পরীৰ আপা আমাকে দেখে স্বাভাৱিক গলায় বললেন, ছোটন না ?

‘ইয়া।’

‘উৎ ! কতদিন পৰ দেখা। বোস এই চেয়াৰটায়।’

‘আপনি ভাল আছেন পরী আপা ?’

‘ইয়া, আমাৰ মেঘে দেখবি ? বোস নিয়ে আসছি।’

লাল জামা গায়ে ডল পুতুলৰ মত একটি ঘূমন্ত মেয়েকে কোলে কৰে ফিৰে আসলেন তিনি।

‘দেখ, অবিকল আমাৰ মত হয়েছে। তাই না ?’

‘ইয়া, কি নাম বেখেছেন মেয়েৰ ?’

‘নীৱা। নায়টা তোৱ পছন্দ হয় ?’

‘চমৎকাৰ নাম।’

অনেকক্ষণ বসে রইলাম আমি। একসময় পরী আপা বললেন, বাড়ী যা ছেটন। রাত হয়েছে।

বাবা আৱ মা তেমনি বসে আছেন। বাবাৰ মাথা সামনে ঝুকে পড়েছে। তাঁৰ সাবা মাথায় দুধেৰ মত সাদা চূল। মা দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইৱে। পায়েৰ শব্দে চমকে উঠে বাবা বললেন, ছোটন ফিৱলি ?

‘কি !’

‘পৰীদেৱ বাসায় চিয়েছিলি ?’

‘ইয়া।’

অনেকক্ষণ আৱ কোন কথা হল না। আমৰা তিনজন চূপচাপ বসে রইলাম।

এক সময় বাবা বললেন, পৰী কিছু বলেছে ?

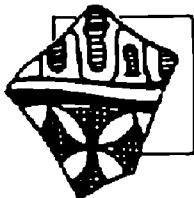
‘না।’

মাৰ শৰীৰ কেঁপে উঠলো। একটি হাহাকারেৰ মত তীক্ষ্ণ স্বৰে তিনি ফুপিয়ে উঠলেন, “আমাৰ বড় খোকা। আমাৰ বড় খোকা।”

এন্দ্ৰিন খোয়ে মৱা আমাৰ অভিমানী দাদা যে প্ৰগাঢ় ভালবাসা পৰী আপার জন্মে সঞ্চিত কৰে বেখেছিলেন তাৰ সবটুকু দিয়ে বাবা আমাৰ যাকে কাছে টানলেন ঝুক্ক পড়ে চুম্ব খেলেন মাৰ কুক্ষিত কপালে। ফিসফিস কৰে বললেন, কাঁদে না কাঁদে না।

ভালবাসাৰ সেই অপূৰ্ব দশ্যে আমাৰ চোখে ভল আসলো। আৰু আৰু জ্যোৎস্নাৰ দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে কলচুম, পৰী আপা, আজ তোমাকে কৈমা কৰেছি।

BanglaBook.org



নিউটনের ভূল সূত্র

রাপেশুর নিউ মডেল হাইস্কুলের সায়েন্স চিচার হচ্ছেন অমর বাবু।

অমর নাথ পাল, বি.এসসি. (অনার্স, গোল্ড মেডাল)।

শুধু সিরিয়াস ধরনের শিক্ষক। স্কুলের স্যারদের আসল নামের বাইরে একটা নকল নাম থাকে। ছাত্র মহলে সেই নামেই তাঁরা পরিচিত হন। অমর বাবু স্কুলে ‘ঘড়ি স্যার’ নামে পরিচিত। তাঁর বুক পকেটে একটা গোল ঘড়ি আছে। ফ্লাস টোকার আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে সময় দেখে নেন। ফ্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ামাত্র আবার ঘড়ি বের করে সময় দেখেন। তখন যদি তাঁর ভূরু ক্রচকে যায় তাহলে বুঝতে হবে ঘণ্টা ঠিকমত পড়েনি। দু'এক মিনিট এদিক-ওদিক হয়েছে।

তাঁর ফ্লাস নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে। হাসা যাবে না, পেনসিল দিয়ে পাশের ছেলের পিঠে খোচা দেয়া চলবে না, খাতায় কটিকুটি খেলা চলবে না। মনের ভূলেও যদি কেউ হেসে ফেলে তিনি হতভম্ব ঢোকে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলবেন, সায়েন্স ছেলেখেলা নয়। হাসাহাসির কোন ব্যাপার এর মধ্যে নেই। সায়েন্স পড়াবার সময় তুমি হেসেছ, তার মানে বিজ্ঞানকে তুমি উপহাস করেছ। মহা অন্যায় করেছ। তার জন্যে শাস্তি হবে। আজ ফ্লাস শেষ হবার পর বাড়ি যাবে না। পাটিগাঁতের সাত প্রশ্নালার ১৭, ১৮, ১৯ এই তিনিটি অংক করে বাড়ি যাবে। ইচ্ছ ইট ক্লিয়ার?

অপরাধী শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। তার লাঞ্ছনা দেখে অন্য কেউ হয়ত ফিক করে হেসে ফেলল। অমর স্যার থমথমে গলায় বলবেন, ওকি, তুমি হাসছ কেন? হাস্যকর কিছু কি বলেছি? তুমি উঠে দাঁড়াও। অকারণে হাসার জন্য শাস্তি হিসেবে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবে।

অমর বাবু পকেট থেকে ঘড়ি বের করবেন। পাঁচ মিনিট তিনি এক সন্তুতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইবেন। ছাত্ররা মৃত্তি মত বসে থাকবে।

অমর বাবুর বয়স পঞ্চাশ। স্ত্রী, দ্বি ছেলে এবং দুটি মেয়ে — এই নিম্নে তাঁর সংসার। দুটি ছেলেই বড় হয়েছে — রাপেশুর বাজারে একজনের কাপড়ের ব্যবসা, অন্যজনের ফার্মেসী আছে। ভাল টাকা রোজগার করে। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। অন্য মেয়েটির বিয়ের কথা হচ্ছে। এদের কারোর সঙ্গেই তাঁর মন নাই। স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের তিনি সহ্য করতে পারেন না। অনেক দিন হল বাড়িতেও থাকেন না। স্কুলের সোল্লায় একটা খালি ঘরে বাস করবেন। সেখানে বিছানা বালিশ আছে। একটা স্টোভ আছে। গভীর রাতে স্টোভে চা বানিয়ে থান।

জাপেন্সুর স্কুলের হেড স্যার তাঁকে বলেছিলেন, আপনার ঘর-সংসার থাকতে আপনি
স্কুলে থাকেন, এটা কেমন কথা ?

অমর বাবু পঞ্জীয় গলায় বললেন, রাত জ্যে পড়াশোনা করি, একা থাকতেই ভাল
লাগে। তাছাড়া ওদের সঙ্গে আমার বনে না। তবে স্কুলে রাত্রি যাপন করে যদি আপনাদের
অসুবিধার কারণ ঘটিয়ে থাকি তাহলে আমাকে সরাসরি বলুন, আমি ডিম্ব ব্যবস্থা দেখি।

হেড স্যার সঙ্গে সঙ্গে কলেন, আরে না — এই কথা হচ্ছে না। আপনার মেখানে ভাল
লাগবে আপনি সেখানে থাকবেন।

তিনি অমর বাবুকে ঘটালেন না। কারণ অমর বাবু অসন্তুষ্ট ভাল শিক্ষক। অংকের ডুবো
জাহাজ। ডুবো জাহাজ বলার অর্থ তাঁকে দেখে মনে হয় না তিনি অংক জানেন। ভাবুক
ভাবুক ভাব আছে। ক্লাসে কোন অংক তাঁকে করতে দিলে এমন ভাব করেন যেন অংকটা
মাথাতেই ঢুকছে না। তারপর পকেট থেকে শোল ঘড়ি বের করে ঘড়ির দিকে ধানিকক্ষণ
তাকিয়ে থেকে, চোখ বজ্জ করে মুখে মুখে অংকটা করে দেন। স্কুলের অনেক ছাত্রের ধারণা
এই ঘড়িতে রহস্য আছে। ঘড়ি অংক করে দেয়। ব্যাপার তা নয়। তাঁর ঘড়ির সেকেশের
কাঁটাটায় গওগোল আছে। কখনো ক্রতৃ যায় কখনো আন্তে তবে গড়ে সমান থাকে। এইটাই
তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করেন।

অমর বাবুকে ভাল মানুষ বলা যেতে পারে তবে তিনি অমিশুক, কথাবার্তা প্রায় বলেন
না বললেই হয়। কারোর সাতে-পাঁচেও থাকেন না। টিচার্স কফন করে জানালার পাশের
চেয়ারটায় চুপচাপ বসে থাকেন। ঘণ্টা পড়লে ক্লাসে রওনা হন। স্কুলের আরবী শিক্ষক
মৌলানা ইদরিস আলি তাঁকে নিয়ে মাঝে-মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করেন। বিশেষ
লাভ হয় না। তিনি ঠাট্টা-তামাশা পছন্দ করেন না। কেউ ঠাট্টা করলে কঠিন চোখে তাকিয়ে
থাকেন।

আজ বৃহস্পতিবার, হাফ স্কুল। আগামী কাল ছুটি। ছাত্র-শিক্ষক সবার মধ্যেই একটা
ছুটি ছুটি ভাব চলে এসেছে। থার্ড পিরিয়ডে অমর বাবুর ক্লাস নেই। তিনি জানালার কাছের
চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। ইদরিস সাহেব তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন,
তারপর অমর বাবু, আপনার সামনের কি খবর ?

অমর বাবু কিছু বললেন না তবে চোখ তুলে তাকালেন। মনে মনে বসিক্ষণার জন্য
প্রস্তুত হলেন। বিজ্ঞান নিয়ে এই লোকটি কঠিন রসিকতা করে যা তিনি একবারেই সহ্য
করতে পারেন না।

ইদরিস সাহেব পানের কোটা থেকে পান বের করতে করতে বললেন, অনেকদিন থেকে
আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘূরছে। রোজই ভাবি আপনাকে জিজ্ঞাস করব।

‘জিজ্ঞেস করলেই পারেন !’

‘ভরসা হয় না। আপনি তো আবার প্রশ্ন করলে বিশেষ ঘান !’

‘বিজ্ঞান নিয়ে রসিকতা করলে রাগি। এম্বিয়েট শুনা না — আপনার প্রশ্নটা কি ?’

ইদরিস সাহেব পান চিবুতে চিবুতে বললেন, পৃথিবী যে ঘূরছে এই নিয়ে প্রশ্ন। পৃথিবী
তো ঘূরছে, তাই না ?

‘ছি। পৃথিবীর দুরকম গতি — নিজের অঙ্কের উপর ঘূরছে, আবাৰ সূৰ্যেৰ চারদিকে ঘূৰছে।’

‘বাই বাই কৰে ঘূৰছে?’

‘ছি?’

‘তাই যদি হয় তাহলে আমাদেৱ মাথা কেন ঘূৰে না? মাথা ঘোৱা উচিত ছিল না? এন্তিমে তো মাটে দুটা চকুৱ দিলে মাথা ঘূৰতে থাকে। ওকি, এৱকম কৰে তাকাছেন কেন? রাগ কৰছেন না—কি?’

‘বিজ্ঞান নিৰে বসিকৃতা আমি পছন্দ কৰি না।’

‘বসিকৃতা কি কৱলায়?’

অমুৰ বাবু চেয়াৱ ছেড়ে উঠে পড়লেন। ক্লাসেৱ সময় হয়ে গৈছে। ষষ্ঠা পড়াৰ আগেই ক্লাসেৱ সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এই তাৰ নিয়ম। পৃথিবী কোন কাৱণে হঠাৎ উল্টে গৈলেও নিয়মেৰ ব্যতিক্ৰম হবে না।

আজ পড়াৰ বিষয়বস্তু হল আলো। আলোৰ প্ৰতিফলন ও প্ৰতিসূৰণ। বড় চমৎকাৰ বিষয়। আলো হচ্ছে একই সঙ্গে তৱজ্জ্বল ও বস্তু। কি অসাধাৱণ ব্যাপার! ক্লাস টেনেৱ ছেলেগুলি অবশ্যি এসব বুৰবৈ না। তবে বড় হয়ে বখন পড়বে তখন চমৎকৃত হবে।

অমুৰ বাবু ক্লাসে চুক্কেই বললেন, আলোৰ গতিবেগ কত — কে বলতে পাৱ? সাতজন ছেলে হাত তুলল। তাৰ মন খাৱাপ হয়ে গৈল। তাৰ খাৱণা ছিল সবাই হাত তুলবে। ছেলেগুলি কি সায়েন্সে মজা পাচ্ছে না? তা কি কৰে হয়? পৃথিবীতে মজাৰ বিষয় তো একটাই। সায়েন্স।

‘তুমি বল, আলোৰ গতিবেগ কত?’

‘প্ৰতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজাৰ মাইল।’

‘ভেৱী গুড়। এখন তুমি বল, আলোৰ গতি কি এৱ চেয়ে বেশি হতে পাৱে?’

‘ছি—না স্যার।’

‘কেন পাৱে না?’

‘এটাই স্যার নিয়ম। প্ৰকৃতিৰ নিয়ম।’

‘ভেৱী গুড়। ভেৱী ভেৱী গুড়। প্ৰকৃতিৰ কিছু নিয়ম আছে যে নিয়মেৰ কখনো ব্যতিক্ৰম হবে না। হতে পাৱে না। যেমন মাধ্যাকৰ্ষণ। একটা আম ষদি গাছ থেকে পড়ে গৈলে তা ঘাটিতেই পড়বে, আকাশে উড়ে যাবে না। ইজ ইট ক্লিয়াৰ?’

‘ছি—স্যার।’

‘মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ জনক কে?’

‘নিউটন।’

‘নামটা তুমি এই ভাবে বললে যেন নিউটন হলেন একজন বাম-স্যাম, বাম—মধুৰ, রহিম—কৱিম। নাম উচ্চারণে কোন শৰ্কা নাই — কল মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।’

ছাত্রতি কাঁচুমাচু শুখে বলল, মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।

‘একজন অত্যন্ত শুভেয় বিজ্ঞানীর নাম অশুক্রার সঙ্গে কলার জন্যে তোমার শান্তি হবে। ক্লাস শেষ হলে বাড়ি যাবে না, পাঠিগণিতের বাব নম্বর প্রশ্নামালার একুশ আর বাইশ এই দুটি অংক করে তারপর যাবে। ইজ ইট ক্লিয়াব?’

ছেলেটির মুখ আরো শুকিয়ে গেল।

অমর বাবুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। ছেলেগুলি তাঁর মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞান অবহেলা করছে। অশুক্রার সঙ্গে পড়ছে। খুবই দুঃখের কথা।

সন্ধ্যার পর তিনি স্কুল লাইব্রেরীতে খানিকক্ষণ পড়াশোনা করলেন। বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনকথা। মনের অশান্ত ভাব একটু কমল। তিনি স্কুলের দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর ছেটি ছেলে রতন টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছে। মুখ কাঁচমাচু করে বাবানায় দাঁড়িয়ে আছে। সে ভার বাবাকে স্কুলের ছাত্রদের চেয়েও বেশি ভয় করে।

‘রতন কিছু বলবি?’

‘মা বলছিলেন, অনেকদিন আপনি বাড়িতে যান না।’

‘তাতে অসুবিধা তো কিছু হচ্ছে না।’

‘মা’র শরীরটা ভাল না। ভ্রু।’

‘ডাক্তার ডেকে নিয়ে যা। আমাকে বলছিস কেন? আমি কি ডাক্তার?’

রতন মাথা নিচু করে চলে গেল। অমর বাবুর মনে হল আরেকটু ভাল ব্যবহার করলেই হত। এতটা কঠিন হ্বার প্রয়োজন ছিল না। কঠিন না হয়েই বা কি করবেন — গাথা ছেলে — মেট্রিকটা তিনবাবেও পাস করতে পারেন। জগতের আনন্দময় বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি কিছুই জানল না — আলো কি সেই সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আলো কি জিঞ্জেস করলে নির্ধারণ বলবে — এক ধরনের তরকারি, ভর্তা করেও খাওয়া যায়। ছিঃ ছিঃ।

ঘড়ি ধরে ঠিক নটায় তিনি রাতের খাবার শেষ করলেন। খাওয়া শেষ করতেই বেঁপে বৃষ্টি নামল। খোলা জানালা দিয়ে ঝুঝ করে হাওয়া আসতে লাগল। মেঘ ডাকতে লাগল। অমর বাবু দরজা-জানালা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলেন। তাঁর ঘুমতে যাবার সময় বাঁধা আছে রাত দশটা কুড়ি। এখনো অনেক বাকি আছে। এই সময়টা তিনি চুপচাপ বসে নানা বিষয় ভাবেন। ভাবতে ভাল লাগে। আগে পড়াশোনা করতেন। এখন চোখের ভ্রান্তি হারিকেনের আলোয় বেশিক্ষণ পড়তে পারেন না। মাথায় যত্নগা হয়। ঢাকায় ফিলে ডাল ডাক্তার দিয়ে চোখ দেখান দরকার।

তিনি বিছানায় পা তুলে উঠে বসলেন। শীত শীত লাগছিল, গায়ে একটু চন্দনী জড়াবেন কি-না যখন ভাবছেন তখন হঠাৎ শরীরটা যিমিযিম করে উঠল। তিনি খানিকটা নড়ে উঠলেন। আর তখন অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার হল — তিনি লাঙ্ঘ করলেন বিছানা ছেড়ে তিনি উপরে উঠে যাচ্ছেন। প্রায় হাত তিনেক উঠে গেলেন এবং সেমানেই শির হয়ে গেলেন। চোখের ভুল? অবশ্যই চোখের ভুল। মহাবিজ্ঞানী নিউটনের সূত্র অনুযায়ী এটা হতে পারে না। হতে পারে না। হতে পারে না। নিতান্তই অসম্ভব সুন্দর প্রথম দিকে উঠা যেমন অসম্ভব, এটাও তেমনি অসম্ভব। এ হতেই পারে না।

কিন্তু হয়েছে। তিনি খাট থেকে তিন হাত উপরে শির হয়ে আছেন। ঘরের সবকিছু আগের মত আছে, শুধু তিনি শূন্যে ভাসছেন। অমর বাবু চোখ বন্ধ করে দলে মনে বললেন,

হে ঈশ্বর, দয়া কর। দয়া কর। শরীরে কেমন যেন অনুভূতি হল। হয়ত এবার নিচে নেমেছেন। তিনি চোখ খুললেন, না আগের জ্ঞানগাতেই আছেন। এটা কি করে হয়?

প্রচণ্ড শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল আর তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধপ করে নিচে পড়লেন। থানিকটা ব্যথাও পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিছনায় শুয়ে পড়লেন। চাদর দিয়ে সারা শরীর রেকে দিলেন। কি ঘটেছে তা নিয়ে তিনি আর ভাবতে চান না। ঘুমুতে চান। নিশ্চিন্ত ঘূম। ঘূম ভেঙে যাবার পর হয়তো সব স্বাভাবিক হয়ে থাবে।

রাতে তাঁর ভাল ঘূম হল। শেষ রাতের দিকে তিনি একবার জ্বেগে উঠে বাথরুমে যান। আজ তাও পেলেন না, এক ঘুমে রাত পার করে দিলেন। যখন ঘূম ভাঙল — তখন চারদিকে দিনের কড়া আলো, রোদ উঠে গেছে। তাঁর দীর্ঘ জীবনে এই প্রথম সৃষ্টির পর ঘূম ভাঙল। রাতে কি ঘটেছিল তা মনে করে গায়ে কঁটা দিয়ে উঠল। দৃঢ়স্বপ্ন, নিশ্চয়ই দৃঢ়স্বপ্ন। বদহজম হয়েছিল। বদহজমের কারণে দৃঢ়স্বপ্ন দেখেছেন। বসে বসেই মুখিয়ে পড়েছিলেন। এরফম হয়। মানুষ খুব ক্লান্ত থাকলে বসে বসে মুখিয়ে পড়তে পারে। ঘূমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখেছেন। দীর্ঘ স্বপ্নের স্থায়িত্বকাল হয় খুব কম। হয়ত এক সেকেণ্ডের একটা স্বপ্ন দেখেছেন। এই হবে — এছড়া আর কি? স্বপ্ন, অবশ্যই স্বপ্ন। অমর বাবুর মন একটু হালকা হল।

পরের দিনের কথা। প্রথম পি঱িয়ডে অমর বাবুর ঝুঁস নেই। টিচার্স কমন রুমে চুপচাপ বসে আছেন। ইদরিস সাহেব যথারীতি তাঁর পাশে এসে বসলেন। পানের কোটা বের করতে করতে বললেন, অমর বাবুর শরীর খারাপ না-কি?

‘ছি-না।’

‘দেখে কেমন কেমন জ্ঞানি লাগছে। মনে হচ্ছে অসুস্থ। গায়ে কি স্তর আছে?’

‘ছি-না।’

‘রাতে ভাল ঘূম হয়েছিল?’

‘হ্যাঁ, তবে দৃঢ়স্বপ্ন দেখেছি।’

‘কি দৃঢ়স্বপ্ন দেখেছেন?’

অমর বাবু ইতৃষ্ণু করে বললেন, দেখলাম শুন্যে ভাসছি।

‘আরে ভাই এটা কি দৃঢ়স্বপ্ন? শুন্যে ভাসা, আকাশে উড়ে যাওয়া — এইসব স্বপ্ন তো আমি বোঝই দেখি। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি অনেক উচু থেকে ধূপ করে মাটিতে পড়ে (শেষ) ... খুব টেনশানের স্বপ্ন।’

অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, ঠিক স্বপ্ন না, মনে হয় জ্ঞানুত্ত অবস্থায় দেখেছি।

‘কি বললেন? জ্ঞানুত্ত অবস্থায়? জ্বেগে জ্বেগে দেখলেন আপনি শুন্যে ভাসছেন?’

‘ছি।’

‘জ্ঞানুত্ত অবস্থায় দেখলেন শুন্যে ভাসছেন?’

অমর বাবু জ্ববাব দিলেন না। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন। ইদরিস সাহেব বললেন, রাত-দিন সামেন্স সামেন্স করে আপনার মধ্যা ইচ্ছে হয়ে গেছে। বিশ্রাম দরকার। আপনি এক কাজ করুন — ছুটি নিয়ে বাড়ি ছেলে যান। আজ ঝুঁস নেয়ার দরকার নেই। আমি হেড স্যারকে বলে আসি?

‘না না, আমার শরীর ঠিকই আছে।’

অমর বাবু যথাবীতি ক্লাসে গেলেন। তাঁর পড়াবাব কথা আলোর ধর্ম। তিনি শুরু করলেন মাধ্যাকর্ষণ।

“দুটি বস্তু আছে। একটির ভর m₁ অন্যটির ভর m₂। তাদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে r। তাহলে মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ হবে

m₁m₂

r²

এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। স্যার আইজ্জাক নিউটনের বিদ্যুত সূত্র। এর কোন নড়চড় হবে না। হতে পারে না। বাবারা বুঝতে পারছ?”

হেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আজ্জ পড়াবাব কথা আলোর ধর্ম, প্রতিফলন, প্রতিসরণ; স্যার মাধ্যাকর্ষণ পড়াচ্ছেন কেন?

“বাবারা কি বলছি বুঝতে পারছ?”

ছাত্ররা জবাব দিল’না।

“যদি কেউ বুঝতে না পার হাত তোল।”

কেউ হাত তুলল না। এক সময় ঘট্টা পড়ে গেল। কোনদিনও যা হয় না তাই হল। অমর বাবু ঘট্টা পড়ার পরেও চুপচাপ বসে রইলেন। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন না বা উঠেও গেলেন না। চোখ বক্ষ করে মৃত্তির মত বসে রইলেন। ছাত্রদের বিস্ময়ের কোন সীমা রইল না।

সক্ষা হয়ে গেছে। অমর বাবু স্কুল লাইব্রেরীতে বসে আছেন। হাতে একটা বই। নাম—“মৌমাছিদের বিচিত্র জীবন।” পড়তে বড় ভাল লাগছে। কত স্কুল প্রাণী অথচ কি অসঙ্গব বুঝি, কি অসঙ্গব জ্ঞান। মৌচাকের ভেতরের তাপমাত্রা তারা একটা নিদিট শানে স্থির করে রাখে। বাড়তেও দেয় না, কমতেও দেয় না। এই কাজটা তারা করে অতি দ্রুত পাখা কাঁপিয়ে। তাপমাত্রা এক হাজার ভাগের এক ভাগও বেশ কম হয় না। মানুষের পক্ষেও যা বেশ কঠিন।

তিনি রাত আটটার দিকে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। শরীরটা ভাল লাগছে না। একটু জ্বর জ্বর লাগছে। তিনিন ক্যারিয়ারে আবার দিয়ে গেছে। তিনি কিছু খাবেন না হলে টিক করলেন। না খাওয়াই ভাল হবে। অনেক সময় পেটের গুগোল থেকে যন্তিম উত্তেজিত হয়। তাতে আজ্জবাজ্জে স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা ঘটতে পারে। না খেলে জীবেঁনা। লেবুর সরবত বানিয়ে এক গ্লাস সরবত খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন।

কাল শীত শীত লাগছিল, আজ আবার গরম লাগছে। জামালা, আলা, সামান্য বাতাস আসছে। সেই বাতাস মশারির ভেতর ঢুকছে না। তিনি মশারি খুলে ফেললেন। মশা কামড়াবে। কামড়াক। গরমের চেয়ে মশার কামড় খাওয়া ভাল।

মশারি খুলে ফেলে বিছানায় শোয়া যাত্র আবার গত ঘটনার মত হল। তিনি ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে ঘেতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মাঝে মাঝে ছাদ স্পর্শ করল।

তিনি হাত দিয়ে সেই ছাদে ধাক্কা দেয়া স্থানিকটা নিচে নেয়ে আবার উপরে উঠতে লাগলেন। একি অস্তুত কাণ? আবারো কি স্বপ্ন? না, স্বপ্ন না। আজ্জকেরটা স্বপ্ন না।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার উপর কাজ করছে না। পৃথিবীর ভর যদি হয় m_1 , তিনি যদি হন m_2 এবং তাঁর ভর m_2 যদি হয় শূন্য তাহলে মাধ্যাকর্ষণ কল হবে শূন্য। তাঁর ভর কি এখন শূন্য? তিনি পাশ ফিরলেন, শরীরটা চমৎকারভাবে ঘূরে গেল। সাঁতার কটির ঘত করলেন 'তেমন লাভ হল না। যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন। এটাই স্বাভাবিক, বাতাস অতি হলকা। হলকা বাতাসে সাঁতার কটা যাবে না।

ব্যাখ্যা কি? এর ব্যাখ্যা কি? একটা মানুষের ভর হয়েও শূন্য হয়ে যেতে পাবে না। নিচে নামার উপায় কি? মনে মনে আমি যদি চিন্তা করি নিচে নামব তাহলে কি নিচে নামতে পারব? তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন — নেমে যাচ্ছি, দূর নেমে যাচ্ছি। লাভ হল না। যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন।

আজ্ঞা তিনি যদি খুশ ফেলেন তাহলে খুশ্টোর কি হবে? মাটিতে পড়ে যাবে না শূন্যে ঝুলতে থাকবে? তিনি খুশ ফেললেন। খুব স্বাভাবিকভাবে খুশ মাটিতে পড়ল। গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে ছেড়ে দিলে সেটিও কি শূন্যে ভাসতে থাকবে? না—কি নিচে পড়ে যাবে? অতি সহজেই এই পরীক্ষা করা যায়। তিনি গায়ের পাঞ্জাবী খুলে ফেললেন। ছেড়ে দিতেই দ্রুত তা নিচে নেমে গেল। তার মানে এই অসুস্থ ব্যাপাটির সঙ্গে শুধুমাত্র তিনিই জড়িত। তাঁর গায়ের পোশাকের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। তিনি চোখ বজ্জ করে চিন্তা করছেন মাধ্যাকর্ষণ কল যদি হয় F তাহলে

$$F = \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

m_1 পৃথিবীর ভর। m_2 তাঁর নিজের ভর। r হচ্ছে তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব। m_2 যদি '0' হয়, F হবে শূন্য। কিন্তব্য F যদি হয় অসীম তাহলেও F হবে '0'. কোন বিচিত্র কারণে কি তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব অসীম হয়ে যাচ্ছে? ভাবতে ভাবতে অমর বাবুর ঘূম পেয়ে গেল। এক সময় মাতি থেকে ছফ্ট উচ্চতে সত্ত্ব সত্ত্ব ঘূমিয়ে পড়লেন। গভীর ঘূম। তাঁর নাকও ডাকতে লাগল। ঘূমের মধ্যেই তিনি পাশ ফিরে শুলেন। কোন রকম অসুবিধা হল না।

ঘূম ভাঙলো ভোরবেলা।

অনেক ক্লো হয়েছে। ঘরে রোদ তুকেছে। তিনি পড়ে আছেন মেঝেতে। কখনু ঘাটাটে নেমে এসেছেন তিনি জানেন না। গায়ে কোন ব্যথা বোধ নেই কাজেই ধপ কার্য পড়েন নি — আস্তে আস্তে নেমে এসেছেন।

অমর বাবু স্বাভাবিক মানুষের মত হাত-মুখ ধূলেন। মুড়ি শুভ্র দিয়ে সকালের নাশতা সাবলেন। পুরুর থেকে গোসল শেষ করে মথাসময়ে স্কুলে গেলেন। আজ প্রথম পিরিয়ডেই তাঁর ঢ্রাস। তিনি ঢ্রাস না নিয়ে নিজের চেঞ্চারে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন। মনে হল ঘূমুচ্ছেন। আসলে ঘূমুচ্ছিলেন না, ভাবার চেষ্টা করছিলেন — তাঁর জীবনে এসব কি ঘটেছে?

ব্যাপারটা শুধু রাতেই ঘটেছে। দিনে ঘটেন না। আজ্ঞা তিনি যদি তাঁর নিজের ঘরে না ঘূমিয়ে অন্য কোথাও থাকেন তাহলেও কি এই ব্যাপার ঘটবে? রাতে খোলা মাঠে যদি ঘূমিয়ে

থাকলে তাহলে কি ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যে চলে যাবেন? মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি বা সূর্যের কাছাকাছি? কিংবা আরো দূরে — এশ্বোমিড়া নক্ষত্রপুঞ্জ... সুদূর কেন ঘোষণে...?

‘স্যার!'

অমর বাবু চমকে তাকালেন। দশুরী কালিপদ দাঁড়িয়ে আছে।

‘হেড স্যার আপনারে বুলায়।'

হেড স্যার তাঁকে কেন ডেকে পাঠালেন তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। ইদরিস সাহেব কি হেড স্যারকে কিছু বলেছেন? বলতেও পারেন। পেট পাতলা মানুষ — বলাটাই স্বাভাবিক। আজ্ঞ ব্যাপারটা কি তিনি নিজে গুছিয়ে হেড স্যারকে বলবেন? কলা ঘেতে পারে। মানুষটা ভাল। শুরুতেই অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন না।

হেড স্যার বললেন, কেমন আছেন অমর বাবু?

‘জি ভাল।'

‘দেখে তো ভাল মনে হচ্ছে না। বসুন। চা খাবেন?’

‘চা তো স্যার আমি খাই না।'

‘এক-আধাৱ খেলে কিছু হয় না। খান। কালিপদকে চা দিতে বলেছি।'

কালিপদ চা দিয়ে থার্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা দিতে গেল। হেড স্যার বললেন, শুনলাম গতকাল ক্লাস নেননি। আজও ফার্স্ট পিরিয়ড মিস গেছে।

‘ঘূম ভাঙতে দেরি হয়েছে স্যার।'

‘ও আজ্ঞ। আপনার তো সব ঘড়ি-ধ্রা। ঘূম ভাঙতে দেরি হল কেন?’

অমর বাবু চুপ করে রইলেন।

‘পারিবারিক কোন সমস্যা যাচ্ছে না-কি?’

‘জি-না।'

‘আপনার যেয়ে গতকাল আমার কাছে এসেছিল। খুব কামাকাটি করল। আপনি বাড়িতে থাকেন না। এই নিয়ে বেচারীর মনে খুব দুঃখ। দুঃখ হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

‘আমি একা থাকতেই পছন্দ করি।'

‘নিজের পছন্দকে সব সময় খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নেই। অন্যদের কথা ও ভাবতে হয়। আমরা সামাজিক জীব...’

‘স্যার উঠি?’

‘বসুন খানিকক্ষণ। গল্প করি — অমর বাবু আমি বলি কি যদি অস্মীয়া শী থাকে তা হলে, আপনার সমস্যাটা আমাকে বলুন। ইদরিস সাহেব স্বপ্নের কথা কি সব বলছিলেন —’

অমর বাবু ইতস্তত করে বললেন, বিজ্ঞানের সূত্র মিলছে না স্মাৰক হেডমাস্টার সাহেব বিশ্বিত হয়ে বললেন, কোন সূত্র মিলছে না?

‘স্যার আইজাক নিউটনের সূত্র — মাধ্যাকর্ষণ সূত্র।'

‘আপনার ধারণা সূত্রটা ভুল?’

অমর বাবু জবাব দিলেন না। হেডমাস্টার সাম্প্রতি বিশ্বিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। এক সময় বললেন, আজ্ঞ আপনি বৱে বাড়িতে জো যান। আপনাকে দশ দিনের ছুটি দিয়ে

দিলাম। বিশ্রাম করুন। বিশ্রাম দরকার। অভিবিষ্ট পরিশ্রমে যাবে যাবে মানুষের মাথা এলোমেলো হয়ে যায়।

‘স্যার, আমার মাথা ঠিকই আছে।’

‘অবশ্যই ঠিক আছে। কথার কথা কলাম। যান, বাসায় চলে যান . . . বাড়ির সবাই অঙ্গীর হয়ে আছে।’

অমর বাবু বাড়ি গেলেন না। কফন করে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। হাতে একটা ফুল স্ক্যাপ কাগজ। সেই কাগজে নিউটনের সূত্র নতুনভাবে লিখলেন —

$$F = k \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

এখানে k -এর মান ১ তবে মাঝে মাঝে k · এর মান হচ্ছে শূন্য। যেমন তাঁর ক্ষেত্রে হচ্ছে। এক সময় কলম দিয়ে নির্মাণভাবে সব কেটেও ফেললেন। নিউটন ষে সূত্র দিয়ে গেছেন — তাঁর মত সামান্য মানুষ সেই সূত্র পাস্টাতে পারেন না।

অমর বাবু টিফিন পিরিয়ডে অনেক সময় নিয়ে ইংরেজীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যানকে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির বাংলা অনুবাদ অনেকটা এই রকম—

জনাব,

আমি কৃপেশ্বর হাইস্কুলের বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক। নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া আপনাকে পত্র দিতেছি। সম্পত্তি আমার জীবনে এমন এক ঘটনা ঘটিতেছে যাহার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি খুঁজিয়া না পাইয়া আপনার দ্বারা স্থূলভাবে হইলাম। আমি শূন্যে ভাসিতে পারি। আপনার নিকট শূব্ধ অঙ্গুত মনে হইলেও ইহা সত্য। আমি স্কুলের নামে শপথ নিয়া বলিতেছি — আপনাকে যাহা বলিলাম সবই সত্য। কোন রকম চেষ্টা ছাড়াই আমি শূন্যে উঠিতে পারি এবং ভাসমান অবস্থায় দীর্ঘ সময় কঢ়িতে পারি। জনাব, বিষয়টি কি বুঝিবার ব্যাপারে আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তাহা হইলে এই অধিম আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। আপনি বলিলেই ঢাকায় আসিয়া আমি আপনাকে শূন্যে ভাসমান ব্যাপারটি চাকুৰ দেখাইব। জনাব, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।

বিনীত

অমর দাস পাল

B.Sc. (Hon's)

দশ দিনের পুরোটাই তিনি নিজের ঘরে বাসিলেন — বাড়িতে গেলেন না। তাকে নিতে তাঁর ছেটি ঘেয়ে অতসী এসেছিল। তাকে কখনে বিদেয় করলেন। এই ঘেয়েটা পড়াশোনায় ভাল ছিল — তাকে এত করে বললেন সামেল্প পড়তে, সে ভর্তি হল আর্টস-এ। কোন যানে

হয়? তাকে নিউটনের শাস্যাকর্ষণ শক্তির সূত্র কি জিঞ্জেস করলে সে হ্য করে তাকিয়ে থাকবে। কি দুঃখের কথা।

অতসীকে ধমকে ঘর থেকে বের করে দিলেও সে গেল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তিনি বাইরে এসে বিরস্ত গলায় বললেন, কাঁদছিস কেন?

সে ফুপাতে ফুপাতে বলল, তোমার শরীর খারাপ বাবা। তুমি বাড়িতে চল।

‘শরীর খারাপ তোকে কে বলল?’

‘সবাই বলাবলি করছে। তুমি না-কি কি সব স্বপ্ন-টপ্প দেখ?’

‘কোন স্বপ্ন দেখি না। আমি ভাল আছি। নির্জনে একটা পরীক্ষা করছি। পরীক্ষা শেষ হোক — তোদের সঙ্গে এসে করেকদিন থাকব।’

‘কিসের পরীক্ষা?’

‘কিসের পরীক্ষা বললে তো তুই বুঝবি না। হ্য করে তাকিয়ে থাকবি। এত করে বললাম সাম্মেল পড়তে।’

‘অংক পারি না যে।’

‘অংক না পারার কি আছে? যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ — অংকে তো এর বাইরে না। কাঁদিস না। বাসায় যা। আমি ভাল আছি।’

তিনি যে ভাল আছেন তা কিন্তু না।

রোজ রাতে একই ব্যাপার ঘটছে। খেয়ে-দেয়ে ঘুমুতে যান — মাঝ রাতে সুয ভেঙে দেখেন শূন্যে ভাসছেন। তখন আতঙ্কে অস্তির হওয়া ছাড়া পথ থাকে না। তিনি ইচ্ছে করলেই নিচে নামতে পারেন না।

নিচে কিভাবে নামেন তাও জানেন না। রাতটা তাঁর অঘুমেই কাটে। তিনি ঘুমুতে যান দিনে। এমন যদি হত তিনি দিনরাত সারাক্ষণই শূন্যে ভাসছেন তাহলেও একটা কথা ছিল। নিজেকে সাম্ভনা দিতে পারতেন যে, কোন-এক অস্তুত প্রক্রিয়ায় তাঁর তর শৃণ্য হয়ে গেছে। ব্যাপারটা সে রকম না। এমন কেউ এখানে নেই যে তিনি সাহায্যের জন্যে তাঁর কাছে যাবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যান সাহেবও কিছু লিখছেন না। হয়ত ভেবেছেন পাগলের চিঠি। কে আর কষ্ট করে পাগলের চিঠির জবাব দেয়?

ন' দিনের মাঝায় অমর বায়ু চিঠির জবাব পেলেন। অতি ভদ্র চিঠি। চেয়ারম্যান সাহেবের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাডে লিখেছেন —

জ্ঞানাব,

আপনার চিঠি কৌতুহল নিষে পড়লাম। আপনি বিজ্ঞানের শিক্ষক। কাজেই বুঝতে পারছেন আপনি যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন তা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। আপনি যদি আমার অফিসে এসে শূন্যে ভাস্তু থাকেন তাহলেও আমি বিশ্বাস করব না। ভাবব এর পেছনে ম্যাজিকের কোন ফৌল কাজ করছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যাদুকররা শূন্যে ভাস্তু খেলা সব সময়ই দেখায়।

যাই হোক, আপনার চিঠি পড়ে আমার মনে হয়েছে যে আপনার সমস্যাটি মানসিক। আপনি মনে মনে ভাবছেন — শূন্যে অসছেন। আসলে ভাসছেন না। সবচে ভাল হয় যদি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা

কবেন। একমাত্র তিনিই আপনাকে সহায় করতে পারেন, আর্থি আপনাকে কোন বক্ষ সাহায্য করতে পারছি না বলে আন্তরিক ভাবে দৃঢ়ুচিত। আপনার সুস্থান কর্মনা করে শেষ করছি।

বিনীত
এস.আলি
M.Sc.,Ph.D., F.R.S.

অমর বাবু যন্নোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাবার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দিলেন না। কাবপ তিনি জ্ঞানেন বিষয়টা সত্যি। তিনি দু'একটা ছোটখাট পরীক্ষা করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যেমন স্কুল থেকে লাল রঞ্জের চক নিয়ে এসেছিলেন। শূন্যে উঠে যাবার পর সেই লাল রঞ্জের চক দিয়ে ছাদে বড় বড় করে লিখলেন,

হে পরম পিতা সৈশ্বর, তুমি আমাকে দয়া কর।

তোমার অপার বহস্যের খানিকটা আমাকে দেখতে দাও।

আমি অঙ্ক, তুমি আমাকে পথ দেখাও। জ্ঞানের আলো আমার হৃদয়ে প্রভৃতি কর। পথ দেখাও পরম পিতা।

আরো অনেক কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল, চক ফুরিয়ে যাওয়ায় লেখা হল না। এই লেখাটা ছাদে আছে। তিনি তাকলৈই দেখতে পান। এমন যদি হত লেখাটা তিনি একা দেখতে পাচ্ছেন তাহলেও বোঝা যেত সমস্যটা মনে। কিন্তু তা তো না। অন্যরাও লেখা পড়তে পারছে। গতকাল বিকেলে হেড মাস্টার সাহেব তাঁকে দেখতে এসে হঠাতে করেই বিস্মিত গলায় বললেন, ছাদে এই সব কি লেখা?

‘অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, প্রার্থনা সংগীত।

‘প্রার্থনা সংগীত ছাদে লিখলেন কেন?’

‘শুয়ে শুয়ে যাতে পড়তে পারি এই জন্যে।’

‘লিখলেন কিভাবে? মই দিয়ে উঠেছিলেন না—কি?’

অমর বাবু জবাব দিলেন না। হেড মাস্টার সাহেব জবাবের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, আপনার ছুটি তো শেষ হয়ে গেল, আপনি কি ছুটি আরো বাড়াতে চান? ‘জি—না।’

‘আপনি বরং আরো কিছুদিন ছুটি নিন। শরীরটা এখনো সেরেছে বলে মনে হয় না। আপনাকে খুব দুর্বল লাগছে।’

‘আমার শরীর যা আছে তাই থাকবে স্যার। আর ভাল হবে না।’

‘এইসব কি ধরনের কথা? কোন ডাঙ্কারকে কি দেখিয়েছেন?’

‘জি—না।’

‘ডাঙ্কার দেখাতে হবে। ডাঙ্কার না দেখালে কিভাবে হয়ে? বিধু বাবুকে দেখান। বিধু বাবু এল.এম.এফ. হলেও ভাল ডাঙ্কার। যে কোন বড় ডাঙ্কারীর কান কেটে নিতে পারে। বিধু বাবুকে দেখানোর কথা মনে থাকবে?’

‘জি স্যার, থাকবে।’

‘না আপনার মনে থাকবে না। আমি বরং নিয়ে আসব। আমার ছেটি ঘেয়েটার স্তুর। বিশু বাবুকে বাসায় আসতে বলেছি। এলে, আপনার কাছে পঠিয়ে দেব।’

‘জি — আচ্ছা।’

‘এখন তাহলে উঠিঃ অমর বাবু?’

‘একটু বসুন স্যার।’

হেড মাস্টার সাহেব উঠতে গিয়েও বসে পড়লেন। তিনি খানিকটা বিস্তৃত, কারণ অমর বাবু এক দৃষ্টিতে ছাদের লেখাগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে অসম্ভব চিন্তিত মনে হচ্ছে। অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, আপনাকে একটা কথা বলতে চাইছি স্যার — যদি কিছু মনে না করেন।

‘বলুন কি বলবেন। মনে করাকৰিব কি আছে?’

অমর বাবু প্রায় ফিসফিস করে বললেন, আমি শূন্যে ভাসতে পারি।

‘বুঝতে পারলাম না কি বলছেন।’

‘আমি আপনা—আপনি শূন্যে উঠে যেতে পারি।’

‘ও আচ্ছা।’

হেড মাস্টার সাহেব “ও আচ্ছা” এমন ভঙ্গিতে বললেন যেন শূন্যে ভেসে থাকবার ব্যাপারটা বোজ্জই ঘটছে। তবে তার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি খুব চিন্তিত বোধ করছেন।

‘ছাদের লেখাগুলি শূন্যে ভাসতে লেখা।’

‘ও আচ্ছা।’

‘আপনার কি আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?’

হেড মাস্টার সাহেব জবাব দিলেন না। অমর বাবু বললেন, আমি স্যার এই জীবনে কখনো যিষ্যো কথা বলিনি। ছেলেবেলায় হয়ত বলেছি, জ্ঞান হবার পর থেকে বলিনি।

‘আমি বিশু বাবুকে পাঠিয়ে দেব।’

‘জি আচ্ছা।’

হেড মাস্টার সাহেব ইতস্তত করে বললেন, উনাকে শূন্যে ভাসাব ব্যাপারটা বলার দরকার নেই। জ্ঞানাঞ্জানি হবে — ইয়ে মানে — লোকজন হাসাহাসি করতে পারে।

‘আমি আপনাকেই খোলাখুলি বলেছি। আর কাউকে বলিনি।’

‘ভাল করেছেন। খুব ভাল করেছেন।’

বিশু বাবু এসে খানিকক্ষণ গল্পটুল করে যাবার সময় ঘুমের অমুখ দিয়ে গেলেন। বললেন, দুঃস্বপ্ন না দেখার একটাই পথ। গভীর নিম্ন। নিম্ন পাতলা হজেই মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। আমি ফোনোবাববিটন ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছি। শোবার আগে দুটি করে ধাবেন।

অমরবাবু দুটো ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমতে গেলেন। তবে ঘুমতে যবাব আগে এক কাণ করলেন — কালিপদকে বললেন, লম্বা একগাছি দড়ি নিয়ে তাঁকে খুব ভাল করে চৌকির সঙ্গে বেঁধে রাখতে।

কালিপদ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

BanglaBook.org

অমর বাবু বিবৃত মুখে বললেন, আমার খাথা খারাপ হয়নি, খাথা ঠিক আছে। তোমকে যা করতে বলেছি কর। ব্যাপারটা কি পবে শুধিয়ে বলব। লস্বা দেখে একগাছি দড়ি আন। শক্ত কবে আমাকে চৌকির সঙ্গে বাধ।

কালিপদ তাই করল। তবে করল খুব অনিষ্টার সঙ্গে।

অমর বাবু ঘূমিয়ে পড়লেন। ঘূমের ট্যাবলেটের কারণে তাঁর গাঢ় মিস্ত্রা হল। ঘূম ভাষ্টল বেলা উঠার পর। তিনি দেখলেন — এখনো চৌকির সঙ্গে বাঁধা আছেন তবে চৌকি আগের জ্যায়গায় নেই, ঘরের মাঝামাঝি চলে এসেছে। তার একটিই মানে — চৌকি নিয়েই তিনি শূন্যে ভোসেছেন। নামার সময় চৌকি আগের জ্যায়গায় নামেনি। স্থান পরিবর্তন হয়েছে।

তিনি সেদিনই বিছানাপত্র নিয়ে বাড়িতে চলে এলেন। অতসী তাঁকে দেখে কেন্দে ফেলল। তিনি বিবৃত গলায় বললেন, নাকে কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?

অতসী কাঁদতে কাঁদতেই বলল, তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে কেন বাবা? কি ভয়ংকর রোগা হয়ে গেছো।

‘ভাল ঘূম হচ্ছে না, এই জন্যে শরীর খারাপ হয়েছে, এতে নাকে কাদার কি হল?’

‘সবাই বলাবলি করছে তোমার না—কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কালিপদ নাকি রোজ রাতে দড়ি দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখে?’

‘কি যত্নণা! একবারই বাঁধতে বলেছিলাম — এর মধ্যে এই গল্প ছড়িয়ে গেছে?’

‘তোমার কি হয়েছে বাবা বল?’

‘কিছু হয়নি।’

অমর বাবু ছদ্মন বাড়িতে থাকলেন। এই ছদ্মনে একটি শুক্রতৃপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করলেন। শূন্যে ভাসার ব্যাপারটা তিনি একা একা থাকার সময়ই ঘটে। অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে ঘুমুলে ঘটে না। যে ক্ষয়াত তাঁর সঙ্গে ঘূমিয়েছেন সে ক্ষয়াত তিনি শূন্যে ভাসেননি। দুর্বাত ছিলেন একা একা, দুর্বাতেই শূন্যে উঠে গেছেন।

পূজ্জার ছুটির পর স্কুল নিয়মিত শুরু হল। তিনি স্কুলে গেলেন না। লস্বা ছুটির দরখাস্ত করলেন। আবার বাড়ি ছেড়ে বাস করতে শুরু করলেন স্কুলের ঘরে। দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকতে তাঁর ভাল লাগে না।

শূন্যে ভাসার ব্যাপারটা রোজ ঘটতে লাগল। আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘটতে নাইল। এখন বিছানায় শোয়ামাত্র শূন্যে উঠে যান। সারারাত সেখানেই কাটে। শেষ রাতেও নাকে নিচে নেমে আসেন। ব্যাপারটা ঘটে শুধু রাতে, দিনে ঘটে না। কখনো নাথ এবং অন্য কোন ব্যক্তির সামনেও ঘটে না।

হেড স্যাব এবং ইদরিস স্যাব পর পর দুর্বাত অমর বাবুর ঘরে জেগে বসে ছিলেন। দেখার জন্যে ব্যাপারটা কি। তাঁরা মুহূর্তের জন্যেও চোখের পাত্র গুরুত্ব করেননি। লাভ হয়নি, কিছুই দেখেননি। হেড স্যাব বললেন, ব্যাপারটা পূরোপূরি মামলাকে।

অমর বাবু দৃঢ়ুক্তি গলায় বললেন, আপনার কি খবর আমি পাগল হয়ে গেছি?

‘না, তা না। পাগল হবেন কেন? তবু আমর শত্রু ব্যাপারটা আপনার মনে ঘটছে। একবার ঢাকায় চলুন না, একজন মনোরোগ বিষয়সম্বন্ধের সঙ্গে কথা বলি।’

‘না।’

‘ক্ষতি তো কিছু নেই। চলুন না।’

‘আমি যেতে চাইছি না স্বার, কাকশ। আমি দ্বন্দ্ব ব্যাপারটা সত্তি। সত্তি না হলে ছাদে এই লেখাগুলি অঙ্গ কিভাবে লিখলাম? দেখছেন তো হবে কোন মই নেই।’

হেড স্যার চূপ করে বইলেন। অমর বাবু বললেন, আপনারা ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, আমি আবার শূন্যে উঠে ছাদে একটা লেখা লিখব।

হেড স্যার বললেন, তার দরকার নেই কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি আমদেব সামনে ব্যাপারটা পারছেন না কেন?

‘আমি জানি না। জানলে বলতাম। জানাব চেষ্টা করছি, দিন-রাত এটা নিয়েই ভাবছি।’

‘এত ভাবাভাবির দরকার নেই, আপনি আমার সঙ্গে ঢাকা চলুন। দুদিনের ব্যাপার: যাব, ডাক্তার দেখাব, চলে আসব। আমার একটা অনুরোধ রাখুন। পীজ। আপনার হয়ত লাভ হবে না কিন্তু ক্ষতি তো কিছু হবে না।’

অমর বাবু ঢাকায় গেলেন।

একজন অতি বিখ্যাত মনোবোগ বিশেষজ্ঞ দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে নানান প্রশ্ন করলেন। পৰপৰ কয়েকদিন তাঁব কাছে যেতে হল। শেষ দিমে বিশেষজ্ঞ উদ্বলোক বললেন,

‘আপনার যা হয়েছে তা একটা রোগ। এর উৎপত্তি হচ্ছে অবসেসন। বিজ্ঞানের প্রতি আপনার তীব্র অনুরাগ। সেই অনুরাগ রূপান্তরিত হয়েছে অবসেসনে। কেউ যখন বিজ্ঞানকে অবহেলা করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে তখন আপনি তীব্র আঘাত পান। এই আঘাত আপনি পেয়েছেন আপনার অতি নিকটজনের কাছ থেকে। যেমন ধৰুন আপনার কন্যা। সে বিজ্ঞান পড়েনি। আর্টস পড়ছে। এই তীব্র আঘাত আপনার মন গ্রহণ করতে পাবেন। আপনার অবচেতন মন ভাবতে শুক করেছে — বিজ্ঞানের সূত্র অভাস নয়। ভুল সূত্রও আছে। মাধ্যাকর্ষণ সূত্রও ভুল। এক সময় অবচেতন মনের ধারণা সঞ্চারিত হয়েছে চেতন মনে। বুঝতে পাবছেন?’

‘জ্ঞি না, বুঝতে পাবছি না।’

‘মোদ্দা কথা হল, আপনার রোগটা মনে।’

‘না — আমি নিজে বিজ্ঞানের শিক্ষক। আমি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিচাব-বিবেচনা করোচি। আমি যে শূন্যে উঠতে পাবি এটা ভুল না। পরীক্ষিত সত্য।’

‘মোটেও পরীক্ষিত সত্য নয়। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি দেখেন যে আপনি শূন্যে ভাসছেন। দেখলেও কথা ছিল, কেউ কি দেখেছে?’

‘জ্ঞি-না।’

‘আমি ট্রাংকুলাইজার জ্ঞাতীয় কিছু অমুখ দিচ্ছি। নিয়মিত আবেন, ব্যায়াম করবেন। মন প্রফুল্ল রাখবেন। বিজ্ঞান নিয়ে কোন পড়াশোনা করবেন না।’

অমর বাবু দৃঢ়ঘৃত গলায় বললেন, ‘আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি কিন্তু আমি যা বলছি সত্য বলছি —।’

‘ব্যাপারটা হয়ত আপনার কাছে সত্তি। কিন্তু পর্বার কাছে নয়। আপনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করলেও এই সিদ্ধান্তে আসবেন।’

অমর বাবু স্মৃতিদেয়ে রূপেশ্বরে ফিরে এলেন। স্কুল যোগ দিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই যাথা খাবাপের সব লক্ষণ স্টাঁ ব মধ্যে একে একে দেখ দিতে লাগল বিড়বিড় করে কহ বলেন, একা একা হাঁটেন। হাঁটার সময় দৃষ্টি থাকে আকাশের দিকে নিতস্ত অপবিচ্ছিন্ন কাউকে দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে যন, শস্ত গলায় বলেন, কিছু মনে করবেন না। আপনি কি নিউটনের গতিসূত্র জানেন?

পাগলের অনেক বকম চিকিৎসা করানো হল। কোন লাভ হল না। বরং লক্ষণগুলি আরো প্রকট হওয়া শুরু করল। গভীর রাতে ছাত্রদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে উচু গলায় ডাকেন — জৰুৱাৰ, ও জৰুৱাৰ, উঠে আয় তো ববা। খুব দুরকার।

জৰুৱাৰ উঠে এলে তিনি কুরণ গলায় বলেন, নিউটনের সূত্র মনে আছে? ভাল করে পড়। এস.এস.ডি তে আসবে। সাথে অংক থাকবে — “ভূমি থেকে দশ ফুট উচ্চতায় ১ গ্রাম ভৱ বিশিষ্ট একটি আপেল ছাড়িয়া দিলে তাৰ গতিবেগ পাঁচ ফুট উচ্চতায় কত হইবে? অংকটা চট কৰে কৰ। মাধ্যাকৰ্ষণজনিত ভৱণ কত মনে আছে তো?”

আমাদের সমাজ পাগলদের প্রতি খুব নিষ্পূর্ব আচরণ কৰে। অমর বাবুৰ ক্ষেত্ৰেও তাৰ ব্যতিক্রম হল না। বছৰ খানিক না ঘূৰতেই দেখা গেল ছোট ছেলেমেয়েৱা তাকে দেখে বলছে — “নিউটনের সূত্রটা কি ষেন?” অমর বাবু দাঁত-মুখ পিচিয়ে এদেৱ তাড়া কৰছেন। তাৰা মজা পেয়ে খুব হাসছে। কাৰপ তাৰা জানে পাগলৰা শিশুদেৱ তাড়া কৰে ঠিকই — কখনো আক্ৰমণ কৰে না।

পৌষ্টিৰ শুক। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। এই শীতেও খালি গয়ে শুধুমাত্ৰ একটা ধূতি কোমৰে পেঁচিয়ে অমর বাবু রাস্তায় রাস্তায় হাঁটেন। নিউটনের সূত্র মনে আছে কিনা এই প্ৰশ্ন তিনি এখন আৱ কোন মানুষকে কৰেন না। পশু-পাখি, কৌট-পতঙ্গদেৱ কৰেন। তাৰা প্ৰশ্ৰেৱ উন্নৰ সঙ্গত কাৰণেই দেয় না। তিনি তখন ক্ষেপে যান।

ৱাত দশটাৰ মত বাজে। কনকনে শীত।

অমর বাবু দাঁড়িয়ে আছেন একটা কাঁঠাল গাছেৰ নিচে। কাঁঠাল গাছেৰ ডালে কঁঠকাটা বাদুৰ ঝুলছে। তিনি বাদুৰগুলিকে নিউটনের সূত্র সম্পর্ক বলছেন। তখনই দেখা (শৈল) হারিকেন হাতে হেড স্যার আসছেন। কাঁঠাল গাছেৰ কাছে এসে তিনি থমকে দুড়ালেন। অমর বাবুৰ দিকে তাকিয়ে দুঃখিত গলায় বললেন, কে অমর?

‘জি স্যার।’

‘কি কৰছেন?’

‘বাদুৰগুলিৰ সঙ্গে কথা বলছিলাম স্যার।’

‘ও আছা।’

‘এদেৱ সঙ্গে কথা বললে মনটা হালকা হয়। ওদেৱ নিউটনেৰ সূত্রগুলি বুঝিয়ে দিছিলাম।’

‘এই শীতে রহিবে ঘূৰছেন। বাসায় গিয়ে থাকো।’

‘ঘূম আসে না স্যাব !’

হেড মাস্টার সাহেব ইতস্তত করে বললেন, ইয়ে অমর বাবু, এখনো কি আপনি শূন্য ভঙ্গেন ?

‘জি—না । ঢাকা থেকে আসার প’র আর ভাসিনি। যদি আবার কখনো ভাসতে পারি — আপনাকে কল্ব। অমাব এখনে খাকতে ইচ্ছে করে না। ভাসতে ভাসতে দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে ।’

‘দূরে কোথায় ?’

‘মহাশূন্যে — অসীম দূরত্বে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ মন্ত্র সব ছাড়িয়ে . . . ’

‘ও আছো ।’

‘যাবাব আগে আমি আপনাকে খবর দিয়ে যাব ।’

‘আছো ।’

শীত কেটে গিয়ে বর্ষা এসে গেল। অমর বাবু লোকালয় প্রায় ত্যাগ করলেন। বেশির ভাগ সময় বনে-জঙ্গলে থাকেন। কলেশুরের পাশের গ্রাম হলদিয়ায় ঘন বন আছে। এখন এই বনেই তাঁর আনন্দান। তাঁব যেয়ে অতসী প্রায়ই তাঁকে খুঁজতে আসে। পায় না। যেরেটা বনে বনে ঘূরে এবং কাঁদে। তিনি চার-পাঁচদিন পর পর একবার বের হয়ে আসেন। তাঁকে দেখে আগের অমর বাবু বলে চেনার কোন উপায় নেই। যেন মানুষ না — প্রেত বিশেষ। মাথাভর্তি বিরাট চূল, বড় বড় দাঢ়ি। হাতের নখগুলি বড় হতে হতে পাখির ঠোটের মত বেঁকে গেছে। স্বভাব-চরিত্র হয়েছে ভয়ংকর। মানুষ দেখলে কামড়াতে আসেন। হঠাৎ-পাথর ছুঁড়েন। একবার স্থানীয় পোশ্ট মাস্টারকে গলা টিপে প্রায় মেরে ফেলতে বসেছিলেন। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। অতসীর বিয়ে হয়ে গেছে, সেও এখন আবার খোঁজে আসে না।

দেখতে দেখতে এক বছব পার হয়ে গেল। কার্তিক মাস। অক্ষপ অক্ষপ শীত পড়ছে। এগারোটার মত বাজে। হেড স্যার খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছেন, হঠাৎ শুনলেন উঠান থেকে অমর বাবু ডাকছেন — স্যার, স্যার — স্যার জেগে আছেন ?

‘কে ?’

‘স্যার আমি অমর। একটু বাইরে আসবেন ?’

হেড স্যার অবাক হয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, খবর্দার, ভুক্তি বেরুতে পারবে না। পাগল মানুষ — কি না কি করে বসে। ঘুমাও।

অমর বাবু আবার কাতর গলায় বললেন, একটু বাইরে আসুন স্যার — খুব দরকার। খুব বেশি দরকার।

হেড স্যার ভয়ে ভয়ে বাইরে এলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন তাঁর বাড়ির সামনের আমগাছের সমান উচ্চতায় অমর বাবু ভাসছেন। অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় দৃশ্য। একটা মানুষ অবলীলায় শূন্যে ভাসছে। তার জন্যে পাখিদের মত তাঁকে আবা ঝাপ্টাতে হচ্ছে না।

‘স্যাব দেখুন আমি ভাসছি !’

হেড স্যার জ্বাব দিতে পারছেন না। প্রথম কয়েক মুহূর্ত মনে হচ্ছিল চোখের ভুল। এখন তা মনে হচ্ছে না। ফকফকা চাদের আলো। সিনের আলোর মত সব দেখা যাচ্ছে। তিনি

পরিষ্কার দেখছেন — অমর বাবু শূন্যে ভাসছেন। এই তো ভাসতে খানিকটা এগিয়ে এলেন। সীতার কাটার মত অবস্থায় মানুষটা শুয়ে আছে। কি অশ্রয়!

‘স্যার দেখতে পাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আজ হঠাতে করে শূন্যে উঠে গেলাম। বন থেকে বের হয়ে ঝাপেশুরের দিকে আসছি হঠাতে শরীরটা হালকা হয়ে গেল। দেখতে দেখতে দশ-বারে ফুট উঠে গেলাম। প্রথমেই ভাবলাম আপনাকে দেখিয়ে আসি। ভাসতে ভাসতে আসলাম।’

‘আব কেউ দেখেনি?’

‘না। কয়েকটা কুকুর দেখেছে। ওরা ভয় পেয়ে শুব চিংকার করছিল। এরকম দেখে তো অভ্যাস নেই। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে স্যার?’

‘হ্যাঁ, হচ্ছে।’

‘আমি ঠিক করেছি — ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যে ঘিলিয়ে যাব।’

‘ও আচ্ছা।’

‘আমার মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল সারাক্ষণ ব্যথা করত। এখন ব্যথাও নেই। আগে কাউকে চিনতে পারতাম না। এখন পারছি।’

‘শুনে ভাল লাগছে অমর বাবু।’

‘অন্য একটা কারপেও মনে শুব শান্তি পাচ্ছি। কাবণ্টা বলি — মহাশূন্যে ভাসার রহস্যটাও ধরতে পেরেছি।’

হেড মাস্টার সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, রহস্যটা কি?

‘রহস্যটা শুব সাধারণ। এতদিন কেন ধরতে পারিনি কে জানে। তবে স্যার আপনাকে রহস্যটা বলব না। বললে আপনি শিখে যাবেন। তখন দেখা যাবে সবাই শূন্যে ভাসছে। এটা ঠিক না। প্রকৃতি তা চায় না। স্যার যাই?’

অমর বাবু উপরে উঠতে লাগলেন। অনেক অনেক উচুতে। এক সময় তাঁকে কালো বিন্দুর মত দেখাতে লাগল।

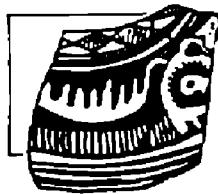
হেড স্যারের স্ত্রী হারিকেন হাতে বারান্দায় এসে ভৌত গলায় বললেন, কি বাপুর? পাগলটা কোথায়?

‘চলে গেছে।’

‘তুমি বাইরে কেন? ভেতরে এসে ঘূঘাও।’

তিনি ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন।

অমর বাবুকে এর পর আব কেউ এই অঞ্চলে দেখেনি। হেড স্যার সেই বাত্তির কথা কাউকেই বলেননি। কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করবে না। সবাই পাগল ভাববে। আব একবার পাগল ভাবতে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত পাগল হতেই হয়। এটু তো তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন।



মন্ত্রীর হেলিকপ্টার

মন্ত্রী হবার পর তিনি (আশুল কাদের জোয়ারদার) এই প্রথমবার গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। বেড়াতে যাওয়া নয় — সরকারী সফর। গ্রামের উন্নয়ন দেখবেন, স্কুলের মাঠে একটা বক্তৃতা দেবেন, মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। অনেক প্রোগ্রাম।

নিজ গ্রামে যাবার ব্যাপারটিতে বড় রকমের জাঁকজমক করার তাঁর খুব ইচ্ছা। কিন্তু এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হবে কি-না বোঝা যাচ্ছে না। হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা এখনো হয়নি। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী (সোলায়মান) এখনো চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু জোয়ারদাব সাহেব খুব-একটা ভরসা করতে পারছেন না। সোলায়মান ছেলেটি ভ্যাবদা ধরনের। আগের সিএসপি-দের সেই ধারালো ভাবের কিছুই তার মধ্যে নেই। আজেবাজে সব ছেলেপুলে এখন সিভিল সার্ভিসে চলে আসছে। চেহারা দেখলে মনে হয় প্রাইভেট টিউশ্যানি করে জীবন চালায়।

একটা হেলিকপ্টারের খুবই দরকার। প্রথমবার যাচ্ছেন। সেই মাওয়াটার মধ্যে কিছু নাটকীয়তা থাকবে না? বিকট শব্দ হবে হেলিকপ্টারের — অঞ্চল ভেঙে লোকজন আসবে, তবেই না ব্যাপারটা জরুবে।

তিনি গন্তীর ভঙিতে হেলিকপ্টার থেকে নামবেন। পুলিশের একটা দল তাঁকে গার্ড অব অনার দেবে। এইসব জিনিস গণগ্রামের লোকজন আগে দেখেনি। মুশ্ফ হয়ে দেখবে। পুলিশ কঞ্জন আসবে কে জানে? সোনাদিয়ায় পুলিশ স্টেশন নেই। তবু জনাদশেক নিষয়ই থাকবে। আজকালকার পুলিশগুলি ল্যাদল্যাদা। বিনা ইস্ত্রীর পোশাকেই নিষয়ই চলে আসবে। অথচ গার্ড অব অনারের অনুস্থানটিতে দরকার কিছু স্মার্ট পুলিশ। দেশ থেকে স্মার্টনেস উঠেই গিয়েছে।

জোয়ারদাব সাহেব বিরক্ত মুখে বেল টিপে পি.এস.কে আসতে বললেন। পি.এস.কে দেখে তাঁর বিরক্তি আরো বেড়ে গেল। সে আজ এসেছে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে। এটা কি কৰি সম্মেলন?

স্যার ডেকেছেন?

আজ দেখি নতুন জামাইয়ের ড্রেস পরে চলে এসেছেন।

পি.এস. দাঁত বের করে হাসল। যেন খুব মজ্জার কথা কিছু শুনল।

সোলায়মান সাহেব!

হ্বি স্যার!

পায়জামা-পাঞ্জাবী ড্রেসটা অফিসের কাণ্ডে জন্মে ঠিক সুইটেল নয়। বিদেশে পায়জামা-পাঞ্জাবী লোকজন পরে ঘূরতে যাবার সময়। তারা এটাকে বলে স্লাপিং সূট।

এটা তো বিদেশ না।

জোয়ারদার সাহেব বহু কষ্টে নিজেকে সামলালেন। এই ছেকবার মুখে মুখে কথা কলার একটা বন্ধনত্যাগ আছে। আগেও লক্ষ্য করেছেন। ম্যানস এক বস্তু এ জানেই না। যেন ঘন্টীর সঙ্গে কথা বলছে না — কথা বলছে ইয়াব বক্সুর সঙ্গে। হোয়াট ইচ্ছ দিস?

সোলায়মান সাহেব!

ছি স্যার।

যাবার ব্যবস্থা কি করেছেন?

সব ফাইন্যাল করা হয়েছে স্যার।

কি ফাইন্যাল করলেন দয়া করে বলুন, আমি শুনি। অবশ্যি আপনার যদি তকলিফ না হয়।

কথাগুলি আগাত করার জন্যেই বলা। কিন্তু পি.এস. সেটা ধরতে পাবল না। হাসিমুখে কলতে লাগল —

এখান থেকে ময়মনসিংহ যাব ট্রেনে করে। সেলুনের ব্যবস্থা হয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে যাব গাড়িতে করে। গাড়ির ব্যবস্থা ময়মনসিংহের ডি. সি. করবেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই কথা হয়েছে।

হেলিকপ্টারে কি হল?

ব্যবস্থা করা যায়নি। আমি হেলিকপ্টার সবই এনগেজড।

এনগেজড মানে? দেশে কি এখন মুক্ত চলছে নাকি?

পি.এস.. চূপ করে এইল। জোয়ারদার সাহেব খমথমে গলায় বললেন, আপনি একজন ইনএফিসিয়েন্ট অফিসার — এটা বোধহয় আপনি নিজেও জানেন না।

গাড়িতে যেতে খুব কষ্ট হবে না স্যার। রাস্তা ভালো।

রাস্তা ভালো হলে গোকুর গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলুন। পুরোপুরি দেশীয় একটা ব্যাপার হবে। ঘন্টী গোকুর গাড়িতে করে এসেছেন। নিউজ হবে।

পি.এস চূপ করে রাইল। তাকে দেখে মনে হলো না সে খুব চিঞ্চিত। সামান্য একটা কাজ করতে পারেনি অথচ তার জন্যে কোনো অনুশোচনা পর্যন্ত নেই।

আপনি প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে দিন। হেলিকপ্টার পাওয়া গেলে যাবো নয়, তোমাবো না। ট্রেন-মোটরে গেলে সমস্তটা দিন নষ্ট হবে। নষ্ট করার মতো সময় আবাব হাতে পাই।
বুঝতে পারছেন?

ছি স্যার।

দাঢ়িয়ে আছেন কেন? চলে যান।

জোয়ারদার সাহেব বিমৰ্শ মুখে সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ বিলালেন। একটা ফাইলে চোখ বুলাতে চেষ্টা করলেন। কিছুতেই মন বসল না।

দুপুরে লাক্ষ খেতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন কিধে হয়নি। ঘন্টী হবার পর তাঁর এই রোগ হয়েছে — কিধে হয় না। যা খান তাই বদহজ্ঞ হয়ে যায়। দুদিন আগে একটা চপ খেয়েছিলেন। এখনো ডেকুরের সঙ্গে সেই চপের গুরুত্ব আসছে। কুৎসিত ব্যাপার: অথচ তিনি যে পরিশ্রম করেন না তাও না। সারাদিন বলতে গেলে ছেটাছুটির মধ্যেই কাটে।

স্যার আসবো?

জোয়ারদার সাহেব চোখ ছোট করে তাকালেন। পি.এস. ব্যাটা উকি দিছে। একে দেখলেই এখন কেমন গা ঝালা করছে। কথা বলতে ইচ্ছ করছে না। কিন্তু তবু তিনি সহজ-ভাবেই বললেন, কি ব্যাপার?

হেলিকপ্টার জোগাড় হয়েছে স্যার। সিভিল এভিয়েশনের।
তেরী প্রতি।

প্রোগ্রাম তাহলে স্যাব ঠিক বইলো। বিকাল চারটায় বওনা হবো। ফিববো ছটায়।
ঠিক আছে।

আব কোনো ম্যাসেজ কি স্যার দিতে চান?

দাঁড়ান, চিন্তা করে দেবি। আপনার খাবার খাওয়া হয়েছে?
ছি-না, এখন গিরে খাবো।

আমার সঙ্গে বসে পড়ুন। খাবার যথেষ্টই আছে। খেতে খেতে ডিসকাস করা যাবে। না-কি কোনো অসুবিধা আছে?

ছি-না স্যার, অসুবিধা আবার কি?

পি.এস. ছেলেটিকে এখন আব সে রকম খাবাপ লাগছে না। লম্বা এবং ফর্সা চেহারার
কারণেই হয়তো পায়জামা-পাঞ্জাবীতে সুন্দর মানিয়েছে। তার মেয়েগুলির জন্যে এ রকম
ছেলে পাওয়া গেলে ভালো হতো। কিন্তু মন্ত্রী হবার আগেই সবক'টি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।
এলেবেলে ধরনের বিয়ে। কাউকে বলার ঘতো কিছু না। ইশ, আব ক'টা দিন যদি অপেক্ষা
করা যেতো।

সোলায়মান সাহেব!

ছি স্যার।

আপনি হয়তো ভাবছেন আমি হেলিকপ্টার দিয়ে গ্রামের লোকদের ভড়কে দিতে চাই।
একটা কায়দা করতে চাই।

আমি এ রকম কিছুই ভাবছি না স্যার।

ভাবলেও কোনো ক্ষতি নেই, কাবণ আসলেই আমি একটু কায়দা করতে চাই। গ্রামের
লোকজন এসব জিনিস খুব পছন্দ করে। এই হেলিকপ্টারের গল্পই তারা একমাস ধরে
করবে। করবে না?

অবশ্যই করবে।

ভড়ংয়ের দরকার আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভড়ং করেছেন আব আবর্ণে তো . . .

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভড়ং করেছেন নাকি?

নিশ্চয়ই করেছেন। আলখাল্লা গায়ে দিয়ে বেড়াতেন না। আলখাল্লাটাই তাঁর ভড়ং।
বুঝতে পারছেন?

পারছি স্যার।

আমি আরেকটা কাজ করতে চাই। ফেরার পথে তেকজন রুগ্নকে ঢাকায় নিয়ে আসতে
চাই চিকিৎসাব জন্য।

কেন স্যার?

এতে ডাকল পারপাস সার্ভ হবে। নাম্বার ওয়ান — গ্রামের মানুষদের প্রতি আমার যমতা প্রকাশ পাবে। নাম্বার টু — একজন দরিদ্র ব্যক্তি হেলিকপ্টারে ঘূরবে। এই গচ্ছ সে বাকি জীবন স্বার সঙ্গে করবে।

তাতে স্যার, আপনার কি লাভ ?

সব সময় লাভ-লোকসানটাকে বড় করে দেখেন কেন ? হৃদয়টাকে প্রসারিত করুন। তার দরকার আছে।

ক্ষি স্যার আছে।

আপনি ‘ওয়াবল্যাসে’ রুগী খুঁজে রাখতে বলে দিন।

কি ধরনের রুগীর কথা বলব স্যার ?

তার মানে ?

যে কোনো রুগী হলেই তো হবে না। বেশ জরুরি ধরনের রুগী দরকার। অপনি নিশ্চয়ই একজন আমাশার রুগী ঢাকায় আনতে চান না।

আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন ?

ক্ষি না স্যার।

করবেন না। রসিকতা জিনিসটা আমার পছন্দ নয়। এখন যান, ব্যবস্থা করুন।

লাক্ষের জন্যে ধন্যবাদ স্যার।

ব্যবস্থা ভাল হল।

জ্ঞায়ারদার সাহেব যা আশা করেছিলেন তাব চেয়ে ভাল। লোকে লোকারণ্য। সবাই নিশ্চয়ই হেলিকপ্টার দেখতে আসেনি। কেউ কেউ বক্তৃতা শুনতেও এসেছে। তিনি একটি চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। ঘনঘন তালি পড়ল। পায়ে হেঁটে পরিচিত-অপরিচিত অনেক বাড়িতে গেলেন। স্কুলের স্যারদের পা ঝুঁয়ে সালাম করলেন। এই দুর্ভিত সম্মানে স্যার অভিভূত হলেন। একজন কেঁদে ফেললেন। গ্রামের মাতৰবর শ্রেণীর কিছু লোক ব্যাপ পাচি নিয়ে এসেছিলেন। তারা সারাক্ষণই বাজাতে লাগল — হলুদ বাট, মেলি বাট, বাট ফুলের মড়। তারা এই একটি সুরই জানে।

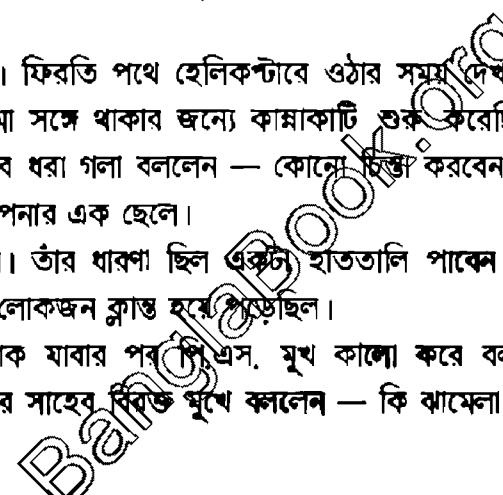
জ্ঞায়ারদার সাহেব বড়ই খুশী হলেন। ফিরতি পথে হেলিকপ্টারে ওঠার সময় দেখলেন একজন রুগীকেও তোলা হয়েছে। রুগীর মা সঙ্গে থাকার জন্যে কামাকাটি শুক করেছিল। কিন্তু জায়গার টানাটানি। জ্ঞায়ারদার সাহেব ধরা গলা বললেন — কোনো চুক্তি করবেন না, মা। দায়িত্ব আমার। মনে করুন আমিও আপনার এক ছেলে।

এই বলে তিনি আশেপাশে তাকালেন। তাব ধারণা ছিল একটা হাততালি পাকেন। তা পেলেন না। সম্ভবত হাততালি দিতে দিতে লোকজন ঝুঁস্ত হয়ে পড়েছিল।

হেলিকপ্টার ছেড়ে দিল। মিনিট দশেক মাবার পর পি.এস. মুখ কালো করে বলল, একটা ঝামেলা হয়ে গেছে স্যার। জ্ঞায়ারদার সাহেব বিষ্ণু পুর্ণে ঝুঁকে ঝুলেন — কি ঝামেলা ?

রুগী তো স্যার ধাবি খাচ্ছে।

ধাবি খাচ্ছে মানে ?



বড় বড় কবে শ্বাস টানছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছ ঢাকা পৌছবার আগেই কিছু-একটা হয়ে যাবে। ঘাটের মরা তুলে দিয়েছে স্যার।

ঘাটের মরা তুলে দিয়েছে তো আপনরা ছিলেন কোথায়? দেখতে পাবলেন না?

পি.এস. চূপ করে গেলেন।

ঢাকায় এই ডেডবিডি নিয়ে আমি কৰবোটা কি? ঝামেলাটা বুঝতে পারছেন? না, পারছেন না?

পারছি স্যার।

বিরাট একটা কেলেংকারি হয়ে যাবে।

কেলেংকারির কি আছে স্যার? আপনি চেষ্টা করেছিলেন সেটাই বড় কথা।

এই ডেডবিডির ঝামেলার কথা ভাবেন। এটা আবাব গ্রামে ফেরত পাঠাতে হবে না?

রুগ্নী ঘড়ঘড় শব্দ করছে। হেলিকপ্টারের পাখাৰ আওয়াজ ছাপিষ্ঠেও সেই শব্দ কানে আসছে। হঠাতে কবে সেই শব্দ থেমে গেল। জোয়ারদার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, মরে গেল নাকি?

হ্যাঁ-না। এখনো শ্বাস টানছে, তবে প্রায় হয়ে এল।

জোয়ারদার সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, হা করে বসে আছেন কেন? কি করবেন বলুন।

আমরা বরং আবাব গ্রামেই ফিরে যাই। ঝামেলা নামিয়ে দিয়ে আসি। বললেই হবে অবস্থা খুব খারাপ দেখে মা-বাবার কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। মৃত্যু মায়ের কোলে হওয়া ভাল।

যা ভালো বুঝেন করেন। আপনাদের ওপর নির্ভর করাটাই বোকামি।

হেলিকপ্টার আবাব নামল স্কুলের ঘাটে। রুগ্নী মারা গেল তাৰো কিছুক্ষণ পৰ। নামাঞ্জু অনাজার শেষে মন্ত্রী সাহেব অসাধারণ একটি বজ্র্তা দিলেন। অনেকেই কেঁদে ফেলল।

ফেরার পথে তিনি পি.এস. কে বললেন, “প্ৰোগ্ৰামটা শেষ পৰ্যন্ত ভালোই হয়েছে, কি বলেন? সব ভালো যাব শেষ ভালো।”



ভয়

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কিভাবে পরিচয় হল আগে বলে সেই।

কেমিস্ট্রি প্ৰ্যাকটিক্যাল পৱীক্ষার এগজামিনার হয়ে পাড়া গা ধৰনেৰ এক শহৱে শিয়েছি (শহৱ এবং কলেজেৰ নাম বলাৰ প্ৰয়োজন দেখাই না) মূল গল্পেৰ সঙ্গে এদেৱ সম্পৰ্ক নেই। নামগুলি প্ৰকাশ কৰতেও কিছু অসুবিধা আছে। এই অকলে আমি আগে কখনো আসিনি। পৱিত্ৰজ্ঞ এক রাজ্ববাড়িকে কলেজ বানানো হয়েছে। গাছ-গাছড়ায় চাৰদিক আজম : বিশাল

কম্পাউন্ড। কিন্তু লোকজন নেই। পরিষ্কার জন্যে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। খ-খা করছে চারদিক। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম।

একটা সময় ছিল যখন এগজামিনাবেদেব আলাদা খণ্ডি-হস্ত ছিল কলেজের প্রিসিপ্যাল নিজের বাসায় রাখতেন। সকাল-বিকাল নানান ধরনের খাবার। ফাল ফেনেল পাক করই ধরা হত। যত্তের চূড়ান্ত যাকে বলে। এখন সেই দিন নেই। কেউ পাস্তাই দেয় না। বিবর চোষে তাকায়।

আমার জ্ঞানগা হল কেমিস্ট্রি ল্যাবোরেটরির পাশের একটা খালি কামরায়। প্রিসিপ্যাল সাহেব বললেন, আপনাকে হোস্টেলেই রাখতে পারতাম কিন্তু কুণ্ঠতেই পারছেন চারদিকে থাকবে ছাত্র। আপনি অস্বত্তি বোথ করবেন। ছাত্রো তো আর আগের মত নেই। মদটদ খায়। একবার একটা বাজে মেয়ে নিয়ে এসে নানান কীর্তি করবেছে। বিশ্বী ব্যাপার। তবে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। আমার বাসা থেকে খাবার যাবে।

খাকার ঘর দেখে চমকে উঠলাম। আগে বোধহয় স্টোর কম ছিল। একটামাত্র জানালা। রেলের টিকিট দেয়ার জানালার মত ছেট। ঘর ভর্তি মাকড়সার ঝূল। দুটি বিশাল এবং কৃৎসিত মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে বসে আছে। এই নিবীহ প্রাণিতিকে আমি অসম্ভব ভয় পাই। এদের ছায়া দেখলেও আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঝাড়ুদারকে পাঁচটা টাকা দিলাম মাকড়সা এবং মাকড়সার ঝূল পরিষ্কার করবার জন্যে। সে কি করল কে জানে। ঘর হেমন ছিল তেমনি রইল। দুটির জ্ঞানগায় এখন দেখছি তিনটি মাকড়সা। তৃতীয়টির গায়ের বঙ্গ কালো। চোখ ছলছল করছে।

সন্ধ্যাবেলা হাবিস নামের একজন লোক একটা হাবিকেন জ্বলিয়ে দিয়ে গেল। অর্থে দিনের বেলায় ইলেকট্রিসিটি আছে দেখেছি। হাবিস বলল — রাত দশটার পর কাবেন্ট আসে। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। রাত দশটার পর আমি কাবেন্ট দিয়ে কবব কি?

সন্ধ্যার পর এলেন কেমিস্ট্রির ডেমনেস্ট্রেটর সিবাজউদ্দিন। এর সঙ্গে আমার সকালে একবার দেখা হয়েছে। তখন বোধহয় তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। মুখ ভর্তি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মত চাপ দাঢ়ি। মাথায় টুপী। চোখে সুরমা। গা থেকে আতরের গুঁজ বেকচে। বেঠেখাট একজন মানুষ। বয়স পঞ্চাশের মত হলেও চমৎকার স্বাস্থ্য। এই গরমেও গায়ে ঘিয়া রঙের একটা চাদর। তিনি কথা বলেন খুব সুন্দর করে।

স্যার কেমন আছেন?

ভালই আছি।

আপনার খুব তকলিফ হল স্যার।

না, তকলিফ আর কি?

আগে এগজামিনাব সাহেবরা এলে প্রিসিপ্যাল স্যারের বাসায় থাকতেন। কিন্তু ওর এক ছেলের মাথার দোষ হয়েছে। প্রিসিপ্যাল স্যার এখন আর কাউকে বাসায় রাখেন না। ছেলেটা বড় ঝামেলা করে।

আমি বললাম, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে।

সিবাজউদ্দিন সাহেব ক্ষীণ কষ্টে বললেন, স্যার, তেওঁরে এসে একটু বসব?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আসুন গল্প কৰি।

সিরাজউদ্দিন সাহেব বসতে বসতে বললেন, এখানে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের একট ডাকবাংলা আছে। আপনাকে সেখানে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে বেভিন্যুব সিও তাঁর ফল্টিলি নিয়ে থাকেন। কোয়াটারের খুব অভাব।

বুঝতে পারছি। এই নিয়ে আপনি ভাববেন না। দিনের বেলাটা তো কলেজেই কাটবে। রাতে এসে শুধুমানো। বই-পত্র নিয়ে এসেছি। সময় কাটানো কোন সমস্যা না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ইতক্ত করে বললেন, — রাতে ঘর থেকে বেরতে হলে একট শব্দ-টব্ব করে তারপর বেরকৈন। খুব সাপের উপস্থিপ !

তাই নাকি ?

জী স্যাব। এখন সাপের সময়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত থেকে বের হয়। হাওয়া থায়।

আমার গা হিম হয়ে গেল। এ তো মহাযন্ত্রণা। আয় দুশ গজ দূরে ঘোপ-ঝাড়ের মধ্যে বাথরুম। আমার আবার রাতে কয়েকবব বাথরুমে যেতে হয়।

তবে স্যার ঘবের মধ্যে কোন ভয় নেই। চাবদিকে কাবলিক আসিড দিয়ে দিয়েছি। সাপ আসবে না।

না এলেই ভাল।

যদি স্যার আপনি অনুমতি দেন পা উঠিয়ে বসি।

বসুন বসুন। যে ভাবে আপনার আরাম হয় সে ভাবেই বসুন।

ডস্টলোক পা উঠিয়ে বসলেন এবং একের পর এক সাপের গল্প শুরু করলেন। সেইসব গল্পও সত্যি বিচিত্র। রাতে ঘুম ভেঙেছে — হঠাৎ তাঁর মনে হল নাভীর উপর চাপ পড়ছে। চোখ মেললেন। ঘবে চাঁদের আলো। সেই আলোয় লক্ষ্য করলেন একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে তাঁর নাভীর উপর শয়ে ঘুমুচ্ছে। আসল সাপ। শক্তড়।

এক সময় আমি বিবর্ণ হয়ে বললাম, সাপের গল্প আব শুনতে ইচ্ছা করছে না। দয়া করে অন্য গল্প বলুন।

ডস্টলোক সম্ভবত সাপের গল্প ছাড়া অন্য কোন গল্প জানেন না। কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে শুরু করলেন সাপের সঙ্গম দৃশ্যের বর্ণনা। — চৈত্র মাসের এক জ্যোৎস্নায় তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন। বর্ণনা শুনে আমরা গা ঘিনঘিন করতে লাগল। সিরাজউদ্দিন সাহেব বললেন, সাপ যে জায়গায় এইসব করে তার মাটি করচে ভরে কোমরে রাখলে পুরুষ বাড়ে।

বিঞ্ঞানের একজন শিক্ষকের মুখে কি অভ্যুত্ত কথা। আমি ঠাট্টা করে বললাম, আপনি সেখানকার মাটি কিছু সংগ্রহ করলেন ?

তিনি আমার ঠাট্টা বুঝতে পারলেন না। সবল ভঙ্গিতে বললেন, জী স্যাব।

লোকটি নির্বোধ। নির্বোধ মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগে না। কিন্তু এই লোক উঠেছে না। সাপ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সে আমাকে দেন। যালে বোধহয় তৈরী হয়েই এসেছে। মুক্তি পাবার জন্যে এক সময় বলেই ফেললাম। আরাদনের জানিতে টায়ার্ড হয়ে এসেছি। যদি কিছু মনে না কবেন বাতি-টাতি নিভিয়ে ঘুমে পড়ব।

ডস্টলোক অবাক হয়ে বললেন, কি বলছুন স্টোর ? ভাত না খেয়ে ঘুমাবেন ? ভাত তো এখনো আসেনি। দেরি হবে। আমি প্রিসিপ্যাল সাহেবের বাসা থেকে খোঁজ নিয়ে তারপর আপনাব কাছে এসেছি। আমি যাওয়ার পর বাসা চড়িয়েছে। গোশত বাসা হচ্ছে।

তাই নাকি ?

ঞ্জি ! আপনি গরু খান তে ?

ঞ্জি খাই ।

এখানে কসাইখানা নাই । যাবে যাবে গরু কাটা হয় । আজ হাটবার । তাই গরু কাটা হয়েছে । প্রিসিপ্যাল সাহেব দুই ভাগ নিয়েছেন ।

ও আচ্ছা ।

পিচিশ টাকা করে ভাগ ।

তাই বুঝি ?

প্রিসিপ্যাল স্যারের শ্রীর বাস্তা থুব ভাল ।

তাই নাকি ?

ঞ্জি । তবে আজ রান্না করছে তাঁর ছেলের বৌ । যে ছেলেটা পাগল তার বৌ ।

ও আচ্ছা ।

বিরাট অশাস্তি চলছে প্রিসিপ্যাল স্যারের বাড়িতে । ছেলে বাটি নিয়ে তার মাকে কোপ দিতে গেছে । বৌ শিয়ে যাবখানে পড়ল । এখন ছেলেকে বেঁধে রেখেছে । এই জন্যেই বাস্তা দেবি হচ্ছে ।

কোন হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলেই হত । ওদের দুঃসময়ে . . .

কি যে বলেন স্যার । আপনি আমাদের মেহমান না ? তাছাড়া উদ্দলোকের খাওয়ার ঘর হোটেল এই জায়গায় নাই । নিতান্তই গণ্ডগ্রাম । হঠাৎ সাব-ডিভিশন হয়ে গেল । ভাল একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নাই ।

রাত সাড়ে দশটায় খাবার এল । দুটি প্লেট, সিরাজউদ্দিন সাহেবও আমার সঙ্গে খেতে বসলেন । হাত থুতে থুতে বললেন, প্রিসিপ্যাল স্যার আমাকে আপনার সঙ্গে খেতে বলেছেন । আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহমান । আপনি একা একা খাবেন, তা কি হয় ?

প্রিসিপ্যাল সাহেবের ছেলের বৌ অনেক কিছু রান্না করেছে । অসাধারণ রান্না । সামান্য সব জিনিসও বাস্তা গুণে অপূর্ব হয়েছে । মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল । বেচারী হয়ত চোখের জল ফেলতে ফেলতে রেখেছে । আজ রাতে সে হয়ত কিছু খাবেও না ।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ।

ঞ্জি স্যার ।

প্রিসিপ্যাল সাহেবের ছেলের বৌকে বলবেন, আমি এত ভাল বাস্তা কর্মখরেয়েছি । স্ট্রোপদী এরচে' ভাল বাঁধতো বলে আমার মনে হয় না ।

ঞ্জি স্যার, বলো । তবে প্রিসিপ্যাল স্যারের শ্রীর বাস্তা কাছে কিছুই না । আছেন তে কিছুদিন, নিজেই বুঝবেন ।

প্রিসিপ্যাল সাহেবকে বেশ বিচক্ষণ লোক বলে মনে হল । তিনি একটা টর্চ লাইট পাঠিয়েছেন । ফ্লাস্ক ভর্তি চা পাঠিয়েছেন । পান-সুপারি-অসাম আছে একটা কোটা ।

খাওয়া-দাওয়ার পরও সিরাজউদ্দিন সাহেব স্টেকক্ষণ বসে রাখলেন । চা খেলেন, পান খেলেন, দীর্ঘ একটা সাপের গল্প বললেন । বিদ্যুৎ নিলেন রাত গ্রামোটার পর । যে লোকটি

ক্রমাগতই সাপের কথা বলেছে তার দেখলাম তেমন ভয়-টুষ নেই। টর্চ বা লাঠি ছাড়াই দিয়ি হনহন করে চলছে।

আমি দুবজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। নতুন জ্বাফগায চট করে ঘূম আসবে না। শুয়ে শুয়ে হাস্কা থরনের কিছু বই পড়া যায়। হারিকেনের এই আলোয় সেটা সম্ভব হবে না। আমি সিগারেট ধরিয়ে স্মৃতিক্ষে খুললাম। বই বের করব। ঠিক তখনই একটা কাণ্ড হল। প্রচণ্ড ভয় লাগল। অথচ ভয়ের কোনই কারণ ঘটেনি। তবু আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। যেন বন্ধ দরজার ও-পাশেই অশ্বীরী কিছু দাঙ্ডিয়ে আছে। যেন এক্ষণি সেই অশ্বীরী অতিথি ভয়ংকৰ কিছু করবে। নিজের অঙ্গাস্তেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম — কে কে? আর তখনি শুনলাম থপথপ শব্দে একজন কেউ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। ছোট একটা কাশির শব্দও শুনলাম।

ভয়টা যেমন হঠাত এসেছিল তেমনি হঠাত চলে গেল। আমি শুবই স্বাভাবিক ভঙিতে দরজা খুলে বাইবে এসে দাঢ়ালাম। ঠাঁদের আলোয় চারদিক খৈ-খৈ করছে। কোথাও কেউ নেই। হঠাত এই অস্বাভাবিক ভয় আমাকে অভিভূত করল কেন? এখনো গা ঘামে ভেজা। হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে। আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বারদায় দাঙ্ডিয়ে বাইলাম। হাস্কা বাতাস দিচ্ছে। বেশ লাগছে দাঙ্ডিয়ে থাকতে। লুসী পরা খালি গায়ের একটি লোক বিড়ি টানতে টানতে আসছে। আমাকে দেখেই বিড়ি লুকিয়ে ফেলে বলল, আদাৰ স্যাব।

আদাৰ। তুমি কে?

আমার নাম কালিপদ। আমি কলেজের দারোয়ান।

তুমি কিছুক্ষণ আগে কি এইখানেই ছিলে?

জি স্যাব। লাইব্রেরী ঘরের সামনে বসে ছিলাম।

কাউকে যেতে দেখেছ?

আজ্ঞে না। কেন স্যাব? কি হইছে?

না, এমি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইলেকট্রিসিটি চলে এল। আমি নিশ্চিন্ত মনে বই নিয়ে শুতে শোলাম। স্টিফান কিংয়েব লেখা ভৌতিক উপন্যাস। দারুণ রংগরগে ব্যাপার। একবার পজতে প্রক্র করলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। ভয়-ভয় লাগে, আবার পড়তেও ইচ্ছা করে। পুরোপুরি ঘূমুতে গেলাম একটার দিকে। বারবার মনে হতে লাগল কিছুক্ষণ আগে এই অস্বাভাবিক ভয়টা কেন পেলাম? রহস্যটা কি?

আমি খুব-একটা সাহসী মানুষ এরকম দাবী করি না। কিন্তু আকারণে এত ভয় পাবার যত মানুষও আমি নই। একা একা বহু রাত কাটিয়েছি।

সে রাতে আমার ভাল ঘূম হল না।

দিনের বেলাটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। একমজুর ছেলে পরীক্ষা দেবে। জোগড়যন্ত কিছুই নেই। ল্যাবোরেটরীর অবস্থা শোচনীয়। একজনামাত্র ‘ব্যালেন্স’, তাও ঠিকমত কাজ করছে না। প্রয়োজনীয় ক্যামিকেলস ও নেই। সে নিয়ে কারো মাথাব্যথাও নেই। কেমিস্ট্রির দুষ্প্রস্তুত চিতার। ওরা নির্বিকার ভঙিতে বসে আছেন। একজন আমাকে বলে গেলেন, কলেজেৰ

অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ক্লাস-ট্লাসও তেমন হয়নি। একটু দেখেননে নিবেন স্যার। পাস মাটো দিয়ে দিবেন।

আমি হেসে বললাম, কি করে দেব বলুন। দেবাব তো একটা পথ লাগবে। এরা তো মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কিছুই করেনি।

কি করে করবে বলেন, স্টাইক-ফেস্ট্রাইক লেগেই আছে। জিনিসপত্রও কিছু নেই।

একমাত্র সিরাজউদ্দিন সাহেবকে দেখলাম ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছেন। চেষ্টা করছেন কিভাবে ছাত্রদের খানিকটা সাহায্য করা যায়। একশজ্ঞ ছাত্র-ছাত্রীর কেউ তাকে এক ঘৃহুর্তের জন্যে চোধের আড়াল করতে রাজি নয়। একটি যেয়ে সল্ট এ্যানালিসিসে কিছুই না পেয়ে তাদের স্বভাবমত কাঁদতে শুরু করেছে। সিরাজউদ্দিন সাহেব তাকে একটা ধমক দিলেন, খবরদার কাঁদবি না। কাঁদলে চড় খাবি। গোড়া থেকে কর। ড্রাই টেস্টগুলি আগে কর। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করবি।

ওগজামিনারদের একটা দায়িত্ব হচ্ছে লক্ষ্য রাখা যেন ছাত্ররা তাদের নিজেদের কাজগুলি নিজেরাই করে। কিন্তু সব সময় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। দেখেও না দেখার ভাব করতে হয়। এখন যেমন করছি। ছাত্রদের জন্যে আমার খানিকটা ফয়তাও লাগছে। যত্প্রাপ্তি নেই, ক্যামিকেলস নেই, স্যারদের কোন আগ্রহ নেই, ছেলেরা করবে কি?

দুপুরবেলা প্রিসিপ্যাল সাহেব দেখতে এলেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। অদ্বোককে মনে হল বিপর্যস্ত। কিছুক্ষণ মুখ কুঁচকে রেখে বললেন, দেন, সব কটিকে ফেল করিয়ে দেন। ঝামেলা চুক্তে যাক।

কোন প্রিসিপ্যালকে এরকম কথা বলতে শুনিনি। আমি হেসে ফেললাম। প্রিসিপ্যাল সাহেব বললেন, রাতে অসুবিধা হয়নি তো?

ছি না, হয়নি।

সিরাজউদ্দিনকে আপনার খোজখবর রাখতে বলেছি। কোন কিছুর দরকার হলেই তাকে বলবেন। সংকোচ করবেন না।

না করব না।

সাপের গল্প বলে মাথা খারাপ করিয়ে দেবে। পাতা দেবেন না। এখানে সাপের উপর একেবাবেই নেই।

তাই নাকি?

আপনাকে তয় পাইয়ে দিয়েছে বোধহয়? আমাকেও দিয়েছিল। প্রথম যখন আসি এমন অবস্থা ঘৰ থেকে বেরবাব আগে হারিকেন, লাঠি এইসব নিয়ে বের হয়ে ছিল হা হা।

প্রিসিপ্যাল সাহেব বেশীক্ষণ দাঢ়ালেন না। আগামীকাল সকালে চা খাবার দাওয়াত দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন।

গাঁচটায় পরীক্ষা শেষ হবার কথা। শেষ হল রাত নটিয়া সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিধ্বস্ত অবস্থা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, পরীক্ষা কৈ আপনার ছাত্ররা দেয়নি, দিয়েছেন আপনি। মনে হচ্ছে ভালই দিয়েছেন।

আমার সঙ্গেই তিনি যাবে ফিরলেন। খাওয়া—দাওয়া করে নিজের জাফগায় ফিরে যাবেন। অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার জন্যেই বোধহয় আজ আর সাপের পল্প শুরু হল না। নিষ্পত্তি খাওয়া শেষ করে তিনি উঠে পড়লেন

স্যার যাই। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। রাত—বিরাতে বেকুবার সময় একটু খেয়াল রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন। সাপেরই এখন সিজ্জন।

শুব খেয়াল রাখব।

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসামাত্র ঠিক আগের মত হল। তীব্র একটা ভয় আমাকে আচম্ভ করে ফেলল। থরথর করে হাত—পা কাপছে। নিষ্পাস নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে এক্ষণি বোধ হয় অস্ত্রান হয়ে যাব। দরজার কড়ায় টন করে একটা শব্দ হল। যেন কেউ কড়া নাড়তে গিয়েও কড়া নাড়ল না। ঠিক তখনই ভয়টা চলে গেল। আমি পুরোপূরি স্বাভাবিক।

ভগ থেকে ঢেলে এক গ্লাস পানি খেলাম। দরজা খুলে বাইরে এলাম। চাবদিকে ফকফকা ঝ্যোৎস্না। গলা উচিয়ে ডাকলাম — কালিপদ, কালিপদ। কেউ সাড়া দিল না। আজ বোধহয় সে ডিউটি দিচ্ছে না।

বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম। সিগারেট ধরালাম। আকাশে অস্প মেঘ। যাবে যাবে মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। অপূর্ব আলো-আধাৰী। ঢাকা শহরে বসে এই দশ্য ভাবাই যায় না। তবে বড় বেশি নির্জন। মিথি ভাকছে। কিন্তু সেই মিথির ডাকও ম্যাজিকের মত হঠাতে করে থেমে যাচ্ছে। শুনতে ভাল লাগে।

ফুম্ফু থেকে চা ঢেলে নিয়ে আবার এসে বসলাম বারান্দায়। আর তখন দেখলাম কালিপদ আসছে। তার হাতে একগাদা এঁটো বাসন—কোসন। সঙ্গে পুরুরে খোবে।

এই কালিপদ।

আদাৰ স্যাব।

একটু শুনে যাও তো।

কালিপদ এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে প্রশান্ত কৰল। হিন্দুদের প্রণামের এই ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর।

বাতদুপুরে বাসন ধৃতে যাচ্ছ নাকি?

হ স্যার।

আচ্ছা, তুমি কি সিরাজউদ্দিন সাহেবের বাসা চেন?

আজ্ঞে চিনি।

কত দূর?

দুই মাইলের উপরে হইব।

কালিপদ, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারব স্যাব, বলেন।

তুমি কি আমাকে ওৰ বাসায় নিয়ে যেতে আবণ্ণি?

কালিপদ অবাক হয়ে বলল, এখন?

হ্যাঁ এখন। তুমি তোমার কাজ দেৱে আস, তাৰপৰ যাব।

অমি উন্নবে ডাইক্যা নিয়া আসি ?

না, ডেকে আনতে হবে না। আমিই যাব। তোমার কোন অসুবিধা আছে ?

আঞ্জে না, অসুবিধা নাই। অমি আসতেছি।

সিরাজউদ্দিনের বাসায় যাবার ব্যাপারটা যে আমি ঘোকেব মাথায় করলাম তা না। আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে আমার হঠাতেও তয় পাবার একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটা বের করতে না পাবলে আজ রাতেও আমার ঘূম হবে না। আধিভৌতিক কোন ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া এ পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তুকেই নিউটনের গতিসূত্র মানতে হয়।

ডাল ভাঙা ক্রোশ বলে একটা কথা বইপত্রে পড়েছি। আজ রাতে সেটা বাস্তবে জ্বান গেল। হাঁটছি তো হাঁটছিই। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছি, কালিপদ আর কতদূর ? সে তার উপরে ঘোৎ জ্ঞাতীয় একটা শব্দ করছে। লোকটি কথা কম বলে। কথাবার্তা হ্যাঁ না-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিংবা কে জানে গ্রাম-ট্রামের দিকে হয়তো চলতি অবস্থায় কথা কম বলার নিয়ম। তার উপর লক্ষ্য করলাম লোকটা একটু ভীতু টাইপের। কোন শব্দ হতেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আমি যখন বলছি, কি হল কালিপদ ? তখন আবার হাঁটা শুরু করছে। আমি আগেও দেখেছি দারোয়ানবা সব সময় ভীতু ধরনের হয়।

এক সময় আমরা ছেটখাট একটা নদীর ধাবে চলে এলাম। বর্ষাকালে এর চেহারা রমরমা থাকলেও থাকতে পারে। এখন দেখাচ্ছে সরু ফিতার মত। পায়ের পাতাও হয়ত ভিজবে না।

কালিপদ নদীর নাম কি ?

বিকই নদী।

বিকই চালের কথা শুনেছি। এই নামে যে নদীও আছে কে জানত।

নদী পাব হতে হবে ?

আঞ্জে না।

এসে পড়েছি নাকি ?

হ।

সে হ বলেও থামছে না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না কোথাও থামবে। মনে হচ্ছে এটা আমাদের অনন্ত যাত্রা। সিবাজউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা কি বলব কিছুই ঠিক করিব নাগে থেকে ঠিকঠাক করে গেলে কোন লাভ হয় না। আসল কথা বলবার সময় ঠিক করে-রাখা কথা একটাও মনে আসে না। কতবার এ রকম হয়েছে। ঘোবনে জরী নামের একজন কিশোরীর সঙ্গে বেশ ভাল পরিচয় ছিল। খুব সাহসী মেয়ে। সে নিজ থেকেই একবাব আমাকে খবর পাঠাল আমি যেন সন্দ্ব্যাবেলায় তাদের বাড়ির ছান্দো অপেক্ষা করি। সাবাদিন ভাবলাম ছান্দের নির্জনতায় কি সব কথা বলব। কতটুকু অবেগ কাকবে। কোন পর্যায়ে হাতে হাত রাখব। বাস্তবে তার কিছুই হল না। প্রচণ্ড ঘণ্টা বেঁধে গেল। জরী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ছোটলোক। আমি কড়া গলায় বললাম, আমি ছেটলোক না ছোটলোক হচ্ছ তুমি। শুধু তুমি একা না, তোমাদের বাড়ির সবাই ছোটলোক। এবং তোমার বড় মামা একটা ইতর। আবেগ-ভালবাসার একটি কথাও দুঃজনের কেড়ে লগাম না।

স্যার এই বাড়ি।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ছেট্ট একটা চিনের ঘৰ। কলাগাছ দিয়ে ঢেরা। এড় পোড়ানো
গুৰু আসছে। পরিষ্কার ঝৰখকে উঠান। উঠানে দাঁড়াতেই কূকূর ডাকতে লাগল। চোব
ভেবেছে বোং হয়। ভেতব খেকে সিরাজউদ্দিন চেচাল, কে কে? কালিপদ বলল, দরজাটা
খুলেন। আমি কালিপদ। দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলল না। হায়কেন জ্বালানো হল। তাতে বেশ
খানিকটা সময় লাগল। সিরাজউদ্দিন একটি লুঙ্গি পরে খালি গাষ্ঠে বের হয়ে এল। চোখ
কপালে তুলে বলল, স্যার আপনি?

দেখতে এলাম আপনাকে।

কেন?

কোন কাবণ নেই। ঘূৰ আসছিল না। ভাবলাম, দেখি বাতের বেলা গ্রাম কেমন দেখা
যায়। আপনি বোধহয় শয়ে পড়েছিলেন? ঘূৰিয়ে পড়েছিলেন?

ছি।

ঘূৰ লজ্জিত। কিছু মনে করবেন না।

আসেন, ভিতরে এসে বসেন।

সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিস্ময় এখনো কাটেনি। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, কোন
ঝামেলা হয়েছে স্যার?

না না, ঝামেলা কি হবে? বেড়াতে এসেছি। একটু অসময়ে চলে এলাম এই আর কি!

স্যার একটু চা করি?

অসুবিধা না হলে, করুন।

না, না। কোন অসুবিধা নাই। কোন অসুবিধা নাই।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ছোটছুটি শুরু করলেন। উঠানে চুলা জ্বালানো হল। কালিপদ
দেখলাম টাকা নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। হয়ত চা বা চিনি নেই, আনতে গেছে। এই
রাতদুপুরে কোথায় এসব পাবে কে জানে।

সিরাজউদ্দিন সাহেব।

ছি স্যার।

লোকজন দেখছি না যে। আপনি একাই থাকেন নাকি?

বিয়ে-শাদী তো করি নাই।

করেননি কেন?

ভাগ্যে ছিল না। কষ্টের সংসার ছিল। নিজেই খেতে পেত্তায না।

এখন তো বোধ হয় অবস্থা সে রকম না।

ছি, এখন মশাআল্লাহ সামলে উঠেছি। কিছু জমিজমাও করেনি।

তাই নাকি?

অতি অল্প। ধানী জমি।

একা একা থাকেন, ভয় লাগে না?

ভয় লাগবে কেন?

BanglaBook.org

সিরাজউদ্দিন অবাক হয়ে তাকিছে রহিলেন। আমি খানিকটা অস্পতি বোধ করতে লগলাম। ভয়ের ব্যাপারটা নিয়েই আমি অঙ্গাপ করতে চাই কিন্তু কিভাবে স্টো করা যায়? আমি ইতস্তত করে বললাম, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

ষ্ঠি না। এইসব হচ্ছে কুসম্পকার। এই গ্রামেই একটা বেটি গাছ আছে। লোকে নানান কথা বলে। কি কি নাকি দেখে। আমি কোনদিন দেখি নাই। রাত-বিরাতে কত যাওয়া-আসা করবেছি।

চা তৈরী হয়েছে। চিনি ছিল না। ধেঞ্জুর রসের চা। চমৎকার পায়েস পায়েস গন্ধ। কাপে চুমুক দিতে দিতে সিরাজউদ্দিন কললেন, তবে ঝীন বলে একটা জিনিস আছে।

আমি কৌতৃহলী হয়ে বললাম, আপনি বিশ্বাস করেন?

করব না কেন? কোরান শরীফে পরিকার লেখা — ঝীন এবং ইনসান। হশবের দিনে মানুষের যেমন বিচার হবে ঝীমেরও হবে।

আপনি ঝীন দেখেছেন কখনো?

ষ্ঠি না। সাধারণ লোকে দেখে না।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। সিরাজউদ্দিন লোকটি আসলেই সাধারণ। কোন রকম বিশেষত্ব নেই। আমার হঠাৎ ভয়ের সঙ্গে এই লোকটিকে কিছুতেই জড়ানো যাচ্ছে না। সরাসরি এই প্রসঙ্গটা আনাও মুশকিল। তবু একবার বললাম, আপনি চল আসার পর এ রাতে কেমন যেন হঠাৎ করে ভয় পাই।

সিরাজউদ্দিন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, সাপ জিনিসটা তো ভয়েরই। ভয় পাওয়াটা ভাল। তাহলে সাবধানে চলাফেরা করবেন। অসাবধান হলেই সর্বনাশ। রাতে বের হলে টর্চ লাইটটা সঙ্গে রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন।

বিদায় নিতে নিতে রাত একটা বেজে গেল। সিরাজউদ্দিন আমার সমস্ত আপত্তি অগ্রহ্য করে এগিয়ে দিতে এলেন। তিনি এলেন বিকই নদী পর্যন্ত। চাঁদের আলো আছে। চারদিকে স্পষ্ট দেখা যায়। তবু তিনি জোর করে কালিপদের হাতে একটা হারিকেন ধরিয়ে দিয়ে উল্টো দিকে রওনা হলেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেই মুহূর্তে তিনি বাঁশবনের আড়ালে পড়লেন ঠিক সেই মুহূর্তে আবাব সেই বুকম হল। অক্ষ মুক্তিহীন ভয়। যেন ভয়ংকর অশুভ একটা-কিছু আমার উপর ঝাপিয়ে পড়তে ছুটে আসছে। সেই অশুভ জিনিসটাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আমি ঝুঁকের প্রতি কণিকায় তাকে অনুভব করছি। এর ক্ষমতা অসাধারণ। এ অন্য জগতের ক্ষেত্রে। এ জগতে তাকে কেউ জানে না। আমার সমস্ত ইলিয় কঁপিয়ে দিয়ে ভয়টা চলে গেল। কিছুটা ধাতব হয়ে লক্ষ্য করলাম আমি মাটিতে বসে আছি। কালিপদ আমার মাথার উপর ধূঁকে পড়ে বলছে, “কি হইল স্যার? কি হইল?”

কিছু হয়নি। মাথাটা কেমন যেন করল।

মাথা ধূতেন্তেন স্যার? নদীর পানি দিয়া . . .

মাথা ধূতে হবে না। চল রওনা দেই।

বলেও রওনা দিতে পারলাম না। ভয় একেবারেই নেই কিন্তু শরীর অবসন্ন। অসম্ভব মুম পাছে।

কালিপদ !

জ্বে আস্তে ।

একটু আগে তোমার কি কোন ভয়-ট্য লেগেছে ?

জ্বে না ।

ও আস্তা ! চল আস্তে আস্তে হাঁটি ।

কালিপদ বারবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। পাগল ভাবছে কি-না কে জানে। ভাবলেও তাকে দোষ দেয়া যায় না। যে লোক মাঝরাত্রিতে বেড়াতে বের হয়, অকাবশে ভয় পেয়ে আধমরা হয়ে যায় সে আর যাই হোক খুব সুস্থ নয়।

পরের দিনটা আমার খুব খাবাপ কাটল। কিছুতেই মন বসাতে পারি না। ভাইভা শুরু হয়েছে। ছাত্রদের প্রশ্নের জববগুলি ঠিকমত শুনছি না। বি.এস সি. পরাক্ষা দিতে এসে একজন দেবি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফরমূলাতে দু'টি ক্লোরিন এটম দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ হবার কথা। রাগও হচ্ছে না। পাস নাম্বার দিয়ে বিদ্যায় করে দিচ্ছি। কেমিস্ট্রির হেড বললেন, আপনার কি শরীর খাবাপ ?

আমি ক্লাস্ট গলায় বললাম, হ্যাঁ। কিছুতেই মন বসছে না। খুব টায়ার্ড লাগছে।

রাতে ঘুম কেমন হয়েছে ?

ঘুম ভাল হয়েছে।

যদি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন তাহলে এক ডোজ অশুধ দিতে পারি।

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, আপনি কি হোমিওপ্যাথিও করেন ?

হ্যি । ছোটখাট একটা ডিসপেনসারী আছে। রুগ্নী-টুগ্নী ভালই হয়।

মফস্বল কলেজের চিচারদের এই এক জিনিস। একটিমাত্র পেশায় তাঁরা খুশী নন।

প্রত্যেকের দ্বিতীয় কোন পেশা আছে। কোন পেশাটি প্রধান বোধা মুশকিল।

কি স্যার, হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস আছে ?

হ্যি না, ভূত-প্রেত এবং হোমিওপ্যাথি এই তিনি জিনিস আমি বিশ্বাস করি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।

তদলোক মুখ কালো করে বললেন, হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করবেন না কেন ? এটা তো হাইলি সাইটিফিক ব্যাপার। হ্যানিম্যাল সাহেবের কথাই ধরেন। উনি নিজে একজন পাস ক্ষেত্রে ডাক্তার ছিলেন।

হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আমি একগাদা কথা বলতে পারতাম। টু হুমেন্ড পাওয়ারের একটি অশুধে যে আসলে কোন অশুধই থাকে না সেটা মেলবুর কনসান্টেশন এবং এ্যাভাগেডো নাম্বার দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যেত। তর্কের ক্ষেত্রে সব সময় তাই করি। আজ ইচ্ছা করছে না। পাঁচটা বাজ্ঞাতেই উঠে পড়লাম। পরীক্ষা কুন্ডল ও চলছে, চলছে থাকুক। আমি বললাম, আপনারা ভাইভা শেষ করে দিন। আমি যেকে চলে যাব।

প্রিসিপ্যাল সাহেবের বাসায় আপনার না চা খাবার কথা ?

ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ায় মেজাজ আমো খাবাপ হল। কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু যেতে হবে।

প্রিসিপ্যাল সাহেবও দাওয়াতের কথা ভূলে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে অনেকক্ষণ অসুস্থ চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, ও আচ্ছা আচ্ছা। আসুন আসুন। চা খেতে বলেছিলাম তাই না? কিছু মনে নেই। আসুন বারদায় বনি। নানান খাবেলায় আছি তাই।

তিনি 'আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁব কোন সাড়া পাওয়া গেল না। দরজা ধরে পাঁচ ছ' বছর বয়সের মিটি চেহারার একটি মেয়ে কৌতুহলী চোখে আমাকে দেখছে। এর সঙ্গে দু'একটা কথা বলা উচিত কিন্তু ইচ্ছা করছে না। বাড়ির ভেতর থেকে হিস্ত পশুর গজনের মত গজন কানে আসছে। একটি মেয়েও কানে। কখনো কখনো কান্দা খেয়ে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। এই রকম অবস্থায় চায়ের জন্যে অপেক্ষা করাটাও অপরাধ।

অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। ছেলেটা বড় খামেলা করছে। শুনেছেন বোধহয়?

ন্যি শুনেছি।

ভাল খবর কেউ কখনো শুনে না। কিন্তু এই সব খবর সবাই শুনে ফেলে। নিতান্ত অপরিচিত লোকও এসে গায়ে পড়ে বিচিত্র সব চিকিৎসার কথা বলে।

আমি চূপ করে রাখলাম। প্রিসিপ্যাল সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, সেই জাতীয় চিকিৎসা এখন হচ্ছে। সাত নদীর পানিতে গোসল। ঠাণ্ডায় গোসল দিয়ে নিউমেনিয়া বাঁধাবে। ডাঙ্কারী চিকিৎসা করাচ্ছেন না?

তাও আছে। বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সব রকম চিকিৎসাই চলছে। কোনটাই লাগছে না। অসুখটা শুরু হল কিভাবে?

প্রিসিপ্যাল সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে হয়তো তাঁর ইচ্ছা করছে না। চা চলে এল। শুধু চা নয়। মিটি, সিঙ্গৱা, কচুরি।

নিন চা নিন। কিন্তু না থাকলে এই খাবারগুলি খাবেন না। সবাই দোকানের কেনা। এদিকে আবার শুব ডাইরিয়া হচ্ছে।

চা-টা চমৎকার। এক চুমুক দিয়েই যাথা ধৰাটা অনেকখানি সেরে গেল। প্রিসিপ্যাল সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, কি করে অসুখটা শুরু হল সত্যি জানতে চান?

বলতে ইচ্ছে না করলে থাক।

না না, শুনুন। গত বছর গরমের সময় আমার এই ছেলে তার বউকে নিয়ে এখনে আসে। আমি অনেকদিন থেকেই আসতে বলেছিলাম। ছুটি পায় না, আসতে পারে না। ব্যাংকের চাকরি, ছুটিছাটা কম। সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। আমি এখনে জেনেছি দু'বছর আগে। ছেলে প্রথম এল। আমরাও শুব খুশী।

রাত্রিবেলা বেশ গল্পগুজব করছি। সিবাজ্জউদ্দিন এসেছে। সাজের গল্প-টল্প করছে। রাত দশটার দিকে সিবাজ্জউদ্দিন চলে যেতেই ছেলে যেন কেশম হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাসছে। কোনমতে বলল, তাৰ নাকি অসুস্থ ভয় লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসি-ভাসি করতে লাগল। তখন কিছু বুকতে পারিনি। এখন বুঝছি এ রাতেই তাৰ পাগলামিৰ প্রথম শুরু।

প্রিসিপ্যাল সাহেব চূপ করলেন। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছি। আমার শরীর দিয়ে শীতল স্নোত বয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় শুক শুকিয়ে কাঠ। প্রিসিপ্যাল সাহেব বললেন,

কয়েকদিন পৰ আবাৰ এৱকম হল। সেও বাতেৰ বেলা। কলেজেৰ কিছু প্ৰফেসরকে খেতে
বলেছিলাম। তাৰা খাওয়া-দাওয়া কৰে চলে যাবাৰ পৰ আবৰ আমাৰ ছেলে এই বকম কৰতে
লাগল।

আমি ক্ষীণস্বৰে বললাম, সিৱাজউদ্দিন সাহেবেৰও দাওয়াত ছিল ?

হঁয়া ছিল। কলেজ স্টাফেৰ সবইকে বলেছিলাম।

তাৰপৰ কি হল, বলুন।

আৰ বলাৰ কিছু নেই। রোজই ওৱকম হতে লাগল।

কখন হত ?

ৰাত দশটা সাড়ে দশটা।

আমি কেৱল কথা না বলে পৱপৰ দ্টা সিমাৰেটে শেষ কৰলাম। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে।
এখন আমাৰ চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে পাৰছি না। আমি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাৱে
বললাম, সিৱাজউদ্দিন সাহেব কি প্ৰায়ই আসেন এখানে ?

আসে। আমাৰ ছেট ছেলেটাকে প্ৰাইভেট পড়ায়। সিনিয়াৰ লোক। রোজ সাতটাৰ
সময় আসে, ৰাত দশটা সাড়ে দশটাৰ আগে ঘায় না।

আমি কি আপনাৰ ছেলেটাকে একটু দেখতে পাৰি ?

তিনি বেশ অবাক হলেন। উঠে দাঢ়িয়ে বললেন, আসুন আমাৰ সঙ্গে। আমি তাৰ সঙ্গে
গেলাম। না গোলেই ভাল কৰতাম। সাতশ-আটশ বছৰেৰ একটা ছেলে। দড়ি দিয়ে বাধা। কি
যে অসহায় লাগছে। ছেলেটি আমাৰ দিকে কেমন অস্তৃত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। আমি
বললাম, ওকে এখান থেকে সৱিয়ে নিয়ে যান। ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা কৰান।

ঢাকাতেই তো ছিল। কোন বকম উন্নতি হয় না। ঢাকাৰ শুন্দি। এখানে বৱক্ষ ভাল
আছে। সিৱাজউদ্দিনেৰ সঙ্গে বেশ খাতিৰ। সে এলে শান্ত থাকে। প্ৰায় স্বাভাৱিক আচৰণ
কৰে।

তাই নাকি ?

ছি। কয়েকদিন ধৰে সিৱাজ আসছে না। আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। তাই ছেলেটাৰ উগ্
ৰভাৱ হয়ে গোছে। গত পৰশু বটি নিয়ে তাৰ ঘা'কে কাটতে গিয়েছিল।

সিৱাজউদ্দিন সাহেবেৰ সঙ্গে কথা-টথা বলে ?

না, কথা-টথা কিছু না। চুপচাপ থাকে। ও এলে খুশী হয় এইটা ব্যাধি। মুচকি মুচকি
হাসে। সিৱাজউদ্দিন গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে একেবাৰে শান্ত হয়ে স্বাস্থ।

আমি তাকিয়ে আছি ছেলেটিব দিকে। সে গোঞ্জনিৰ মত একটা চাপা শব্দ কৰছে। মুখ
থেকে অনবৱত লালা বেৱুচ্ছে। মুখ সীমৎ হা হয়ে আছে। একটু আগেই ঘাকে অসহায়
লাগছিল এখন সে বকম লাগছে না। বৱং কেমন যেন জয়দৰ্শক লাগছে। আমি ঘৱ থেকে
বেৱুতে বেৱুতে বললাম, প্ৰিসিপ্যাল সাহেব, আমাকে তাৰ মাতেই ঢাকা চলে যেতে হচ্ছে।

কি বললেন ?

আমি কিছুতেই থাকতে পাৰছি না। কেৱল আবেজ না সেই কাৰণও আপনাৰ কাছে ব্যাখ্যা
কৰতে পাৰছি না। কোনদিন পাৰব বলেও মনে হয় না।

আমি আপনাৰ কথা কিছুই বুঝতে পাৰছি না।

আপনি পরীক্ষা কয়েকদিন পিছিয়ে দিন। নতুন এগজামিনাব এসে বাকিটা শেষ করবেন।
অসম্ভব কথা আপনি কলছেন।
তা বলছি। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।

সেই রাতেই আমি ঢাকা চলে আসি। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটি স্মৃতি থেকে পূরোপুরি
মুছে ফেলি। নিজেকে বোঝাই যে সমস্তটাই ছিল উত্তপ্ত মন্তিক্ষের কল্পনা। গ্রামের নির্জনতা
কোন-না-কোন ভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

এই ঘটনাব প্রায় ঢার বছর পর সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা। আমি তাকে
চিনতে পারিনি। তিনি বায়তুল মোকাররমের ফুটপাত থেকে উলোন সুয়েটার কিনছিলেন।
তিনি আমাকে দেখতে পেরে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

স্যার আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি সিরাজ।

চিনতে পেরেছি।

ঐবার স্যার কাউকে কিছু না বলে হট করে চলে গেলেন। পরীক্ষা এক ঘাস পিছিয়ে
গেল। কি দুর্দশা ছাত্রদের। গরীবের ছেলেপুলে।

আমি কঠিন স্বরে বললাম, আপনারা সবাই ভাল তো?

ছি ভাল।

প্রিসিপ্যাল সাহেব, তুনি ভাল আছেন?

উনাব খবরটা জানি না। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর ঢাকবি ছেড়ে দিয়ে জামালপুর চলে
গেলেন।

ছেলেটা মারা গেছে বুঝি?

ছি। বড়ই দুঃখের কথা। পাগল মানুষ — বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় চলে গেল।
নানান জায়গায় ঝোঝাখুঝি। তিনদিন পর নদীতে লাশ ভেসে উঠেছে। আমিই খুঁজে পাই।
আমার বাড়ির পাশের ঘাটে গিয়ে লেগেছিল।

তাই বুঝি?

ছি স্যার। খুবই আফসোসের কথা।

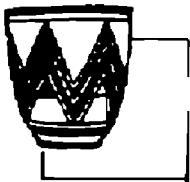
এখন কি নতুন প্রিসিপ্যাল এসেছেন?

ছি। ভাল লোক। প্রায়ই যাই উনার বাসীয়। আমাকে খুব আদর করেন। উনার সঙ্গে
গল্প-গুজব করি।

ভাল কথা।

তবে স্যাব অস্তুত ব্যাপার কি জানেন? নতুন প্রিসিপ্যাল সাহেবের স্ত্রী মাঝে মাঝে বিনা
কারণে ভয় পেয়ে চিংকার, চেচামেচি করেন। অবিকল আগের প্রিসিপ্যাল সাহেবের ছেলের
মত অবস্থা। মনে হয় বাড়িটার একটা দোষ আছে।

আমি কঠিন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম। সিরাজউদ্দিন বলল, আপনার
সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভাল লাগছে স্যার। আপনীর জো আমার প্রায়ই মনে হয়। সিরাজউদ্দিন
হাসল। তার হাসিতে শিশুর সারল্য। চোখ দুঃটিমদায় আর্ত।



অচিন বৃক্ষ

ইদবিশ বলল, ভাইজ্ঞান ভাল কইয়া দেহেন। এব নাম অচিন বৃক্ষ।

বলেই থু করে আমার পায়ের কাছে একদলা থুথু ফেলল। লোকটির কূৎসিত অভ্যাস, প্রতিটি বাক্য দুঃখের করে বলে। দ্বিতীয়বার বলার আগে একদলা থুথু ফেলে।

ভাইজ্ঞান ভাল কইবা দেহেন, এব নাম অচিন বৃক্ষ।

অচিন পাখির কথা গানের মধ্যে প্রায়ই থাকে, আমি অচিন বৃক্ষের কথা এই প্রথম শুনলাম এবং দেখলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এবা সবাই বৃক্ষ শব্দটা উচ্চারণ করছে শুন্দভাবে। তৎসম শব্দের উচ্চারণে কোন গঙগোল হচ্ছে না। অচিন বৃক্ষ না বলে অচিন গাছও বলতে পাবত, তা বলছে না। সম্ভবত গাছ বললে এব মর্যাদা পূরোপুরি রাখিত হয় না।

ইদবিশ বলল, ভাল কইয়া দেহেন ভাইজ্ঞান, ত্রিভূবনে এই বৃক্ষ নাই।

তাই না-কি?

হ্বে। ত্রিভূবনে নাই।

ত্রিভূবনে এই গাছ নাই শুনেও আমি তেমন চমৎকৃত হলাম না। গ্রামের মানুষদের কাছে ত্রিভূবন জ্ঞায়গাটা খুব বিশাল নয়। এদের ত্রিভূবন হচ্ছে আশেপাশের আট-দশটা গ্রাম। হয়ত আশেপাশে এককম গাছ নেই।

কেমন দেখতাছেন ভাইজ্ঞান?

ভাল।

এই রকম গাছ আগে কোনদিন দেখছেন?

না।

ইদবিশ বড়ই খুশি হল। থু করে বড় একদলা থুথু ফেলে খুশির প্রকাশ ঘটাল।

বড়ই আচানক, কি বলেন ভাইজ্ঞান?

আচানক তো বটেই।

ইদবিশ এবার হেসে ফেলল। পান খাওয়া লাল দাঁত প্রায় সঁব কঢ়া বৈ হয়ে এল। আমি ঘনে ঘনে বললাম, কী যন্ত্রণা! এই অচিন বৃক্ষ দেখাব জন্যে আমাকে ফাইলের উপরে হাঁটতে হয়েছে। বর্ষা কবলিত গ্রামে দুমাইল হাঁটা যে কি জিনিস, যার কোনদিন হাঁটেননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। জুতা খুলে খালি পায়ে হাঁটতে হয়েছে শুন্দি ওয়ার্মের জীবাণু যে শরীরে চুকে গেছে সে বিষয়ে আমি পূরোপুরি নিশ্চিত।

গাছটা দেখতাছেন কেমন কল দেহি ভাইজ্ঞান?

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। এরা শুধু দেখিয়ে খুশি নয়, প্রশংসাসূচক কিছুও শুনতে চায়। আমি কোন বৃক্ষ-প্রেমিক নই। সব গাছ আমার কাছে এক বকম মনে হয়।

আশেপাশের মানুষদেরই অমি চিনি না, গাছ চিনব কি করে? মানুষজন তাও কথা বলে, নিজেদের পরিচিত করার চেষ্টা করে। গাছেরা তেমন কিছুই করে না।

অচিন বৃক্ষ কেমন দেখলেন ভাইজ্ঞান?

আমি ভাল করে দেখলাম। মাঝাবি সাইজের কাঁঠাল গাছের মত উঁচু, পাতাগুলি তেতুল গাছের পাতার মত ছোট ছোট, গাছের কাণ্ড পাইন গাছের কাণ্ডের মত ঘস্য। গাছ প্রসঙ্গে কিছু না বললে ভাল দেখায় না বলেই বললাম, ফুল হয়?

ইদরিশ কথা বলার আগেই, পাশে দাঁড়ানো রোগা লোকটা বলল, ক্ষে না — ফুল ফুটনের টাইম' হয় নাই। 'টাইম' হইলেই ফুটবে। এই গাছে ফুল আসতে মেলা 'টাইম' লাগে।

বয়স কত এই গাছের?

তা ধরেন দুই হাজারের কম না। বেশি ও হাততে পারে।

বলেই লোকটা সমর্থনের আশায় চারদিকে তাকাল। উপস্থিত জনতা অতি দ্রুত মাথা নাড়তে লাগল। যেন এই বিষয়ে কাবো ঘনেই সন্দেহের লেশমাত্র নেই। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। গ্রামের লোকজন কথাবার্তা বলার সময় তাল ঠিক রাখতে পারে না। হট করে বলে দিল দু'হাজার বছৰ। আর তাতেই সবাই কেমন মাথা নাড়ছে। আমি ইদরিশের দিকে তাকিয়ে বললাম, ইদরিশ মিয়া, গাছ তো দেখা হল, চল যাওয়া যাক।

আমার কথায় মনে হল সবাই খুব অবাক হচ্ছে।

ইদরিশ হতভম্ব গলায় বলল, এখন যাইবেন কি? গাছ তো দেখাই হইল না। তার উপরে, মাস্টার স্নাবরে খবর দেওয়া হইছে। আসতাছে।

আমার চারপাশে সতেরো আঠারোজন মানুষ আর একপাল উলঙ্গ শিশু। অচিন বৃক্ষের লাগোয়া বাড়ি থেকে বৌ-ঘিরা উকি দিচ্ছে। একজন এক কাঁদি ডাব পেড়ে নিয়ে এল। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, কালো রঞ্জের বিশাল একটা চেয়ারও একজন মাথায় করে আনছে। এই গ্রামের এটাই হয়ত একমাত্র চেয়ার। অচিন বৃক্ষ যাঁরা দেখতে আসেন তাদের সবাইকে এই চেয়ারে বসতে হয়।

অচিন বৃক্ষের নিচে চেয়ার পাতা হল। আমি বসলাম। কে—একজন হাতপাথা দিয়ে আমাকে প্রবল বেগে হাওয়া করতে লাগল। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব চলে এলেন। বয়স অল্প, তবে অল্প বয়সেই গালটাল ভেঙে একাকার। দেখেও মনে হয়ে জীবনযুক্তে পরাজিত একজন মানুষ। বেঁচে থাকতে হয় বলেই বেঁচে আছেন। ছাত্র পড়াচ্ছেন। হেডমাস্টার সাহেবের নাম মুহুম্মদ কুদুস। তাঁর সম্বৰত হাঁপানি আছে। বড় গড় করে শুস নিচ্ছেন। নিজেকে সামলে কথা বলতে অনেক সময় লাগল।

স্যারের কি শহিল ভাল?

জ্বি ভাল।

আসতে একটু দেরি হইল। মনে কিছু নিবেন না স্যার।
না মনে কিছু নিছ্ব না।

বিশিষ্ট লোকজন শহর থাইক্যা অচিন বৃক্ষে আসে, কড় ভাল লাগে। বিশিষ্ট লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

আপনি ভুল করছেন ভাই। আমি বিশিষ্ট ক্ষেত্র নই।

এই তোমরা স্যারকে হাত-পা ধোয়ার পানি দেও নাই, বিষয় কি?

হাত-পা ধুয়ে কি হবে? আবাব তে কালো ভাঙতেই হবে।

হেডমাস্টার সাহেব অত্যন্ত বিশ্বিত হলেন, খাওয়া-দাওয়া করবেন না? আমাব বাড়িতে পাক-শাক হইতেছে। চাইরটা ডাল-ভাজ, বিশেষ কিছু না। গেরাম দেশে কিছু জোগাড়যন্ত্রও করা যায় না। বিশিষ্ট মেহমানরা আসেন। গত বৎসর যয়মনসিংহের এ ডি সি সাহেব আসছিলেন। এডিসি বেঙ্গলুরু। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। অচিন বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এক হাজার টাকা দেওয়ার শয়দা করলেন।

তাই না-কি?

জ্ঞি। অবশ্যি টাকা এখনো পাওয়া যায় নাই। এরা কাজের মানুষ। নানান কাছের চাপে ভুল গেছেন আর কি। আমাদের মত তো না মে কাজকর্ম কিছু নাই। এদেব শতেক কাজ। তবু ভাবতেছি একটা পত্র দিব। আপনে কি বলেন?

দিন। চিঠি দিয়ে মনে করিয়ে দিন।

আবাব বিবক্ত হন কি-না কে জানে। এরা কাজের মানুষ, চিঠি দিয়ে বিবক্ত করাও ঠিক না। এই চায়ের কি হইল?

চা হচ্ছে না-কি?

জ্ঞি, বানাতে বলে এসেছি। চায়ের ব্যবস্থা আমাব বাড়িতে আছে। মাঝে-মধ্যে হয়। বিশিষ্ট মেহমানরা আসেন। এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিৰ এক প্রফেসোৱ সাহেব এসেছিলেন, বিৱাট জ্ঞানী লোক। এদেব দেখা পাওয়া তো ভাগ্যেৰ কথা, কি বলেন স্যার?

তা তো বটেই।

চা চলে এল।

চা খেতে খেতে এই গ্রামেৰ অচিন বৃক্ষ কী কৰে এল সেই গাঞ্জ হেডমাস্টার সাহেবেৰ কাছে শুনলাম। এক ডাইনী না-কি এই গাছেৰ উপৰ 'সোয়ার' হয়ে আকাশপথে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাৰ পানিৰ পিপাসা হয়। এইখানে সে নামে। পানি খেয়ে তৃষ্ণা নিবারিত কৰে। পানি ছিল বড়ই যিঠা। ডাইনী তখন সন্তুষ্ট হয়ে গ্রামেৰ লোকদেব বলে, তোমাদেৰ যিঠা পানি খেয়েছি, তাৰ প্ৰতিদানে এই গাছ দিয়ে গেলাম। গাছটা যত্ন কৰে বাখবে। অনেক অনেক দিন পৰে গাছে ফুল ধৰবে। তখন তোমাদেৰ দুঃখ থাকবে না। এই গাছেৰ ফুল স্বৰূপে মহোষ্ঠ। একদিন উপাস থেকে খালি পেটে এই ফুল খেলেই হবে।

আমি বিবক্ত হয়ে কললাম, আপনি এই গাঞ্জ বিশ্বাস কৰেন?

হেডমাস্টার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, বিশ্বাস কৰব না কেন? বিশ্বাস না কৰাব তো কিছু নাই।

যে যুগে মানুষ চাঁদে হাঁটাহাঁটি কৰছে সেই যুগে আপৰি বিশ্বাস কৰছেন গাছে চড়ে ডাইনী এসেছিল?

জগতে অনেক আচানক ব্যাপার হয় জনাব। যেমন ধৰেন ব্যাঞ্জেৰ মাথায ঘণি যে ঘণি সাত রাজ্ঞাব ধন। অস্তকাৱ রাতে ব্যাঞ্জ এই ঘণি পৰি পৰি থেকে বেৱ কৰে। তখন চাৰদিক আলো হয়ে যায়। আলো দেখে পোকাৱা আসে। ব্যাঞ্জ সেই পোকা ধৰে ধৰে থায়।

আপনি ব্যাঞ্জেৰ ঘণি দেখেছেন?

জি জনাব। মিজের চোখে দেখা। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীৰ ছাত্ৰ।

আমি চুপ কৰে গেলাম। যিনি ব্যাঙ্গেৰ মণি নিজে দেখেছেন বলে দাবি কৰেন তাঁৰ সঙ্গে
কুসংস্কাৰ নিয়ে তর্ক কৰা বৃথা। তাহাড়া দেখা গেল ব্যাঙ্গেৰ মণি তিনি একাই দেখেননি —
'আমাৰ আশেপাশে যারা দাঙিয়ে আছে তাদেৱ অনেকেও দেখেছে।'

দুপুৰে হেডমাস্টাৰ সাহেবেৰ বাসায় খেতে গেলাম। আমি এবং ইদবিশ। হেডমাস্টাৰ
সাহেবেৰ হতদৰিদৰ অবস্থা দেখে মনটাই খাবাপ হয়ে গেল। প্ৰাইমাৰী স্কুলেৰ একজন
হেডমাস্টাৰ সাহেবেৰ ষদি এই দশা হস্ত তখন অন্যদেৱ না-জ্ঞানি কি অবস্থা। অৰ্থচ এৰ মধ্যেই
পোলাও রাঙ্গা হয়েছে। মুৰগিৰ কোৱামা কৰা হয়েছে। দৰিদ্ৰ মানুষটাৰ অনেকগুলি টাকা বেৰ
হয়ে গেছে এই বাবদে।

আপনি এসেছেন বড় ভাল লাগতেছে। অজ্ঞ পাড়াঁগায়ে থাকি। দু' একটা জ্ঞানেৰ কথা
নিয়ে যে আলাপ কৰব সেই সুবিধা নাই। চাৰদিকে মূৰ্খেৰ দল। অচিন বৃক্ষ থাকায় আপনাদেৱ
মত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰা আসেন। বড় ভাল লাগে। কিছু জ্ঞানেৰ কথা শুনতে পারি।

বেচাৰা জ্ঞানেৰ কথা শুনতে চায়। কোন জ্ঞানেৰ কথাই আমাৰ মনে এল না। আমি
বললাম, রাঙ্গা তো চমৎকাৰ হয়েছে। কে বেঁধেছে, আপনাৰ স্ত্ৰী ?

জি না জনাব। আমাৰ কনিষ্ঠ ভগী। আমাৰ স্ত্ৰী খুবই অসুস্থ। দীৰ্ঘদিন শ্যাশ্যায়ী।
সে-কি ?

হাটেৰ বালুৰে সমস্যা। টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তারৰা বলেছেন, লাখ দুই টাকা খৰচ
কৰলে একটা-কিছু কৰা যাবে। কোথায় পাব এত টাকা বলেন দেখি।

আমি চুপ কৰে গেলাম।

হেডমাস্টাৰ সাহেব সহজ ভঙ্গিতে বললেন, আপনি যখন আসছেন আমাৰ স্ত্ৰীৰ সঙ্গে
দেখা কৰিয়ে দিব। সে শহৰেৰ মেয়ে। মেট্ৰিক পাস।

তাই না-কি ?

জি। মেট্ৰিক ফাস্ট ডিভিশন ছিল। টোটেল মাৰ্ক ছয়শ' এগাৰো। জেনারেল অংকে
পেয়েছে ছিয়াত্তৰ। আৱ চাৰটা নম্বৰ হলে লেটাৰ হত।

হেডমাস্টাৰ সাহেব দীৰ্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

ওৱ আবাৰ লেখালেখিৰ শখ আছে।

বলেন কি ?

শ্বীৰটা যখন ভাল ছিল তখন কবিতা লিখত। তা এই মূৰ্খেৰ জৰুৰীয় কবিতাৰ মত
জিনিস কে বুঝবে বলেন ? আপনি আসছেন দু'একটা পড়ে দেখবেন।

জি নিশ্চয়ই পড়ব।

মহসিন সাহেব বলে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি একটি কবিতাৰ কপি কৰে নিয়ে
গিয়েছিলেন। বলেছিলেন অনেক পত্ৰিকাৰ সাথে তাঁৰ যোগাযোগ আছে, ছাপিয়ে দিবেন।

ছাপা হয়েছে ?

হয়েছে নিশ্চয়ই। কবিতাটা ভাল ছিল, নদীৱ উপৰে লেখা। পত্ৰিকা টত্ৰিকা তো এখানে
কিছু আসে না। জ্ঞানাৰ উপায় নাই। একটা পত্ৰিকা পড়তে হলে যেতে হয় যশাখালিৰ

বাজার চিন্তা করেন অবস্থা। শেখ সাহেবের মৃত্যুর ঘবর পেয়েছি দুদিন পর, বুধবার অবস্থা।

অবস্থা তো খারাপ বলেই মনে হচ্ছে।

তাও অচিন বৃক্ষ ধাকায় দুনিয়ার সাথে একটা যোগাযোগ আছে। আসেন ভাইসাব, আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলেন। সে শহরের যেয়ে। যয়মনসিংহ শহরে পড়াশোনা করেছে।

আমি অস্বত্তি বোধ করতে লাগলাম অপরিচিতি অসুস্থ একজন মহিলার সঙ্গে আমি কী কথা বলব? ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে অচিন বৃক্ষ দেখতে যাঁরা আসেন তাঁদের সবাইকে এই মহিলার সঙ্গেও দেখা করতে হয়।

মহিলার সঙ্গে দেখা হল।

মহিলা না বলে মেয়ে বলেই উচিত। উনিশ-কুড়ির বেশি বয়স হবে না। বিছানার সঙ্গে মিলে আছে। মানুষ নয় যেন মিশরের ময়ি। বিশিষ্ট অভিধিকে দেখে তার মধ্যে কোন প্রাপচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল না। তবে বিড় বিড় করে কী যেন বলল। হেডমাস্টার সাহেব তার মুখের কাছে ঝুকে পড়লেন। পরক্ষণেই হাসি মুখে বললেন, আপনাকে সালাম দিচ্ছে।

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। কিছু-একটা বলতে হয় অথচ বলার মত কিছু পাছি না। মেয়েটি আবার বিড়বিড় করে কী যেন বলল, হেডমাস্টার সাহেব বললেন — বেনু বলছে আপনার খাওয়া—দাওয়ার খুব কষ্ট হল। ওর কথা আব কেউ বুঝতে পাবে না। আমি পাবি।

আমি বললাম, চিকিৎসা হচ্ছে তো? না—কি এমনি রেখে দিয়েছেন?

হেডমাস্টার সাহেব এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মেয়েটি বিড়বিড় করে আবারো কী যেন বলল। হেডমাস্টার সাহেব বুঝিয়ে দিলেন — ও জিজ্ঞেস করছে অচিন বৃক্ষ দেখে খুশি হয়েছেন কি-না।

আমি বললাম, হয়েছি। খুব খুশি হয়েছি।

মেয়েটি বলল, ফুল ফুটলে আবেকবাব আসবেন। ঠিকানা দিয়ে যান। ফুল ফুটলে আপনাকে চিঠি লিখবে।

মেয়েটি এই কথাগুলি বেশ স্পষ্ট করে বলল, আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। আমি বললাম, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি যাই।

হেডমাস্টার সাহেব আমাকে এগিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। আমি বাজু জলাম না। এই ভদ্রলোকের এখন উচিত তার স্ত্রীর কাছে থাকা। যত বেশি সময় তার স্ত্রীর পাশে থাকবে ততই মস্তক। এই মেয়েটির দিনের আলো যে নিভে এসেছে তা যে-কেউ বলে দিতে পারে।

আমি এবং ইদরিশ ফিরে যাচ্ছি।

আসার সময় যতটা কষ্ট হয়েছিল ফেরার সময় ক্ষতটা না। আকাশে মেঘ করায় রোদের হাত থেকে বক্ষা হয়েছে। তার উপর ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। ইদরিশের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগুচ্ছি।

আমি বললাম, হেডমাস্টার সাহেব তাৰ স্ত্ৰীৰ চিকিৎসা কৰাচ্ছে না ?
কৰাইতাছে। বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল সব গেছে পৱিবাবেৰ পিছনে। অখন বাড়ি-ভিটা
পর্যন্ত বদৰক।

তই ন-কি ?

ঙ্গি ! এই যানুষ্ঠা পৱিবাবেৰ জন্যে পাগল। সাবা বাহ্তু ঘূমায় না। স্ত্ৰীৰ ধাৰে বইস্যা
থাকে। আৱ দিনেৰ মধ্যে দশটা চকৰ দেয় অচিন বৃক্ষেৰ কাছে।

কেন ?

ফুল ফুটেছে কি-না দেখে। অচিন বৃক্ষেৰ ফুল হইল অখন শেষ ভবসা।

আমি দীৰ্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

খেয়াঘাটেৰ সামনে এসে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। দেখা গেল হেডমাস্টার সাহেব
ছুটতে ছুটতে আসছেন। ছুটে-আসাজনিত পৱিশৰ্মে খুবই কাহিল হয়ে পড়া একজন যানুষ
যাব সাবা শৰীৰ দিয়ে দৰদৰ কৰে ঘাম ঘৰছে। ছুটে আসাৰ কাৰণ হচ্ছে স্ত্ৰীৰ কৰিতাৰ খাতা
আমাকে দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন। মনে পড়ায সঙ্গে কৰে নিয়ে এসেছেন।

আমোৱা একটা অশুখ গাছেৰ ছায়াৰ নিচে বসলাম। হেডমাস্টার সাহেবকে খুশি কৰাৰ
জন্যেই দুনস্বৰী খাতাৰ প্ৰথম পাতা থেকে শেষ পাতা পৰ্যন্ত পড়ে বললাম, খুব ভাল হয়েছে।

হেডমাস্টার সাহেবেৰ চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি দীৰ্ঘ সময় চুপ কৰে থেকে
বললেন, এখন আৱ কিছু লিখতে পাৰে না। শৰীৰটা বেশি খাবাপ।

আমি বললাম, শৰীৰ ভাল হলে আবাৰ লিখবেন।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, আমিও বেনুকে সেইটাই বলি, অচিন বৃক্ষেৰ ফুল ফুটাৰও
বেশি বাকি নাই। ফুল ফুটাৰ আগে পঢ়া শ্যাওলাৰ গঞ্জ ছাড়াৰ কথা। গাছ সেই গঞ্জ ছাড়া শুকু
কৰেছে। আৱ কেউ সেই গঞ্জ পায় না। আমি পাই।

আমি গভীৰ মমতায ভদ্ৰলোকেৰ দিকে তাৰিয়ে রইলাম।

তিনি ইতন্তু কৰে বললেন, প্ৰথম কৰিতাটা আৱেকৰাৰ পড়েন স্যাব। প্ৰথম কৰিতাটাৰ
একটা ইতিহাস আছে।

কী ইতিহাস ?

হেডমাস্টার সাহেব লাজুক গলায বললেন, বেনুকে আমি তখন প্ৰাইভেট পড়াই।
একদিন বাড়িৰ কাজ দিয়েছি। বাড়িৰ কাজেৰ খাতা আমাৰ হাতে দিয়ে দেৱড়েল্যান্ড পালাইল।
আব তো আসে না। খাতা খুইল্যা দেখি কৰিতা। আমাৰে মিয়া লেৰা কী সৰ্বমাশ বলেন
দেখি। যদি এই খাতা অন্যেৰ হাতে পড়ত, কি অবস্থা হইত বলেন ?

অন্যেৰ হাতে পড়বে কেন ? বুদ্ধিমত্তী মেয়ে, সে দিবেআপনোৱ হাতেই।

তা ঠিক। বেনুৰ বুদ্ধিৰ কোন মা-বাপ নাই। কি বুদ্ধিৰেকি বুদ্ধি ! তাৰ বাপ-মা বিয়ে ঠিক
কৰল — ছেলে পৃবালী ব্যাংকেৰ অফিসাৰ। চেহাৰামুকত জল। ভালু বৎশ। পান চিনি হয়ে
গেল। বেনু চুপ কৰে বইল। তাৰপৰ একদিন তামি ঝপ্পৰে গভীৰ বাতে ধূম থেকে ডেকে বলল,
মা তুমি আমাৰে বিষ জোগাড় কইৱা দেও। আমিৰ বিষ খাৰ। বেনুৰ মা বললেন, কেন ? বেনু
বলল, আমি একজনৰে বিবাহ কৰব কথা দিছি, এখন অন্যেৰ সঙ্গে বিবাহ হইতেছে। বিষ

ছাড়া আমার উপায় নাই। কতবড় মিথ্যা কথা, কিন্তু বলল ঠাণ্ডা গলায়। এই বিষে ভেঙ্গে গেল রেনুব মা-বাবা তাড়াহুড়া করে আমার সঙ্গে বিষে দিলেন। নিষ্পের ঘরের কথা আপনাকে বলে ফেললাম, আপনি স্যার মনে কিছু নিবেন না।

না — আমি কিছু মনে করিনি।

সবাইবেই বলি। বলতে ভাল লাগে।

হেডমাস্টারের চোখ চকচক করতে লাগল। আমি বললাম, আপনি ভাববেন না। আপনার স্ত্রী আবাব সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তিনি জড়নো গলায় বললেন, একটু দোষা করবেন স্যার। ফুলটা যেন তাড়াতাড়ি ফুটে।

পড়স্ত বেলায় খেয়া নৌকার উঠলাম। হেডমাস্টার সাহেব মৃত্তির মত ওপারে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই এক ধরনের প্রতীক্ষার ভঙ্গি আছে। সেই প্রতীক্ষা অচিন বৃক্ষের অচিন ফুলের জন্যে। যে প্রতীক্ষায় প্রহব গুগছে হতদরিদ্র গ্রামের অন্যসব মানুষরাও। এবং কী আশ্চর্য, আমার মত কঠিন নাস্তিকের মধ্যেও সেই প্রতীক্ষার ছায়া। নদী পার হতে হতে আমার কেবলি মনে হচ্ছে — আহা ফুটুক। অচিন বৃক্ষে একটি ফুল হলেও ফুটুক। কত রহস্যময় ঘটনাই তো এ পৃথিবীতে ঘটে। তার সঙ্গে যুক্ত হোক আরো একটি।

হেডমাস্টার সাহেকও পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। তার হাতে হাতীর ছবি আঁকা দুনস্বরী একটা কবিতার খাতা। দূর থেকে কেন জানি তাঁকে অচিন বৃক্ষের মত লাগছে। হাতগুলি যেন অচিন বৃক্ষের শাখা। বাতাস পেয়ে দূলছে।

নিশ্চিকাব্য

পরী মেয়েকে ঘূম পাড়িয়ে বাইরে এসে দেখে চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে। চিকমিক করছে চারদিক। সে ছোট্ট একটি নিঃশ্঵াস ফেলল। এরকম জ্যোৎস্নায় মন খারাপ হয়ে যায়।

বেশ বাত হয়েছে। খাওয়া—দাওয়ার পাট চুকেছে অনেক আগে। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। শুধু আজিজ, সাপ খেলানো সুবে পরীক্ষার পড়া পড়ছে। পরীর এখন আর কিছুই করার নেই। সে একাকী উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল।

কি করছ ভাবী?

পরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল হারিকেন হাতে রুনু এসে দাঁড়িয়েছে। সে হালকা গলায় বলল, ঘুমুবে না ভাবী?

ঘুমুব। দাঁড়া একটু। কি চমৎকাব জ্যোৎস্না দেখলি?

হ্যাঁ।

আয় রুনু, তোকে একটা জিনিস দেখাই।

কি জিনিস?

এই দেখ জামগাছটার কেমন ছায়া পড়েছে। অমিকুল মানুষের মত না? হাত-পা সবই আছে।

ওয়া, তাই তো। রুনু তবল গলায় হেসে উঠল।

পরী বলল, কুয়োত্তলায় একটু বসবি না কি রে রুনু? চল বসি গিয়ে।

তোমার মেয়ে জেগে উঠে যদি ?

বেশিক্ষণ বসব না, আয় ।

কুয়োত্তলাটি বাড়ি থেকে একটু দূরে। তার দুপাশে দুটি প্রকাণ শিরীষ গাছ। জ্বায়গাটা
বড় নিবিলি কনু বলল, কেমন অঙ্ককার দেখেছ ভাবী ? ভয় ভয় লাগে ।

দূর, ভয় কিসের। বেশ হাওয়া দিছে, তাই না ?

হ্যাঁ ।

দুঃখনেই কুয়োর বাধানো পাশ্টায় চুপচাপ বসে রহল। যিরবিব বাতাস বইছে। বেশ
লাগছে বসে থাকতে। পরী কি মনে করে যেন হঠাতে খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসছ কেন ভাবী ?

এম্বি। বাস্তায় একটু হাঁটবি নাকি ?

কোথায় ?

চল না, হাঁটতে হাঁটতে পুকুর পাড়ের দিকে যাই। বেশ লাগছে না জ্যোৎস্নাটা ?

কনু সে কথার জ্বাব না দিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, দেখ ভাবী, কে যেন দাঁড়িয়ে
আছে প্রিথানটায় ?

শিরীষ গাছের নিচে যেখানে ঘন হয়ে অঙ্ককার নেমেছে, সেখানে সাদা মত কি-একটি
যেন নড়ে উঠল।

কে ওখানে ? কথা বলে না যে, কে ?

কেউ সাড়া দিল না। কনু পরীব কাছে সবে এল। ফিসফিস করে বলল, ভাবী, ছেট
ভাইজানকে ডাক দাও ।

তুই দাড়া না, আমি দেখছি। ভয় কিসের এত ?

সাহস দেখাতে হবে না ভাবী, তুমি ছোট ভাইজানকে ডাক ।

শিরীষ গাছের নিচের ঘন অঙ্ককার থেকে একটা লোক হেসে উঠল। হাসির শব্দ শুনেই
কনু বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, বড় ভাইজান এসেছে। বড় ভাইজান এসেছে ।

পর মুহূর্তেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়িতে খবর দিতে ।

আনিস সুটকেস কুয়োত্তলায় নামিয়ে পরীর পাশে এসে দাঢ়াল। পরী কিছুক্ষণ কোন
কথা বলতে পারল না। তার কেন জানি চোখে পানি এসে পড়ল ।

তুকুন ভাল আছে, পরী ?

হ্যাঁ ।

আব তুমি ?

ভাল। অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন ?

তোমাদের আসতে দেখে দাঢ়ালাম। কি মনে করেছিলে তুম্হুক ? পরী তার জ্বাব না
দিয়ে হঠাতে নিচু হয়ে কদম্বুসি করল। আনিস অপ্রস্তুত হয়ে আসল ।

কি যে কর তুমি পরী, লজ্জা লাগে ।

ততক্ষণে হারিকেন হাতে বাড়ির স্বাই কেরাতে এসেছে। পরী বলল, তুমি আগে যাও।
সুটকেস থাক, রশীদ নিয়ে যাবে ।

আনিস হাসিমুখে হাঁটতে লাগল ।

বাড়ির উঠোনে আনিস এসে দাঁড়াতেই আনিসের মা কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অভ্যাসই এরকম। যে কোন খুশির ব্যাপারে মরাকান্না কাঁদতে বসেন। কেউ ধরক দিয়ে না থামালে সে কান্না থেমে না। আনিসের বাবা চেঁচিষ্টে বললেন, একটা জলচৌকি এনে দে মা কেউ, বসুক সবগুলি হয়েছে গাধ। কনু হা করে দেখছিস কি পাখা এনে হাওয়া কর।

আনিসের ছেটভাই আজিঞ্জ কলল, খবর দিয়ে আসে নাই কেন দাদা? খবর দিলেই ইস্টিশনে থাকতাম।

আনিস কিছু বলল না। ভূতোর ফিতা খুলতে লাগল। আনিসের মার কান্না তখনো থামেনি। এবার আজিঞ্জ ধরক দিল।

আহ মা, তোমার ঘ্যানঘ্যানানি থামাও।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কান্না থেমে গেল। সহজ ও শাভাবিক গলায় তিনি বললেন, তোর শরীরটা এত খারাপ হল কি করে রে আনিস? পেটের ঐ অসুখটা সারেনি? চিকিৎসা করাছিস তো বাবা?

সবাই লক্ষ্য করল আনিসের শরীর সত্ত্য খারাপ হয়েছে। কষ্টাব হাড় বেরিয়ে গেছে। গাল ভেতরে বসে গেছে। আনিসের বাবা বললেন, স্বাস্থ্য খারাপ হবে না, মেসের খাওয়া। পাঁচ বছর মেসে থাকলাম, জানি তো সব। বুঝলে আনিসের মা, মেসে খাওয়ার ধারাই ঐ।

পরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আনিসের জন্য নতুন করে রাঙ্গা চড়াতে হবে। তবু তার ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। পরীর শাশুড়ি এক সময় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ওকি বৌমা, সংয়ের মত দাঁড়িয়ে আছে কেন? রাঙ্গা চড়াও গিয়ে। তার আগে আনিসকে চা দাও এক কাপ।

পরী অপ্রস্তুত হয়ে রাঙ্গাঘরে চলে এল। কনু এল তার পিছু পিছু।

কনু হেসে বলল, আমি চা বানিয়ে আনছি, তুমি ভাইজানের কাছে থাক ভাবী। পরী লজ্জা পেয়ে হাসল।

তুই তো ভাবী ফাঁজিল হয়েছিস কনু।

হয়েছি তো হয়েছি। তোমাকে একটা কথা বলি ভাবী।

কি কথা?

কনু ইতস্তত করতে লাগল। পরী আবাক হয়ে বলল, বল না কি বলবি।

বাবা আমার যেখানে বিয়ে ঠিক করেছেন সেটা আমার পছন্দ না ভাবী। ভাইজানকে বুঝিয়ে বলবে তুমি। দোহাই তোমার।

পরী আশ্চর্য হয়ে বলল, পছন্দ হয়নি কেন কনু? ছেলেটা তো বেশ ভালোই। কত জ্যাগাজ্য আছে। তার উপর স্ফূলে মাস্টারি করে।

কুকুক। আমার একটুও ভাল লাগেনি। কেমন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছিল দেখতে এসে। না না ভাবী, তোমার পায়ে পড়ি।

আচ্ছ আচ্ছা, পায়ে পড়তে হবে না। আমি বলবি।

কনু খুশি হয়ে বলল, তুমি বড় ভাল মেয়ে।

তাই নাকি?

ঁ। ভাইজান হঠাতে আসায় তোমার খুব খুশি লাগছে তাই না?

পরী জ্বাব না দিয়ে মুখ নিচু করে হাসতে লাগল।

কল না ভাবী খুব খুশি লাগছে?

লাগছে।

কনু ছেট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। থেমে থেমে বলল, ভাইজানের চাকরিটা বড় বাজে।
বৎসরে দশটা দিন ছুটি নেই। গত ঈদে পর্যন্ত আসল না।

পরী কিছু বলল না। চাহের কাপে চিনি ঢালতে লাগল।

কনু বলল, এবাব ভূমি বাসা করে ভাইজানের সঙ্গে থাক ভাবী। মেসের খাওয়া থেঁয়ে
তার শরীরের কি হাল হয়েছে, দেখেছ?

পরী মনুষের বলল, দুই জায়গায় খবচ চালানো কি সহজ কথা? অল্প কটা টাকা পায়।
চা হয়ে গেছে, নিয়ে যা রে কনু।

কনু চা নিয়ে এসে দেখে তার বিয়ে নিয়েই আলাপ হচ্ছে। বাবা বলছেন, ছেলে হল
তোমার বি.এ. ফেল। তবে এবাব প্রাইভেট দিছে। বংশটংশ খুবই ভাল। ছেলের এক মামা
ময়মনসিংহে ওকালতী করেন। তাকে এক ডাকে সবাই চিনে।

আনিসের মা বলছেন, ছেলে দেখতে-শুনতে খারাপ না — ঝণ্টা একটু যাজা। পুরুষ
মানুষের ফর্সা বঙ্গ কি আর ভাল? ভাল না।

আনিস বলল, কনুর পছন্দ হয়েছে তো? তার পছন্দ হলে আর আপন্তি কি?

পাশের বাড়ি থেকে আনিসের ছোট চাচা এসেছেন খবর পেয়ে। তিনি বললেন, কনুর
আবাব পছন্দ-অপছন্দ কি? আমাদের পছন্দ নিয়ে কথা।

আনিস কনুর দিকে তাকিয়ে হাসল। লজ্জা পেয়ে কনু চলে এল বামাঘরে।

আনিসের বাবা বললেন, কাল বিকালে না হয় ছেলেটাকে খবর দিয়ে আনি। তুই দেখ।

কাল বিকাল পর্যন্ত তো থাকবো না বাবা। আজ শেষ রাতেই যাব।

মে কি?

ছুটি নিয়ে আসিনি তো। কোম্পানি একটা কাজে পাঠিয়েছিল ময়মনসিংহ। অনেকদিন
আপনাদের দেখি নাই। কাজটাও হয়ে গেল সকাল সকাল। তাই আসলাম।

একটা দিন থাকতে পারিস না?

উঞ্চ! কাল অফিস ধরতেই হবে। প্রাইভেট কোম্পানি, বড় ঝামেলার চাকরি।

আনিস একটা নিঃশ্বাস ফেলল। সবাই চূপ করে গেল হঠাৎ। চার মাস পুর এসেছে
আনিস। আবাব কবে আসবে কে জানে। আনিসের মা কাপা গলায় বললেন, তোর বড়
সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে দে না।

আনিস হেসে উঠল। গায়ের শার্ট খুলতে খুলতে বলল, বড়কুস্তি যাদ কোনমতে টের পায়
আমি বাড়িতে এসে বসে আছি তাহলেই চাকরি নট হয়ে যাবে। তুমসল করব মা, গা কুটকুট
করছে।

কুয়োয় করবি? পানি তুলে দেবে?

উঞ্চ, পুরুরে করব। পুরুরে মাছ আছে কে আঁকড়িজ?

আছে ভাইজান। বড় বড় মৃগেল মাছ আছে।

আনিসের পিছু পিছু পুকুর পাড়ে সবাই এসে পড়ল। আনিসের বাবা আব মা পাড়ে বসে বইলেন। আজিজ “ভীষণ গরম লাগছে” এই বলে আনিসের সঙ্গে গোসল করতে নেয়ে গেল। ঝুনু ঘাটের উপর তোয়ালে আব সাবান নিয়ে অপেক্ষা করছে। আনিসের সবচেয়ে ছোট বোন ঝুনু, ঘূমিয়ে পড়েছিল। আনিস ভোর রাত্রে চলে যাবে শুনে তার ঘূম ভাঙানো হয়েছে। সেও এসে চুপচাপ কুনূর পাশে বসেছে। শুধু পরী আসেনি। দুটি চুলোয় বান্না চাপিয়ে সে আগনের আঁচে বসে আছে একাকী।

থাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে অনেক বাত হল। আনিসকে ধিরে গোল হয়ে সবাই বসে গল্প করতে লাগল। উঠোনে শীতল পাটিতে বসেছে গল্পের আসব। এর মধ্যে কৃশ্ণলী পাকিয়ে কুনু ঘূমছে। চমৎকার চাঁদনি সেই সঙ্গে মিটি হাওয়া। কারুর উঠতে ইচ্ছে করছে না। পরীর কাঞ্জ শেষ হয়নি। সে বাসন-কোসন নিয়ে শুতে গেছে ঘাটে। এক সময় কুনু বলল, ভাইজান এখন ঘুমোতে থাক মা। বাত শেষ হতে দেরি নেই বেশি। আনিসের বাবা বললেন, হ্যা, হ্যা যা রে তুই ঘুমুতে যা। কুনু তুই বৌ-মাকে পাঠিয়ে দে। বাসন সকালে ধূলেই হবে।

ঘরের ভিতর হারিকেন জলছিল। আনিস সলতা বাড়িয়ে দিল। টুকুন কৃশ্ণলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আনিস চুমু খেল তার কপালে। পরীর দিকে তাকিয়ে বলল, জ্বর নাকি টুকুনের? হ্য।

কবে থেকে?

কাল থেকে। সদি জ্বর। ও কিছু না। ঘাম দিচ্ছে, এক্ষুণি সেরে যাবে। আনিস পরীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। পরীর লজ্জা করতে লাগল। পরী বলল, হাসছো কেন?

এম্বি। পরী তোমার জন্যে শাড়ি এনেছি একটা। দেখ তো পছন্দ হয় কি—না।

পরী খুশি খুশি গলায় বলল, অনেকগুলি পয়সা খরচ করলে তো।

শাড়িটা পর, দেখি কেমন তোমাকে মানায়।

কুনুর জন্যে একটা শাড়ি আনলে না কেন? বেচারীর একটাও ভাল শাড়ি নেই।

পয়সায় কুলোলে আনতাম। আরেকবার আসার সময় আনব।

পরী ইতস্তত করে বলল, আমার একা একা শাড়ি নিতে লজ্জা লাগবে। এইটি কুনুর জন্যে থাক। আবেকবার নিয়ে এসো আমার জন্যে।

আনিস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বেশ থাক তবে, আজ রাতের জন্যে পরী না দেখি?

শাড়ির ভাঁজ ভেঙে যাবে যে। কুনু মনে করবে আমার জন্যে এনেছেন পরে তাকে দিয়েছ।

আচ্ছা, তাহলে থাক।

পরী লজ্জিত স্বে বলল, বিয়ের শাড়িটা পরবো? যদি যন্তে তাহলে পরি।

পরী লজ্জায় লাল হয়ে ট্রাঙ্কের তালা খুলতে লাগল। আনিস বলল, টুকুন দেখতে তোমার মত হয়েছে, তাই না?

হ্যা, আব্বা তাকে ছোট পরী ডাকে। অঙ্গু টুকুনের একটা ভাল নাম রাখ না কেন?

জরী রাখব তার নাম।

জরী আবার কেমন নাম?

তোমার সঙ্গে মিলিয়ে বাখলাম। পরীর মেয়ে জরী।

পরী হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, অন্য দিকে তাকিয়ে থাক, শাড়ি বদলাব।
কি হয় অন্য দিকে না তাকালে?

আহ শুধু অসভ্যতা।

আনিস ঘাথা নীচু করে টুকুনকে আদর করতে লাগল। পরী হালকা গল্পায় বলল, দেখ
তো কেমন লাগছে?

একেবারে লাল পরী।

ইশ, শুধু টাট্টা।

রাস্মাঘর থেকে দুপথুপ শব্দ উঠছে।

আনিস বলল, এত রাতে ধান কূটছে কেন?

ধান কূটছে না চাল ভাঙছে। তোমার জন্যে পিঠা তৈবি হবে।

মিশ্চয়ই কুনূর কাণ।

আনিস পরীর হাত ধরে তাকে কাছে ঢানল। পরীর চোখে আবার পানি এসে পড়ল।
গাঢ়স্বরে বলল, আবার কবে আসবে?

ভুলাই যাসে।

কতদিন থাকবে তখন?

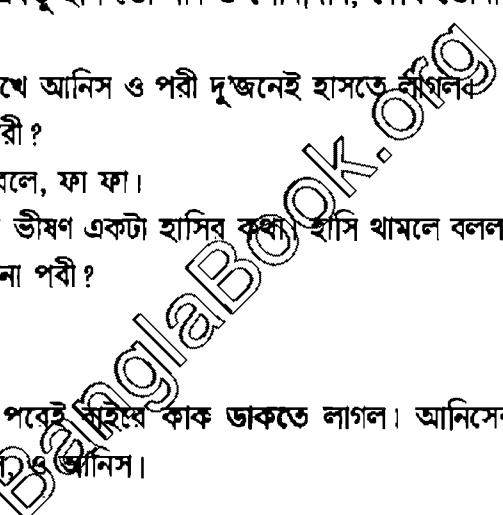
অ-নে-ক দিন।

তুমি এত রোগা হয়ে গেছ কেন? পেটের এই ব্যথাটা এখনো হয়?

হয় মাঝে মাঝে?

টুকুন কেঁদে জেগে উঠল। পরী বলল, জ্বর আরো বেড়েছে। ও টুকুন সোনা, কে এসেছে
দেখ। দেখ তোমার আবু এসেছে।

আনিস বলল, আমার কোলে একটু দাও তো পরী। আরে আরে মেয়ের একটা দাত
উঠেছে দেখছি। কি কাণ। ও টুকুন, ও জরী, একটু হাস তো মা। ও সোনামণি, দেখি তোমার
দাতটা?

টুকুন তারস্বরে চেঁচাতে লাগলো। তাই দেখে আনিস ও পরী দুজনেই হাসতে  আমার জরী সোনা কথা শিখছে নাকি, পরী?

হ্য। মা বলতে পারে। আর পাখি দেখলে বলে, ফা ফা।

আনিস হো হো করে হেসে উঠল — যেন ভীষণ একটা হাসির কব্বা। হাসি থামলে বলল,
আমার জরী তোমার চেয়েও সুন্দর হবে। তাই না পরী?

আমি আবার সুন্দর নাকি?

না, তুমি ভীষণ বিশ্বী।

আনিস আবার হেসে উঠল। তার একটু পয়েন্ট করিয়ে কাক ডাকতে লাগল। আনিসের
বাবার গলাব আওয়াজ পাওয়া গেল। ও আনিস ও আনিস।

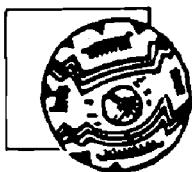
ছি আবু।

এখন রওনা না দিলে ট্রেন ধরতে পারবি না বাবা।

আনিস টুকুনকে শুইয়ে দিল বিছানায়। পরী কোন কথা বলল না। আনিস বাইবে বেরিয়ে দেখল চাঁদ হেলে পড়েছে জ্যোৎস্না পিংকে হয় এসেছে। বিদায়ের আয়োজন শুরু হল ঘুমস্ত ঝুনুকে আবার সুম থেকে টেনে তোলা হল। সে হঠাতে বলে ফেলল, ভবী আজ বিয়ের শাড়ী পরেছে কেন?

কেউ তার কথার কোন অবাব দিল না। যানুষের সুধ-দুধের সাথী আকাশের চাঁদ। পরীকে অহেতুক লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যেই হয়তো একধণ বিশাল মেঘের আড়ালে তার সকল জ্যোৎস্না লুকিয়ে ফেলল।

লয়া লয়া পা ফেলে এগিয়ে চলল আনিস। শেষ রাতের ট্রেনটা যেন কিছুতেই মিস না হয়।



কৃষ্ণপক্ষ

হানিফ দাঁড়িয়ে আছে জারুল গাছের নিচে।

জ্যাম্বাটা বেশ সুবিধাজনক, গাছ-গাছড়ায় ঝুপড়ির মত হয়ে আছে — দূর থেকে তাকে দেখার উপায় নেই। টর্চের আলো ফেললেও বোৰা যাবে না। কিছু কিছু বে-আক্রেল লোক টর্চের আলো রাস্তায় ফেলার বদলে আশেপাশের ঝোপঝাড়েও ফেলে। তবে আশাৰ কথা হল, টর্চওয়ালা লোক এই অঞ্চলে নেই বললেই হয়। যে দুএকজন আছে তারা ব্যাটারি বাঁচাবার জন্যে খুট করে খানিকটা আলো ফেলেই টর্চ নিভিয়ে ফেলে।

তত্ত্ব মাস।

তালপাকা গরম পড়েছে। হানিফের গায়ে মার্কিন কাপড়ের মোটা পাঞ্চায়ী। গা অসুস্থ ঘামছে। অবশ্যি এই রকম অবস্থায় সব সময় তাঁর গা ঘামে। মাঘ মাস হলেও ঘামজোড়া ধরনের কোন কাজের আগে আগে তাঁর এমন হয়। যানুষ মারা সহজ কোন কাছে না। বড় কাজ।

হানিফ দাঁড়িয়ে আছে নওয়াবগঞ্জের মুনশি রইসুন্দিন নামের একজন লোককে খুন করার অন্যে। মুনশি রইসুন্দিনকে সে চেনে না। লোকটা ভাল কি মদ তাও জানে না। তবে মদ হবারই সম্ভাবনা। ভাল নির্বিরোধী কোন যানুষকে কেউ খুন কৰতে চায় না।

অবশ্যি লোকটি ভাল হলেও কিছু যায় আসে না। কাঞ্জিটা করে দিলে হানিফ পাঁচ হাজার টাকা পাবে — এটাই আসল কথা। পাঁচ হাজারের মধ্যে এক হাজার তাকে দেয়া হয়েছে। যাকি চার হাজার কাজ শেষ হলে পাওয়া যাবে। অঙ্গুষ্ঠাকাজ শেষ হলে আজ রাতেই। এইসব ব্যাপারে টাকা-পয়সা নিয়ে কেউ ঝামেলা করে না। মাঝে মাঝে বেশি পাওয়া যায়।

তিনি বছর আগে এই রকম একটা কাজের জন্যে দুই হাজার টাকা বেশি পাওয়া গেল : ছহাজাবেব চুক্তি হয়েছিল। পুরো টাকাটা পাওয়াৰ পৰ হানিফ বলল, বকশিশ দেবেন না ? মোৰাবক শাহ নমেৰ আধবুড়ো মানুষটা অতি ক্রুত মাধা নাড়তে নাড়তে বলল, অবশ্যই দিব . তৎক্ষণাৎ দুহাজার টাকা দিয়ে ক্ষম গলায় বলল, আপনে খুশি তো ?

এই একটা যজ্ঞার ব্যাপার — কাজ শেষ হবাৰ পৰ তাকে আপনি আপনি কৰে বলা হয়। এৰ আগে তুমি হানিফেৰ ধাৰণা ভয়েৱ চোটে আপনি বলে।

হানিফ মোৰাবক শাহ নমেৰ বুড়ো লোকটাকে বলেছিলো, আমি বসতেছি। কাজ ঠিকমত সমাধান হয়েছে কি-না খোজ নিস্বে আসেন, তাৰপৰ ঘাব।

মোৰাবক শাহ চমকে উঠে বলেছিল, তাৰ দৱকাৰ হবে না। আপনেৰ কথা ঘোল আনা বিশ্বাস কৰতেছি। আপনাৰ বসতে হবে না, আপনি যান।

একটু বসি। এক কাপ চা থাই।

মোৰাবক শাহ ফ্যাকাশে মুখে বলেছে, চায়েৰ আঘোজন বাঢ়িতে নাই। আপনে দোকানে গিয়া চা খান। ভাংতি টাকা দিতাছি। এই বলে পাঁচ টাকার ময়লা একটা নোট বেৰ কৰে দিল। হানিফ নোটটা পকেটে রাখতে রাখতে মনে মনে হেসেছে। লোকটাৰ ভয় দেখতে মজা লাগছে, হাৰামজাদা, মানুষ মারবাৰ সময় খেয়াল ছিল না ?

আপনে তা হইলে এখন যান। বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না।

হানিফ উদাস গলায় বলল, কোন অসুবিধা নাই।

আপনে হইলেন বিদেশী লোক, আপনেৰে সন্দেহ কৰবো।

আৱে না, কী সন্দেহ কৰবো ? এত বড় গঞ্জ, বিদেশী লোক তো থাকবই। এক গ্লাস পানি দিতে বলেন।

পানি দিতেছি। পানি খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান।

পানি খাওয়াৰ পৰও হানিফ যায় না। জৰ্দা দিয়ে পান খেতে চায়। পান মুখে দিয়ে বিড়ি ধৰায়। উদাস ভঙ্গিতে টানতে থাকে।

আসলে কাজ শেষ হবাৰ পৰপৰই জ্বায়গা ছেড়ে চলে যেতে তাৰ ইচ্ছা কৰে না। বড়ই ক্লান্ত লাগে। ঘূৰ পায়। তাছাড়া এইসব ঘটনাৰ পৰ কি সব কথাবাৰ্তা বটে সেইগুলিৰ শুনতে ইচ্ছা কৰে। থানা থেকে পুলিশ সাহেব এসে চারদিকে মিথ্যা আতঙ্ক জাগিয়ে ভোলে। একে ধমকায়, তাকে ধমকায় — এইগুলি দেখতে ভাল লাগে। পুলিশ সাহেবেৰ মুখ দৃঢ় এবং রাগ বাগ ভাব ফুটাতে চেষ্টা কৰেন, কিন্তু পারেন না। পুলিশ সাহেবেৰ মুখ দেখতে যনে হয় তিনি গভীৰ আনন্দ বোধ কৰছেন। খুন-খাৰাবি মানেই তাঁদেৱ পকেটে বিছুক্তটা পয়সা। কাজেই এইসব ঘটনায় তাঁৰা আনন্দিতই হবেন। এটাই স্বাভাৱিক। খুন কৰ কৰে হলেও দশ-বারো জনকে খৰে হাজতে পুৱে দিবেন। এদেৱ ছাড়াতে টাকা জাগিবে, খুনৰ শক্তদেৱ টাকা দিতে হবে। যে খুন হয়েছে তাৰ আত্মীয়-বস্তনদেৱও টাকা খৰত কৰতে হবে। টাকাৱই খেলা।

পায়েৰ কাছে মড়মড় শব্দ হল। হানিফ চমকে খানিকটা সৱে গেল। সাপ-খোপ হত্তে পারে। ভাস্তু মাস হল সাপেৰ মাস। গৱামে অঙ্গুষ্ঠ হয়ে গৰ্ত ছেড়ে বেৰ হয়। হানিফেৰ সঙ্গে একটা টৰ্চ আছে। আলো ফেলে দেখবে না—কি বাপোৱটা কি ? না, সেটা ঠিক হবে না।

আশেপাশে কেউ নেই। টর্চ ছলালেও কোন ক্ষতি হবে না, তবু সাবধান থাকা ভাল। পয়ে
ঝিখি ধরে গেছে। কতকথ ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে তা নিজে ধরতে পাবছে না। মাঝে মাঝে
মনে হয় সময় কঠিছেই ন, আবর মাঝে ধরে ঘনে হয় অতি ক্ষত কেটে যাচ্ছে।

হানিফ বসল।

হাতের আঙুল আঙুল করে সিগারেট ধরাল। পকেটে দশটা সিগারেট নিয়ে
এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। এখন সিগারেট আছে তিনটা। সাতটা এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেছে।
এব থেকে মনে হচ্ছে রাত কম হয়নি। হানিফ রুমাল দিয়ে ঘায মুছল। অন্য সময়ে এতটা
ঘায়ে না। আজ্ঞ বড় বেশি ঘামছে। মুখের ভেতরটাও মোনতা লাগছে। মানুষের মুখের
ভেতরেও কি ঘায হয়? মনে হয়, হয়। না হলে মুখের ভেতর মোনতা লাগত না।

ঘূটঘূটে অঙ্ককার।

কৃষ্ণপক্ষের বাত, অঙ্ককার হবেই। আকাশে যেহ খাকায় নক্ষত্রের আলোও নেই। খুন
করার জন্যে সময়টা ভাল না। এই বকম অঙ্ককার রাতে ভুল-ভাস্তি হয়। ভুল লোক মারা
পড়ে। চাঁদনি রাতে হলে ভুল-ভাস্তি হয় না। কে আসছে দূর থেকে দেখা যায়। সবচে' ভাল
হয় দিনের বেলা। তবে এই জাতীয় কাজ-কর্ম দিনের আলোয় হয় না বললেই হয়।

কৃষ্ণপক্ষে কাজ করতে হবে বললেই হানিফ গতকাল সন্ধ্যায় দুই ব্যাটারীর এই টর্চ
লাইটটা কিনেছে। কাজ করার আগে মুখে আলো ফেলে দেখে নিতে হবে লোক ঠিক আছে
কি-না। একবার আলো ফেললেই চিনতে পারবে। আলো না-ফেলে হাটা দেখেও চিনতে
পারবে — লোকটা হাঁটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ডান পায়ে কোন দোষ-টোষ মনে হয় আছে।

লোকটাকে সে যাতে চট করে চিনতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গতকাল তার সঙ্গে আলাপও
করেছে। লোকটা প্রতিদিন ভোর আটটার ট্রেনে মোহনগঞ্জ থেকে যায় বারহাটা, ফিরে রাত
দশটার ট্রেনে। দলিল লেখক। দলিল লেখকরা সাধাবণত হতদিন্তি হয়, — এ সেই শ্রেণীর না।
এর পয়সা-কড়ি ভাল আছে। বাড়িতে টিনের বড় বড় দুটো ঘর। বাংলাঘরের পশ্চিমদিকে
টিউবওয়েল। লম্বা বাঁশের আগায় এন্টেনা দেখে বোঝা যায় টেলিভিশন আছে। নিচয়ই
ব্যাটারীতে চালায়। এই অঞ্চলে এখনো ইলেক্ট্রিসিটি আসেনি। ব্যাটারীতে টিভি চল্যানো
শ্বরচান্ত ব্যাপার। তবে লোকটা কঞ্চিৎ ধরনের। গতকাল সকালে কিছুক্ষণ সঙ্গে থাকায় ক্ষেত্রে
স্বভাবচরিত্র পরিষ্কার বোঝা গেছে। হানিফ ডিস্ট্রিট বোর্ডের সড়কে তার অপেক্ষার দাঁড়িয়ে
ছিল। মোহনগঞ্জ রেলস্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যাবে, এতে চেহারাটা মনে রাখা হয়ে যাবে।
অঙ্ককারেও চিনতে অসুবিধা হবে না।

লোকটা মাটির দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে ডিস্ট্রিট বোর্ডের সড়কে উঠে এল।
হানিফ সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভাইজ্ঞানের সঙ্গে যাচ্চাক্ষর আছে(?) একটা সিগারেট ধরাব।
বইসুন্দিন সক চোখে তাকাল। নিতান্ত অনিচ্ছায় দেয়াশালার পুর বাবু বের করল। হানিফ তার
সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। হাসি মুখে বলল, কৰ্ম ভাইজ্ঞান, আপনেও একটা ধৰান।
লোকটা তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। মিঠান্ত অপরিচিত একজন মানুষের কাছ
থেকে সিগারেট নিতে বিদ্যুমাত্র সংকোচ বা দিব্য দেখাল না। কঞ্চিৎ প্রকৃতির লোকজনের এই
হচ্ছে লক্ষণ। যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে নেয়া।

হানিফ বলল, ইস্টিশানের দিকে যান না—কি ভাইজান ?

হ্যাঁ।

অর্থি একজন চাউলেব পাইকর। চাউল কিনতে আসছিলাম, দরে বনল না। এই দিকে চাউলেব দর বেশি।

হ্যাঁ।

লোকটা সব কথার জ্বাব এক অক্ষরে দিচ্ছে। কপুষ ধরনের মানুষদের এটাও এক ধরনের আচরণ। মুখের কথাও তাদের কাছে টাকা-পয়সাব মতন। সহজে খরচ করতে চায় না। লোকটা বাজারে ঢোকার মুখে এক খিলি পান কিনল। হানিফ সঙ্গে আছে। একবার জিঞ্জেস করল না পান খাবে কি-না।

অথচ কিছুক্ষণ আগেই তার কাছ থেকে সিগাবেট নিয়ে বিনা দ্বিধায় খেয়েছে। আশ্চর্য লোক।

হানিফ দুপুরের দিকে রইসুন্দিনের বাড়িতে গিয়েও উপস্থিত হল। এটা তার দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। কাজকর্ম করার আগে ও বাড়িতে একবার যাবেই। রইসুন্দিনের বাড়িতের তার পছন্দ হল। হিন্দু বাড়ির মত পরিষ্কার-পরিচ্ছম বাড়ি। ফুটফুটে একটা সবুজ জামা-পরা মেয়ে বাংলাঘরের উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। হানিফ মধুর গলায় বলল, ও মা তুমি এই বাড়ির ?

হ।

আমার জন্য গেলাসে কইরা পানি আন তো, তিয়াশ লাগছে।

মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। কেমন হেলতে—দুলতে যাচ্ছে। দেখতে ভাল লাগছে। পাঁচ-ছয় বছর বয়স হবে, কিন্তু পরিষ্কার কাজকর্ম। কি সুন্দর করে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। মেয়েটি ফিবে এল খালি হাতে। চিকন সুরে বলল, চাপকল থাইক্যা পানি খাইতে কইছে।

আচ্ছা আচ্ছা। তুমি চাপ কলে চাপ দেও আমি পানি খাই।

মেয়েটি খুব উৎসাহেব সঙ্গে কলে চাপ দিয়ে পানি বের করল। মনে হল সে পানি বের করার কাজটায় খুব মজা পায়।

তোমার নাম কি গো ?

ময়না।

বড় ভাল নাম — ময়না। রইসুন্দিন সাব তোমার কে হয় ?

বাজান হয়।

আচ্ছা আচ্ছা ভাল।

হানিফের একটু মন খারাপ হল। ঘটনা ঘটে গেলে এই মেয়ে নিশ্চয়ই ডাক ছেড়ে কাঁদবে। কাঁদলেও কিছু করার নেই। ঘটনা সে না ঘটালে অন্য কেউ ঘটাবে। ব্যাপার একই। মাঝখান থেকে এতগুলি টাকা হাতছাড়া হবে। টাকার খুবই দলভূক। হাত এখন একবারে খালি। তার বৌ খানিকটা সৌধিন ধরনের মেয়ে, অভাব সহ্য করতে পারে না। একবেলা উপাস দিলেই চিকির করে বাড়ি মাথায় তুলে। ছেলেমাহিঙ্গাকে ধরে ধরে পিটায়। সাপের মত ফোস ফোস করতে করতে বলে — সব সব।

টাকাটা পাওয়া গেলে মাস ছয়েকেব জন্য নিশ্চিন্ত। শ্যামগঞ্জ বাজারের মেয়ে মানুষটা ব কাছেও তাহলে ইঙ্গিত নিয়ে যাওয়া যাবে। মেয়ে মানুষটা বড় ভুঁচ করছে। গত মাসে একবাব গিয়েছিল, দরজা থেরে কঠিন গলায় বলল, আইজ জান শিয়া, ঘরে লোক আছে।

হানিফ আবাব সিগারেট ধরাল। আব একটা মাত্র বাকি আছে। শেষ সিগারেটটা ধরানো যাবে না। কাজের শেষে একটা সিগারেট ধৰাতেই হয়। টিপটিপ করে বৃটি পড়ছে। সিগারেটের আঙুন খুব সাবধানে বৃটির ফেঁটা থেকে আড়াল করে রাখতে হচ্ছে। বৃটির ফেঁটায় আঙুন নিতে গেলে সিগারেট আব ধৰানো যাবে না। রাতের ট্রেইন আসতে আজ এত দেরি করছে কেন কে জানে। লোকাল ট্রেইনগুলির আসা-যাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। খুব বেশি দেরি করলে বইসুন্দিন নামের রোগা কঢ়ুম লোকটা হয়ত আসবেই না। বারহাট্টায় আত্মীয় বাড়িতে থেকে যাবে। আরো একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। এইসব কাজে অপেক্ষার যত্নণা বড় যত্নণা। একবাব এই রকম একটা কাজে এগারো দিন অপেক্ষা করা লাগলো। লোকটাকে কিছুতেই একা পাওয়া যায় না। সঙ্গে সব সময় একজন না একজন থাকে। অতি সাবধানী লোক। এত সাবধান হয়েও অবশ্যি শেষ রক্ষা হয়নি। কপাল মরণ লেখা থাকলে সাবধান হয়েও লাভ হয় না। লক্ষ্মির লোহার ঘর বানিয়েও বাঁচতে পারেনি।

এই লোক অবশ্যি সাবধানী না। একা একাই ঘোরাফিরা করে। তার এত বড় একজন শক্ত আছে তা বোধ হয় জানেও না। না জানাই ভাল। জানলে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। মৃত্যুভয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। তাছাড়া মরাটা ভয়াবহ কিছু না। একদিন না একদিন সবাইকেই মরতে হবে। রোগে ভূগে বিছানায় শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে মরার চেয়ে এইভাবে মরে যাওয়া ভাল। কষ্ট অনেক কম। মৃত্যুর পথ শহীদের দরজা পাওয়ারও একটা সম্ভাবনা থাকে। অপঘাতে মৃত্যু হলে শহীদের দরজা পাওয়া যায় — মৌলানা সাহেব একবাব ওয়াজে বলেছিলেন। অপঘাতে মৃত্যু আব পেটের অসুখে মৃত্যু। এই দুয়ের জন্যে আছে শহীদের দরজা। মৌলানা সাহেবদের সব কথা কেন জানি বিশ্বাস হতে চায় না। পেটের অসুখে মৃত্যু হলে শহীদের দরজা পাওয়া যাবে কি জন্যে? কারণটা কি? সত্তি হলে অবশ্যি ভালই হয়। তাহলে বড় মেয়েটা শহীদের দরজা পায়। মেয়েটা মারা গেল পেটের ব্যথায়। কোন চিকিৎসা করাতে পারেনি। কি চিকিৎসা করাবে, হাতে নাই একটা পর্যন্ত। মেয়েটা ছটফট করেছে আব বলেছে — বাজান, আমারে ডাঙ্কারেব কাছে লইয়া যাও।

হানিফ নিয়ে গিয়েছিল। ডাঙ্কার সাহেব গঞ্জীর মুখে বলেছিলেন — পেট কাটা লাগবে। তিন হাজার টাকা ধৰচ হবে কমসে কম। আছে টাকা? না থাকলে স্বৰক্ষী হাসপাতালে ভতি করে দে।

হানিফ তাও পারেনি। মেয়েটা কোলের উপর ছটফট করতে করতে মরল। বড় মেয়েটার মৃত্যুর পর মানুষ মারাব প্রথম কাজটা হানিফ করবে। যে মনুষটাকে প্রথম মারে তার নাম ছিল দৰীর। মরাব সময় সেও অবিকল তার মেয়ের মৃত্যু ছটফট করতে করতে হানিফকে কলল, আফনে আমারে ডাঙ্কারেব কাছে লইয়া যান।

কি আশ্চর্য কথা। যে তার পেটে ছোরা বসিলেছে তাকেই অনুরোধ করছে ডাঙ্কারেব কাছে নিয়ে যেতে। মৃত্যুর সময় মানুষ অসুস্থ অসুস্থ কাণ্ডকারখানা করে। কেন করে কে

জানে? এক লোকের পেটে ছোরা বসাবাব পর দুঃহাতে পেট চেপে বসে পড়তে পড়তে খুবই অবাক-হওয়া গলায় জিজ্ঞেস করেছিল — ভাইজান আপনের নাম কি?

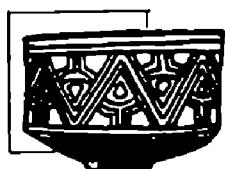
মৃত্যুর সময় মানুষের মাথায় বোধ হয় কিছু-একটা হয়। সব গোলমাল হয়ে যায়। তাব বড় মেঝেরও তাই হয়েছিল। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল — বাজান, আপনে হাসতাছেন ক্যান। কি হইছে?

হানিফ তখন হাসছিল না। চিংকার করে কাঁদছিল। সেই কান্না মৃত্যুর সময় দেয়েটার কাছে হাসি হয়ে থরা পড়ল।

পিপড়া কামড়াচে।

রাতে পিপড়া কামড়ায় না, কিন্তু এখন কামড়াচে কেন কে জানে? হানিফ ঘোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল রইসুন্দিন আসছে। পা টেনে টেনে আসছে।

হানিফ ছেটু নিষ্পাস ফেলল। শেষ সিগারেটা রংগে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ধরানো যাবে। তবে দিয়াশলাই ভিজ্বে গেছে। ভেঙ্গা দিয়াশলাই দিয়ে এ সিগারেট ধরানো সমস্যা হতে পারে, এই নিয়েই সে খানিকটা চিন্তিত এবং বিষণ্ণ।



ছায়াসঙ্গী

প্রতি বছর শীতের ছুটির সময় ভাবি কিছুদিন গ্রামে কাটিয়ে আসব। দলবল নিয়ে যাব — হৈচৈ করা যাবে। আমার বাচ্চারা কখনও গ্রাম দেখেনি — তারা খুশি হবে। পুরুরে আপাঞ্জাপি করতে পারবে। শাপলা ফুল শুধু যে মতিঝিলের সামনেই ফোটে না, অন্যান্য জায়গাজোড়ে ফোটে তাও স্বচক্ষে দেখবে।

আমার বেশির ভাগ পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি না। এটা কৈফন করে জানি লেগে গেল। একদিন সত্তি সত্তি রওনা হলাম।

আমাদের গ্রামটাকে অঙ্গ পাড়াগী বললেও সম্মান দেখানো অসম যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন সুন্দর সময়েও সেখানে পৌছতে হয় গরুর গাড়িতে। বর্ষার সুম্মতি নোকা, তবে মাঝখানে একটা হাওড় পরে বলে সেই যাত্রা অগন্ত্যযাত্রার মত।

অনেকদিন পর গ্রামে শিয়ে ভাল লাগল। দেখলাম আমার বাচ্চাদের আনন্দ বর্ধনের সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। কোথেকে যেন একটা হাড় জোরজোরে বেতো ঘোড়া জোগাড় করা হয়েছে। এই ঘোড়া নড়াচড়া করে না, এক জ্যাগত দাঁড়িয়ে থাকে। খুব বেশি বিরক্ত হলে দীর্ঘ

নিঃশ্বাসের মত একটা শব্দ করে এবং লেজটা নাড়ে। বাচ্চবা এত বড় একটা জীবন্ত ফ্রেনা পেয়ে যহাখুশি, দুর্ভিলজ্ঞ এক সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে থাকে।

তাদের অসংখ্য বক্তু-বাক্তবও জুটে গেল যেখানেই যায় তাদের সঙ্গে গেটি পঞ্চাশেক হেলেপুলে থাকে। আমার বাচ্চারা যা করে তাতেই তারা চমৎকৃত হয়। আমার বাচ্চারা তাদের বিপুল জনপ্রিয়তায় অভিভূত। তারা তাদের যাবতীয় প্রতিভা দেখাতে শুরু করল — কেউ কবিতা বলছে, কেউ পান, কেউ ছড়া।

আমি একগাদা বই সঙ্গে করে নিয়ে নিয়েছিলাম। আমার পরিকল্পনা — পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়া। শুষ্ঠে-বসে বই পড়া, শুর বেশি ইচ্ছা করলে খাতা-কলম নিয়ে বসা। একটা উপন্যাস অর্ধেকের মত লিখেছিলাম, বাকিটা কিছুতেই লিখতে ইচ্ছা করছিল না। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। নতুন পরিবেশে যদি লিখতে ইচ্ছা করে।

প্রথম কিছুদিন বই বা লেখা কোনটাই নিয়ে বসা গেল না। সাধারণত লোকজ্ঞ আসছে। তারা অত্যন্ত গভীর গলায় নানা জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী। এসেই কলবে — ‘দেশের অবস্থাড়া কি কন দেহি ছোড় মিয়া। বড়ই চিঞ্চাযুক্ত আছি। দেশের হইলড়া কি? কি দেশ ছিল আর কি হইল?’

দিন চার-পাঁচকের পর সবাই বুঝে গেল দেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। গল্প-গুজ্জবও তেমন করতে পারি না। তারা আমাকে রেহাই দিল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। গ্রামের নতুন পরিবেশের কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক আমি লেখালেখির প্রবল আগ্রহ বোধ করলাম। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসলাম, সারাদিন লেখালেখি কাটাকুটি করি। সক্ষ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বের হই। চমৎকার লাগে। প্রায় রাতেই একজন দুর্জন করে ‘গাতক’ আসে। এরা জ্যোৎস্নাভেজা উঠোনে বসে চমৎকার গান ধরে —

“ও মনা

এই কথাটা না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।

না না না — আমি প্রাণে বাঁচতাম না।”

সময়টা বড় চমৎকার কাটতে লাগল। লেখার ব্যাপারে আগ্রহ বাঢ়তেই লাগল। সারাদিনই লিখি।

এক দুপুরের কথা — একমনে লিখছি। জ্ঞানালার ওপাশে খুট করে শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি খালি গায়ে রোগামত দশ-এগার বছরের একটা ছেলে গভীর আগ্রহে অংশীয় দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে আগেও দেখেছি। জ্ঞানালার ওপাশ থেকে গভীর কৌতুহলে সে আমাকে দেখে। চোখে চোখ পড়লেই পালিয়ে যায়। আজ পালাল না।

আমি বললাম — কি বে?

সে মাথাটা চট করে নামিয়ে ফেলল।

আমি বললাম — চলে গেলি নাকি?

ও আড়াল থেকে বলল — না।

‘নাম কি বে তো?’

‘মন্ত্রাঞ্জ মিয়া।’

‘আয়, ভেতরে আয়।’

BanglaBook.org

'না।'

আর কোন কথাবার্তা হল না। আমি লেখায় ডুবে গেলাম। ঘূঘূ ডাকা শ্রান্ত দুপুরে
লেখালিখির আনন্দই অন্য রকম। মন্তাজ্জ মিয়াব কথা ভুলে গেলাম।

পরদিন আবাব এই ব্যাপার। জ্বানালাব ওপাশে মন্তাজ্জ মিয়া বড় বড় কেতুহলী চোখে
তাকিয়ে আছে। আমি বললাম — কি ব্যাপার মন্তাজ্জ মিয়া? আয় ভেতবে।

সে ভেতবে তুকল।

আমি বললাম, ধাকিস কোথায়?

উত্তরে পোকা খাওয়া দাঁত বের করে হাসল।

'স্কুলে যাস না?'

আবাব হাসি। আমি খাতা থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে তাৰ হাতে দিলাম। সে তাৰ
এই বিৱল সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে গেল। কি কৰবে বুঝতে পারছে না! কাগজটার গন্ধ
শুকল। গালেৰ উপৰ খানিকক্ষণ চেপে ধৰে বেথে উক্কাব বেগে বেরিবে গেল।

বাতে খেতে খেতে আমাৰ ছেটি চাচা বললেন — মন্তাজ্জ হারামজ্জাদা তোমাৰ কাছে নাকি
আসে? আসলে একটা চড় দিয়ে বিদায় কৰবে।

'কেন?'

'বিৱাট চোৱ। যাই দেখে তুলে নিয়ে যায়। ত্ৰিসীমানায় ঘেঁষতে দিবে না। দুইদিন পৰপৰ
যাব খায়। তাতেও ঈশ্ব হয় না। তোমাৰ এখানে এসে কৰে কি?'

'কিছু কৰে না?'

'চুবিৰ সঙ্গানে আছে। কে জানে এব মধ্যে হয়ত তোমাৰ কলম-টলম নিয়ে নিয়েছে।'

'না কিছু নেয়নি।'

'ভাল কৰে খুঁজে-টুঁজে দেখ। কিছুই বলা যায় না। ঐ ছেলেৰ ঘটনা আছে।'

'কি ঘটনা?'

'আছে অনেক ঘটনা। বলব এক সময়।'

পৰদিন সকালে ফখারীতি লেখালিখি শুরু কৰেছি। হৈচৈ শুনে বেৰ হয়ে এলাম। অবাক
হয়ে দেৰি মন্তাজ্জ মিয়াকে তিনচাৰজন চ্যাংদোলা কৰে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা ফুঁপাছে
বোঝাই যাচ্ছে প্ৰচণ্ড মার খেয়েছে। ঠোট ফেটে রক্ত পড়ছে। একদিকেৰ গাল ফুলে আছে।

আমি বললাম, কি ব্যাপার?

শাস্তিদাতাদেৱ একজন বলল, দেখেন তো এই কমলটা আপনেৰ কৰ্মন্বা। মন্তাজ্জ
হারামজ্জাদাৰ হাতে ছিল।

দেখলাম কলমটা আমাৰই। চাৰ-পাঁচ টাকা দামেৰ বল পয়েন্ট অমন কোন শহীদ বস্তু
নয়। আমাৰ কাছে চাহিলেই দিয়ে দিতাম। চুৱি কৰাৰ প্ৰয়োজন নহৈল না। মন্টা একটু খারাপই
হল। বাচ্চা বয়সে ছেলেটা এমন চুৱি শিখল কেন? বড় হৰি এ কৰবে কি?

'ভাইসাব, কলমটা আপনার?'

'হ্যা। তবে আমি এটা ওকে দিয়ে দিয়েছি। ছিঁড়ে দিন। বাচ্চা ছেলে, এত ঘাৰধৰ
কৰেছেন কেন? মাৰাধৰ কৰাৰ আগে আমাকে ভজ্জেস কৰে নেবেন না?'

শাস্তিদাতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, এই মাইবে শুর কিছু হয় না। এইভা এব কাছে পানিস্তান। মাইব না খাইলে এর ভাস্ত হস্তম হয় না।

মন্তাজ মিয়া বিস্মিত চোখে আমাকে দেখছে। তাকে দেখেই মনে হল সে তাৰ স্কুল জীবনে এই প্ৰথম একজনকে দেখছে যে চুবি কৰাৰ পৰও তাকে চোৱ বলেনি। মন্তাজ মিয়া নিঃশব্দে বাকি দিনটা জানলার ওপাশে বসে রইল। অন্যদিন তাৰ সঙ্গে দু'একটা কথাবাৰ্তা বলি। আজ একটা কথাও বলা হল না। মেজাজ খাবাপ হয়েছিল। এই বয়সে একটা ছেলে চুবি শিখবে কেন?

মন্তাজ মিয়াৰ ষে একটা বিশেষ ঘটনা আছে তা জানলায় আমাৰ ছোট চাচীৰ কাছে। চুৱিৰ ঘটনাৰও দু'দিন পৰ। গ্ৰামেৰ মানুষদেৱ এই একটা অস্তুত ব্যাপার। কোন্ ঘটনা যে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কেনটা তুচ্ছ তা এৱা বুৰাতে পাৰে না। মন্তাজ মিয়াৰ জীবনেৰ এত বড় একটা ব্যাপার কেউ আমাকে এতদিন বলেনি অথচ তুচ্ছ সব বিষয় অনেকবাৰ কৰে শোনা হয়ে গেছে।

মন্তাজ মিয়াৰ ঘটনাটা এই —

তিন বছৰ আগে কাঠিক ঘাসেৰ মাঝামাঝি মন্তাজ মিয়া দুপুৰে প্ৰবল জ্বৰ নিয়ে বাড়ি ফেৰে। সেই জ্বৰেৰ প্ৰকোপ এতই বেশি যে শেষ পৰ্যন্ত মন্তাজ মিয়াৰ হতদৰিপ্ৰি বাবা একজন ডাঙ্কাৰও নিয়ে এলেন। ডাঙ্কাৰ আনাৰ কিছুক্ষণেৰ মধ্যেই মন্তাজ মিয়া মাৰা গেল। গ্ৰামে জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই বেশ স্বাভাৱিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা হয়। মন্তাজ মিয়াৰ মা কিছুক্ষণ চিৎকাৰ কৰে কাঁদল। তাৰ বাবাৰ খানিকক্ষণ — ‘আমাৰ পুত্ৰ কই গেল রে’ বলে চেঁচিয়ে স্বাভাৱিক হয়ে গেল। বেঁচে থাকাৰ প্ৰবল সংগ্ৰামে তাৰেৰ লোগে থাকতে হয়। পুত্ৰশোকে কাতৰ হলে চলে না।

মাৰা মানুষ যত তাড়াতাড়ি কৰৰ দিয়ে দেয়া হয় ততই নাকি সোয়াৰ এবং কৰৰ দিতে হয় দিনেৰ আলো থাকতে থাকতে। কাজেই জুম্মা ঘৰেৰ পাশে বাদ আসৱ মন্তাজ মিয়াৰ কৰৰ হয়ে গেল। সব কিছুই খুব স্বাভাৱিকভাৱে।

অস্বাভাৱিক ব্যাপারটা শুক হল দুপুৰ রাতেৰ পৰ। যখন মন্তাজ মিয়াৰ বড় বোন রহিমা কলমাকান্দা থেকে উপস্থিত হল। কলমাকান্দা এখান থেকে একুশ মাইল। এই দীৰ্ঘ পথ একটি গৰ্ভবতী মহিলা পায়ে হেঁটে চলে এল এবং বাড়িতে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলল, ‘তোমৰা কৰছ কি? মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে। কৰৰ খুইড়া তাৰে বাইৱ কৰ। দিৱং কৰবা না।

বলাই বাহ্য্য, কেউ তাকে পাতা দিল না। শোকে—দুঃখে মানুষেৰ মাঝা খুলাপঁ হয়ে যায়। কৰৰ দিয়ে দেয়াৰ পৰ নিকট আত্মীয়-স্বজনবা সব সময় বলে — ‘তাৰে নাই।’ কিন্তু মন্তাজ মিয়াৰ বোন রহিমা এই ব্যাপারটা নিয়ে এতই হৈ-চৈ শুক কৰল যে সবাই বাধ্য হল মৌলানা সাহেবকে ডেকে আনতে।

রহিমা মৌলানা সাহেবেৰ পায়ে গিয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে — আপনে এৱে বাঁচান। আপনে না বললে কৰৰ খুত্ত না। আপনে রাঙ্গি না হওয়া পৰ্যন্ত আমি পাৰ ছাড়তাম না। মৌলানা সাহেব আমেক চেষ্টা কৰেও রহিমাকে ঘোঁড়ে ফেলতে পাৱলেন না। রহিমা বজ্জ আঁটুনিতে পা ধৰে বসেৱহল।

মৌলানা সাহেব বিৱৰণ হয়ে বললেন — বাঁইচ্যা আছে বুঝলা ক্যামনে?

রহিমা ফৌপাতে ফৌপাতে বলল, আমি জানি।

গ্রামের মৌলানারা অতি কঠিন হস্তয়েব হয় বলে আমাদের একটা ধারণা আছে। এই ধারণা সত্যি নয়। মৌলানা সাহেব বললেন — প্রয়োজনে কবর দ্বিতীয়বাব খেঁড়া জায়েভ আছে। এই ঘেয়ের মনের শান্তির জন্যে এটা কবা যায়। হাদিস শব্দিয়ে আছে..

কবর খেঁড়া হল।

ভয়াবহ দশ্য !

মস্তাজ মিয়া কবরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখে প্রবল আলো পড়ায় চোখ মেলতে পারছে না। কাফনের কাপড়ের একখণ্ড লুঙ্গির মত পেঁচিয়ে পরা। অন্য দুটি খণ্ড সুন্দর করে ভাঁজ করা।

অসংখ্য মানুষ জমা হয়ে আছে। এই অবিশ্বাস্য দশ্য দেখে কারো মুখে কোন কথা সরল না। মৌলানা সাহেব বললেন — কি বে মস্তাজ ?

মস্তাজ যদু স্ববে বলল, পানির পিয়াস লাগচ্ছে।

মৌলানা সাহেব হাত বাড়িয়ে তাকে কবর থেকে তুললেন।

এই হচ্ছে মস্তাজ মিয়াব গল্প। আমি আমার এই জীবনে অস্তৃত গল্প অনেক শুনেছি। এবকম কখনো শুনিনি।

ছেট চাচাকে বললাম, মস্তাজ তারপর কিছু বলেনি ? অঙ্ককার কবরে জ্ঞান ফিরবার পর কি কি দেখল না দেখল এইসব ? .

ছেট চাচা বললেন — না। কিছু কয় না। হারামজাদা বিবাট বজ্জাত।

‘জিজ্ঞেস করেননি কিছু ?’

‘কত জনে কত জিজ্ঞেস করছে। এক সাংবাদিকও আসছিল। ছবি তুলল। কত কথা জিজ্ঞেস করল — একটা শব্দ করে না। হারামজাদা বদের হাজি !’

আমি বললাম, কবর থেকে ফিরে এসেছে — লোকজন তাকে ভয়-টয় পেত না ?

‘প্রথম প্রথম পাইত। তারপর আর না। আল্লাহত্তায়ালার কূদরত। আল্লাহত্তায়ালার কেরামতি আমরা সামান্য মানুষ কি বুঝব কও?’

‘তা তো বটেই। আপনারা তার বোন রহিমাকে জিজ্ঞেস করেননি সে কি করে বুঝতে পারল মস্তাজ বেঁচে আছে?’

‘জিজ্ঞেস করার কিছু নাই। এইটাও তোমার আল্লাহর কূদরত। উনার কেরামতি।’

ধর্ম-কর্ম করুক বা না করুক, গ্রামের মানুষদের আল্লাহত্তায়ালার ‘কূদরত এবং কেরামতি’ উপর অসীম ভঙ্গি। গ্রামের মানুষদের চরিত্রে চমৎকার সমাজিক আছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এরা প্রচুর মাতামাতি করে, আবার অনেক বড় বড় ঘটনা হজর করে। দার্শনিকের মত গলায় বলে ‘আল্লাহর কূদরত’।

আমি ছেট চাচাকে বললাম, রহিমাকে একটু খবর দিয়ে আনানো যায় না ? ছেট চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ?

‘কথা বলতাম।’

‘খবর দেওয়ার দরকার নাই। এন্নেই আসব।

‘এন্নিষেই আসবে কেন ?’

ছেট চাচা বললেন — তুমি পুলাপান নিয়া আসছ। চাইবদিকে খবব গেছে। এই গ্রামের যত মেয়ের বিয়া হইছে সব অধন নাইওর আসব। এইটাই নিয়ম। আমি অবাকহই হলাম। সত্তি সতি; এটাই নাকি নিয়ম। গ্রামের কেন বিশিষ্ট মানুষ আসা উপলক্ষে গ্রামের সব মেয়েরা নাইওর আসবে। বাপের দেশে আসার এটা তাদের একটা সুযোগ। এই সুযোগ তাবা নষ্ট করবে না।

আমি আগৃহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি এসেছে?

‘আসব না মানে? গেরামের একটা নিয়ম—শৃঙ্খলা আছে না?’

আমি ছেট চাচাকে বললাম, আমাদের উপলক্ষে যে সব মেয়েরা নাইওর আসবে তাদের প্রত্যেককে যেন একটা করে দামী শাড়ি উপহার হিসেবে দেয়া হয়। একদিন খুব যত্ন করে দাওয়াত খাওয়ানো হয়।

ছেট চাচা এটা পছন্দ করলেন না তবে তাঁর বাজি না হয়েও কোন উপয় ছিল না। আমাদের জমিজমা তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করছেন।

গ্রামের নিয়ম যত এক সময় বহিয়াও এল। সঙ্গে চারটি ছেট ছেলেমেয়ে। হতদরিদ্র অবস্থা। স্বামীর বাড়ি থেকে সে আমার ভন্যে দুটা ডালিম নিয়ে এসেছে।

আমার স্ত্রী তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াল। খাওয়ার শেষে তাকে শাড়িটি দেয়া হল। মেয়েটি অভিভূত হয়ে গেল। একরকম একটা উপহার বোধ হয় তার কল্পনাতেও ছিল না। তব চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে নিলাম। কোলম গলায় বললাম, কেমন আছ রহিমা?

রহিমা ফিসফিস করে বলল, ভাল আছি ভাইজান।

‘শাড়ি পছন্দ হয়েছে?’

‘পছন্দ হইব না। কি কন ভাইজান? অত দামী জিনিস কি আমরা কোনদিন চড়ক্ষে দেখছি।’

‘তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। তুমি কি করে বুঝলে ভাই বেঁচে আছে?’

রহিমা অনেকটা চূপ করে থেকে বলল, কি কইরা বুঝলাম আমি নিজেও জানি না ভাইজান। মৃত্যুর খবর শুইন্যা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসছি। বাড়ির উঠানে পাও দিতেই তিনি হইল মন্ত্রজ্ঞ বাঁইচ্যা আছে।

‘কি জন্যে মনে হল?’

‘জানি না ভাইজান! মনে হইল।’

‘এই রকম কি তোমার আগেও হয়েছে? মানে কোন ঘটনা আগে থেকেই কি তুমি বলতে পার?’

‘জ্ঞি-না।’

‘মন্ত্রজ্ঞ তোমাকে কিছু বলেনি? জ্ঞান ফিরলে স্মরণ দেখল বা তার কি মনে হল?’

‘জ্ঞি-না।’

‘জিজ্ঞেস কৰনি?’

কৰছি। হারামজাদা কথা কয় না।’

রহিমা আরো খানিকক্ষণ বসে পান-টান খেয়ে চলে গেল।

আমার টানা লেখালেখিতে ছেদ পড়ল। কিছুতেই আব লিখতে পাবি না। সব সময় মনে হয় বাচ্চা একটি ছেলে কববিশ বিকট অঙ্ককারে জেগে উঠে কি ভাবল? কি সে দেখল? তখন তার মনের অনুভূতি কেমন ছিল?

মন্ত্রজ্ঞ যিয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, আবার মনে হয় — জিজ্ঞেস করাটা টিক হবে না। সব সময় মনে হয় বাচ্চা একটি ছেলেকে ভয়শক্তি মনে করিয়ে দেয়াটা অন্যান্য কক্ষ। এই ছেলে নিশ্চয়ই প্রাণপণে এটা ভুলতে চেষ্টা করছে। ভুলতে চেষ্টা করছে বলেই কাউকে কিছু বলতে চায় না। তবু একদিন কৌতুহলের হাতে প্রাঙ্গিত হলাম।

দুপুর বেলা।

গল্পের বই নিয়ে বসেছি। পাড়া গাঁৱ কিম ধৰা দুপুর। একটু যেন ঘূমঘূম আসছে। জানালার বাইরে খুটু করে শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি মন্ত্রজ্ঞ। আমি বললাম — কি খবর মন্ত্রজ্ঞ?

‘ভাল।’

‘বোন আছে না চলে গেছে?’

‘গেছে গা।’

‘আয় ভেতরে আয়।’

মন্ত্রজ্ঞ ভেতরে চলে এল। আমার সঙ্গে তার ব্যবহাব এখন বেশ স্বাভাবিক। প্রায়ই খানিকটা গল্প-গুজ্বব হয়। মনে হয় আমাকে সে খানিকটা পছন্দ করে। এইসব ছেলেরা ভালবাসার খুব কাঙ্গাল হয়। অল্প কিছু ঘিটি কথা, সামান্য একটু আদর — এতেই তারা অভিভূত হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে বলে আমার ধারণা।

মন্ত্রজ্ঞ এসে খাটের এক প্রান্তে বসল। আড়ে আড়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম — তোর সঙ্গে কফেকটা কথা বলি, কেমন?

‘আইচ্ছা।’

‘ঠিকমত জ্বাব দিবি তো?’

‘হ্য।’

‘আচ্ছা মন্ত্রজ্ঞ, কবরে তুই জেগে উঠেছিলি, মনে আছে?’

‘আছে।’

‘যখন জেগে উঠলি তখন ভয় পেয়েছিলি?’

‘না।’

‘না কেন?’

মন্ত্রজ্ঞ চুপ করে রইল। আমার দিক থেকে অল্পদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, কি দেখলি — চারদিকে অঙ্ককার?

‘হ।’

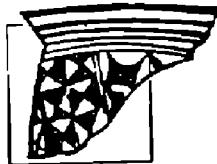
‘কেমন অঙ্ককার?’

মন্ত্রজ্ঞ এবাবে জ্বাব দিল না। মনে হচ্ছে সে বিরক্ত হচ্ছে।

আমি বললাম — কবর তো শুব অঙ্ককার তবু ভয় লাগল না ?
মন্ত্রাজ নিচু স্বরে বলল, ‘আরেকজন আমার সাথে আছিল, সেই জনে; তব লাগে নাই।’
আমি চমকে উঠে বললাম, ‘আরেকজন ছিল যানে ? আরেকজন কে ছিল ?’
‘চিনি না। আঙ্কাইরে কিছু দেখা যায় না।’
‘ছেলে না যেয়ে ?’
‘জানি না।’
‘সে কি করল ?’
‘আমারে আদর করল। আর কহল কোন ভয় নাই।’
‘কিভাবে আদর করল ?’
‘মনে নাই।’
‘কি কি কথা সে বলল ?’
‘মজার মজার কথা — খালি হাসি আসে।’
বলতে বলতে মন্ত্রাজ মিয়া ফিক্ করে হেসে ফেলল।
আমি বললাম, কি রকম মজার কথা ? দু'একটা বল তো শুনি ?
‘মনে নাই।’
‘কিছুই মনে নাই। সে কে — এটা কি বলেছে ?’
‘জ্ঞি-না।’
‘ভাল করে ভেবে-টেবে বল তো — কোনকিছু কি মনে পড়ে ?’
‘উনার গায়ে শ্যাওলার মত গঞ্জ ছিল।’
‘আর কিছু ?’
মন্ত্রাজ মিয়া চূপ করে রইল।
আমি বললাম, ভাল করে ভেবে-টেবে বল তো। কিছুই মনে নেই ?
মন্ত্রাজ মিয়া অনেকক্ষণ চূপ করে থেকে বলল, একটা কথা মনে আসছে।
‘সেটা কি ?’
‘বলতাম না। কথাড়া গোপন।’
‘বলবি না কেন ?’
মন্ত্রাজ জবাব দিল না।
আমি আবার বললাম — বল মন্ত্রাজ, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছে। মন্ত্রাজ উঠে চলে
গেল।

এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখ। বাকি যে ক'দিন গোসে ছিলাম সে কোনদিন আমার
কাছে আসেনি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছি তবু আসেনি। কয়েকবার নিজেই গেলাম। দূর
থেকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে গেল। আমি আর কিছু করলাম না।

কিছু বহস্য সে তার নিজের কাছে রাখতে পারে। রাখুক। এটা তার অধিকার। এই
অধিকার অনেক কষ্টে সে অর্জন করবেছে। শ্যাঙ্গলা-গঙ্গী সেই ছায়াসঙ্গীর কথা আমরা যদি
কিছু নাও জানি তাতেও কিছু যাবে আসবে না।



জলিল সাহেবের পিটিশন

তিনি হাসি মুখে বললেন, আমি দুঃখন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বাবা। সেভেন্টি ওয়ানে আমার দুটি ছেলে মারা গেছে।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ভদ্রলোকের চেহারা বিশেষত্বহীন। বয়স প্রায় ষাটের কোঠায়। সে তুলনায় বেশ শক্ত-সমর্থ। বসেছেন যেরুদঙ্গ সোজা করে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চশমা-চশমা নেই। তার মানে চোখে ভালই দেখতে পান। আমি বললাম, আমার কাছে কি ব্যাপার? ভদ্রলোক যেভাবে বসে ছিলেন সেভাবেই বসে রইলেন। সহজ সুবে বললেন, একজনের ডেড-বডি পেয়েছিলাম। মালিবাগে কবর দিয়েছি। আমার ছেটি মেয়ের বাড়ি আছে মালিবাগে।

তাই নাকি?

জি। মালিবাগ চৌধুরী পাড়া।

আমার কাছে কেন এসেছেন?

গম্পণজ্বর করতে আসলাম। নতুন এসেছেন এ পাড়ায়। খোজখবব করা দরকাব। আপনি আমার প্রতিবেশি।

ভদ্রলোক হাসিমুখে বসে রইলেন। আমার সন্দেহ হল, তিনি হয়তো সত্যি সত্যি হাসছেন না। তাব মুখের কাটাটাই হাসি হাসি। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, আমি আপনার পাশের গলিতেই থাকি।

তাই বুঝি?

জি? ১৩/২, বাসার সামনে একটা নারিকেল গাছ আছে দেখছেন তো?

আমি দেখিনি। তবু যাথা নাড়লাম। ভদ্রলোকের চরিত্র স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সত্যিত অবসর জীবন যাপন করছেন। কিছু করবাব নেই। সময় কাটানোটাই বোধহয় সোর এখন একমাত্র সমস্যা। যার জন্যে ছুটির দিনে প্রতিবেশি খুজতে হয়।

আমার নাম আবদুল জলিল।

আমি নিজের নাম বলতে গেলাম, ভদ্রলোক বলতে দিলেন মান্দু গলায় বললেন, চিনি আপনাকে চিনি।

চা খাবেন? চায়ের কথা বলি?

জি-না। আমি চা খাই না। চা সিগারেট কিছুই খাই না। নিশার মধ্যে পান খাই।

পান তো দিতে পারব না, এখানে কেউ পান আপনি না।

পান আমার সঙ্গেই থাকে।

ভদ্রলোক কাঁধের ঘোলাতে হাত ঢাকিয়ে পানের কৌটা বাব করলেন। বেশ বাহারী কৌটা। টিফিন কেরিয়ারের মত তিন-চারটা আলাদা বাটি আছে। আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করলাম ভদ্রলোক লম্বা পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন। সব: সকালটা হত্তো এখনে কাটাবেন। নিজের ছেলে দুটির কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলবেন। দুঃখ-কষ্টের গল্প অন্যকে শোনাতে সবাই খুব পছন্দ করে। ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে এসে বললেন, প্রফেসার সহেব, আপনি একটা পান খাবেন?

হ্যাঁ-না।

পান কিন্তু শরীরের জন্য ভাল। পিস্ত ঠাণ্ডা রাখে। যারা পান খায় তাদের পিস্তে দোষ হয় না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। পানের রস আর মধু হল গিয়ে পিস্তের খুব কড় ওষুধ।

আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে দশটা। আজ ইউনিভার্সিটি নেই। থাকলে সুবিধা হত্তো: বলা যেত — ‘কিছু ঘনে করবেন না। এগারোটাৰ সময় একটা ক্লাস আছে। আপনি অন্য আরেক দিন সময় হাতে নিয়ে আসুন।’ ছুটির দিনে এরকম কিছু বলা যায় না।

ভদ্রলোক তাঁর পানের কৌটা খুলে নানান রকম মশলা বের করলেন। প্রতিটি মশলা শুকে শুকে দেখলেন। পান বানালেন অত্যন্ত ঘন্টে। যিনি পান বানানোর মত তুচ্ছ ব্যাপারে এতটা সময় নষ্ট করেন তিনি যে আজ দুপুরের আগে নড়বেন না তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আশ্চর্য! ভদ্রলোক পান মুখে দিয়েই উঠে দাঢ়ালেন। হাসিমুখে বললেন, যাই, আমি অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।

বিস্ময় সামলে আমি আন্তরিকভাবেই বললাম, বসুন, এত তাড়া কিসের?

তিনি বসলেন না। আমি তাঁকে সিডি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ফেরার পথে দেখি, বাড়িওয়ালা বারান্দায় জ্ব কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি গন্তীর গলায় বললেন, প্রফেসার সাহেবকে ধরেছে বুঝি? সিগনেচার করবেন?

কি সিগনেচার?

জলিল সাহেবের পিটিশনে সিগনেচার করেননি?

পিটিশনটা কিসের?

আমাকে বলতে হবে না: নিজেই টের পাবেন। হাড় ভাজা-ভাজা করে দিবে। কোন প্রশ্ন দিবেন না।

অস্পষ্ট একটা অস্তিত্ব নিয়ে ঘরে ফিরলাম। নতুন পাড়ায় আমি অনেক বিরক্তিকর ব্যাপার আছে। নতুন নতুন মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। কল পাবচয় অনেক সময়ই সূর্খকর হয় না। তবে জলিল সাহেব প্রসঙ্গে ভয়টা বোধহয় অসম্ভব। এবপর তাঁর সঙ্গে দুঃখের দেখা হল। বেশ সহজ স্বাভাবিক যানুষ। একবার দেখা গৈর যামেসির সামনে। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, প্রফেসার সাহেব না? ভাল আছেন?

হ্যাঁ ভাল। আপনি ভাল আছেন? কই অভিজ্ঞা প্রলেন না!

সময় পাই না। খুব ব্যস্ত। পিটিশনটাৰ ব্যাপারে।

আমি আব কথা বাড়লাম না। ফ্লামের দোহাই দিয়ে বিকশায় উঠে পড়লাম। দ্বিতীয়বাব
দেখা হল নিউ ম্যার্কেটের একটা নিউজ স্টার্টের সামনে। দেখি, তিনি স্বে হয়ে বসে একটির
পর একটি পত্রিকা দ্রুত পড়ে শেষ করছেন। হকাব ছেন্টের ক্রুক দ্বাটিতে তাঁকে দেখছে।

কি জলিল সাহেব, কি পড়ছেন এত মন দিয়ে?

জলিল সাহেব আমার দিকে তাকালেন। যনে হল ঠিক চিনতে পারলেন না। তাঁর চোখে
চশমা।

চশমা নিয়েছেন নাকি?

হ্যাঁ। সঙ্গ্যা হলে মাথা ধরে। প্লাস পাওয়ার। ভাল আছেন প্রফেসার সাহেব?

হ্যাঁ ভাল।

যাব একদিন আপনার বাসায। পিটিশনটা দেখাব আপনাকে। চৌক্ষ হাজার তিনশ'
সিগনেচাব জোগাড় হয়েছে।

কিসের পিটিশন?

পড়লেই বুবৈনে। আপনারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আপনাদের বুবতে কষ্ট হবে ন।

আমার ধাকণ ছিল সরকারের কাছে কোন সাহায্য-টাহায্য চেয়ে পিটিশন করা হয়েছে।
সেখানে চৌক্ষ হাজার সিগনেচারের ব্যাপারটা বোৰা গেল না। আমি নিজে থেকেও কোন
আগ্রহ দেখালাম না। জগতে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা কম নয়। সিগনেচাব সংগ্রহ করা যদি তাঁর
মেশা হয়, তা নিয়ে আমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।

কিন্তু উদ্বিগ্ন হতে হল। জলিল সাহেব এক সংক্ষ্যায তাঁর চৌক্ষ হাজার তিনশ'
সিগনেচারের ফাইল-পত্র নিয়ে আমার বাসায উপস্থিত হলেন। হাসি হাসি মুখে বললেন, ভাল
করে পড়েন প্রফেসার সাহেব।

আমি পড়লাম। পিটিশনের বিষয়বস্তু হচ্ছে — দ্বিতীয় বিশ্বযুক্তে দশ লাখ ইন্হলী মারা
গিয়েছিল। সেই অপরাধে অপরাধীদের প্রত্যেকের বিচার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।
কিন্তু এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ মেবে অপবাধীরা কি করে পার পেয়ে গেল? কেন এ নিয়ে
আজ কেউ কোন কথা বলছে না? জলিল সাহেব তাঁর দীর্ঘ পিটিশনে সরকারের কাছে
আবেদন করেছেন যেন এদের বিচার করা হয়।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তিনি শাস্তি স্বরে বললেন, আমার দু'টি জেলে আরো
গেছে, সেই জন্যেই যে আমি এটা করছি তা ঠিক না। আমার ছেলে মারা গেছে মুক্তি। ওদের
মৃত্যুর জন্যে আমি কোন বিচার চাই না। আমি বিচার চাই তাদের জন্যে যান্মুক্তিরা ঘর থেকে
ধরে নিয়ে যেবে ফেলেছে। আমার কথা বুবতে পারছেন?

পারছি।

জ্ঞানি পারবেন। আপনি জ্ঞানী-গুণী মানুষ। অনেকেই পদে সু। বুবলেন ভাই অনেকে
মানবতার দোহাই দেয়। বলে, বাদ দেন। ক্ষমা করে দেন। ক্ষমা এত সম্ভা? এ্যা, বলেন সম্ভা?

আমি কিছু বললাম না। জলিল সাহেব পানের কিছুটা বির করে পান সাজাতে বসলেন।
শাস্তি স্বরে বললেন, আপনি কি মনে করছেন আমি ছেড়ে দেব? ছাড়ব না। আমার দুই ছেলে
ফাইট দিয়েছে। আমিও দেব। মৃত্যু পর্যন্ত ফাইট দেব। দৱকার হলে বাংলাদেশের প্রতিটি

মানুষের সিগনেচার জোগাড় করব। ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গেল আব কেউ কোন শব্দ করল না? আমরা মানুষ না অন্য কিছু বলেন দেখি?

আমি সিগনেচার ফাইল উল্টে দেখতে লাগলাম। খুব গোছানো কাঢ়া-কর্ম, সিগনেচারের পাশে বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা। স্বাধীনত মুদ্রে নিহত আত্মীয়-স্বজনের নাম-ধার।

অনেকেই মনে করে আমার মাথার ঠিক নাই। এক পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম। সম্পাদক সাহেব দেখাই করলেন না। ছোকরা মত একটা ছেলে বলল, কেন পুরাণ কাসুন্দি ঘাউছেন? বাদ দেন ভাই। আমি তার দাদার বয়সী লোক আমাকে বলে ভাই।

আপনি কি বললেন?

আমি বললাম, ভূমি চাও না এদের বিচার হোক?

ছেলেটি কিছু বলে না। সরাসরি না বলারও সাহস নাই। অথচ এই সব ছেলেরা কত সাহসের সঙ্গে মুক্ত করেছে। করে নাই?

ছি করেছে।

আপনার বাড়িওয়ালার কথাই ধরেন। তার এক শালাকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে ফেলেছে। অথচ এই লোক সিগনেচার করেনি। ত্রিশ লক্ষ লোক মরে গেল। কোন বিচার হল না। মনে হলেই বুকের মধ্যে চিন্চিন্ব ব্যথা হয়।

আমি অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভদ্রলোক দ্বিতীয় একটি পান মুখে পূরে বললেন, সরকারী লোকজনদের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা আমি কি বলতে চাই সেটাই ভাল করে শুনতে চায় না। একজন আমাকে বলল, আপনি একটা পরিভ্যক্ত বাড়ির জন্যে দরখাস্ত করেন। আপনার দুটি ছেলে মারা গেছে। বাড়ি পাওয়ার হক আছে আপনার।

আপনি কি বললেন?

আমি আবার বলব কি? বাড়ির জন্যে আমি পিটিশন করছি নাকি? বাড়ি দিয়ে আমি করবটা কি? আমার দুই ছেলের জীবন কি এত সন্তা? একটা বাড়ি দিয়ে দাম দিতে চায়? কতবড় স্পর্ধা চিন্তা করেন। আমি চাই একটা বিচার হবে। বিচার চাই। আর কিছুই না। সভ্য সমাজের নিয়মমত বিচার হবে। বুঝলেন?

ছি বুঝলাম।

আপনারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আপনাদের বুদ্ধাতে কষ্ট হয় না। অন্যেরা বুদ্ধাতে চায়না। একেকটা সিগনেচারের জন্য তিনবার করে যেতে হয়। তাতে অসুবিধা নাই। আমি ছাড়বার লোক না।

আমার সিগনেচার নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। তারপর অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। একটা কৌতুহল জেগে রইল। রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছি, কি ভাই কতদূর করলেন?

চালিয়ে যাচ্ছি প্রফেসার সাহেব। দোঁয়া রাখবেন।

লোকজন দস্তখত দিচ্ছে তো?

সবাই দেয় না। ভয় পায়।

কিসের ভয়?

ভয়ের কি কোন মা-বাপ আছে? ভয় পাওয়া যাদের স্বভাব তারা ভয় পাবেই। বুঝলেন না? আমি আছি লেগে। অদালতে হাজির করে ছাড়ব: কি বলেন প্রফেসার সাব? তা তো ঠিকই।

ডিস্ট্রিক্টে ভাগ করে ফেলছি। এখন সব ডিস্ট্রিক্টে যাব। কষ্ট হবে। উপায় তো নাই। আপনি কি বলেন?

ভালই তো।

তাছাড়া শুধু দস্তখত জোগাড় করলেও হবে না। কেইস চালানোর মত এভিজেল্স থাকতে হবে। বিনা কারণে নিরপেরাধ লোকজন থরে থরে ঘেরেছে — এটা প্রমাণ করতে হবে না? ওবা ঘাণ্ড ঘাণ্ড সব 'ল'ইয়ার' দেবে। দেবে না?

তা তো দেবেই।

আপনার জ্ঞানামত ভাল ল'ইয়ার আছে?

আমি খোজ করব।

তা তো করবেনই। আপনি তো অঙ্গ না। অন্যায়টা বুঝতে পারছেন। বেশির ভাগ লোকই পাবে না। মৃত্যুর দেশ।

অনেকদিন আর জলিল সাহেবের দেখা পাই না। হয়তো সত্তি সত্তি জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন। বগলে ভারী ভারী ফাইল। দস্তখতের সংখ্যা হয়ত বাড়ছে। বারো হাজার থেকে পনেরো হাজার। পনেরো থেকে বিশ। এমনকি সত্তি হতে পাবে যে চালিশ পঞ্চাশ লাখ দস্তখত জোগাড় করে ফেলবেন তিনি। পঞ্চাশ লাখ লোকের দাবী অত্যন্ত জ্ঞারালো দাবী।

বর্ষার শুরুতে খবর পেলাম জলিল সাহেব অসুখে পড়েছেন। হাপানি, সেই সঙ্গে বিড়ম্বিক ফিভার। বাড়িওয়ালা বললেন, পাগল মানুষ। শরীরের যত্ন তো কোনদিন করে নাই। এ যাত্রা টিকবে না।

বলেন কি?

হ্যাঁ। গ্রীন ফার্মেসীর ডাক্তার সাহেব বললেন। আমি নিজেও গিয়েছিলাম দেখতে।

অবস্থা কি বেশি খারাপ?

বর্ষাটা টিকে কিনা সন্দেহ।

বলেন কি?

শুবহ খারাপ অবস্থা।

বর্ষাটা অবশ্যি টিকে গেলেন। ফাইলপত্র বগলে নিয়ে আবার দুবার বেকলেন। আমার সঙ্গে দেখা হল এক দুপুরে। আমি চিনতেই পারি না এমন অবস্থা। তিনি এগিয়ে এলেন, প্রফেসার সাহেব না?

আবে কি ব্যাপার ভাই? একি অবস্থা আপনার!

বাঁচব না বেশি দিন।

না বাঁচলে চলবে? এত বড় একটা প্রজেক্ট আগে নিয়েছেন।

এটার জন্মেই টিকে আছি।

সিগনেচার কতদূর জোগাড় হয়েছে?

BanglaBook.org

পনেবো হাজাব। মাসে তিনি চারশ'ব বেশি পারি না। বয়স হয়েছে তো। তবে ছাড়বাব লোক না আমি।

না, ছাড়বেন কেন?

কঠগড়ায় দাঢ়া করবো শালাদেব। ইন্দুবা পেরেছে, আমরা পরব না কেন? কি বলেন?

তা তো ঠিকই।

ত্রিশ লাখ লোক মেরেছে বুঝলেন — একটা দুটা না। বাংলাদেশের মানুষ সন্তা না। মজ্জা টেব পাইয়ে দেব।

আজিমপুরের ঐ পাড়ায় আমি প্রায় দু'বছর কাটালাম। এই দু'বছরে জলিল সাহেবের সঙ্গে ভালই ঘনিষ্ঠতা হল। যাবে যাবে যেতাম তাঁর বাসায়। ভদ্রলোকের নিজের বাড়ি। দোতলাটি ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়ার টাকায় সংসার চলে। শ্রী নেই। বড় ছেলের বউ তাঁর সঙ্গে থাকে। ফুটফুটে দু'টি মেয়ে আছে সেই বউটির। যমজ মেয়ে বোধ করি। খুব হাসি-খুশি। ভালই লাগে ও-বাড়ীতে গোলে। বউটি বেশ যত্ন করে।

পিটিশন সম্পর্কে বাচ্চা দু'টির ধারণাও দেখলাম খুব স্পষ্ট। একটি মেয়ে গঞ্জীর হয়ে আমাকে বলল, দাদার খাতা লেখা শেষ হলে যারা আমাব বাবাকে মেরেছে তাদের বিচার হবে।

এইচুকু মেয়ে এত সব বোঝার কথা নয়। জলিল সাহেব নিচয়ই ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে বলেছেন।

ঐ পাড়া ছেড়ে চলে আসাব পরও যাবে—মধ্যে যেতাম। তারপর ধীরে ধীরে যোগাযোগ করে গোল। এবং এক সময় দীর্ঘ দিনের জন্যে দেশের বাইবে চলে গোলাম।

যাবাব আগে দেখা করতে গিয়েছি। শুনলাম তিনি ফরিদপুরে গিয়েছেন সিগনেচার জ্বাগড় করতে। কবে ফিরে আসবেন কেউ বলতে পারে না। তাঁর ছেলের বউ অনেক দুঃখ করল। দুঃখ কবার সঙ্গত কারণ আছে। একমাত্র পুরুষ যদি ঘৰ-সংসার ছেড়ে দেয় তাহলে জীবন দুস্থ হয়ে ওঠে।

বাইবে থাকলে দেশের জন্যে অন্যরকম একটা যমতা হয়। সেই কাবণেই ক্ষেত্রে জলিল সাহেবের কথা মনে পড়তে লাগল। মনে হতো, ঠিকই তো ত্রিশ লক্ষ লোক হজ্যা করে পার পেয়ে যাওয়া উচিত নয়। জলিল সাহেব যা করছেন ঠিকই করছেন। এটা মন্তব্য না। এ যুগে এত বড় অন্যায় সহ্য করা যায় না।

উইক এন্ড-গুলিতে বাঙালীরা এসে ভাড়ে হতো আমার বাসায়। কিছু আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছেলে, মুবহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির অংকের প্রফেসার আফসার উদ্দিন সাহেব। সবাই একমত — জলিল সাহেবের প্রজেক্টে সব বকম সাহায্য করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়িত্ব করা হবে। বিদেশী পত্রিকায় জনমতের জন্যে লেখালেখি করা হবে। আমেরিকার ফ্লাণ্ড শহরে আমরা এক সন্ধ্যাবেলায় ‘আবদুল জলিল সংগ্রাম কমিটি’ গঠন করে যেন্নাম আমি তার আহ্মায়ক। আফসার উদ্দিন সাহেব সভাপতি। বিদেশে বসে দেশের কথা ভরতে বড় ভাল লাগে। সব সময় ইচ্ছে করে একটা-কিছু করি।

দেশে ফিরলাম দুঃহত পথ।

চাকা শহুর অনেকখনি বদলে গেলেও জলিল সাহেবের বাড়ির চেহারা বদলায়নি। সেই
ভাঙা প্লেস্ট রাউটা উঠা বাড়ি। সেই নাবিকেল গাছ। কড়া নাড়তেই চৌম্ব-পনেরো বছবের ভারী
যিষ্টি একটি মেঝে দরজা খুলে দিল। অবাক হয়ে তাকল আমার দিকে।

তুমি কি জলিল সাহেবের নাতনী?

হ্যাঁ।

তিনি বাড়ি আছেন?

না। দাদু তো মারা গেছেন দুঃহত আগে।

ও। আমি তোমার দাদার একজন বন্ধু।

আসুন, তেতরে এসে বসুন।

আমি বসলাম কিছুক্ষণ। মেয়েটির মাঝে সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা ছিল। অস্মিন্তা বাসায়
ছিলেন না। কখন ফিববেন তাবো ঠিক নেই। উঠে আসবাব সময় জিঞ্জেস করলাম, তোমার
দাদু যে মানুষের সিগনেচার জেগাড় করতেন সেই সব আছে?

হ্যাঁ আছে। কেন?

তোমার দাদু যে কাজটা শুক করেছিলেন সেটা শেষ করা উচিত। তাই না?

মেয়েটি খুবই অবাক হল। আমি হাসিয়ুখে বললাম, আমি আবার আসবো, কেমন?

হ্যাঁ আছা।

মেয়েটি গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে নরম গলায় বলল, দাদু বলেছিলেন একদিন কেউ
না কেউ এই ফাইল নিতে আসবে।

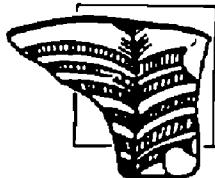
আব যাওয়া হল না।

উৎসাহ মরে গেল। দেশের এখন নানান রকম সমস্যা। যেখানে-সেখানে বোমা ফাটে।
মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়। এর মধ্যে পুরানো একটি সমস্যা টেনে আনতে ইচ্ছা করে না।

আমি জলিল সাহেব নই। আমাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়। শীরপূরে একটা
পরিত্যক্ত বাড়ি কেনার জন্যে নানান ধরনের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। জলিল
সাহেবের বক্রিশ হাজার দরখাস্তের ফাইল নিয়ে রাস্তায় বেরনোর আমার সময় কোথায়?

জলিল সাহেবের নাতনীটি হয়তো অপেক্ষা করে আমার জন্যে। দাদুর ফিচারের
ফাইলটি খুলো যেড়ে ঠিকঠাক করে রাখে। এই বয়েসী মেয়েরা মানুষের কথা খুব বিশ্বাস
করে।

BanglaBook.org



শব্দাত্মা

পুরোপুরি নাস্তিক মানুষের সংখ্যা এই পৃথিবীতে খুবই কম। ঘোর নাস্তিক যে মানুষ তাকেও বিশেষ ক্ষেত্রে শুধু দুর্বল দেখা যায়। আমি একজন ঘোর নাস্তিককে চিনতাম, তার ঠোটে একবার একটা গ্রোথের মত হল। ডাক্তাবরা সন্দেহ করলেন ক্যানসার। সঙ্গে সঙ্গে সেই নাস্তিক পুরোপুরি আস্তিক হয়ে গেলেন। তাহাঙ্গুদের নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে যান। মালীবাগের পীর সাহেবের মূরীদও হলেন।

বায়োপসির পর ধরা পড়ল যে গ্রোথের ধরন ধারাপ নয়। লোকালাইজড গ্রোথ। ভয়ের কিছুই নেই। অপাবেশন করে ফেলে দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আবাব নাস্তিক হয়ে পড়লেন। ভয়াবহ ধরনের নাস্তিক। অংক করে প্রমাণ করে দিলেন যে স্থিতি = 0° ও এবং আত্মা = 0° ।

যাই হোক, মানুষদের চরিত্রের এই দৈত ভাব আমাকে বিস্মিত করে না। প্রচণ্ড বকম সৈশুর-বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেও আমি অবিশ্বাসের বীজ দেখেছি। আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। এর বাইরে কিছু দেখা মানে অস্বাভাবিক কিছু দেখা।

আমি এরকম একজন অস্বাভাবিক চরিত্রের কথা এই গল্পে বলব। চরিত্রের নাম মোতালেব (কাল্পনিক নাম)। বয়স পঞ্চাশ থেকে পাঁচপঞ্চাশ। ভীষণ রোগা এবং প্রায় তালগাছের মত লম্বা একজন মানুষ। চেইন স্যোকার। মাথার কিছু অসুবিধা আছে বলেও মনে হয়। নিতান্ত অপরিচিত লোককেও এই ভদ্রলোক শীতল গলায় বলে ফেলতে পারেন — ভাই, কিছু মনে করবেন না। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন মহামূর্খ।

মোতালেব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় এক বিয়ে বাঢ়িতে কি একটা সমস্যা হয়েছে — কাজী পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা এই জাতীয় কিছু।

বরপক্ষীয় এবং কনেপক্ষীয় লোকজন বিমর্শ মুখে ছোট ছোট গুল্পে ঝর্ণ হয়ে গল্প করছে। আমি একটা দলের সঙ্গে জুটে গেলাম। সেখানে জনৈক অধ্যাপক বিগ বেং এবং এক্সপানডিং ইউনিভার্স সম্পর্কে কথা বলছেন। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শুনছে। ভদ্রলোক দ্রুঞ্জ হেল সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছেন তখন একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। রোগা এবং লম্বা একজন শুকনো মানুষ বললেন, ভাই কিছু মনে করবেন সা, আপনি একজন মহামূর্খ।

অধ্যাপক ভদ্রলোক নিজেকে সামলাতে কিছু স্মরণ নিলেন। পুরোপুরি সামলাতে পাবলেন না — কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আশামুক্ত আমাকে মহামূর্খ বললেন?

‘ক্ষিৎ।’

‘কেন বললেন জানতে পারি?’

‘অবশ্যই জানতে পারেন। আপনি আপনার বক্তৃতা শুকই করেছেন ভূল তথ্য দিব্বে -- বলছেন ব্যাকগ্রাউণ্ড বেডিয়েশন ধরা পড়েছে ইনফ্রাবেডে, তা পড়ে নি। ধরা পড়েছে মাইক্রোওয়েভে। আইনস্টাইনের জ্বেলারেল খিওরি অব রিলেটিভিটির একটি স্থিকায়ই হচ্ছে স্পেস এবং টাইমের জন্য বিগ বেং সিংগুলাবিটিতে। আপনি বললেন ভিন্ন কথা। কোন কিছুই না জ্ঞেনে একটার সঙ্গে একটা মিলিয়ে কি সব উল্টা-পাল্টা কথা বলছেন।’

অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগে তোতলাতে তোতলাতে বললেন —

‘আমি তো ইউনিভার্সিটিতে ফ্লাস নিছি না . . একটু এদিক-ওদিক হতেই পারে।’

‘জ্ঞান ঠাকুরমার ঝূলি না যে যেভাবে ইছু সেইভাবে বলবেন।’

ভদ্রলোক সিগারেটে লস্বা টান নিয়ে অন্যদিকে সবে গেলেন। আমি গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। মজার চরিত্র। কথা বলা দরকার।

মতুকু মজার চরিত্র ভেবে ভদ্রলোকের কাছে গেলাম, দেখা গেল চরিত্র তারচেয়েও মজার। ভদ্রলোকের বিষয় পদার্থবিদ্যা নয় — সাইকোলজী। পদার্থবিদ্যা হচ্ছে তাঁর শখ। এই শখ মেটানোর জন্যে রীতিমত শিক্ষক রেখে অংক, পদার্থবিদ্যা শিখেছেন।

এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে সহজে বস্তুত হয় না। আমি লক্ষ্য করেছি এরা সচরাচর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে থাকে। এই লোকও দেখা গেল সেই রকম। একদিন বেশ বিরক্ত হয়েই বলল, আপনি দেখি মাঝে মাঝেই আমার কাছে আসেন। বিষয়টা কি বলেন তো?

‘বিষয় কিছু না।’

‘বিষয় কিছু না বললে তো হবে না। এ পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না।’

আমি হাসি মুখে বললাম —

‘ফ্লাসিক্যাল ম্যাকানিঞ্জ, তাই বলে কিন্তু ভাই মোতালেব সাহেব, হাইজেনবার্গের আনসারাটিনিটি প্রিসিপ্যাল আপনি ভূলে যাচ্ছেন। একটি বস্তুকে পুরোপুরি আপনি কিন্তু জানেন না। যখন অবস্থান জানেন তখন সঠিক গতি কি তা জানেন না . . .।’

‘আপনার সঙ্গে কৃত্তকে যেতে চাচ্ছি না —আপনি স্পষ্ট করে বলুন কি জন্যে আমার কাছে আসেন — যদ্য পানেব লোভে?’

আমি ঝামেলা এড়াবার জন্যে বললাম, হ্যা।

‘ভাল কথা। আমার পেছনে অনেকেই ঘূরে এবং তাদের উদ্দেশ্য একটাই — বিনা পয়সায় যদ্যপান। তৎক্ষণাত মধ্যবিত্ত বাঙালী যদ্যপান করতে চায় তবে তা মিজুর বাসায় নয় অন্যের বাসায় — যাতে শ্রী জানতে না পাবে। নিজের পয়সায় না অন্যের পয়সায়, যাতে টাকা-পয়সা খরচ না হয় — অন্তত মধ্যবিত্ত।’

আমি বললাম, আপনি মনে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের উপর খুব দিলবুক।

‘অফকোর্স বিরক্ত। মধ্যবিত্ত হচ্ছে সমাজের একটা ফাঁকাল অংশ। আনকটোলড গ্রোথ। এই মধ্যবিত্তের প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা হয় কাজিনের কাছে, প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা হয় বাড়ির কাছের মেয়ের সঙ্গে। প্রথম যদ্যপানের অভিজ্ঞতা হয় অন্যের পয়সায়। এখন বলুন আপনাকে কি দেব? স্কচ ফ্লাব আছে, জীন আছে, ভদকা আছে, কয়েক পদের হাইস্পিন,

আছে। আব আপনার যদি মিস্কড ড্রিংক পচন্দ হয় তাহলে তাও বানিয়ে দেব। You name it, I will make it — হা হা হা।'

'কিছু মনে কববেন না ভাই। আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম — বিনা পয়সাখ মদের লোভে না, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবাব লোভেই আমি আসি।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, আমাকে কি ইন্টারেষ্টিং ক্যাবেন্টার বলে মনে হয়?

'হ্যাঁ।'

'আমি এই নিয়ে তিনবার বিয়ে করেছি — কোন স্ত্রী আমাকে ইন্টারেষ্টিং ক্যাবেন্টার বলে মনে করেননি। প্রথমজন অনেক কষ্টে দু'বছরের মত ঠিকে ছিল, বাকি দু'জন এক বছরও ঠিকেনি। হা হা হা।'

'না টেকায় আপনি মনে হচ্ছে শুশিই হয়েছেন।'

'হ্যাঁ, হয়েছি। স্ত্রীরা স্বামীদের স্বাধীনতায় হাত দিতে পচন্দ করে। শুধু শুধু নানান বায়ানাঙ্কা — যদি খেতে পারবে না, রাত জেগে পড়তে পারবে না, জুয়া খেলতে পারবে না — আবে কি মুশকিল, আমার সব কথায় কথা বল কেন? আমি কি তোমার কোন ব্যাপারে মাথা গলাই? আমি কি বলি — নীল শাড়ি পরতে পারবে না, লাল শাড়ি পরতে হবে। হাই হিল পৰতে পারবে না, ফ্ল্যাট স্যাণ্ডেল পৰবে। বলি কখনো? না বলি না। আমি ওদেরকে ওদের মত থাকতে বলি। আমি নিজে থাকতে চাই আমার মত। ওরা তা দেবে না।'

'এই যে এখন একা একা বাস কবছেন আপনি কি মনে কবেন আপনি সুখী?'

'হ্যাঁ সুখী, মাঝে মাঝে একটু দুঃখ দুঃখ ভাব চলে আসে। তখন মদ্যপান করি। প্রচুর পরিমাণেই করি। পুরোপুরি মাতাল হতে চেষ্টা করি। পারি না। শরীর যখন আব এলকোহল একসেণ্ট করতে পারে না তখন বমি করে ফেলে দেয় কিন্তু মাতাল হতে দেয় না — কেন দেয় না তাবও একটা কারণ আছে।'

'কি কারণ?'

'বলব, আবেকদিন বলব। এখন বলেন কি খাবেন? আজকের আবহাওয়াটা 'ব্লাডি মেরী' জন্যে শুব আইডিয়াল। দেব একটা ব্লাডি মেরী বানিয়ে? জিনিসটা স্বাস্থের জন্যেও তাল। প্রচুর টমেটোর বস দেয়া হয়।'

তদলোকের সঙ্গে আমার ভালই খাতির হল। মাসে দ্রেকবাব তাঁর কাছে ঘুরি। বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে কথা হয়। যেমন স্টশুরের অস্তিত্ব, এন্টি ম্যাটার, লাইস আফ্টার ডেথ। তদলোকের নাস্তিকতা দেখার মত। যা বলবেন — বলবেন। কোথাও স্বেচ্ছায়ের কিছু বাখবেন না। আমাব মত আরো অনেকেই আসে। তবে তাদের মূল আগ্রহ ক্ষেত্র যাত্রায়।

একবাব আমাদেব আড়ায় এক তদলোক একটি ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতাব কথা বলছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এ রকম — শ্রাবণ মাসে একমাস তিনি গ্রামেব বাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ি স্টেশন থেকে অনেকখানি দূৰ। সক্ষ্যাবেলা টেন্স এসে পৌছাব কথা। পৌছতে পৌছতে রাত নটা বেজে গেল। গ্রামদেশে রাত নটা যানে প্রিশুতি রাত। কড়-বৃষ্টি হচ্ছে। স্টেশনে একটা লোক নেই। একা একাই বওনা হলাম। কঁচুদূৰ যবাবৰ পৰ হঠাৎ দেখি আমাব আগে আগে কে যেন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ কাউকে দেখিনি। এখন এই সাইকেলে করে

কে যাচ্ছ ? আমি বললাম — কে কে কে ? কেউ জবাব দিল না। লোকটা একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চিনলাম। যে সাইকেলে বসে আছে তার নাম পরমেশ। আমরা এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছি। বছর তিনেক অংগে নিউম্যার্নিং হয়ে থাব যাব . . .

গল্পের এই পর্যায়ে মোতালেব সাহেব বাঁজখাই গলায় বললেন — স্টপ। আপনি বলতে চাচ্ছেন — আপনার এক ভূতবস্তু সাইকেল চালিয়ে আপনার পাশে পাশে যাচ্ছিল ?

‘হ্যাঁ।’

‘মনে হচ্ছে আপনাকে সাহস দেবার জন্মেই সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল।’

‘হতে পারে ?’

মোতালেব সিগারেট ধরাতে ধরোতে বললেন, তর্কের খাতিবে স্বীকাব কবে নিলাম যে, আপনার বক্সু মরে ভৃত হয়েছেন। আপনাকে সাহস দেবার জন্মে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। এখন সমস্যা হল — সাইকেল। একটা সাইকেল মরে ‘সাইকেল-ভৃত’ হবে না। যদি না হয় তাহলে আপনাব ভূতবস্তু, সাইকেল পেলো কোথায় ?

যিনি গল্প করছিলেন তিনি থমকে গেলেন। মোতালেব সাহেব বললেন, স্বীকাব করলাম অবশ্যই তর্কের খাতিরে যে মানুষ মরে ভৃত হতে পাবে। তাই বলে কাপড় মরে তো ‘কাপড়-ভৃত’ হবে না। আমরা যদি ভৃত দেখি তাদের নেটো দেখা উচিত। ওরা কাপড় পায় কোথায় ? সব সময় দেখা যায় ভৃত একটা সাদা কাপড় পরে থাকে। এর মানে কি ?

মজাব ব্যাপার হচ্ছে — এই যোব নাস্তিক, প্রচণ্ড মুক্তিবাদী মানুষের কাছ থেকে আমি অবিশ্বাস্য একটি গল্প শুনি। যেভাবে গল্পটি শুনেছিলাম অবিকল সেইভাবে বলছি। গল্পের শেষে মোতালেব সাহেব কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অপ্রয়োজন বিধায় সেই ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি না। বৈশাখ মাসের এক বড়-বৃষ্টির সন্ধ্যায় মোতালেব সাহেব গল্প শুরু করলেন।

‘এই যে ভাই লেখক, ইটাবেস্টিং অভিজ্ঞতাৰ একটা ঘটনা শুনবেন ? একটা কণ্ঠশেলে ঘটনাটা বলতে পারি। চুপ কবে শুনে যাবেন। কোন প্রশ্ন কৰতে পারবেন না। এবং ঘটনাটা বিশ্বাস কৰতে পারবেন না।’

‘বিশ্বাস কৰলে অসুবিধা কি ?’

‘অসুবিধা আছে। আমার যাথ্যমে কোন অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার প্রচার পাবে তা হয় নাটো হতে দেয়া যায় না ! আপনি যদি ধৰে নেন এখন যা শুনছেন তা একটা গল্প — মজাব গল্প — তা হলৈই আপনাকে বলতে পারি।’

‘এই গল্পটি আমি কোথাও ব্যবহাব কৰতে পাবি ?’

‘পারেন। কাবণ গল্প-উপন্যাসকে কেউ শুরুত দেয় না। সবাই ধৰেই নেয় এগুলি বানানো ব্যাপার।’

‘তাহলে বলুন শুনি।’

ড্রোক পৰ পৰ চার পেগ মদ্যপান কৰলেন। জুব মদ্যপানের ভঙ্গি ও অসুস্থিৎ। অসুস্থিৎ মেজারিং গ্লাস ভর্তি কবে হইম্বিক নেন। এক ফ্লাইচে পানি মেশান না। ঢক কৰে পুরোটা মুখে ফেলে দেন কিন্তু নিলে ফেলেন না। বুলুকুচা মত শব্দ হয়। তারপৰ এক সময় মোঁৎ কৰে

গিলে ফেলে বলেন — কেন যে যানুষ এই সব ছাইপাশ থায় — বলেই আবাব খানিকটা নেন। যাই হোক, ত্বরলাকের জ্বরানীতে মূল গল্পে যাচ্ছি —

‘স্তুখন আমার বহস চরিষ। এম.এ. পাস করেছি। ধারণা ছিল খুব ভাল বেঙ্গাল্ট হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢিচার হিসেবে এন্টি পেয়ে যাব। তা হয়নি। এম.এ.-র রেজাল্ট খুবই খারাপ হল : কেন হল তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, পরীক্ষা ভাল দিয়েছি। একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি — জনৈক অধ্যাপক বাগ কবে আমাকে খুবই কম নম্বর দিয়েছেন। এই গুজব অমূলক নাও হতে পারে। অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল না। দুঃএকজন আমাকে বেশ পছন্দ করেন। আবাব কেউ কেউ আছেন আমার ছায়াও সহ্য কবতে পাবেন না।

যা বলছিলাম, বেজাটের পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা খুব রাগাবাণি করলেন। হিন্দী ভাষায় বললেন — নিকালো। আভি নিকালো।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, চলে যাচ্ছি। হিন্দী বলার দবকাব নেই।

এই বলেই স্যুটকেস গুছিয়ে বের হয়ে পড়লাম। আমি খুবই স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। কাঙ্গাই খালি হাতে ঘর থেকে বের হলাম না। বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হলাম। কোথায় যাচ্ছি কাউকে বলে গেলাম না। সঙ্গে একগাদা বই। বিশাল একটা খাতা। এক ডজন বলপর্মেট। সেই সময় আমার লেখালেখির বাতিক ছিল। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস শুরু করেছিলাম। যে উপন্যাস মূল ডিটেকটিভ খুন করে। ইন্টাবেস্টিং গল্প।

যাই হোক, বাড়ি থেকে বের হয়েও খুব-একটা দূরে গেলাম না। একটা হোটেলে ঘর ভাড়া করে রইলাম। দেখি, সেখানে কাজ কৰার খুব অসুবিধা — সারক্ষণ হৈচে।

কিছু কিছু কামরায় রাত দুপুরে যদি থেয়ে মাতলামিও কবে। মেঘেছেলে নিয়ে আসে।

হোটেল ছেড়ে দিয়ে শহরতলীতে একটা বেশ বড় বাড়ি ভাড়া কবে বসলাম। এক জজ সাহেব শখ কবে বাড়ি বানিয়ে ছিলেন। তার শখ হয়তো এখনও আছে। ছেলেমেয়েদের শখ মিশে গেছে। এ বাড়িতে কেউ আব থাকতে আসে না।

একজন কেয়ারটেকার-কাম-মালি-কাম-দারোয়ান আছে। বাড়ির পুরো দায়িত্ব তাব। লোকটিকে দেখে মনে হয় বদলোক। আমাকে যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে, মনে হচ্ছে, নিজ দায়িত্বেই দিয়েছেন। ভাড়ার টাকা মালিকের কাছে পৌছাবে বলে মনে হল না। ওটোনিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। পৌছালে পৌছাবে না পৌছালে নেই। আমার এক মাস থার্মের জন্য। সেটা থাকতে পারলেই হল। নিরিবিলি বাড়ি। আমার খুবই পছন্দ হল। লেখালেখির জন্য চমৎকার।

কেয়ারটেকারের নাম ইয়াকুব। বহস পঁয়তাঙ্গিশের কাছে। বিপর্যাসভ ধরনের চেহারা। তবে গলার স্বরটি অতি মধুর। আমি একাই এ বাড়িতে থাকব কোনো বিশ্বিত গলায় বলল, স্যার কি সত্যি সত্যি একা থাকবেন ?

‘হ্যা।’

‘বিষয়টা কি ?’

‘বিষয় কিছু না। পড়াশোনা করব। লেখালেখি করব।’

‘আব খাওয়া-দাওয়া ? হোটেল এখানে পাবেন কোথাও ? সেই যদি শহবে যান, পাঁচ মাহের থাকা।’

‘বাম্বা কবে দেবে এমন কাউকে পাওয়া যায় না ? টাকা—পয়সা দেব।’

‘আপনি বললে আমি রঁধব। খেতে পারবেন কিনা সেটা হল কথা।’

‘পারব। খাওয়া নিয়ে আমার কোন খুঁতখুতনি নেই।’

‘আরেকটা জিনিস বলে রাখি স্যার। মূৰগি ছাড়া কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না। হাটবাবের মাছ-টাচ পাওয়া যায়। হাটবাবের দেবি আছে। আব চালটা স্যাব একটু মেটা আছে। আপনাব নিশ্চয়ই চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস।’

‘চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস ঠিকই, মোটা চালে অসুবিধা হবে না। তবে ভাত যেন শক্ত না হয়। শক্ত ভাত খেতে পারি না।’

দেখা গেল লোকটি রাম্ভায় স্টোপদী না হলেও তাব কাছাকাছি। দুপুরে খুব ভাল খাওয়াল। বাতেও নতুন নতুন পদ করল। আমি বিস্মিত। রাতে খেতে খেতে বললাম, এত ভাল রাম্ভ শিখলে কোথায় ? ইয়াকুব গন্তীর মধ্যে বলল,

‘আমাব স্ত্রীৱ কাছে শিখেছি। খুব ভাল রাঁধতে পাৰত।’

‘পাৰত বলছ কেন ? এখন কি পাৰে না ?’

ইয়াকুব গন্তীর হয়ে গেল। ভাবলাম নিশ্চয়ই খুব ব্যক্তিগত কোন ব্যাপাব। এখন আৱ প্ৰশ্নৰ জবাব পাওয়া যাবে না। তবে সহজেই নিজেকে সামলে নিল। সহজ স্বে বলল, এখন পাৰে কি পাৰে না জানি না স্যার। আমাৰ সঙ্গে থাকে না।

‘কোথায় থাকে ?’

‘জানি না কোথায় থাকে। ওব চৱিতি খারাপ ছিল। এৱ-তাব সাথে যোগাযোগ ছিল। বিশ্বী অবস্থা। বলাৰ মত না। অনেক দেন-দৰবাৰ কৰেছি। কিছু লাভ হয় নাই। ভাৱপৰ সাত বছৰেৰ দুই মেয়ে ঘবে রেখে পালিয়ে গেছে। বুঝে দেখেন কত বড় হারামী।’

‘কতদিন আগেৱ কথা ?’

‘বছৰ দুই।’

‘কোন খবৰ পাওয়া যায়নি ?’

‘মোড়লগঞ্জে বাজাৰে না—কি দেখা গিয়েছিল — আমাৰ কোন আগ্ৰহ ছিল না। খোজ নেই নাই।’

এদেৱ জীবনেৱ এই জ্ঞাতীয় কিছু-কাহিনী শুনতে সাধাৰণত ভালই লাগে। আমাৰ লাগল না। আমাদেৱ সবাৰ জীবনেই একান্ত সমস্যা আছে। সেই সব নিয়ে মাঝা ঘন্টালৈ চলে না। কিন্তু ইয়াকুব মনে হল কথা বলবেই।

‘জীবনে বড় ভুল কি কৰেছিলাম জানেন স্যার ? সুন্দৰী বিয়ে কৰেছিলাম। ডানাকাটা পৰী বিয়ে কৰেছিলাম।’

‘বড় খুব সুন্দৰ ছিল ?’

‘আগুনেৱ মত ছিল। আগুন থাকলেই পোকামাকড় আসে। তাই হল আমাৰ জীবন হল অতিষ্ঠ। একদিন মোড়লগঞ্জেৱ বাজাৰে গেছি। ফিৰে এসে দেৱিৰ সদৰ দৰজা বন্ধ। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি কৰলাম। কেউ দৰজা খোলে না। শেষে ধূম কৰে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে কে যেন দৌড় দিল। আমি বড়ৱেৰ বললাম — এ কে ? বড়ৱেলল, আমি কি জানি কে ?’ ইয়াকুব একেৱ পৰ এক বউয়েৰ কীতিকাহিনী বলতে লাগল। আমি এক সময় বিৰক্ত হয়ে বললাম —

‘ঠিক আছে বাদ দাও এসব কথা।’

‘বাদ দিতে চাইলেও বাদ দেয়া যায় না। তিনবার সালিসী বসন। সালিসীতে ঠিক হল বাড়িরে তালাক দিতে হবে। তালাক দিলাম না। যন মানল না। তার উপর জমজ দেয়ে আছে। এব ফল হইল এই...’

‘স্ত্রী কোথায় আছে তুমি জন না?’

‘জ্ঞি-না।’

‘মেয়েরা তোমাব সঙ্গেই থাকে?’

‘জ্ঞি।’

‘কি নাম মেয়েদের?’

‘জমজ মেয়ে হয়েছিল জনাব। তুইন একজনের নাম, তুমার আরেকজনের নাম। নাম বেখেছিল মেয়েব মা।’

‘ভাল, খুব ভাল।’

‘কোন কিছু দরকার লাগলে এদের বলবেন। মেয়েরা এইখানেই থাকে। ডাক দিলেই আসবে।’

‘না, আমার কিছু লাগবে না।’

‘বিবর্জন করলেও বলবেন। থাবড়া দিয়ে গাল ফাটায়ে দিব। মেয়েগুলি বেশি সুবিধাৰ হয় নাই। মায়েৰ খাসিলত পেয়েছে। সারাদিন সাজগোজ। এই পায়ে আলতা, এই ঠোটে লিপস্টিক।’

‘স্কুলে পড়ে না?’

‘আৱে দূৰ — পড়াশোনা। এৱা যায় আৱ আসে।’

মেয়ে দুঁটিকে আমার অবশ্যি খুবই পছন্দ হল। দুঁজনই হাস্যমুখ। সারাক্ষণ হাসছে। সব সময় সেজেগুজে আছে। কাজেরও খুব উৎসাহ। যদি বলি, এই এক গ্লাস পানি দাও তো। ওফি ছুটে যাবে। দুঁজনই দুঁহাতে দুটা পানিভৰ্তি গ্লাস নিয়ে এসে বলবে, চাচা আমাৰটা নেন। চাচা, আমাৰটা নেন। আধগ্লাস পানি খেলেই যেখানে চলত সেখানে বাধ্য হয়ে দু' গ্লাস খাই। যাতে মেয়ে দুটোৱ কোনটাই কষ্ট না পায়।

মেহ নিম্নগামী। যতদিন যেতে লাগল বাচ্চা দুঁটিকে আমার ততই পছন্দ হতে লাগল। ছেটখাট কিছু উপহার কিনে দিলাম। দুঁজনেৰ জন্যে দুটা রঙ পেনসিলৰ সেট ছেটখাট ছেট আয়না। যাই পায় আনন্দে লাফায়। বড় ভাল লাগে দেখতে। গ্ৰেডিউল দেখতে দেখতে এগৰো দিন কেটে গেল। বাবো দিনেৰ দিন একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা বলাৰ আগে পারিপার্শ্বিক অবস্থাৰ একটা বৰ্ণনা দিয়ে নেই।

আমাৰ বাড়িটা পশ্চিমবৰ্তী। বাড়িৰ সামনে এবং খেড়ে আমন থানেৰ ঘাঠ। বাড়িৰ উপৰে জঙ্গলা ধৰনেৰ জায়গা। এক সময় নিবিড় বাঁশবন ছিল। এখন পাতলা হয়ে গেছে। দক্ষিণে উকিল বাড়িৰ বিশাল বাগান। সেই বাগানে আমি, জাম, লিচু থেকে শুক কৰে আতাফলেৰ পাছ পৰ্যন্ত আছে। একজন বেঁটেখাটি দক্ষিণওয়ালা মালি সেই বাগান পাহাৰা দেয়। আমাৰ সঙ্গে দেখা হলেই গভীৰ বিনয়েৰ সঙ্গে জ্বানতে চায় — স্যাবেৰ শইলডা কি ভাল? ঘুমেৰ কোন ডিস্টাৰ্ব হয় না তো?

আমি প্রতিবারই বিস্মিত হয়ে বলি, ঘুমের ডিস্টাৰ্ব হবে কেন?

‘শহবেব মানুষ হঠাৎ গেৱাম আইস্যা পড়লেন। এই ভন্যে জিগাই।’

‘আমাৰ ঘূৰ, খাওয়া-দাওয়া কোন কিছুতেই কোন অসুবিধা হচ্ছে না।’

‘অসুবিধা হইলে কইবেন। ভয়-ডৰ পাইলে ডাক দিবেন। আমাৰ নাম বদকল। আমি রাইতে সুমাই না। জাগান থাকি।’

‘ঠিক আছে বদকল। যদি কখনো প্ৰয়োজন বোধ কৰি তোমাকে ডাকব।’

এগাবো দিনেৰ দিন প্ৰয়োজন বোধ কৰলাম। দিনটা সোমবাৰ। সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। দুপুৰ থেকে তুমুল বৰ্ষণ শুকু হল। এৱ মধ্যে ইয়াকুব এসে বলল, স্যার একটা বিৱাট সমস্যা। তুঁহীনেৰ গলা ফুলে কি যেন হয়েছে, নিঃশ্বাস নিতে পাৰছে না। ওকে তো স্যার ডাক্তারেৰ কাছ দেয়া দৱকাৰ।

আমি তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে দেখতে গেলাম। খুবই খাৱাপ অবস্থা। শুধু গলা না — সমস্ত মূখ ফুলে গেছে। কি কষ্টে যে নিঃশ্বাস নিছে সেই জানে। মেয়েটাৰ শৰীৰ এত খাৱাপ অথচ এৱা আমাকে কিছুই বলেনি। আমাৰ ঘনটাই খাৱাপ হয়ে গেল।

আমি বললাম, এক মুহূৰ্ত দেৱী কৰা ঠিক হবে না। তুমি এক্ষুণি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।

‘স্যার, আপনাৰ খাওয়া-দাওয়া . . . ’

‘আমাৰ খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তোমাকে কিছু চিন্তা কৰতে হবে না। চাল ফুটিয়ে নিতে পাৰব। একটা ভিমও ভেজে নেব। তুমি দেৱি কৰবে না।’

আমি ইয়াকুবকে কিছু টাকাও দিলাম। সে ঘণ্টাখানেকেৰ মধ্যে দুই মেয়েকে একটা গুৰুৰ গাড়িতে তুলে রওনা হয়ে গেল। আমাৰ বুকটা ঈঝাৎ কৰে উঠল। কেন মেন মনে হল মেয়েটা বাঁচবে না।

আমি থাকি দোতলাৰ দক্ষিণমুখী একটা ঘৰে। ঘৰটা বিশাল। দুদিকে জানলা আছে। আসবাবপত্ৰ কলতে পূৱানো একটা খাট, খাটেৰ পাশে টেবিল। লেখাৰ টেবিলে হাবিকেন ছাড়াও মোমদানে মোমবাতি। লেখালেখিৰ জন্যে শুধু হাবিকেনেৰ আলো যথেষ্ট নয় বলেই মোমবাতিৰ ব্যবস্থা।

কেন জানি সংক্ষ্যার পৰ থেকে ভয় কৰতে লাগল। বিছানায় বসে লিখাচ্ছি^{হঠাৎ} মনে হল কেউ-একজন দক্ষিণেৰ বাবাদায় নৱম পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি কে কে বলতেই হাঁটাৰ শব্দ থেমে গেল।

আমি দূৰ্বলচিত্তেৰ মানুষ নই। তবে যে কোন সাহসী মানুষও কেন কৰাবে বিশাল একটা বাড়িতে একা পড়ে গেলে একটু অন্য রকম বোধ কৰে। আমাৰ স্বামী রকম লাগতে লাগল। সেই অন্য রকমটাও আমি ঠিক ব্যাখ্যা কৰতে পাৰছিলাম আৰু একবাৰ মনে হচ্ছে পানিৰ পিপাসা হচ্ছে। আবাৰ পৰ মুহূৰ্তেই মনে হচ্ছে — না পানিৰ পিপাসা না — অন্য কিছু। অনেক চেষ্টা কৰেও কিছু লিখতে পাৱলাম না। লেখাৰ জন্যে মাথা নিচু কৰতেই মনে হয় দৱজ্জাৰ ফাঁক দিয়ে কেউ আমাকে দেখছে। তাকালেই^{সুয়ে শুনছে}। দুৰ্বাৰ আমি বললাম — কে কে? বলেই লজ্জা পেলাম। কে কে বলে চেচানোৰ কেন মানে হয় না।

এই সময় লক্ষ্য করলাম হারিকেনের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তেল কমে এসেছে। এক্ষুণি হয়ত দপ্ত করে নিভে যাবে। এতে ত্য পাবাব তেমন কোন কাবণ নেই। আবো একটি হাবিকেন পাশের বরে আছে। সবুজ রঙের বড় একটা বোতলে কেরোসিন তেল থাকে। সেই বোতলটি একতলার রাস্মা ঘরে। তাহাড়া মোমবাতি তো আছেই।

আমি নিম্ননিম্ন হাবিকেন নিয়ে একতলায় নেমে গেলাম। চা বানিয়ে খাব। হারিকেনে তেল ভরব। রাতে খাবার কিছু করা যায় কিনা তাও দেখব।

দেখলাম রাতে খাবার জন্যে চিহ্নিত হবার কোন কাবণ নেই। ইয়াকুব ভাত বেঁধে রেখে গেছে। কড়াইয়ে ডাল আছে। ডিম আছে। ইচ্ছা করলেই ডিম ভেজে নেয়া যায়।

চা বানিয়ে খেলাম। ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। বারদায় পা দিতেই বুকটা হ্যাঁৎ করে উঠল। মনে হল সবুজ রঙের দুরে শাড়ি পরা একটি মেয়ে যেন হ্যাঁৎ কৃত সরে গেল। মেয়েটার চোখ দুটি যায় মায়া। কিন্তু এই অঙ্ককাবে মেয়েটার চোখ দেখার কথা না। তাহলে আমি এসব কি দেখছি?

বৃষ্টির বেগ খুব বাড়ছে। রীতিমত ঝড়ো হাওয়া বইছে। আমি আবার ঘরে আগের জ্বায়গায় ফিরে এলাম। আনালা বঞ্চ করে দিলাম। শৌ-শৌ শব্দ তবু কামল না।

ঠিক তখন বজ্জ্বপাত হল। প্রচণ্ড বজ্জ্বপাত। সাউণ্ড ওয়েভের নিষ্পত্তি একটা ধাক্কা আছে। এই ধাক্কায় মোমবাতির কিংবা হারিকেনের শিখা নিভে যায়। টেবিলের উপর হারিকেনের আলো নিভে গেল। হ্যাঁৎ চারদিকে গাঢ় অঙ্ককাব।

আমি তখন পরিষ্কার শুনলাম মেয়েলী গলায় কেউ-একজন বলছে — আপনে বাইরে আসেন। আমি ঠেঁচিয়ে বললাম — কে? সেই আগের কষ্ট আবার শোনা গেল—ভয় পাইয়েন না। একটু বাইরে আইসা দাঁড়ান।

অল্প বয়স্ক মেয়ে মানুষের গলা। পরিষ্কার গলা।

আমি আবার বললাম — কে, তুমি কে?

কোন জবাব পাওয়া গেল না। মনে হল কেউ যেন ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ঘরের দরজা একটু ফাঁক করল।

আমি উঠে বারান্দায় চলে এলাম। বারান্দায় কেউ নেই। তবু মনে হল কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। সে চাষে কিছুটা সময় আমি বারান্দায় খাকি।

শুপ শুপ শব্দ আসছে। শব্দ কোথেকে আসছে ঠিক বোধ যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোদাল দিয়ে কেউ মাটি কোপাচ্ছে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতে কোদাল দিয়ে মাটি কেওপাচ্ছে কে? আমি বারান্দায় বেলিং-এর দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন বিদ্যুৎ চমকালো। বিদ্যুৎের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম দক্ষিণ দিকের বাঁশবনের কাছে কোদাল দিয়ে একজন মাটি কোপাচ্ছে। রে মাটি কোপাচ্ছে সে হল আমাদের — ইয়াকুব।

কিন্তু ইয়াকুব এখানে আসবে কেন। ও তো মেঘে নিয়ে শহরে গেছে। বিদ্যুৎ চমক দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আমি আমি তাকে দেখছি। সে খুব ব্যস্ত হয়ে মাটি কোপাচ্ছে। গভীর গর্ত করছে। সে কি করবে আড়েছে? পাশে কাপড় দিয়ে মোড়া লম্বা এটা কি?

পরিষ্কার কিছু দেখছি না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তখনই শব্দ দেখছি। বুঝতে পারছি এটা বাস্তব কোন দশ্য নয়। এই দশ্যের জন্ম আমার চেনাজ্ঞান। জগতের নয়; অন্য জগতে, অন্য সময়ে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে খরখর করে কাঁপছি। মূষলধারে বর্ষণ হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমি ইয়াকুবকে দেখছি। সে অতি ব্যস্ত। অতি দ্রুত করব হুঁচছে। কার করব? সবুজ কপড়ে মোড়া একটি মৃতদেহ পাশে রাখা। বৃষ্টির পানিতে তা ভিজছে। এটা তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ? কি আশ্চর্য! হাত পাঁচেক দূরে বাঢ়া দুটা বসে আছে। এরা এক দৃষ্টিতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে আছে।

যে কপৰতী স্ত্রী পালিয়ে যাবার কথা ইয়াকুব বলে, এই কি সেই মেয়ে? এই মেয়েটিকে সেই কি হত্যা করেছিল? হত্যাকাণ্ডটি কোন-এক বর্ষার রাতে ঘটেছিল? কোন-এক অস্বাভাবিক উপায়ে সেই মৃত্যুটি কি আবাব ফিরে এসেছে? আমি দেখছি। ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন-একটি দশ্য ইলিয়গ্রাহ্য হয়ে ধৰা পড়ছে আমার কাছে।

আমি আমার এই জীবনে কোন অতি প্রাকৃতিক বিষয়কে স্থান দেইনি। আজ আমি এটা কি দেখছি?

ভদ্রলোক এইখানে গল্প শেষ করলেন।

আমি বললাম — তারপর? তারপর কি হল?

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনাকে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম, বলা হল। এর আর তারপর বলে কিছু নেই।

‘আপনি এই দশ্যটি দেখলেন, তারপর কি করলেন?’

‘আপনি হলে কি করতেন?’

‘আমি হলে কি করতাম সেটা বাদ দিন। আপনি কি করেছেন সেটা বলুন।’

‘দাঁড়ান, আরো খানিকটা এলকোহল গলায় ঢেলে নেই। তা না হলে বলতে পারব না।’

ভদ্রলোক ঢকঢক করে অনেকখানি কাঁচা ছইস্কি গলায় ঢেলে দিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি স্থির গলায় বললেন — আমি সেদিন যা করেছিলাম একজন বৃক্ষিয়ান যুক্তিবাদী মানুষ তাই করবে — আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেখানে প্রচণ্ড ভয়াবহ কোন ঘটনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষের ভয় থাকে না। এক জাতীয় প্রবৃজনহীন শরীরে চলে আসে। তখন প্রচুর প্রকার ভাঙ্গতে শুরু করে। মানুষ শারীরিক শক্তি পায়। ভয় কেতে যায়।

‘আমার কোন ভয় ছিল না। আমি দ্রুত গেলাম এ জায়গায়। কালো পানিতে মাখামাখি হয়ে গেলাম।’

‘তারপর কি দেখলেন?’

‘কি আর দেখব? কিছুই দেখলাম না। আপনি কি ভোষেছেন শিয়ে দেখব ইয়াকুব তাঁর স্ত্রীর ডেডবড়ি নিয়ে বসে আছে?’

‘না তা ভাবিনি।’

‘নেচার বলুন বা ইশ্বর বলুন বা প্রকৃতি বলুন — এরা কোন রকম অস্বাভাবিকতা সহ্য করে না। এই জিনিসটি খেয়াল রাখবেন। কাজেই আমি কিছুই দেখলাম না। বৃষ্টিতে

শিঙ্গলাম, কাদায যাখামাখি হলাম। আমার জ্বেদ চেপে গেল। পাশের বাগানের মালিকে
ডেকে এনে সেই রাতেই জায়গাটা খুঁড়লাম। কিছুই পাওয়া গেল না।'

পরদিন ধানাম খবর দিলাম। পুলিশের সাহায্যে আবারো থোড়াখুঁড়ি করা হল। কিছুই
পাওয়া গেল না। সবার ধারণা হল আমার যাথা থারাপ হয়ে গেছে। আমার বাবা খবর পেয়ে
আমাকে এসে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হলাম। শুনে অবাক
হবেন — এই ঘটনার পর মাসবানিক আমি ঘুমতে পারতাম না।

'গচ্ছটা কি এখনেই শেষ না আরো কিছু কলবেন ?'

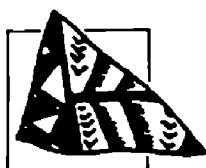
'না আর কিছু কলব না। ভাই আগেই তো বলেছি এটা কোন ভৌতিক গচ্ছ না।
ভৌতিক গচ্ছ হলে দেখা যেত ইয়াকুব বৌটাকে মেরে ঐখানে কবর দিয়ে রেখেছিল।
ভৌতিক গচ্ছ না বলেই — এটা সত্য হয়নি। তবে ঐ বাড়ি আমি কিনে নিয়েছি। বর্ষার সময়
প্রায়ই ঐখানে একা একা রাত্তিয়াপন করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ রাতে ঘটনার অংশবিশেষ
আমি দেখেছিলাম। নিজের উপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে বাকিটা দেখতে পারিনি।
কোন-একদিন বাকিটা হয়ত দেখব। ইচ্ছা করলে আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনি
কি যাবেন ?'

'না — আমার ভূত দেখার কোন ইচ্ছা নেই — আপনার ঐ মালি, ইয়াকুব না-কি যেন
নাম বললেন, ও কি এখনো ঐ বাড়িতে আছে ?'

'হ্যাঁ আছে।'

'সে আপনার ঘটনা শুনে কি বলে ?'

'এটাও একটা মজ্বার ব্যাপার। সে কিছুই বলে না। হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। চুপ
করে থাকে। ভাল কথা, এতক্ষণ যে আমাদের ড্রিঙ্কস দিয়ে গেল, কাজু বাদাম দিয়ে গেল,
তার নামই ইয়াকুব। তাকে আমি সব সময় কাছাকাছি রাখি। আপনি কি তার সঙ্গে কথা
বলবেন ? ইয়াকুব, এই ইয়াকুব . . .।



আনন্দ-বেদনার কাব্য

বইটির নাম — রিস্কুলী পৃথিবী।

প্রচন্দে একটি মেয়ের মুখের ছবি। মেয়েটি কাঁকছে শীর মুখের পাশে একটি প্লোব।
একটি বিকটদর্শন নর-কংকাল প্লোবটি বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। কংকালটির ডান হাতে
একগুচ্ছ রঞ্জনীগঞ্জা। যথেষ্ট জটিলতা। পৃথিবীর রিস্কুলী ফুটিয়ে তোলাব আয়োজনে কোনো
ত্রুটি নেই।

এ ধরনের প্রচন্দচিত্রের বইগুলোর পাতা সাধারণত উল্টানো হয় না। তবুও অভ্যাসবশেষেই পাতা উল্টালাম। এবং এক সময় দেখি গ্রন্থকারের লেখা ভূমিকাটি পড়তে শুরু করেছি। শুরু না করলেই বেধহয় ভালো ছিল। ভূমিকাটিতে খুব মন খারাপ করা একটি ব্যাপার আছে। আমার নিজের যথেষ্ট দৃশ্য-কষ্ট আছে, অন্যের দৃশ্য-কষ্ট আর ছুতে ইচ্ছে করে না। গ্রন্থকার লিখেছেন,

‘দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্বে বিজ্ঞপ্তী প্রতিবীর পাশুলিপি প্রস্তুত করি। সেই সময় আমার অভি আদরের জ্যেষ্ঠ কল্যা মোসাম্বৎ নূরমাহার খানম (বেনু) উক্ত গ্রন্থের জন্যে প্রচন্দচিত্রটি অঙ্কন করে। অর্থাত্বে তখন গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে পারি নাই। আজ্ঞ প্রকাশিত হইল। কিন্তু হয় আমার বেনু মা দেখিতে পাইলো না।’

বইটির দ্বিতীয় পঠায় প্রচন্দশিল্পীর সামান্য একটু পরিচয়ও আছে।

সেখানে লেখা প্রচন্দশিল্পীঃ মোসাম্বৎ নূরমাহার খানম। দশম শ্রেণী বিজ্ঞান বিভাগ।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত বইটি হঠাত করেই অসামান্য হয়ে উঠল আমার কাছে। এই বইটি যিরে দরিদ্র পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবিটি চোখের সামনে দেখতে পেলাম। লয়া বেণীর দশম শ্রেণীর কালোমতো বোগা একটি মেয়ে যেন গভীর ভালোবাসায় বাবার বইয়ের জন্যে রাত জেগে প্রচন্দ আঁকছে। আঁকা হবার পর বাবাকে দেখল সেটি। প্রতিবীর সব বাবাদের মতো এই বাবাও মেয়ের শিল্পকর্ম দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। রাতে সবাই খেতে বসেছে। দরিদ্র আয়োজন। কিন্তু সবার মুখ হাসি-হাসি। বাবা বললেন, পাস করলে আমার বেনু-মাকে আমি আর্ট কলেজে দেবো। বেনু বেচারী লঙ্ঘনয় মরে যায়। ভাত মাখতে মাখতে কলল, দূর ছাই, মোটেও ভালো হয়নি। বাবা রেগে গেলেন, ভালো হয়নি মানে? আঁকুক দেখি কেউ এ-রকম একটা ছবি।

বই অবশ্যি বাবা প্রকাশ করতে পারলেন না। কে ছাপবে এ রকম বই? দুঃএকজন প্রকাশক বলেও ফেলল, এসব পদ্যের বই কি আজকাল চলেরে ভাই? এসব নিজের পয়সায় ছাপতে হয়। ঢাকা জমান, জমিয়ে নিজেই ছাপেন।

প্রযোজ্ঞনীয় টাকা জেগাড় করতে বাবার দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগল। হয়তো স্তীর কানের দুলজেড়া বিক্রি করতে হল। সে বছর সৈদে বাচ্চারা কেউ কাপড় নিল না। তিনি খুঁচে পেতে সন্তান একটি প্রেস বের করলেন যার বেশির ভাগ টাইপই ভাঙা। কিন্তু তাতে কিছু ঘায় ঝাসে না। কারণ প্রেসের মালিক সালাম সাহেব, গ্রন্থকারের কবিতার একজন ভজ্জি গ্রন্থকার লিখেছেন,

টাইপ প্রেসের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব আবদুস সালাম সাহেব আমার এই গ্রন্থানি প্রকাশের ব্যাপারে প্রভৃতি সাহায্য করিয়াছেন। এই কাব্যানুরাগী বন্ধুবৎসল মনুষ্টির সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাত্তিত ছিল। জনাব আবদুস সালাম সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া ছেট করার ধৃষ্টতা আমার নাই।’

ভূমিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে কবি সন্ধ্যাকেলায় প্রফুল্ল দেখতে ফর্খন যেতেন তখন সালাম সাহেব হাসিমুখে বলতেন, এই যে কবি সাহেব, আসেন, আপনার সেকেও প্রফুল্ল রেডি। কই রে কবি সাহেবের জন্য চা আন। চা খেতে রেতে বললেন, প্রফুল্ল চোখ ঝুলাতে ঝুলাতে আপনার একটা কবিতা পড়েই ফেললাম। বেশ লিখেছেন।

কোন কবিতাটির কথা বলছেন?

ঐ যে কি ধৈন বলে, ইয়ের ওপর যেটা লিখলেন। বৃষ্টি বাদলার কথা আছে যেটায়।

ও 'নব-বর্ষার' কথা বলছেন?

হ্যাঁ, এটাই। চমৎকার। শুধুই ভাবের কথা। আপনি তো ভাই বিরাট লোক।

কবি নিশ্চয়ই বই ছাপানোর সব টাকা আবদুস সালাম সাহেবকে দিতে পারেননি। সালাম সাহেব বললেন, যখন পারেন দিবেন। কবি মনুষ আপনি। আপনার কাছে টাকা ঘার থাবে নাকি — হা হা হা। কম্পন পারে আপনার মতো কবিতা লিখতে?

ভূমিকা পড়েই আনতে পারলাম নেত্রকোণা শহরে একজন প্রবীণ উকিল বাবু নলিনী রঞ্জন সাহাও জনাব আবদুস সালামের মতো কবির প্রতিভায় মুগ্ধ। কবি লিখেছেন,

'বাবু নলিনী রঞ্জন সাহার উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে গ্রহণ্যানি প্রকাশ করিবার জন্য আগ্রহী করিয়াছে। বাবু নলিনী রঞ্জন একজন স্বভাব-কবি এবং কাব্যের একজন কঠিন সমালোচক। তিনি যখন আমার কবিতা প্রসঙ্গে সামুদ্রিক পত্রিকা 'মঙ্গলা'তে আমার একটি কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই কবির কাব্যগত অন্তিবিলম্বে প্রকাশ হওয়া বাহুনীয় তখনই আমি স্থির করি . . .।'

'রিজন্শু পঞ্চিবী'তে মোট একশ' তেরোটি কবিতা আছে। প্রতিটি কবিতার নিচে রচনার স্থান, তারিখ এবং সময় দেওয়া আছে। অনেকগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত ফুটনোট। কয়েকটি উল্লেখ করি — 'দিবাবসান' কবিতাটির ফুটনোটে লেখা,

'আমার বড় শ্যালক জনাব আমীর সাহেবের বাড়িতে এই কবিতাটি রচিত হয়। তাহার বাড়ির সম্মিলিতে খবরপ্রোত্তা একটি নদী আছে (নাম স্মরণ নাই)। উক্ত নদীর তীরে এক সন্দ্যায় বসিয়াছিলাম। দিবাবসানের পরপরই আমার মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়। কবিতা রচনার উপকরণ সঙ্গে না থাকায় আবেগটি যথাযথ ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। সমস্ত কবিতাটি মনে মনে রচিত করিয়া পরে লিপিবন্ধ করিতে হইয়াছে।'

অন্য একটি কবিতার (বাসর শয়া) ফুটনোটটি এ রকম —

'এই দীর্ঘ কবিতাটি আমি আমার বাসর রাত্রে রচনা করিয়াছি। সেই সময় বাহিরে খুব দুর্ঘাগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। প্রচণ্ড হাওয়া এবং অবিশ্রান্ত বর্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। আমরা নব-পরিণীতা বালিকা—বধু মেঘগঞ্জনে বারবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল।'

বাসর রাত্রিতে স্বামীর এই কাব্যরোগ দেখে নৃতন বৌটি নিশ্চয়ই দারুণ অবাক হয়েছিল। তার চোখে ছিল বিস্ময় এবং হয়তো কিছুটা ভয়। কবি স্বামী দীর্ঘ রচনাটি কে সেই রাত্রেই পড়ে শুনিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে? না শুনিয়ে কি পারেন? বড় জলের রাত। হাওয়ার মাতামাতি। টাটকা নতুন কবিতা। রহস্যমণ্ডিত এক নারী। সেই স্তুতি কি যে অপূর্ব ছিল সেটি আমরা ফুটনোট পড়ে কিছুটা বুঝতে পারি।

এবং এও বুঝতে পারি, যে লোক বিয়ের রাতে সাড়ে ছয়শস্তার একটি কবিতা লিখতে পারে, সে পরবর্তী সময়ে কি পরিমাণ বিরক্তি ও হতাহত সৃষ্টি করেছে তার স্ত্রীর মনে। ঘরে হয়তো টাকা-পয়সা নেই। ছেট ছেলের জ্বর ভার জন্যে সাগ কিনে আনতে হবে। কিন্তু ছেলের বাবা কবিতার খাতা নিয়ে বসেছেন। গভীর ভাবযোগে তাঁর চোখে জল। লিখেছেন, 'একদা জ্যোৎস্নায়' নামের শীর্ষ কোনো রচনা। কেন কিছু কিছু মানুষ এমন নিষি-পাওয়া হয়?

দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-বক্ষনা কিছুই তাদের স্পর্শ করে না। স্বগীয় কোনো একটি হিস্ত পক্ষ তাদের তড়া করে ফিরে। কেন করে? আমার উপর জানা নেই। জানতে ইচ্ছে হয়।

এইসব নিশ্চি-পাওয়া মানুষদের বেশিবভাগই নিজের ক্ষুদ্র পরিবার এবং কয়েকজন ভালোমানুষ বঙ্গু-বাঙ্কির ছাড়া আর কারের কাছে তাদের আবেগের কথা পৌছাতে পারেন না। ক্ষণগ স্থিতির এন্দেরকে আবেগে উদ্বলিত হবার মতো অপূর্ব একটি হৃদয় দিয়ে পাঠান কিন্তু সেই আবেগকে প্রবাহিত করবার মত ক্ষমতা দেন না। এরা বড় দৃঢ়শী মানুষ।

‘রিত্বিণী পৃথিবী’র পাতা উচ্চাতে উচ্চাতে আমার এমন কষ্ট হল। কবি কতো বিচিত্র বিষয় নিয়ে কতো আজ্ঞেবাজে জিনিসই না লিখেছেন। ইরানের শাহকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা আছে। কি আছে এই সৈরাচারী রাজার মধ্যে যে তাকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা লিখতে হল? তিনটি কবিতা আছে মহাসাগর নিয়ে। কবি কিন্তু সাগর-মহাসাগর কিছুই দেখেননি। [সমুদ্র দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে বহুবার আমি ঘনকক্ষে সমুদ্র দেখিয়াছি। ফুটনোট, ‘হে মহা সিঙ্গ’।]

কবিতা আমি পড়ি না। কিন্তু রিত্বিণী পৃথিবীর প্রতিটি কবিতা আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। কিছুই নেই। কষ্টে সঞ্চিত শেষ মুদ্রাটিও নিষ্কয়ই চলে গেছে এই বইয়ে। বাকি জীবন এই পরিবারটি অবিজ্ঞিত গ্রন্থটির প্রতিটি কপি গভীর আগ্রহে আগলে রাখবে। প্রাপ্ত ধরে সেরদরে বিক্রি করতে পারবে না। বইয়ের স্তুপের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধা মাঝে মাঝে গোপনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু তাতে কি আছে? অন্তত একটি দিনের জন্যে হলোও তো এই পরিবারটিতে আনন্দ এসেছিল। কবি-স্তৰী মুঢ় চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলেন, আমার স্বামী তাহলে সত্য সত্য একটি বই লিখে ফেলেছেন? ছেলেমেয়েরা বাবার বই নিয়ে ছুটে গেছে বঙ্গু-বাঙ্কিবদের দেখাতে।

বাবা প্রথমবারের মতো বুক উচু করে তাঁর বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে বলেছেন, স্যার আপনার জন্যে একটা বই আনলাম। বড় সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আরে আপনি আবার বই লিখলেন কবে?

স্যার, প্রচন্দটা আমার মেয়ের আঁকা।

তাই নাকি? বাহু চমৎকার।

রিত্বিণী পৃথিবীর শেষ কবিতাটি সম্পর্কে বলি। শেষ কবিতাটির নাম ‘মাণী’। কবিতাটি নৃকুমাহার খানমকে নিয়ে লেখা। ফুটনোট থেকে জানতে পারি, মনুষের আগের রাতে সে যখন রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার অসহায় বাবা এই কর্তব্যতাটি লিখে এনেছিলেন মেয়েকে কিঞ্চিৎ ‘উপশম্য’ দেবার জন্যে। কবিতাটি ক্ষুদ্র এবং বচনাভঙ্গি অন্য কবিতার মতোই কাঁচা। কিন্তু প্রতিটি শব্দ চোখের গহীন ছলে লেখা বলেই বোধকরি কবিতাটি দৃঢ়শী বাবার মতোই হাহাকার করে ওঠে। সেই জাহাঙ্গীর বিশুব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে চলে যায় অদেখা সব ভূবনের দিকে। একটিমাত্র কবিতা লিখেন্ত ক্ষেত্র কেউ কবি হতে পারেন। অল্প কিছু পংক্তিমালাতেও ধরা দিতে পারে কোনো এক ঘৃহন বোধ, মহান আনন্দ, জগতের গভীরতম ক্রস্তন। সেই অর্থে আমাদের ‘রিত্বিণী’ রচনা একজন কবি।



অপেক্ষা

বশির মো঳ার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তিনি কোন কিছুতেই রাগ করেন না।

রেগে যাবার মত কোন ঘটনা ঘটে, তিনি সারা চোখে-মুখে উদাস এক ধরনের ভাব ফুটিয়ে মৃদু গলায় বলেন, আজ্ঞা আজ্ঞা।

না রাগার মহৎ গুণের জন্যে তিনি পরপর তিনবার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছেন। বাড়িতে পাকা দালান তুলেছেন। দশ বছর আগে জমির পরিমাণ যা ছিল আজ তাই বেড়ে তিনগুণ হয়েছে। সম্পত্তি একটি পাওয়ার টিলার কিনেছেন। অনেক দূর দূর থেকে মানুষজন চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির বারান্দায় পলিথিনের কাগজে ঢেকে রাখা যন্ত্রিত দেখতে আসে। বশির মো঳া যন্ত্রিত এখনো মাঠে নামাননি। এই সবই সম্ভব হয়েছে তাঁর ‘না রাগা’ স্বভাবের জন্যে, মোলায়েম কথাবার্তার জন্যে। অস্তত বশির মো঳ার নিজের তাই ধারণা।

শ্রাবণ মাসের সকাল।

দুপুর আগে প্যাচপ্যাঁচ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এখনো শেষ হয়নি। আকাশ ঘোলাটে। মনে হচ্ছে দুপুরের আগে বৃষ্টি করবে না।

বশির মো঳া বাংলা ঘরের বারান্দায় ইঞ্জিচেয়ারে কাত হয়ে আছেন। নানান কারণে তার ঘন বিকিঞ্চ। আশেপাশে ডাকাতি হচ্ছে। তাঁর বাড়িতেও হতে পারে। এখন পর্যন্ত কেন হয়নি সেটাই রহস্য। অবশ্যি একটি দোনলা বন্দুক তাঁর আছে। বন্দুকের অস্তিত্ব জানান দেবার জন্যে পার্ষি শিকারের নাম করে পরশু সকালেই তিনটা গুলি করলেন। কাজটা ঠিক হল কিনা তাও বুঝতে পারছেন না। হিতে বিপরীত হতে পারে। বন্দুকের লোভে ডাকাত আসতে পারে। ডাকাতের দুশ্চিন্তা ছাড়াও অন্য আরেকটি দুশ্চিন্তা তাঁকে কাবু করে ফেলেছে— কিছুতেই ঘোকের মাথায় গত বছর আরেকটি বিয়ে করে ফেলেছেন। মেয়েটির বয়স অল্প কিছুতেই পোষ মানছে না। তাঁর নিজের বয়স পঁয়তালিশ। এই বয়সে সতের বছরের কাগজীর ফস ভুলাবার জন্যে যে সব জৎ করতে হয় তা করা বেশ কষ্ট। তবু তিনি কুরুক্ষে চেটা করছেন। লাভ হচ্ছে না। মেয়েটি পোষ মানছে না।

আজ সকালে তাঁর মনের অবস্থা শ্রাবণ মাসের আকাশের মেলাই ঘোলাটে। অবশ্যি তাঁর মুখ দেখে কেউ তা বুঝতে পারবে না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বৃষ্টি-ভেজা সকালের অবসর বেশ উপভোগ করছেন। ভেতরের বাড়িতে ছায়ের কথা কলা হয়েছে। চা এখনো আসেনি। এই বাড়িতে শহরের বাড়িগৰের মত দুর্বল চো হয়। খবরের কাগজ আসে। দুপুর দেরি হয়, তবে নিয়মিত আসে।

বশির মোল্লার কোলে খবরের কাগজ পড়ে আছে। তবে তিনি কাগজ পড়ছেন না। কাগজ পড়তে তাঁর একেবারেই ভাল লাগে না। ছবিশুলি দেখেন। ছবির নিচের লেখাগুলিও সব সময় পড়তে ভাল লাগে না। বশির মোল্লা অলস চেথে খবরের কাগজের একটা ছবিটি দিকে তাকিয়ে আছেন। ছবিতে এরশাদ সাহেবকে একজন বৃক্ষের কাঁধে হাত রেখে কি যেন বলতে দেখা যাচ্ছে। গুচ্ছ গ্রাম-ট্রায় হবে। একেক প্রেসিডেন্ট এসে একেকটা কায়দা করেন। জিয়া সাহেব খাল কাটিয়ে গেছেন। ইনি বানাচ্ছেন গুচ্ছ গ্রাম। পরের জন এসে কি করবে কে জানে।

'প্রেসিডেন্ট সাব !'

বশির মোল্লা, খবরের কাগজ থেকে চোখ তুললেন। এদিকের সবাই তাঁকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদের সুবাদে প্রেসিডেন্ট সাব ডাকে। তাঁর ভালই লাগে। আজ লাগল না, কাবগ তাঁর সামনে দাঢ়িয়ে আছে কেরামত। কেরামত তাঁর বাড়ির কামলা। দশ বছর বয়স থেকেই আছে। এখন বয়স হয়েছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। বোকা ধরনের মানুষ। এরা কামলা হিসাবে অসাধারণ হয়। যা করতে বলা হয় মুখ বুজে করে। বশির মোল্লা কেরামতকে দেখে বিরক্ত হলেন। কাবগ কেরামতের এখন ক্ষেত্রে থাকার কথা। তাঁর সামনে ঘূরঘূর করার কথা না।

কিছু বলবি না—কি রে কেরামত ? .

একটা কথা ছেল।

বলে ফেল।

কেরামত মাথা নিচু করে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, বয়স তো হইল। এখন যদি একটা বিবাহ দিয়া দেন। ঘর-সংসার করি। ঘর-সংসার করতে মন চায়।

বশির মোল্লা বিশ্মিত স্বরে বললেন, বিয়ে করতে চাস ?

কেরামত গলার স্বর আরো নিচে নামিয়ে বলল, বয়স হইতাছে। ঘর-সংসার করতে ইচ্ছ হয়। নবজীও বয়সকালে বিবাহের কথা বলেছেন, হাদিস-কোরানে আছে।

পছন্দের কেউ আছে না—কি ?

না। আপনে দেখাশোনা কইবা . . .

আচ্ছা ঠিক আছে, হবে। আমিহি ব্যবস্থা করব। ঘর তুলে দিব। জমিও দিয়ে দিব। বেতন তো কিছু নেস না — সব জমা আছে। ব্যবস্থা করে দিব।

হ্রে আচ্ছা।

এখন যা, কাজে যা। কাজ ফালায়া আসা ঠিক না।

হ্রে আচ্ছা।

বিয়ের কথা বারবার আমারে বলারও দরকার নাই। আমার মনে থাকব। সুবিধামত ব্যবস্থা করব। বিয়া-সাদী তাড়াছড়ার ব্যাপার না।

হ্রে আচ্ছা।

BanglaBook.org

রাতে পাহারার ব্যাপারটা ঠিক আছে তো? খুব সাবধান। দল বাইক্স লাঠি-শরকি হাতে
পাহাড়া দিবি।
ছ্বে আচ্ছা।

পরের তিনি বছর বশির মোল্লার উপর দিয়ে নানান বিপদ-আপদ গেল। জমি সংক্রান্ত
এক ঘামলায় জড়িয়ে থানা-পুলিশে অনেক টাকা গচ্ছা গেল। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এক মৃত
সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজেও মরমর হল। দীর্ঘদিন তাঁকে ঢাকায় বেশে চিকিৎসা করতে হল।
তাঁর বাড়িতে একবার ডাকাতিও হল। তাবচে' বড় কথা — তাঁর অতি মোলায়েম স্বভাব সঙ্গেও
তিনি পরপর দুটি ইলেকশনে হেরে গেলেন। স্কুল কমিটির নির্বাচন এবং পৌরসভার নির্বাচন।
এই রকম অবস্থায় মেজাজ ঠিক থাকে না। কাজেই কেরামত আবার যখন বিয়ের প্রস্তাব
তুলল তিনি রেগে গিয়ে কললেন, তুই এমন বিয়ে-পাগলা হলি কেন কল তো? এই অবস্থায়
বিয়ের কথা তুলনি কিভাবে?

কেরামত বলল, তিনি বছর পার হইছে পেসিডেন্ট সাব।

আমার অবস্থা তুই দেখবি না? তুই কি বাইবের লোক? তুই ঘরের লোক না? একটু
সামলে উঠি, তারপর ব্যবস্থা করব।

ছ্বে আচ্ছা।

তোর তো ঘৰ-দোয়ারও লাগব। বউ এনে তুলবি কোথায়? একটু সামলে উঠি, তারপর
তোকে জমিজমা লিখে দিব। তখন বিয়ে হবে, তাড়াহড়ার কোন ব্যাপার না।

ছ্বে আচ্ছা।

নিজের মনে কাম করে যা। তোব বিয়ের চিন্তা তোর করা লাগবে না। আমি আছি কি
জন্যে? একটু সামলে উঠি।

বশির মোল্লা পাঁচ বছরের মাথাতেই সামলে উঠলেন। বেশ ভালভাবেই সামলে উঠলেন।
স্কুল কমিটির সভাপতি হলেন। উপজেলা ইলেকশনে জিতলেন। রোয়াইল বাজাবে বাড়ি
বানালেন। গ্রামের বাড়িতে ইলেক্ট্রিসিটি নিয়ে এলেন। তবে গ্রামের বাড়িতে এখন তিনি বেশি
থাকেন না। রোয়াইল বাজারেই থাকেন। তাঁর মনের শাস্তি ফিরে এসেছে। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী
আবো একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে পুরোপুরি পোষ মেনে গেছে। পৌর মাঝের এক সন্ধায়
বশির মোল্লা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দিন তিনেক থাকবেন। আজিম্বাল একনাগাড়ে
বেশিদিন গ্রামের বাড়িতে থাকা হয় না। শহরের নানান কাজকর্ম থাকে। কাজকর্ম ফেলে
গ্রামের বাড়িতে পড়ে থাকা সত্ত্ব না। তাছাড়া বেশ কিছু শক্ত তৈরি করেছে। এরা কখন কি
করে বসে, শহরে সেই সুযোগ কর।

বাড়িতে পা দেয়া মাত্র কেরামতের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বিস্মিত হয়ে কললেন, তুই তো
মেধি বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস রে কেরামত।

কেরামত মাথা নিচু করে ফেলল। যেন বুড়া মাঝে যাওয়া একটা অপরাধ। বশির মোল্লা
কললেন, না এবার তোর বিয়েটা দিয়ে দিতে হয় — দেবি এই শ্রাবণেই ব্যবস্থা করব। বিয়ে-
শাদীর জন্য শ্রাবণ মাস ভাল।

কেরামত শ্রীণ স্বরে বলল, ছে আছা।

তুই একটা ঘর তুলে ফেল। পুস্তুনির উপর পাড়ে যে জ্ঞানগাট আছে প্রশংসন। বাঁশবাড় থেকে বাঁশ য় লাগে নে। ঘরটা আগ হউক।

ছে আছা।

বিয়ে একটু বেশি বয়সে হওয়াই ভাল, বুদ্ধি কেরামত? এতে মিল-মহমত ভাল হয়। তুই ঘর তুলে ফেল। উপরে ছন দিয়ে দিস। ছনের টাকা নিয়ে যাস। তোর তো টাকা পাওনাই আছে।

বশির মোঞ্চা তিনদিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন। থাকতে হল সাতদিন। স্কুল কমিটির কিছু সমস্যা ছিল। সমস্যা মেটাতে হল। ফুড ফুর ওয়ার্ক প্রগ্রামে একশ' মণ গম এসেছিল। সেখান থেকে সম্ভুর মণ গমের হিসাব পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা ও ঠিকঠাক করতে হল। কয়েকটা গ্রাম্য সালিশা করতে হল। দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেল। শহরে ফেরার দিন তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে কেরামতের তৈরি ঘর দেখলেন। সে এই সাতদিনে সুন্দর ঘর তুলে ফেলেছে। ঘরের চারপাশে কাঠাল, আম এবং পেয়ারা গাছের চারা লাগিয়েছে।

বশির মোঞ্চা বললেন, গাছপালা লাগিয়ে তুই তো দেখি হলুস্তুল কবে ফেলেছিস।

কেরামত নিচু গলায় বলল, ফল-ফলাস্তির গাছ, পুলাপান বড় হইয়া আইব।

ভাল করেছিস। ভাল। কয়েকটা নারকেল গাছও লাগিয়ে দে।

ছে আছা।

দেখি এই শ্রাবণেই বিয়ে লাগিয়ে দিব।

ছে আছা।

সেই শ্রাবণে কিছু হল না। তার পরের শ্রাবণেও না। বশির মোঞ্চা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিডনির অসুখ। চিকিৎসা করাতে সপরিবারে ঢাকা গেলেন।

কেরামতকে বলে গেলেন, সেরে উঠেই বিয়ের ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলবেন। যেহে কয়েকটা দেখে রেখেছেন। এদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্র ভাল দেখে কাউকে ঠিক করা হবে।

বিয়ে-শাদী হট করে হয় না। লাখ কথার আগে বিয়ে হওয়া ঠিক না। চিরজীবনের ব্যাপার।

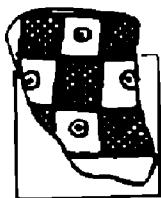
কেরামত নিচু গলায় বলল, কন্যা স্বাস্থ্যবতী হইলে ভাল হয়। ঘরে কজিকর্ম আছে।

অবশ্যই। অবশ্যই। গ্রামের বড় রোগাপটকা হইলে চলে না। আছে, স্বাস্থ্যবতী মেয়েও সন্ধানে আছে। তুই এই বিষয়ে চিন্তা করিস না। আমি আছি কি জন্মে।

কেরামত চিন্তা করে না। নিজের হাতে লাগানো ফলের গাঁজালিকে যত্ন করে। একটা গাছও মেল না যাবে। বিয়ের পর ছেলে-পুলে হবে, ফল-ফলাস্তির গাছ দুরকার। বাজারে জিনিসপত্রের যা দাম। ছেলে-পুলেকে ফল-ফলাস্তি কিনে লাগানো সত্ত্ব না।

কেরামত বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করে। সে জন্মে তার বয়স পাঁচপঞ্চাশ পার হয়েছে। এখন তার মাথার চুল সবই সাদা। বাঁ চোখে তাঁর দেখতেও পায় না। গায়ে সেই আগের জ্বোরও নেই। কাজুকর্ম তেমন করতে পারে না। তবু পুরানো অভ্যাসে সারাদিন ক্ষেত্রে পড়ে

থাকে। সন্ধ্যাকেলায় নিষ্ঠের বাড়িতে এসে অনাগত শ্রী এবং পুত্র-কন্যাদের কথা ভাবতে তার
বড় ভাল লাগে।



শীত

মাঝ রাতে মতি মিয়ার ঘুম ভোঞ্জে গেল।

বুকে একটা চাপ ব্যথা। দম বন্ধ হয়ে আসছে। শ্বাসের কষ্টটা শুরু হল বোধহয়। সে
কাথার ভেতর থেকে মাথা বের করল। কি অসন্তুষ্ট ঠাণ্ডা! বুড়োমারা শীত পড়েছে। দরমার
বেড়ার ফাঁক দিয়ে বরফ-শীতল হাওয়া আসছে। হাতে-পায়ে কোন সাড় নেই। ঠাণ্ডায় জমে
গেছে নাকি?

মতি মিয়া বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল। শ্বাসকষ্ট শুরু হলে কিছুতেই ফুসফুস
ভরানো যায় না। কেউ একটু হাওয়া করলে আবাম হত। ডাকবে নাকি ফরিদের মাকে? মতি
মিয়া উঠে বসবার চেষ্টা করল। আশ্চর্যের ব্যাপার — ব্যথাটা কমে গেল। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক
হয়ে এল। ঠিক তখনই একটা অস্তুত ব্যাপার ঘটল। মতি মিয়ার মনে হল কেউ যেন তার
কাথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। অশরীরী কেউ। সে হাত রাখল মতি মিয়ার পেটে। অসন্তুষ্ট
শীতল হাত। সেই হাতে বড় বড় আঙুল। একবার হাত রেখেই সে হাত সরিয়ে নিল। মতি
মিয়া ভয় পেয়ে ডাকল, বৌমা ও ফরিদের মা।

ফুলজান, ফরিদকে নিয়ে রাম্ভায়রে ঘুমায়। শুশ্রবের বেশিরভাগ কথারই সে কোন জবাব
দেয় না। আজ দিল। বিরক্ত স্বরে বলল, কি হচ্ছে?

কৃপীটা ধরাও গো মা। বড় ভয় লাগতাছে।

ঘুমান দেহি।

কে জানি আমার পেটের মইধ্যে হাত দিল।

স্বপ্ন দেখছেন। কার ঠেকা পরছে আপনের পেটে হাত দিব।

ফরিদবে এটু দিয়া যাও আমার সাথে। দিয়া যাও গো মা। ও যয়ন।

শামাখা চিঙ্গাইয়েন না, ঘুমান।

ও ফরিদের মা, ও বেটি।

ফুলজান সাড়া দিল না। মতি মিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। জ্বাট অঙ্ককার
চারদিকে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে একবিন্দু আলোও আসতে সাধ বোধহয় ক্ষণপক্ষ। তার ভয়টা
কিছুতেই কাটিছে না। বুড়োকালে ঘানুমের ক্ষয় বেঁচে যায়। অক্ষয়েই গা ছমছম করে।
বুড়োকাল বড় অস্তুত কাল।

রামাঘরে শৰ্মচ শব্দ হচ্ছে। ফুলজ্ঞান কি জেগে আছে? নাকি ইন্দুর? ইন্দুরের বড় উৎপাত হয়েছে। ফুলজ্ঞান বিড়বিড় করে কথা বলছে। কে জানে হয়তো বা কৃপী জ্ঞালাবে। দেখতে আসবে তাকে। যতটা ধৰণ মনে হয় মেঘেটা তত ধৰাপ না। মাঝ-যহুরত আছে। মতি মিয়া কাঁথার ভেতর থেকে মাথা বের কৰল। কি ভয়নক ঠাণ্ডা পড়েছে। এই শীতটা বোধহয় কাটানো যাবে না। ভালমদ কিছু এবারই হবে।

বৌমা শুমাইলা নাই, ও ফরিদের মা।

কিতা?

দুই কেঁথায় শীত মানে না।

না মানলে আমি কি করুম কন?

বুড়াকালে শীতটা বেশি লাগে। ফরিদের দিয়া যাও আমার কাছে। ও ফরিদের মা।

ফুলজ্ঞান জ্বাব দেয় না।

ও ফরিদের মা, ও ময়না।

লাভ হয় না কোন। মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘূমতে চেষ্টা করে। ঘূম আসে না। বুড়ো-কালের এই এক ঘন্টণা, একবার ঘূম ছুটে গেলে আর ঘূম আসে না। শীতের রাত জেগে পার করা বড় কষ্ট। ফুলজ্ঞানের দুটো বাচ্চা থাকলে ভাল হত। একটাকে রাখতেন নিজের কাছে। পুলাপানের গায়ে জ্বর ওম। লেপের চেয়ে বেশি ওম। মেছের আলি বেঁচে থাকলেও হত। একটা জোয়ান ছেলে আশেপাশে থাকলেই ঘরবাড়ি গরম থাকে। মতি মিয়ার বুক হ-শ্ব করতে লাগল। বুড়োকালে আশেপাশে একটা জোয়ান ছেলে দরকার। মেছের আলির কথা তার বেশিক্ষণ মনে রইল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ক্ষিধে লেগে গেল। অর্থচ ক্ষিধে লাগার কোনই কারণ নেই। শীতের শুরুতেই ভাতের কষ্ট দূর হয়েছে। ফুলজ্ঞান রোজ দারোগা বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে আসছে। একজনের ভাত কিন্ত তিনজনেরই ভরপেট হচ্ছে।

আজ খাওয়া হয়েছে টেংবা মাছের তরকারি ও ডাল দিয়ে। এইসব ছেটখাট জিনিস তার মনে থাকে না। কিন্ত আজকেরটা মনে আছে। কারণ টেংবা মাছের কাটা বিধে গিয়েছিল। বড় কষ্ট হয়েছে। শৰীরের কষ্টটা এখন বেড়ে গেছে, অল্পতেই কষ্ট হয়।

রামাঘরে আবার শব্দ হচ্ছে। ব্যাপারটা কি? ঘূম ভাঙল নাকি ফরিদের? মাঝে মাঝে ফরিদ চূপি চূপি চলে আসে তার কাছে। বুকের কাছে গুটিশুটি মেবে ঘূমায়। বড় অসুস্থি লাগে। মতি মিয়া উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে। এবং এক সময় অবাক হয়ে চক্ষ করে রামাঘরে কৃপী জ্ঞালানো হয়েছে। বিজ্ঞবিজ শব্দ শোনা যায়। ফরিদের মা নিজের মনেই কথা বলছে নাকি?

বৌমা কি হইছে?

কিছু অয় নাই।

বাতি জ্ঞালাইলা বিষয়ড়া কি?

ফবিদ বিছানা ভিজাইছে।

কও কি, শীতের মইধ্যে কামড়া কি করল?

একটা চড়ের শব্দ শোনা যায়। ফরিদ অবশ্য কানে না। মতি মিয়া উল্লিখিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠে, এরে দিয়া যাও আমার কাছে। মাঝের ধূইর করাৰ কাম নাই। পুলাপান শান্ত।

ফুলজানের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। এখানে আনবে না মিশচই।
ও বৌমা। ও ফরিদের মা।

কি?

ভিজ্ঞা কৈথার ঘইধ্যে রাখন টিক না। বুকে কফ জমলে মুশকিলে পড়বা। দিয়া যাও
আমার কাছে।

ফুলজানের দিক থেকে কোন সাড়া নেই। ফরিদ খুনখুন করে কাঁদতে শুরু করেছে। মতি
মিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আর তখনি ফুলজান ফরিদকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল।
এক হাতে ধরে থাকা কৃপীর সবটা আলো পড়েছে তার মুখে। মুখ থমথম করছে তার।
বোধহয় কেন্দেছে খানিকক্ষণ আগে। ফুলজান মাঝে মাঝে রাত জেগে কাঁদে। মতি মিয়া সরে
নাতির জন্যে জ্বায়গা করে দিল। ফরিদ চোখ বঙ্গ করে আছে। ঘুমের ভান। এমন বজ্জ্বাত
হয়েছে। ফুলজান দাঁড়িয়ে আছে কৃপী হাতে। কিছু বলবে বোধ হয়।

কিছু বলবা নাকি মা?

না।

শীতটা পড়েছে মারাত্মক। রশীদ সাবের কাছে একবার যাইবা নাকি? কম্বল যদি দেয়
একটা।

ফুলজান কিছু বলল না। কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মতি মিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস
গোপন করল। ফরিদের মা যাবে না। যে কোন কারণেই হোক রশীদ সাহেবের কাছে সে
যেতে চায় না। মিলিফের গম এল একবার। সবাই গেল, ফুলজান গেল না। পা টেনে টেনে
যেতে হল মতি মিয়াকেই।

ও ফরিদের মা।

কি কইবেন কন?

যাইবা নাকি কাইল একবার রশীদ সাবের কাছে?

কম্বলের আমার দরকার নাই। শীত লাগে না আমার।

তোমার না লাগলে কি, আমার তো লাগে।

আপনের লাগলে আপনে যান।

মতি মিয়া উঠে বসার চেষ্টা করে। ফরিদ শুয়ে আছে তার গা ঘেঁষে। সে অন্য শুক্রম
একটা উদ্দেশ্জনা অনুভব করে।

বুবলা ফরিদের মা, আমার হক আছে। আমার ছেলে মরে নাই যুক্ত কুণ্ড তৃষ্ণি, যুক্ত
মরে নাই?

হেতো কতই মরছে।

সবের হক আছে। বুবলা? কম্বল আমার হকের জিনিস।

ফুলজান হাই তুলে কৃপী হাতে রামাঘরে ঢুকল। বাতি সিলে শিয়ে চারদিক অঙ্ককার হয়ে
গেল। রাত কতটা বাকি কে জানে? মতি মিয়ার প্রস্তাৱক চাপ হয়েছে। শীতের মধ্যে উঠতে
ইচ্ছা হচ্ছে না। প্রস্তাৱের চাপ এমন এক জিনিস যা জ্বিধের মত হ্রস্ব করে বাড়তে থাকে।

ফরিদ ঘুমাইছে?

হ্র।

ঘূমাইলে কথা কস ক্যামনেরে ছাগল ?

ফবিদ খুকখুক কবে হাসে। মতি মিয়াও হাসে। বড় ভাল লাগে তার। বড় মায়া লাগে।

কাহল কয়ল আনতে যামু বুঝলি ফবিদ ?

আইছা।

তুইও যাইবি আমার সাথে। হকেব কম্বল। ঠিক না ?

হ্য।

ফবিদ ঘূমাইছস ?

ঘূমাইছি।

পেসাৰ কৱন দৰকাৰ।

মতি মিয়া চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই প্ৰচণ্ড শীতে উঠা সন্তোষ না। কিন্তু ইতিমধ্যে তলপেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। মাবুদে এলাই, বুড়ো হওয়াৰ বড় কষ্ট।

ফরিদ ঘূমাইছস ?

ফরিদ জ্বাৰ দেয় না। ঘূমিয়ে পড়েছে বোধহয়। মতি মিয়া ঘূমন্ত ফরিদের সঙ্গেই কথাবাৰ্তা চলাতে থাকে। কথাবাৰ্তায় ব্যস্ত থাকলে ঘনটা অন্য দিকে থাকে। তলপেটেৰ চাপেৰ কথাটা মনে থাকে না।

বুঝলি ফবিদ, কাহল যামু রশীদ সাবেৰ কাছে। তোৱ বাপেৰ নাম কইলে না দিয়া উপায় নাই। বুঝছস ? তুইও যাবি আমার সাথে। চূপ কইৱা বইসা থাকবি। ফাইজ্জলামি বাদৱামি কৱলে চড় খাইবি। বুঝছস ?

মতি মিয়া অনবৱত কথা বলতে থাকে। কথা বলতে বড় ভাল লাগে তার।

সকালটা শুরু হয়েছে খুব চমৎকাৰভাৱে। চনমনে বোদ উঠেছে। কুয়াশাৰ চিহ্নাত নেই। কে বলবে যাঘ মাসেৰ সকাল। মতি মিয়া আয়েশ কৱে বোদে বসে আছে। বড় আৱাম লাগছে।

ফুলজান ফরিদকে টিনেৰ থালায় মূড়ি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। এটা একটা ভাল লক্ষণ। এৱ মানে হচ্ছে ঘৰে পাঞ্চা নেই। যেদিন পাঞ্চা থাকে না সেদিন দুপুৰে ফরিদেৰ মংগৰম ভাতেৰ ব্যবস্থা কৰে। আজও কৰবে। দুই-এক গাল মূড়ি খেলে হত। ফরিদ থালা নিয়ে ঘূরছে দূৱে দূৱে। মূড়ি শেষ না হওয়া পৰ্যন্ত কাছে ভিড়বে না। মতি মিয়া ডাকল, ওই ফরিদ, ওই। এদিকে আয় দাদা। ফরিদ না শোনাৰ ভান কৱল। যথা বজ্জাত হয়েছে ছেনকবা।

ফুলজান দারোগা বাড়ি যাবাৰ জন্যে তৈৱি হচ্ছে। দুপুৰ বেলা মন কৱে এলে হয়। আসবে ঠিকই। মায়া-মহৰত আছে মেয়েটোৱ। ভাল মেয়ে।

দারোগা বাড়ি যাও নাকি গো মা ?

হ্য।

আইছা ঠিক আছে। যাও। রইনটা একটু তেজী হতক, আমিশ যাইতাছি রশীদ সাবেৰ কাছে।

ফুলজান কোন জ্বাৰ দিল না। মতি মিয়া ইতুতত কৱে বলেই ফেলল, চিড়া-মূড়ি কিছু আছে? শহিলডা যেন কেমন কেমন লাগে।

চিড়ি-মুড়ি কিছু নাই।

ঠিক আছে। অনুবিধা নাই। তুমি যাও :

রোদটা এত আরামের যে উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত ইচ্ছা হয় না। তবু মতি মিয়া উঠল। রশীদ
সাহেবের কাছে যাওয়া দরকার। মতি মিয়ার মন বলছে আজ গেলে কিছু-একটা হবে। না
হয়েই পারে না।

আয়রে ফরিদ।

ফরিদ তার থালাব মুড়ির শেষ দানাটি মুখে ফেলে দাদার হাত ধরল। চিকন গলায় বলল,
কোলে নাও। কাউকে কোলে মেবার বয়স কি আছে মতি মিয়া? তবু সে ফরিদকে কোলে
নিল। কিছু দূর নিষে নামিয়ে দিলেই হবে। পুলাপান মানুষ, একটা শখ হয়েছে।

রশীদ সাহেব সোহাগীর সি.ও. বেভিন্যু।

লোকটি ছোটখোট। তাঁকে দেখেই ঘনে হয় সবার উপর বিরক্ত হয়ে আছেন। ভুক না
কুঁচকে তিনি কারো দিকে তাকাতে পারেন না। কম্বলের প্রসঙ্গে তাঁর কোন ভাবান্তর হল না।
তিনি অফিসের উঠোনে একটা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন। চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি সরালেন
না। মতি মিয়া দ্বিতীয়বার বলল, শীতে বড় কষ্ট পাইতাছি।

রশীদ সাহেব সে কথারও কোন জ্বাব দিলেন না। শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন। মতি
মিয়া ভেবে পেল না কথাগুলি কিভাবে বললে শীতের কষ্টটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। রশীদ
সাহেব কম্বলের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন, নিরাসক গলায় বললেন,
এই ছেলে কে?

ছি, আমার নাতি। মেছের আলির ছেলে।

কার ছেলে?

মেছের আলির। মেছের আলিরে চিনলেন না? যুক্ত করল যে মেছের আলি।

রশীদ সাহেব বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। তিনি চিনেছেন। মতি মিয়ার মন খারাপ
হয়ে গেল। এই লোকটা বিরক্ত হচ্ছে কেন? তার ছেলের কথায় বিরক্ত হওয়ার কি আছে?

গত বছর বিলিফের গম এল। মতি মিয়া গম আনতে গিয়ে বলল, চিনছেন তো আমরে?
আমি মেছের আলির বাপ। যুক্ত করতে গিয়ে মারা গেল যে মেছের আলি। চ্যাংড়া মতি একটি
অপরিচিত ছেলে গম দিচ্ছিল। সে চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, মেছের আলির জন্মেও গম
দেয়া লাগবে? সেও কৃটি খাবে? লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই হেসে উঠল। যেন এ বকম
মজার কথা তারা বগুদিন শুনে নাই।

রশীদ সাহেব বিরক্ত হচ্ছেন। কিংবা কে জানে হয়ত রেগেও ফাঁচেন। অফিসার মানুষ।
রেগে গেলে প্রথম দিকে বোঝা যায় না। তাঁরা বাগ চেপে রাখেন। চেচামেচি হৈচে শুরু করে
ছোট লোকেরা। মতি মিয়ার মত মানুষরা।

মতি মিয়া গলা পরিষ্কার করে বলল, জবব যুক্ত করেছিল মেছের আলি। নীলগঞ্জে
একটা সড়কের তারা নাম দিছে, ‘শহীদ মেছেত আলি সড়ক।’ নীলগঞ্জ হইল মিয়া আপনার
এইখান থাইক্যা . . .

চিনি, নীলগঞ্জ কোথায় চিনি।

বশীদ সাহেবের ভূক কুঠকানো। মতি মিয়া চূপ করে গেল। বেলা অনেক হয়েছে। পেটের ক্ষিথে জানান দিচ্ছে। মুখ ভর্তি করে খুশু ঝমা হচ্ছে। বশীদ সাহেব উঠে দাঢ়ালেন। নিলিপ্ত গলায় বললেন, দাঢ়ান আপনি, একটা কম্বলের ব্যবস্থা করছি। চা আবেন?

মতি মিয়ার চোখে পানি এসে গেল। বলে কি এই লোক? মতি মিয়া চেঁথ মুছল। ধৰা গলায় বলল, গত বৎসর বড় কষ্ট করেছি জনাব। দানা পানি নাই। শেষে ফরিদের মা কইল, বুধবারের বাজারে একটা থালা লইয়া বসেন। বসলায় গিয়া। নিজ গেরামের বাজারে ভিক্ষা করা শরমের কথা। বড় শরমের মধ্যে ছিলাম জনাব।

মতি মিয়া ক্রমাগত চোখ মুছতে লাগল। ফরিদ তাকিয়ে আছে। সে বড়ই অবাক হয়েছে।

বশীদ সাহেব শুধু যে কম্বল দিয়েছেন তাই না, পঞ্চাশটি টাকাও দিয়েছেন। সেই টাকার ধানিকটা ভাঙিয়ে মতি মিয়া চা ও চিনি কিনে ফেলল। ফরিদকে বলল, বুড়াকালে চা টা খুব দুরকার। বুকে কফ জমে না। ভাল ঘূম হয়। বুধলিবে বেকুব। বুড়াকালে চা হইল গিয়া অমৃৎ।

তারা দুজন সাড়া দুপুর বাজারে ঘূরল। মতি মিয়া পরিচিত সবাইকেই নতুন কম্বল দেখাল। তার গাল ভর্তি হাসি, মেছের আলির কারণে পাইলায়, বুধলা না? মেছেরের নাম কইতেই মন্ত্রের মত কাম হইল। বিলাতী জিনিস, হাত দিয়া দেখ। জবর ওম। চাইর পাঁচ শ' টেকা দাম হইব, কি কও?

মতি মিয়ার ঘনে ক্ষীণ আশংকা ছিল ফরিদের মা কম্বলটা হয়ত নিজের জন্যে দাবি করবে। মেছের আলির কম্বলে ওদের দাবিই তো বেশি। কিন্তু তা সে করল না। চকচকে নতুন কম্বলের প্রতি তার কোন রকম আগ্রহ দেখা গেল না। সে ষথারীতি ফরিদকে নিয়ে রান্নাঘরে ঘুমুতে গেল।

দীর্ঘদিন পর আরাম করে ঘুমুতে গেল মতি মিয়া। এত আরাম যে চট করে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে না। জেগে গল্প করতে ইচ্ছা করে।

ফরিদের মা, ঘুমাইলা নাকি?

না।

জবর ওম কম্বলটার মইধ্যে। বিলাতী জিনিস তো। বিলাতী জিনিসের ওম অন্য ক্ষম। ভাল ঘূম হইব।

ঘুমান ভাল কইব।

ফরিদের মা।

কন কি।

মেছেরের কথা কইতেই বশীদ সাব খুব ইজ্জত করল। চা খাইয়াইল। শরীফ আদমী। খুব শরীফ আদমী।

ফুলজান জবাব দিল না। মতি মিয়া বলল, ফরিদবে দিয়া যাও, আমার সাথে বাপের কম্বলের নীচে ঘুমাউক। ফুলজান সে কথারও জবাব দিল কাণ ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

গভীর ত্বক্ষিতে ঘুমুবার আয়োজন করল শান্তি মিয়া। ছেলের প্রতি গাঢ় ক্ষতজ্জ্বায় তার মন ভরে যাচ্ছে। বড় শান্তি লাগছে। ঘুমের মফ্তেই সে খনল, ফুলজান কাঁদছে। সে প্রায়ই

কাঁদে। তার কান্না শুনতে মতি মিয়ার কোন কালেই ভাল লাগে না, কিন্তু অংজ ভাল লাগছে। কেমন যেন গানের সুরের মত সুর।

আবায় করে ঘূমায় মতি মিয়া। বাইরে প্রচণ্ড শীত। ঘন হয়ে কৃষ্ণশ পড়ছে। উত্তব দিক থেকে বহিছে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া।



ওইজা বোর্ড

প্রায় আট বছর পর নাসরিনের বড় ভাই আলাউদ্দিন দেশে ফিরল। সঙ্গে বিদেশী বড়। বড়য়ের নাম কুরাব। বড়য়ের চূল সোনালী, চোখ ঘন নীল, মুখটাও মায়া মায়া। তবু মেয়েটাকে কারোরই পছন্দ হল না।

যে পরিধান আগ্রহ নিয়ে নাসরিন বড় ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল, ভাইকে দেখে সে ঠিক ততখানি নিরাশ হল। আট বছর আগে নাসরিনের বয়স ছিল নয়। এখন সতেরো। ন'বছর বয়েসী চোখ এবং সতেরো বছর বয়েসী চোখ এক রকম নয়। ন' বছর বয়েসী চোখ সব কিছুই কৌতুহল এবং যত্ন দিয়ে দেখে। সতেরো বছরের চোখ বিচার করতে চেষ্টা করে। তার বিচারে ভাইকে এবং ভাইয়ের বৌ-কে — দুজনকেই খারাপ লাগছে।

নাসরিন দেখল তার ভাই আগের মত চুপচাপ, শাস্তি ধরনের ছেলে নয়। খুব হৈ- চৈ করা শিখেছে। স্ত্রীকে নিয়ে সবার সামনে বেশ আহ্লাদ করছে। ঠোট গোল করে 'হানি' ডাকছে। অথচ 'হানি' শব্দটা বলার সময় ঠোট গোল হয় না।

আলাউদ্দিন এতদিন পর দেশে আসছে। আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে উপহার-টুপহার আনা উচিত ছিল, তেমন কিছুই আনেনি। ভূষভূষা এ্যাশ কালারের একটা সোয়েটার এনেছে মা'র জন্যে। সেই সোয়েটার নিয়ে কত রকম আধিখ্যেতা — পিওর ওল মা। পিওর ওল ভারতীয় আমেরিকাতেও এক্সপ্রেন্সিভ। মা তোমার কি কালার পছন্দ হয়েছে?

নাসরিনের একবার বলার ইচ্ছা হল, এ্যাশ কালারে পছন্দের কি আছে ভাইয়া?

অবশ্যি কিছু বলল না। তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। এতদিন খুব আসছে। ভাইয়ার কি উচিত ছিল না মা'র জন্যে একটা ভাল কিছু আনা?

বাবার জন্যে এনেছে ক্যালকুলেটর। যে বাবা রিটায়ার করেছে, চোখে দেখতে পায় না, সে ক্যালকুলেটর দিয়ে কি করবে?

নাসরিনের বড় বোন শারমিন তার দুই জন্মজ মেয়েকে কিময়ে সুটকেস খোলার সময় বসে ছিল। এই দুমেয়েকে আলাউদ্দিন দেখেনি। চিঠি লিখে আনিয়েছে এই দুমেয়ের জন্যে একই রকম দুটা জিনিস আনবে, যা দেখে দুজনই মুশ্ক হবে। দুজনের জন্যে দুটা গায়ে মাঝা সাবান বেরুল। এই সাবান ঢাকার নিউ মার্কেটে ভর্তি — আমেরিকা থেকে বয়ে আনতে হয় না।

আলাউদ্দিন বলল, বেশি কিছু আনতে পাৰিনি, বুৰলি? লাস্ট মোমেন্টে ক্লাৱা ডিসাইড কৱল আমাৰ সঙ্গে আসবে: অনেকগুলি টাকা বেৱিয়ে গেল কিছু টাকা সঙ্গেও রাখতে হয়েছে। ঢাকায় হোটেলেৰ বিল কেমন কে জানে?

নাসৱিন বলল, হোটেলেৰ বিল মানে? তুমি কি হোটেলে উঠবে?

'বাধ্য হৰে উঠতে হবে। এই গাদাগাদি ভীড়ে ক্লাৱাৰ দম বন্ধ হয়ে আসছে। চট কৰে তো সব অভ্যাস হয় না। আস্তে আস্তে হয়। তোৱা আবাৰ এটাকে কোন ইস্যু বানিয়ে বসবি না। তোদেৱ কাজই তো হচ্ছে সামান্য ব্যাপারকে কোনমতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ইস্যুতে নিয়ে যাওয়া।'

নাসৱিনেৰ চোখে পানি এসে গেল। তাৰ আপন বড় ভাই তাৰ সঙ্গে এমন ব্যবহাৰ কৱবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। নাসৱিনেৰ চোখেৰ পানি অবশ্যি কেউ দেখতে পেল না। 'একটু আসছি ভাইয়া' বলেই সে চট কৰে উঠে গেল। বাথরুমে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চোখ মুছে উপস্থিত হল। আলাউদ্দিন তখন স্যুটকেস খুলে আৰো কি সব উপহাৰ বেৱ কৰছে। অতি তুছ সব জিনিস — গাড়িৰ পেছনে লাগানোৰ স্টিকাৰ, ষেখানে লেখা —“Hug Your Kid” তাদেৱ গাড়ি কোথায় যে তাৱা গাড়িৰ পেছনে স্টিকাৰ লাগাবে? কেউ অবশ্যি কিছু বলল না। সবাই এমন ভাৱ কৱতে লাগল যে গাড়িৰ স্টিকাৰটাৰ খুব প্ৰয়োজন ছিল।

আলাউদ্দিন বলল, নাসৱিন তোৱ ভান্যে তো কিছু আনা হয়নি।

নাসৱিন বলল, ভাইয়া আমাৰ কিছু লাগবে না।

'তোকে বৱং এখান থেকেই শাড়ি-টাড়ি কিছু কিনে দেব।'

'আচ্ছা।'

আলাউদ্দিন স্যুটকেস ঘাঁটতে লাগল। তাৰ ঘাঁটাৰ ভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে আশা কৱছে কিছু-একটা পেয়ে যাবে, যা নাসৱিনকে দিতে পাৱলে শাড়িৰ ঝামেলায় যেতে হবে না। নাসৱিনেৰ লজ্জাৰ সীমা রইল না।

'এই যে জিনিস পাওয়া গেছে।'

হাসিতে আলাউদ্দিনেৰ মুখ ভৱে গেল। সবাই ঝুঁকে পড়ল স্যুটকেসেৰ উপৰ। লিপিস্টিকেৰ ঘত একটা বস্তু বেৱল। আলাউদ্দিন বলল, নাসৱিন নে। এৱ নাম লিপ গ্ৰাস। ঠোটে দিলে ঠোট চকচক কৱে, ঠোট ফাটে না।

নাসৱিন শুকনো গলায় বলল, থ্যাঙ্কস ভাইয়া।

আলাউদ্দিন বিৱৰণ গলায় বলল, গিফট হচ্ছে গিফট। শিফটেৰ মধ্যে সন্তোষ দায়ী কোন ব্যাপার না। বাঙালীদেৱ স্বভাৱ হচ্ছে, কোন উপহাৰ পেলেই হিসাব-নিকাশ বসে যাবে। দাম কৰত কি!

নাসৱিন বলল, আমি কোন হিসাব-নিকাশ কৱছি না ভাইয়া। লিপ গ্ৰাসটা আমাৰ খুব পছন্দ হয়েছে।

'দ্যাটস গুড। যাই গড, নাসৱিন তোৱ ভাগ্য তালু আৱেকটা জিনিস পাওয়া গেছে — ওইজা বোৰ্ড। এতক্ষণ চোখেই পড়েনি।'

'ওইজা বোৰ্ড আবাৰ কি?'

আলাউদ্দিন লুড় বোর্ডের মত একটা বোর্ড মিলে ধৰল। চারদিকে এ থেকে জ্বেড পর্যন্ত লেখা। মাঝখানে দুটা ঘর — একটায় লেখা 'ইয়েস', একটায় 'নো'।

'এটা কি কোন খেলা ভাইয়া ?'

'খেলাই বলতে পারিস। ভূত বানানোর খেল। প্ল্যানচেটের নাম শুনিসনি ? এটা দিয়ে প্ল্যানচেটের মত করা যায়।'

'কিভাবে ?'

'লাল বোতামটা দেখছিস না ? দুজন বা তিনজন মিলে খুব হালকাভাবে তজনি দিয়ে এটাকে টাচ করে রাখবি, কোন রকম প্রেসার দেয়া যাবে না। বোতামটাকে বাখবি বোর্ডের ঠিক মাঝখানে। ঘরের আলো কমিষ্টি দিবি, আর মনে মনে বলবি — 'If any good soul passes by -- please come', তখন আত্মাটা বোতামে চলে আসবে। বোতাম নড়তে থাকবে। তখন কোন প্রশ্ন করলে আত্মা জবাব দিবে।'

'কিভাবে জবাব দিবে ?'

'বোতামটা অঙ্করগুলির উপর যাবে। কোন কোন অঙ্করের উপর যাবে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। ভূতটার নাম যদি হয় রহিম, তাহলে প্রথমে যাবে 'আর'-এর উপর, তাবপর 'এ'-র উপর, তারপর 'এইচ' — বুঝতে পারছিস ?'

'বোতামটা আপনা-আপনি যাবে ?'

'না, আস্কুল দিয়ে ছুঁয়ে রাখতে হবে।'

'ভাইয়া, ভূত কি সত্ত্ব সত্ত্ব আসে ?'

'আরে দূর দূর। ভূত আছে না-কি যে আসবে। আমেরিকানদের এটা হচ্ছে পয়স বানানোর একটা ফন্ডি। এত সহজে আত্মা চলে এলে তো কাজই হত।'

আলাউদ্দিন আমেরিকানদের স্বত্ত্বা-চরিত্র সম্পর্কে যজ্ঞার যজ্ঞার গল্প করতে লাগল। আলাউদ্দিনের মা — রাহেলার মনে ক্ষীণ আশা — গল্প যেভাবে জমেছে তাতে মনে হয় না ছেলে বৌকে নিয়ে হোটেল যাবে। যদি সত্ত্ব সত্ত্ব যায় তাহলে তিনি মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। এম্বিউটেই বিদেশী বৌয়ের কথায় অনেকেই হাসাহাসি করছে। জ্ঞানশেদ সাহেবের স্ত্রী গত সপ্তাহে এসে সরু গলায় বললেন, বাঙালী ছেলেরা যে বিদেশে নিয়েই বিদেশিনি বিয়ে করে ফেল ঐ সব বিদেশিনিগুলি নীচু জাতের। বি-জ্ঞানারনী এই স্ত্রী। ভদ্রলোকের মেয়েরা বাঙালী বিয়ে করতে যাবে কেন ? ওদের গবজ্জটা কি ?

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, আপনাকে কে বলেছে ?

'বলবে আবার কে ? এ তো সবাই জানে। বাঙালী ছেলেগুলির পাক-চামড়া দেখে আব হৃৎ থাকে না। ওরা তো প্রথম প্রথম জানে না যে, ঐ দেশের বিদেশী চামড়াও সাদা, আবার মেখরানীর চামড়াও সাদা।'

রাহেলা এই সব কথার কোন জবাব দিতে পারেন নি। শুধু শুনে গেছেন। এখন যদি ছেলে বউ নিয়ে হোটেলে চলে যায় তাহলে কি হবে ? সবাই তো গায়ে পুরু দিবে।

অবশ্যি তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এক ছেলের কউয়েব জন্যে একটা ঘর ভালমত সাজাতে। নাসরিনের ঘরটাই সাজাতে হয়েছে। দেয়ালে চুমকাম করা হয়েছে। টিউব লাইট লাগান হয়েছে। একটা ফ্যান ঘরে আছে। সেই ফ্যান ঘটাই ঘটাই শব্দ হয় বলে নতুন

একটি সিলিং ফ্যান কেন হয়েছে। তারপরেও যদি ছেলে বউ নিয়ে হোটেলে উঠে তিনি কি আর করবেন? তাঁর আর কি কবার আছে?

বাতেব খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিন বলল, আমরা তাহলে উঠি যা।
বাহেলা কীণ গলায় বললনে, কোথায় যাবি?

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, কোথায় যাবি বলছ কেন যা? আগেভাগে তো বলেই বেধেছি একটা ভাল হোটেলে উঠতে হবে। ফ্লারা গতরাতে এক ফোটা ঘুমায় নি। বেচারি গরমে সিন্ধ হয়ে গেছে। বাতাস নেই এক ফেঁটা।

‘ফ্যান তো আছে।’

‘বাতাস গরম হয়ে গেলে ফ্যানে লাভ কি? তোমরা গরম দেশের যানুষ, ওব কষ্টটা কি বুঝবে? আমি নিজেই সহ্য করতে পারছিলাম না, আর ও...’

‘বউকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠলে লোকে নানান কথা বলবে।’

আলাউদ্দিন এই কথায় রাগে জ্বলতে লাগল। হড়বড় করে এমন সব কথা বলতে লাগল যার তেমন কোন অর্থ নেই।

তার বাবা মনসুর সাহেব যিনি কখনোই কিছু বলেন না তিনি পর্যন্ত বলে ফেললেন, তুই খামাখা চিৎকার করছিস কেন?

‘আমি খামাখা চিৎকার করছি? আমি খামাখা চিৎকার করছি? আমি শুধু বলছি লোকজনের কথা নিয়ে তোমরা নাচানাচি কর কেন? তোমরা যদি না খেয়ে যব লোকজন এসে তোমাদের খাওয়াবে? প্রতি মাসে দেড়শ” ভলারের যে মানি অর্ডারটা পাও সেটা কি লোকজন দেয়? বল, দেয় লোকজন?’

মনসুর সাহেব দীর্ঘ মিশ্শাস ফেলে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, যা, যেখানে যেতে চাস।

আলাউদ্দিন তিঙ্ক গলায় বলল, তোমরা যে ভাবছ ছেলে ঘর ছেড়ে হোটেলে চলে যাচ্ছে, কাজেই ছেলে পর হয়ে গেল — এটা ঠিক না।

‘আমরা কিছু ভাবছি না। তুই আর ভ্যাজভ্যাজ কবিস না। মাথা ধরিয়ে দিয়েছিস।’

‘মাথা ধরিয়ে দিয়েছি? আমি মাথা ধরিয়ে দিয়েছি?’

আট বছর পৰ ফিরে—আসা পুত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় বাতেহ বাড়ির সদস্যদের খণ্ড প্রতিয়ের মত হয়ে গেল। নাসরিন মনে মনে বলল, বেশ হয়েছে। খুব মজা হয়েছে। আমি খুব শুশ্ৰূশ হয়েছি।

ফ্লারা ঝগড়ার ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না। একবার শুধু জু কুঠকে বলল, ‘তোমরা এত চেঁচিয়ে কথা বল কেন?’ বলেই জবাবের অপেক্ষা না করে বসার ঘরে চিকাটিকি দেখতে গেল। বাংলাদেশের এই ছোট্ট প্রাণী তার হস্ত হরণ করবেছে। সে চিকাটিকির একুশটা ছবি এ পর্যন্ত তুলেছে। ম্যাকরো ল্যান্স আনা হয়নি বলে খুব আকসমাত্ত করছে। ম্যাকরো ল্যান্সটা থাকলে ক্লোজ-আপ নেয়া যেত।

খুব সংত কারণেই গভীর রাত পর্যন্ত এ পরিবারের কোন সদস্য ঘুমুতে পারল না। বারান্দায় বসে বাহেলা ক্রমাগত অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। এক সময় মনসুব সাহেব বললেন, আর কেঁদো না, চোখে ঘা হয়ে যাবে। তোমার ছেলের আশা ছেড়ে দাও। বিদেশী পেঞ্জী বিয়ে করে ধৰাকে সরা দেখছে। হারামজাদা।

নাসরিন আজ ওর ঘরে ঘূমতে পারছে।

ঘরে ঢুকে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কত আগ্রহ করে তারা সবাই মিলে ঘর সাজিয়ে দিয়েছে, তবু ভাইয়ার পছন্দ হল না। এই ঘরটা কি হোটেলের চেয়ে কম সুন্দর হয়েছে? মাথার পাশে টেবিল ল্যাম্প। পায়ের দিকের দেয়ালে সূর্যস্তরের ছবি। খাটের পাশে মেরুপ রঙের বেড সাইড কাপেট। জানালা খুলে ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়ে দিলে খুব-একটা গরম কি লাগে? কই তার তো লাগছে না। তার তো উল্টো কেমন শীত শীত লাগছে।

সে টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। এত বড় খাটে একা ঘূমতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। ভাইয়া থাকবে না জ্বালে বড় আপাকে জ্বোব করে রেখে দিত। নাসরিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আজ রাতটা তাদের জন্যে খুব খারাপ রাত। আজ রাতে তাদের কারোরই ঘূম হবে না। একা একা জেগে থাকা খুব কষ্টে।

ভূত নামালে কেমন হয়? ওইজা বোর্ড খুলে সে যদি বোতামটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে বসে থাকে তাহলে কি কিছু হবে? যদি কোন আত্মা চলে আসে ভালই হয়। আত্মার সঙ্গে গল্প করা যাবে। মুশকিল হচ্ছে — এই আত্মাগুলি আবার কথা বলে না। বোতাম ঠেলে ঠেলে মনের ভাব প্রকাশ করে।

নাসরিন দরজা বন্ধ করে ওইজা বোর্ড নিয়ে বসল। তজনি দিয়ে বোতামটা ছুঁয়ে নরম গলায় বলল, আমার আশেপাশে যদি কোন বিদেহী আত্মা থাকেন তাহলে তাদের যথ্য থেকে একজন কি দয়া করে আসবেন? যদি আসেন তাহলে আমার মনটা একটু ভাল হবে। কারণ আজ আমার মনটা খুব খারাপ। কেন খারাপ তা তো আপনারা খুব ভাল করেই জানেন। পুরো ঘটনার সময় নিশ্চয়ই আপনারা আশেপাশে ছিলেন। ছিলেন না? এই পর্যন্ত বলেই নাসরিন চমকে উঠল। ডান হাতটা একটু যেন কাঁপছে।

বোতামটা কি নড়তে শুরু করেছে? অস্তুব। হতেই পারে না। একি! বোতামটা এগিয়ে গেল কিভাবে? নাসরিন নিজেই হয়ত নিজের অজ্ঞানে বোতাম ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেছে। খানিকটা ভয় এবং খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে নাসরিন অপেক্ষা করছে। হচ্ছেটা কি?

বোতাম ‘ইয়েস’ লেখা ঘরে কিছুক্ষণ থেমে আবার আগের জ্যাগায় ফিবে এল। নাসরিন শব্দ করেই বলল, বাহু বেশ যজ্ঞ তো! পরবর্তী কিছুক্ষণ ‘ইয়েস’ এবং ‘নো’তে বোতাম ঘূরতে লাগল। নাসরিনের শুরুর ভয় খানিকটা কমে গেল। যদিও তখনো বুক ধ্বকধ্বক করছে।

ওইজা বোর্ড ‘ইয়েস’ এবং ‘নো’ ছাড়া আরো দুটি ঘর আছে। সেগুলি হচ্ছে — ‘আমি উন্নত দেব না’, ‘আমি জানি না’। বোতামটা এই সব ঘরেও যাবে মাঝে এল। প্রশ্ন এবং উন্নত এইভাবে সাজান যায়।

‘আপনি কি এসেছেন?’

‘হ্যা।’

‘আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন?’

‘না।’

‘আপনি কোথায় থাকেন?’

‘আমি উন্নত দেব না।’

BanglaBook.org

‘আজ আমাদের সবার খুব মন খারাপ সেটা কি আপনি জানেন?’

‘না।’

‘কি জন্যে আমাদের মন খারাপ সেটা কি বলব?’

‘না।’

‘শুধু না—না করছেন কেন? একটু শুনলে কি হয়? বলি?’

‘হ্যাঁ।’

‘তার আগে বলুন আপনার নাম কি?’

বোতামটা ঘূরতে ঘূরতে এক্ষ ঘরে গিয়ে থামল। নাসরিন বলল, এক্ষ দিয়ে বুঝি কারো নাম হয়? ঠিক করে নাম বলুন।

‘আমি জানি না।’

‘আপনি জানেন না যানে? আপনার কি নাম নেই?’

‘না।’

‘ভূতদের নাম থাকে না?’

‘আমি জানি না।’

‘সে—কি! আমার তো ধারণা প্রেতাত্মারা সব জানে। আর আমি আপনাকে যা—ই জিঞ্জেস করছি — আপনি বলছেন আমি জানি না। আচ্ছা বলুন তো, উনিশকে তেব দিয়ে গুণ দিলে কত হয়?’

‘আমি জানি না।’

‘আমিও জানি না। তবে আপনি যদি বলতেন তাহলে গুণ করে বের করতাম। আপনি কি গুণ অংক জানেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আচ্ছা, আত্মাদের কি অংক করতে হয়?’

বোতাম এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল। উত্তর দিল না। নাসরিন বলল, আপনি কি আমার উপর রাগ করবেন?

‘হ্যাঁ।’

‘প্রীজ, আমার উপর রাগ করবেন না। কেউ আমার সাথে রাগ করলে আমার খুব শিন খরাপ থাকে। এমনিতেই আজ আমার খুব মন খারাপ। আপনি কি জানেন আমার যে মন খারাপ?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেন মন খারাপ সেই ঘটনাটা বলি? বলব?’

‘হ্যাঁ।’

নাসরিন আজ সাবাদিনের ঘটনা বলতে শুরু করল। ঘটনাটো বলতে দু'বার কেঁদে ফেলল। তার কাছে একবারও মনে হল না সে হাস্যকর একটা কোশু করছে। এইসব গৃহপ বোতামটাকে বলার কোন মানে আছে?

BanglaBook.org

নাসরিন ঘূমতে গেল বাত তিনটাৰ। শুব চমৎকাৰ ঘূম হল। ঘূমিয়ে এত ত্ৰপ্তি অনেকদিন সে পায়নি। তবে ঘূমেৰ ঘণ্টো সারাক্ষণই মনে হল — একজন বুড়ো মানুষ তাৰ গায়ে হাত বেঞ্চে শয়ে আছেন। বুড়ো মানুষটাৰ শৰীৰে চুকটোৱে কড়া গন্ধ।

২

তোৱ সাতটায় আলাউদ্দিন এসে উপস্থিত।

সে ভোৱ হতেই বাসায় চলে আসবে রাহেলা তা ভাবেন নি। আগেৰ রাতৰে সব দৃঢ়ৰ তিনি ভুলে গোলেন। হাসি মুখে কললেন, বৌমাকে আনলি না?

‘ও ঘূমচ্ছে। ঘূম ভাঙলে চলে আসবে। মোট লিখে এসেছি।’

‘আসতে পাৰবে একা একা?’

‘আসতে পাৰবে না মানে? কি যে তুমি বল মা। ওকি আমাদেৱ দেশেৰ মেয়ে যে স্বামী ছাড়া এক পা ফেলতে পাৰে না?’

‘তা তো ঠিকই।’

রাহেলা নাশতাৰ আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আলাউদ্দিনকে এখন অনেক সহজ ও স্বাভাৱিক মনে হচ্ছে। রামাঘৱে মাৰ পাশে বসে অনেক গল্প কৱতে লাগল। নাসরিন এবং মনসুৰ সাহেবও গল্পে যোগ দিলেন।

‘তুই তো ত্রি দেশেই থেকে যাবি?’

‘হ্যা। এই দেশে আছে কি বল? এই দেশে থাকলে তো মৰতে হবে না খেয়ে।’

‘অনেকেই তো আছে।’

‘কি রকম আছে তা তো দেখতেই পাইছি।’

‘তাও ঠিক।’

নাসরিনও সহজভাৱে ভাইয়েৰ সঙ্গে অনেক গল্প কৱল। এখন ভাইয়াকে শুব আপন লাগছে। কথা বলতে ভাল লাগছে।

‘ভাইয়া, কাল ওইজ্বা বোৰ্ড দিয়ে ভূত এনেছিলাম।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যা। আপনা-আপনি বোতাম এক ঘৰ থেকে অন্য ঘৰে যায়।’

‘তুই নিশ্চয়ই ঠেলেছিস।’

‘অনেকট ভাইয়া। মোটেই ঠেলি নি।’

‘তুই না ঠেললেও তোৱ সাৰ-কনশাস মাইও ঠেলেছে। আমি নিউজ উইক পত্ৰিকায় দেখেছিলাম — পুৱো ব্যাপারটাই আসলে সাৰ-কনশাস মাইওয়ে।’

এমন সহজ-স্বাভাৱিকভাৱে যে মানুষটা গল্প কৱল মেই আবাৰ ঠিক সন্ধ্যাবেলা একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে বসল। সাধাৰণ ঝগড়া না — কুণ্সিত লগজি ব্যাপারটা প্ৰৱেক্ষণ :

কুৱা আবাৰ পানি চেয়েছে।

নাসরিন ঘূসে কৱে পানি দিয়েছে। এক ছুকে সেই পানি খেয়ে কুৱা বলল, থ্যাংকস। শুব বালো পানি।

কুৱা এখন কিছু কিছু বালু বলাৰ চেষ্টা কৱে।

আলাউদ্দিন বলল, ফোটান পানি দিয়েছিস তো ? বয়েলড ওয়াটাৰ ?

‘না ভাইয়া। টেপের পানি।’

‘কেন ? তোদেরকে কি আগে বলিনি দুব সময় বয়েলড পানি দিবি, পানি ফুটিয়ে পবে বোতল ভৱে রাখবি। সামান্য কথাটা মনে থাকে না ? বয়স যত বাঢ়ছে তোৱ বৃদ্ধি দেখি তত কমছে।’

নাসরিনের মুখ কালো হয়ে গেল।

মনসূব সাহেব মেঘেকে বক্ষা কৰাব জন্যে বললেন, একবাৰ মাত্ৰ খেয়েছে কিছু হবে না। আমৰা তো সব সময় খাচ্ছি।

‘তোমাদেৱ খাওয়া আৱ ক্লাৰার খাওয়া এক হল ? মাইক্রো অৱগেনিজম খেয়ে খেয়ে তোমৰা ইয়মিউন হয়ে আছি। ও তো হয়নি।’

‘যা হবাৱ হয়ে গেছে। এখন চিৎকাৱ কৰে আৱ কি হবে ?’

‘চিৎকাৱ কৰছি না—কি ? তোমাদেৱ সঙ্গে দেবি সামান্য আৰ্টমেন্টও কৰা যায় না।’

নাসরিন অনেক চেষ্টা কৰেও কাঙ্গা আটকাতে পাৱল না। মুখে শাড়িৰ আঁচল গুঞ্জে দ্রুত বেৱ হয়ে গেল। বাহেলা ঘূৰু স্বৱে বললেন, দিলি তো মেয়েটাকে কাঁদিয়ে। যা অভিযানী যেয়ে। বাতে তো খাবেই না।

আলাউদ্দিন বিৰক্ত গলায় বলল, এত অল্পতেই ঘদি চোখে পানি এসে যায় ভাহলে তো মুশকিল। একটা ভূল কৰলে আৱ ভূল ধৰিয়ে দেয়া যাবে না ?

‘ও ছেলেমানুষ !’

‘ছেলেমানুষ কি বলছ ? সতেৱো—আঠাবো বছৰে কেউ ছেলেমানুষ থাকে ? তোমাদেৱ জন্যে বড় হত্তে পাৱে না। তোমৰা ছেলেমানুষ বানিয়ে রেখে দাও।’

আলাউদ্দিন রাতে খেল না। বড়কে নিয়ে না—কি নিৰিবিলি কোথাও ডিনার কৰবে।

নাসরিন সেই রাতে ঘুমতে গেল না খেয়ে। অনেকক্ষণ জেগে রইল, ঘুম এল না। তাৱ খুব কষ্ট হচ্ছে। মৰে যেতে ইচ্ছা কৰছে। অনেক রাতে সে ওইজা বোৰ্ড নিয়ে বসল। আজি আৱ দেবি হল না। বোতামে হাত বাখামাত্ৰ বোতাম নড়তে লাগল। আজি সে উত্তৱগুলিও শুধু ‘হ্যা’ বা ‘না’ দিয়ে দিচ্ছে না। অকৱেৱে উপৰ ঘূৰে ঘূৰে — ছেট ছেট শব্দ তৈবি কৰছে। আজিৰ মজার শব্দ। নাসরিন এই শব্দগুলিতে গুৰুত্ব দিচ্ছে না, আবাৱ গুৰুত্ব দিচ্ছে। একবৰুৱ ভাবছে — এগুলি অবচেতন মনেৱ ইচ্ছা। আৱেকবাৱ ভাবছে — হত্তেও তো ‘পাইঁ’ হয়ত সত্যি কেউ এসেছে। পথিবীতে রহস্যময় ব্যাপারটা তো হয়। কটা রহস্যেৰ সম্বৰ্ধন আমৰা জানি ? কি যেন বলেছেন শেক্সপীয়াৰ — There are many things ...

‘আপনি কি এসেছেন ?’

‘হ্যা।’

‘কাল যিনি এসেছিলেন আজও কি তিনিই এসেছেন ?’

‘হ্যা।’

‘আপনাৰ নাম ?’

‘খুঁ’

‘কি অস্তুত নাম। আচ্ছা আপনি কি জানেন আজি আমাৱ মন কালক্ষেৱ চেয়েও খাৱাপ ?’

‘জানি।’

‘কি করা যায় বলুন তো?’

‘আমি জানি না।’

‘আপনি কি জানেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগে?’

‘জানি।’

‘ভাইয়া বলছিল এই যে আপনি নানান কথা বলছেন এগুলি আসলে আমার মনের অবচেতন ইচ্ছার প্রতিফলন।’

‘হতে পারে।’

‘ভাইয়াকে আমার দারুণ পছন্দ।’

‘আমি জানি।’

‘ঐ পচা মেয়েটা সব নষ্ট করে দিয়েছে। আমার মনে হয় মেয়েটা ডাইনী। ও আশেপাশে থাকলেই ভাইয়া অন্য রকম হয়ে যায়। তখন সবার সঙ্গে ঝগড়া করে।’

‘জানি।’

‘কি করা যায় বলুন তো?’

‘মেয়েটাকে মেরে ফেল।’

‘চিঃ! কি যে বলেন! মানুষকে মেরে ফেলা যায় না—কি?’

‘হ্যা, যায়।’

‘কিভাবে?’

‘অনেকভাবে।’

‘আপনার কথাবার্তার কোন ঠিক নেই। আপনি কি করে ভাবলেন আমি একটা মানুষ মারতে পারি?’

‘সবাই পারে।’

‘আপনি পারেন?’

‘না।’

‘আপনি পারেন না কেন?’

‘আমি জানি না।’

‘মানুষ মারা যে মহাপাপ এটা কি আপনি জানেন?’

‘আমি জানি না।’

‘আপনি আসলে কিছুই জানেন না।’

‘হতে পারে।’

‘তাছাড়া আপনি আবেকটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন শুধুমাত্র নয়, আমি ঐ পচা মেয়েটাকে মেরে ফেললাম, তখন পুলিশ কি আমাকে ছেড়ে দেবে? আমাকে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে না?’

‘তা দিতে পারে।’

www.BanglaBook.org

'আর ভাইয়ার অবস্থাটা তখন চিন্তা করে দেশুন। কি রকম রাগ সে করবে। টাকা-পয়সা দেমা বক্ষ করে দেবে। আমর তখন না খেয়ে যাবা যাব। বাবার এক পয়সা রোজগার নেই, আমাদের ব্যাংকে টাকা-পয়সা নেই। ভাইয়া প্রতিমাসে যে টাকা পাঠায় এটা দিয়ে আমরা চলি। ভাইয়া প্রতিমাসে কত পাঠায় বলুন তো ?'

'আমি জানি না।'

'একশ' ডলার। একশ' ডলারে বাংলাদেশী টাকায় কত হয় তা জানেন ?'

'না।'

'বেশি না, সাড়ে তিন হাজার। মা এবাব কি ঠিক করে রেখেছেন জানেন ? মা ঠিক করে রেখেছেন — ভাইয়াকে বলবে আরো কিছু বেশি টাকা পাঠাতে। একশ' ডলারে হচ্ছে না। জিনিসপত্রের যা দাম। আপনাদের তো আর কেন কিছু কিনতে হয় না। আপনারা আছেন সুখে, তাই না ?'

'আমি জানি না।'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ভাইয়া টাকার পরিমাণ বাড়াবে ?'

'আমি জানি না।'

'না বাড়ালে আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে বাড়াবে না। বিয়ে করেছে, খরচ বেড়েছে। ভাই না ?'

'হতে পারে।'

'টাকা না বাড়ালে কি হবে বলুন তো ? আমার আরেক ভাই আছেন — জিসিম ভাইয়া। চিটাগং-এ আকেন। তাঁর টাকা-পয়সা ভালই আছে। কিন্তু সে আমাদের একটা পয়সা দেয় না। আমরা যদি না খেয়ে যরেও যাই ফিবে তাকায় না। কি করা যায় বলুন তো ?'

'ক্লাবাকে মেরে ফেলা যাক।'

'বারবার আপনি এক কথা বলেন কেন ? আপনার কাছে বুদ্ধি চাচ্ছি।'

'ওকে মেরে ফেলাই একমাত্র বুদ্ধি।'

'মান। আপনার সাথে আর কথাই বলব না।'

নাসরিন ওইজা বোর্ড বক্ষ করে ঘূর্মতে গেল। আজি আর গতরাতের মত চটে কটে ঘূর্ম এল না। একটু যেন তয় তয় করতে লাগল। ওইজা বোর্ড টেবিলের উপর রাখে আর আছে। তাঁর কাছেই একটা চেয়ার। নাসরিনের কেন জানি মনে হচ্ছে চেয়ারে ঐ মিঠাপুরসে আছেন। বুড়ো ধরনের একজন মানুষ, যাব গায়ে চুক্তের গন্ধ। ঐ বুড়ো মানুষটার একটা চোখ ছানি-পড়া। গায়ে চামড়ার কোট। সেই কোটেও এক ধরনের ভ্যাপসা পড়া।

নাসরিন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তাঁর স্পষ্ট মনে হচ্ছে কেউ-একজন আছে। নাসরিন তয়ে তয়ে বলল, আপনি কি আছেন ? চেয়ার নিষ্কাশ উঠল। সত্ত্ব নড়ল ? না মনের ভুল। নাসরিন কীণ স্বরে বলল, আপনি দয়া করে বহু থাকবেন না। চলে যান। যখন আপনাকে দরকাব হবে আমি ডাকব ?

আবার চেয়ার নড়ল। নিশ্চয়ই মনের ভুল।

নাসরিনের বড় তয় লাগছে। জুন মাসের এই প্রচণ্ড গরমের রাতেও একটা চাদরে সারা শরীর ঢেকে সে শুয়ে রইল। ঘূর্ম এল একেবারে শেষ রাতে। তাও গাঢ় ঘূর্ম না। আজেবাজে

সব স্বপ্ন। একসী স্বপ্ন তো শুবই ভয়ংকর। তাৰ শাড়িতে দাউদাউ কৰে আশুন হৃলছে। সে অনেক চেষ্টা কৰছে আশুন নেভাতে। পাৰছে না। যতই চেষ্টা কৰছে, আশুন আৰো ছড়িয়ে পড়ছে। একজন বুড়োমত লোক চূঢ়ট হাতে পুৰো ব্যাপৰটা দেখছে কিন্তু কিছুই কৰছে ন।

টাকার পৰিমাণ বাড়নোৰ দাবী রাহেলা অনেক ভণ্ডিতাৰ পৰ কৱলেন। বলতে তাৰ শুবই লজ্জা লাগল কিন্তু কোন উপায় নেই।

আলাউদ্দিন তখন চা খাচ্ছিল। চায়েৰ কাপ নামিয়ে বিস্তৃত গলায় বলল, টাকা বাড়তে বলছ?

‘হ্যা।’

‘একশ’ ডলারে তোমাদেৱ হচ্ছে না?’

‘না।’

‘তোমৰা কি পাগল-টাগল হয়ে গেলে? আমেৰিকায় কি আমি টাকার চাষ কৰছি? ট্ৰাকটাৰ দিয়ে জমি চষে টাকার চারাগাছ বুনে দিছি?’

রাহেলা কীৰ্তি স্বৰে বললেন, সংসাৰ অচল।

‘সংসাৰ তো আমাৰটা আৱো বেশি অচল। বিয়ে কৰেছি — নতুন সংসাৰ। এ্যপাটমেন্ট নিয়েছি। একটা জিনিস নেই এ্যপাটমেন্টে। কুমাৰা অফিস কৰে, তাৰ একটা আলাদা গাড়ি দৰকাৰ। তোমাদেৱ টাকা তো বাড়তে পাৰবই না বৱং কিছু কমিয়ে দেব বলে ভাৰছি।’

‘আমাদেৱ চলবে কিভাবে?’

‘জসিয় ভাইকে বল। তাৰও তো কিছু দায়িত্ব আছে। সে তো গায়ে ফুঁ দিয়ে শুৱছে।’

রাহেলা দীৰ্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। আলাউদ্দিন বিৰক্ত স্বৰে বলল, এৱকম ঘনঘন দীৰ্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে না মা। নিঃশ্বাস ফেললে সমস্যাৰ সমাধান হয় না।

৩

নাসৱিন ওইজা বোর্ড নিয়ে বসেছে। বাত প্ৰায় দুটো। আজ অন্য দিনেৰ মত গবম নয়। সন্ধ্যাকেলায় তুমুল বৰ্ষা হয়েছে। আকাশ মেঘলা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবারো হয়ত বৃষ্টি হবে। বৃষ্টিৰ ছাঁটি আসছে বলে জানালা বৰ্ষ।

‘আপনি কি আছেন?’

‘হ্যা।’

‘আমাদেৱ কি বিপদ হয়েছে শুনেছেন?’

‘না।’

‘ভাইয়া টাকা-পয়সা বেশি তো পাঠাবেই না বৱং আৱো কৈমিয়ে দিয়েছে।’

‘ও আচ্ছা।’

‘কি কৰব আমৰা বহুন তো?’

‘মেয়েটাকে মেৰে কেজল।’

‘এইটা ছাড়া বুঝি আপনাৰ মাথায় আৱ বুঝি নেই?’

‘না। এটা সবচে ভাল বুঝি।’

‘আপনাৰ সঙ্গে আমাৰ কথা বলতেই ইচ্ছা কৰছে না।’

‘মনে দৃঢ়ঘিত হলাম।’

‘আজ্জ, এই দিন আপনি আমাকে তায় দেখালেন কেন? আপনি কি এই চেয়ারটাই বসে ছিলেন? আমার মনে হয় আপনি এখনো চেয়াবাটায় বসে আছেন।’

‘ফ্লারাকে আগুনে পুড়ে মারলে কেমন হয়?’

‘আপনি আজ্জেবাজে কথা বলবেন না তো। আজ্জ, বলুন তো এইদিন কি আপনি চেয়ারে বসে ছিলেন?’

‘তুমি একটু সাহায্য করলেই হয়।’

‘কি সাহায্য?’

‘যখন আগুন ঝলে উঠবে তখন এই ঘরের দরজা তুমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দেবে।’

‘আপনার কথাবার্তার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘আগুন লাগার পর হেয়েটা ষাণ্টে বেরতে না পাবে।’

‘কি বলছেন আপনি?’

‘আগুন লাগার পর সে ছুটে বের হতে চাইবে। তখন তাকে শুধু আটকান। অল্প কিছুক্ষণ আটকে রাখা।

‘চূপ করুন তো।’

‘ভাল বুঝি দিছি।’

‘আপনার বুঝি চাই না।’

‘তুমি আমার বক্ষ।’

‘না, আমি আপনার বক্ষ নই।’

আজ রাতে নাসরিন এক পলকের জন্মেও চোখ এক করতে পারল না। মনে মনে ঠিক করে ফেলল, ওইজ্জ বোজটা ভোর হতেই আগুন দিয়ে পৃত্তিয়ে ফেলবে। কি সর্বনাশের কথা! বোতামটা এমন অস্তুত কথা বলছে কেন?

8.

আগামীকাল রাত দুটার ফ্লাইটে আলাউদ্দিন চলে যাবে। শেষ রাতটা এ বাড়িতে আজ্জেবাজে জন্মে এসেছে। দীর্ঘদিন হোটেলে থাকায় তাকে বেশ লজ্জিতও মনে হচ্ছে। আজ রাতটা থাকতে তেয়ন কষ্ট হবে না। বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। আবহাওয়া অসহনীয় নয়। তুমি বৃষ্টি হচ্ছে।

আলাউদ্দিন বসার ঘরে স্বাব সঙ্গে গল্প করছে। গল্প বেশ জন্ম উঠেছে। প্রথমদিকে আমেরিকায় সে কি সব বিপদে পড়েছিল তার গল্প। প্রতিটি গল্পেই আগে অনেকবার করে শোনা, তবু সবাই খুব আগ্রহ করে শুনছে।

ঘরে ইলেক্ট্রিসিটি নেই। বিকেলে ঝড়-বৃষ্টির সময় ইলেক্ট্রিসিটি চলে গিয়েছে, এখনো আসেনি। আজ রাতে আর আসবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বৃষ্টি এখনো হচ্ছে। বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ, বৃষ্টির অমরামানি। দমকা হাওয়ার ঝালকা ঝোঁকাব পরিবেশ।

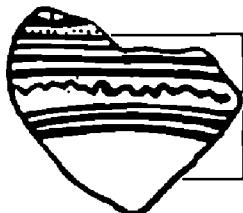
একটিমাত্র হারিকেন, সেটা বসার ঘরে। হারিকেন ঘিরে সবাই বসে আছে।

ফ্লারা ওদের গল্পে কোন মজা পাচ্ছিল না। ঘনঘন হাই তুলছিল। যাবুরাতে সে ঘুমুতে গেল। নাসরিন তার ঘরে ঘোষবাতি ঝালিয়ে দিয়ে গেল।

দুঃটিনা ঘটল তারো মিনিট দশেক পর। গল্প তখন খুব জমে উঠেছে। শুক হয়েছে ভূতের গল্প। রাহেলা ছেটবেলায় নিশির ডাক শুনে ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিলেন — সেই গল্প হচ্ছে। গা ছমছমানো পরিবেশ। ঠিক তখন তীক্ষ্ণ গলায় নামবিন বলল, ঘর এত আলো হয়ে গেছে কেন ভাইয়া? তার কথা শেষ হবাব আগেই শোনা গেল গোঙানি ও চিংকাব। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে এবং ফ্লাবা চেঁচাচ্ছে — Oh God! Oh God!

সবাই ছুটে গেল শোবার ঘরের দিকে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

দুঃটিনা তো বটেই। দুঃটিনা ছাড়ি কিছুই নয়। বাতাসে মেঘবাতি কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল নেটের মশারিতে। সেখান থেকে ফ্লাবার নাহিট গাউনে। সিনথেকিক কাপড় — মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল। খুবই সহজ ব্যাখ্যা। শুধু একটি ব্যাপার ব্যাখ্য করা যাচ্ছে না। ফ্লাবার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। কেউ-একজন বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছিল। আগুন লেগে যাবার পর ফ্লাবা প্রাপণ চেষ্টা করেছে ঘর থেকে বেরুতে। বেরুতে পারেনি। চিংকার করে দরজা খুলতে বলেছে — বড়-বৃটি এবং বস্তুপাতের সঙ্গে তার চিংকারও কেউ শুনেনি। ব্যাকুল হয়ে শেষ মুহূর্তে সে স্টশুরকে ডাকছিল। স্টশুর মানুষের কাতর আহ্বানে সাধারণত বিচলিত হন না।



শ্যামল ছায়া

পুটুখাট শব্দে ঘূম ভেঙে গেল।

কয়েক মুহূর্ত সে নিঃশ্বাস নিতে পারল না, দম আটকে এল। হঠাৎ ঘূম ভেঙে গেলে রহিমার এ রকম হয়। আজ একটু বাড়াবাড়ি হল, ত্রুটায় গলা শুকিয়ে কাঠ, ঘুমে সর্বাস ভিজে যাচ্ছে। রহিমা ভয় পেয়ে ভাঙা গলায় ডাকল, মজিদ মিয়া, ও মজিদ মিয়া।

মজিদ শেষপ্রাপ্তে থাকে। এত দূরে গলার আওয়াজ পৌছানোর কর্তৃ স্মৃত রহিমার মনে হল মজিদ বিছানা ছেড়ে উঠেছে, দরজা খুলছে শব্দ করে! এই আবার যেন কাশল। রহিমা চিকন সুরে দ্বিতীয়বার ডাকল, ও মজিদ মিয়া — ও মজিদ।

কিন্তু কেউ এল না। মজিদ তাহলে শুনতে পায়নি। সেটো সানি এসে গেল বহিমার। হাপাতে হাপাতে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবাব পর এক সময় হঠাৎ করে ব্যথাটা মরে গেল। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। একটু আগেই ষে মেঝে প্রবাব মত অনুভূতি হয়েছে তাও পর্যন্ত মনে রইল না।

নিঃশব্দে থাট থেকে নেমে এল রহিমা। বালিশের নীচ থেকে দেয়াশলাই নিয়ে হারিকেন ধৰাল। খুব আস্তে অনেকটা সময় নিয়ে দরজার খিল খুলল। রাতের কেলা ঘনঘন করে দরজা খুললে মজিদ বিরক্ত হয়। বাইরে বেশ শীত, ঠাণ্ডা বাতাস বহুচে। কার্ডিক মাসের শুরুতেই

শীত নেমে গেছে এবাব। বাঁ হাতে হারিকেন উচু কবে ঘরে পা টিপে মজিদের ঘরের পাশে এসে দাঁড়াল রহিমা। জানালা দিয়ে উকি দিয়ে দেখে মজিদ এখনো জ্বেগে। বুকের নীচে বালিশ দিয়ে উবু হয়ে শুয়ে বই পড়ছে। ঘরের মেঝেতে আধ-খাওয়া সিগারেটের আস্ত্রবণ। করু গন্ধ আসছে সিগারেটের। রহিমা কোন সাড়াশব্দ কবল না। চূপচাপ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগল।

রহিমা ভেবে পাষ না এত রাত জ্বেগে কি পড়ে ছেলেটা। পরীক্ষার পড়া তো কবেই শেষ হওয়েছে। রহিমা অনেকক্ষণ হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার যখন ঝিমুনি এসে গেল তখন ঘদু গলায় ডাকলো, ও মজিদ মিয়া।

মজিদ বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, ঠিক করে ডাকো মা। কি সব সময় মিয়া মিয়া কর।

রহিমা একটু অপ্রস্তুত হল। (মজিদকে মজিদ মিয়া ডাকলে সে রাগ করে কিন্তু রহিমার একটুও মনে থাকে না)। রহিমা বলল, শুয়ে পড় মজিদ।

ভূমি ঘূমাও গিয়ে। ঘ্যানঘ্যান করো না।

রহিমা ঘদু গলায় বলল, জানালা বক্ষ করে দেই? ঠাণ্ডা বাতাস।

মজিদ সে কথার জবাব দিল না। বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগল। রহিমা তবুও দাঁড়িয়ে রইল। তার ঘূমতে ইচ্ছে করছিল না। কে জানে আবার হয়তো ঘূম ভেঙে যাবে, দম বক্ষ হয়ে যাবার কষ্টটা নতুন করে শুরু হবে। মজিদ রাগী গলায় বলল, যাও না মা, দাঁড়িয়ে থেকো না।

রহিমা জানালার পাশ থেকে সরে এল। মজিদকে তার ভয় করে। অথচ জ্বের সময় সে এই এতটুকুন ছিল। রাত-দিন ট্যাট্যা করে কাঁদত। মজিদের বাবা বলত, এই ছেলে বাঁচবে না গো, এরে বেশী মায়া করলে কষ্ট পাবে।

ছিঃ ছিঃ কি অলঙ্কুণি কথা। বাপ হয়ে কেউ এরকম বলে? লোকটাব ধারাই এমন, কথার কোন মা-বাপ নাই।

রহিমা এসে শুয়ে পড়ল। ঘূমতে তার ভাল লাগে না। তাই ঘূম তাড়াতে মানা কথা ভাবে। রাত জ্বেগে ভাববার মত ঘটনা তার বেশী নেই। ঘুরেফিরে প্রতি রাতে একই কথা সে ভাবে। যেন সে একা একা একটি সাজানো ঘরে বসে আছে। হৈ-চৈ হচ্ছে খুব। মনটা বেশী কাল নেই। ভয় ভয় করছে এবং একটু কামা পাচ্ছে তার। এমন সময় বড় ভাবী মজিদের বাবাকে নিয়ে ঘরে চুকেই বললেন, “নাও তোমার জিনিস। এখন দুজনে মিলে ভাব-স্মরণ কর।” এই বলে বাইরে থেকে খুট করে দরজা বক্ষ করে দিলেন। নতুন শাড়ী পরে জড়সড় হয়ে বসে আছে রহিমা। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। কি বলবে তা-ও ভেবে পাঞ্চে না। এমন সময় কি কাণ্ডাই না হল। কথাবার্তা নেই হড়হড় করে লোকটা বমি করে বিছানা ভাসিয়ে ফেলল। লজ্জ-লজ্জার মাথা থেয়ে রহিমা তাকে প্রস্তুত ধরল। ভাবতে ভাবতে চোখ ভিজে উঠে। আহা নতুন বউয়ের সামনে কি লজ্জাই আপনেছিল লোকটা। কতদিনকার কথা অথচ ঘনে হয় এই তো সেদিন।

অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে রহিমা উঠে বসল পানের বাটি থেকে পান বের কবল। সুপুরি কালু ঝুঁচি ঝুঁচি করে। পান মুখে দিয়ে আগের মত চূপি চূপি মজিদের জানালায় উকি দিল। না এখনো ঘূমায়নি। রহিমা মজিদের কোন ব্যাপারই বুঝতে পারে না। লেখাপড়া না-জানা মূর্খ

বাপ-ম'র ছেলে যদি বৃক্ষিত্বি পেয়ে পাস করতে করতে এম.এ. পাস করে ফেলে তাহলে সে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

এক সময় মজিদের চোখ গিয়ে পড়ে জানালায়। “একি যা, এখনো ঘূরঘূর কৰছ? ঘূমাও না কেন?”

ঘাই বাবা ঘাই।

রহিমার নিষ্ঠেকে খুব অসহায় মনে হল। বারান্দায় এসে বসে রইল একা একা। আধখানা চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় আবছা ভাবে সব কিছু নজরে পড়ে। রাতের বেলা একলা লাগে তার। বুকের মধ্যে শু-শু করে। দিনের বেলাটা এতেও খারাপ লাগে না। ঘরের কত কাজকর্ম আছে। কাজের লোক নেই। তাকেই সব করতে হয়। সময়টা বেশ কেটে যায়। বাসার কাছেই মাঝের দোকান আছে একটা। তাবা সারাদিনই কোন গানের সিকিখানা, কোন গানের আধাআধি বাজায়। বেশ লাগে।

মজিদের বাবারও গান ভাল লাগতো। এক একবার গান শুনে টেঁচিয়ে বলেছে, “ফাস ফ্লাস, ফাস ফ্লাস।” মজিদের বাপ লোকটা আমোদ-আহলাদের বড় কাস্তাল ছিল। বদনসিব লোক। আমোদ-আহলাদ তার ভাগ্যে নাই। কোনদিন হ্যাত জামা-টামা পরে খুশী হয়ে গেছে সিনেমা দেখতে। ফিরে এসেছে মুখ কালো করে। হয় টিকিট পায়নি, নয় তো পকেট মার গেছে। কোন বিশ্বের দাওয়াত-টাওয়াত পেলে হাসিমুখে গিয়েছে কিন্তু খেতে পায়নি কিছু। তার খাওয়ার আগেই খাবার শেষ হয়ে গেছে। নিজের ছেলেটা যখন লেখাপড়া শেষ করেছে, চাকরি-বাকরি করে বাপকে আরাম দেবে তখনি কথা নেই বার্তা নেই বিছানায় শুয়েই শেষ। রহিমা বাম্বায়র থেকে বলেছে পর্যন্ত, অসময়ে ঘূমাও কেন? চা খাবে, চা দিব?

রহিমা সেই ঘন্দভাগ্য লোকটার কথা ভেবে নিঃশ্বাস ফেলল। এমন খারাপ ভাগ্যের লোক আছে দুনিয়ায়? মরণের সময়ও যার পাশে কেউ রইল না। মজিদের তখন কোন ধোঁজ নেই। কোথায় নাকি গিয়েছে মিটিং করতে। তার বাপকে কাফন পরিয়ে খাচিয়া তুলে সবাই যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ’ বলে হাঁক দিয়েছে তখন মজিদ নেমেছে বিকশা থেকে। বোকার মত জিজ্ঞেস করেছে, কি হয়েছে?

আহা লোকটা সারাজীবন কি কষ্টটা না করল। কি কষ্ট! কি কষ্ট! মেকানিকের আর কয় পয়সা বেতন? বাড়ীর জমিজমা যা ছিল বেচে বেচে পড়ার ব্যরচ চলল মজিদের। এত কষ্টের পয়সায় পড়ে আজ মজিদের এই হাল। সন্ত্যা নামতেই বস্তুরা আসে মিটিং বসে ঘরে। ট্রেড ইউনিয়ন, মৎস্য সমবায় সমিতি, হেনো ডেনো। ছিঃ।

মজিদের যাথায় কিসের পোকা চুকেছিল কে জানে। যাজ্ঞমৰ বাপকে রহিমা কত বলেছে, ছেলেকে এসব করতে যানা কব গো, কোনদিন পুলিশে ধরবে তাকে।

মজিদের বাপ শুধু বলেছে, বুদ্ধদার বিদ্বান ছেলে, আমি মুখ মানুষ, আমি কি বলব?

রহিমার শীত করছিল, সে ঘরের ভেতর চলে গেল। অঙ্ককার ঘরে চুক্তে গিয়ে ধাক্কা লাগল কিসের সঙ্গে। পিতলের বদনা করে প্রত্যয়ে গেল কস্তূর। মজিদ ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, কে কে?

আমি।

আর কোন সাড়া-শব্দ হল না। রহিমা যখন ভাবছে আবার শুয়ে পড়বে কি-না, তখনি
শুনল মজিদ বেশ শব্দ করে হাসছে। কি কাণ্ড। রহিমা ডকল, ও মজিদ মিয়া।

কি?

হাস কেন?

এম্বিং হাসি। যুমাও তো, ফ্যাসফ্যাস করো না।

না, মজিদকে রহিমা সত্ত্ব বুঝতে পারে না শুধু মজিদ নয়, মজিদের বকুলদেরও অচেনা
লাগে। ঠিক সক্ষ্যাবেলায় তারা আসে। চোখের দৃষ্টি তাদের কেমন কেমন। কথা বলে থেমে
থেমে, নীচু গলায় হাসে। ঘন্টার পর ঘন্টা চলে তাদের আলাপ। সিগারেটের ধোয়ায় ঘর
আচম্ম হয়ে যায়। পাশের বইসূচীনের চায়ের স্টল থেকে দফায় দফায় চা আসে। কিসের
এত গল্প তাদের? রহিমা দরজার সাথে কান লাগিয়ে শুনতে চেষ্টা করে,

না ইলেকশন হবে না। পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

কিন্তু না হলে আমাদের করণীয় কি?

শেখ সাহেব কি ভাবছেন তা জানা দরকার।

শেখ সাহেব আপোস করবেন। সাফ কথা।

সাদেক বেশী বাড়াবাড়ি করছে। একটু কেয়ারফুল না হলে . . .

রহিমার কাছে সমস্তই দুর্বোধ্য মনে হয়। তবু রোজ দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে সে
শোনে। আর যদি কোনদিন শিখ নামের মেয়েটি আসে তবে তো কথাই নেই। রহিমা জঁকের
মত দরজার সঙ্গে সেঁটে থাকে। শিখ আসে লম্বা একটি নকশীদার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে।
একটুও সাজগোজ করে না, তবু কি সুন্দর লাগে তাকে। সে হাসতে হাসতে দরজায় ধাক্কা
দেয়। ভেতর থেকে মজিদ গঢ়ীর হয়ে বলে, কে কে? (যদিও হাসির শব্দ শুনেই মজিদ
বুঝতে পেরেছে কে, তবু তার এই চেষ্টা করা চাই-ই।)

আমি, আমি শিখ।

অয়িশিখ নাকি?

না, আমি প্রদীপশিখ।

কলতে বলতে মেয়েটা হাসিতে ভেঞ্চে পড়ে। দরজা খুলে মজিদ বেরিয়ে আসে। মজিদের
চোখ-মুখ তখন অন্য রকম মনে হয়। দেখে-শুনে রহিমার ভাল লাগে না। কে জানে শিখকে
হয়ত পছন্দ করে ফেলেছে। হয়ত এই মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে বেরিয়েছে অথচ
মজিদের বাপ সুতাখালীর ঐ শ্যামলা মেয়েটির সঙ্গে মজিদের বিয়ে দিবে বলে কি খুশী
(টাঙ্গাইলের লালপাড় একটি শাড়ীও সে দিয়েছে হাসিনা নামের ঐ ভালমানুষ মেয়েটিকে।
রহিমা মেয়েটিকে দেখেনি, শুনেছে শুব নরম মেয়ে আব (বৈশ্য লক্ষণ)। আহা মজিদের বাপ
বেচারা বিয়েটা দিতে পারল না! আহা!

রহিমা কতবার দেখেছে শিখ এলেই মজিদ কেমন অস্থিব হয়ে উঠে। শুধু শুধু হো হো
করে হাসে। চায়ের সঙ্গে খাবার আনতে নিষ্জেকে উঠে যায়। কৰ্মবার্তার মাঝখানে ফস করে
বলে, আজ আর ইলেকশন-ফিলেকশন ভাল হাসিবে না। আজ অন্য আলাপ করব। ঘরে
যারা থাকে তারা উস্থুস করলেও আপনি করে না। তখন শোনা যাব হাসির হস্তা। মেয়েমানুষ
এত চেঁচিয়ে কি করে হাসে রহিমা বুঝতে পারে না। শুধু হাসি নয় গানটানও হয়। শিখ

মেয়েটি মাঝে পান গায় (তার জন্ম স্বইকে খুব সাধ্য-সাধনা করতে হয়। খুব অহংকারী মেয়ে)। রহিমা বুঝতে পারে না এত রাত পর্যন্ত মেয়েমানুষ কি করে আজ্ঞা দেয়। মজিদের বাপ এইসব দেখেও কোনদিন কথা বলেনি। শুধু বলেছে, বুঝাদার বিদান ছেলে, আমি কি করব?

মজিদের বাপ লোকটাও কি কম বুঝাদার ছিল? চুপ করে থাকলে কি হবে দুমিয়ার হাল অবস্থা ঠিক বুঝত। রহিমার কতবার ঘনে হয়েছে পড়াশুনা করতে পেলে এই লোকটাও বক্ষুদের সাথে সঙ্গ্যাবলো ইংরেজিতে গল্প করত। নসিবে দেয়নি। ইমানদার লোক বদনসিব হয়। রহিমা আবার বিছানা ছেড়ে উঠল। বাতি ঝালাল। একা একা অঙ্ককার ঘরে ভাল লাগে না। যুক্তের পর তেলের ঘা দাম হয়েছে। কে আর সারারাত বাতি জালিয়ে রাখবে? এই ঘরে মজিদ আবার ঘুমের মধ্যে খুক খুক করে কাশছে। নতুন হিম পড়েছে। রহিমা কতবার বলেছে জানালা বন্ধ করে ঘূমুতে। কিন্তু মজিদ কিছুতেই শুনবে না। বক্ষ ঘরে তার মাকি দয় বক্ষ হয়ে আসে। মজিদের বাপেরও এরকম বদঅভ্যাস ছিল। মাঝ মাসের শীতেও জানালা খোলা রাখা চাই। একবার তো খোলা জানালা দিয়ে হাত বাঢ়িয়ে তার শার্ট আর গেঞ্জী নিয়ে গেল। শার্টের পকেটে ছয় টাকা ছিল। কি যুশকিল। শেষ পর্যন্ত মজিদের বাপ ছেট এক শার্ট গায়ে দিয়ে কারখানায় গেছে। আহা একটা শার্ট ছিল না লোকটার। কম বেতনের চাকরী। তার উপর পয়সা জমানো নেশা। খুব ধূমধাম করে মজিদের বিয়ে দিবে সেই জন্যে পাই পয়সাটিও জমিয়ে রাখা।

শিখা মেয়েটির সঙ্গে মজিদের পরিচয় না হলে সূতাখালীর ঐ মেয়েটির সঙ্গে কত আগেই মজিদের বিয়ে হয়ে যেত। আর বিয়ে হলে কি বউ ফেলে যুক্ত যেত মজিদ? কোনদিন না। গ্রামের মধ্যে বউ নিয়ে লুকিয়ে থাকতো কিছুদিন। তারপর সব ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসত সবাই।

কিন্তু সে রকম হল না। শিখা মেয়েটি বাহারি ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে আসতেই থাকল। আসতেই থাকল। আর দিনদিন সুন্দর হতে থাকল মেয়েটা।

তখন খুব গণগোল শুরু হয়েছে। মজিদের ঘরে দিনবাত লোকজনের ভীড়। আগের মত শিখা মেয়েটির ভীকৃত হাসি শোনা যায় না। রহিমা বুঝতে পারে খুব খারাপ সময়। দেশের অবস্থা ভাল না। কিন্তু দেশের অবস্থা দিয়ে রহিমা কি করবে? সে শুধু দেখে তার নিজেরই কপাল মন্দ। মন্দ কপাল না হলে কি মজিদ তার বাপকে বলে, দেশের অবস্থা খুব খারাপ। কি হয় বোঝা যাচ্ছে না। তোমরা গ্রামে চলে যাও।

মজিদের বাপ বলেছে, তুই গেলে আমরা যাব।

আরে কি বল পাগলের মত। আমি কি করে যাই? আমার কত কাজ এখন। তোমরা করবে যাবে বল? আমি সব ব্যবস্থা করবে দেই।

মজিদের বাপ সে কথার জ্বাব না দিয়ে ফস ফসে একটা বিড়ি ধরিয়েছে আর মজিদ হঠাতে প্রসঙ্গ পাল্টে নীচু গলায় বলেছে, শিখাকে বিয়ে করলে তোমাদের আপত্তি নেই তো বাবা?

মজিদের বাপ একটুও অবাক না হয়ে বলেছে, কবে বিয়ে?

সে দেরী আছে। তোমাদের আপত্তি আছে কিনা তাই বল।

না, আপনি কিসের জন্যে? বিয়েটা সকাল সকাল কবে ফেললেই তো ভাল হয়। টাকার জন্যে ভাবিস না তুই। তোর বিয়ের টাকা আলাদা কবে পোষ্টাপিসে জমা আছে।

ছেলেব বিয়ে দেখে যেতে পাবল না। বহিমা যখন বন্ধা ঘবে ডাল চাপিয়ে খোজ নিতে এসেছে লোকটা চা-টা কিছু খাবে কিমা তখনি জেনেছে সব শেষ। সব আশ্চর ইচ্ছা।

তারপর তো যুদ্ধই শুরু হল। গ্রামের বাড়িতে রহিমাকে বেধে মজিদ উধাও। কত উড়ে ধৰের কানে আসে। কোথায় নাকি একশ' মুক্তিবাহিনীর ছেলে ধরা পড়েছে। কোথায় নাকি চারজন মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে মিলিটারী পুড়িয়ে মেরেছে। রহিমা শুধু মন্ত্রের মত বলেছে, 'মজিদের হায়াৎ দিখ মাংগি গো আশাহ। তুমি নেকবান। হ্যসবুনাঙ্গাহে নিয়ামুল ওয়াকিল নেয়ামুল যওলা ওয়া নিয়ামুল নাসির।' রহিমার রাতে ঘূর হয় না। জেগে জেগে রাত কাটে। সেই সময়ই অসুখটা হল। হঠাৎ ঘূর ভাঙলে নিঃশ্বাস বক্ষ হয়ে আসে। তৎকায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মনে হয় যত্যু বুঝি এসে বসেছে বুকের উপর।

যুদ্ধ থেমে গেল। মজিদ ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাসিমুখে একদিন দরজার সামনে এসে ডাকল, মা আমি মরি নাই গো। দেখ বেচে আছি।

অসুখটা তখন খুব বাড়ল রহিমার। ক্র্যাচের খটখট শব্দ তুলে মজিদ যখন এক পায়ে হেঁটে বেড়ায় তখন রহিমার বুক ধড়ফড় করে। কি কষ্ট, কি কষ্ট। সে মজিদের মত ভাবতে চেষ্টা করে, 'একটি স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য।'

মজিদ বলে না কিছু কিন্তু রহিমা জানে শিখার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সেই ছেলেটি নিচয়ই মজিদের মত ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটে না।

'স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য।' রহিমা মজিদের মত ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু রহিমা মজিদ নয়। জীবন তার সুবিশাল বাস্তু রহিমার দিকে প্রসারিত করেনি। কাজেই তার ঘূর আসে না।

শেষ রাতে যখন চাঁদ তুবে গিয়ে নক্ষত্রের আলোয় চারদিক অন্য রকম হয় তখন সে চুপি চুপি মজিদের জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। ভাঙা গলায় ডেকে উঠে, 'ও মজিদ মিয়া ও মজিদ মিয়া'। সেই ক্ষীণ কষ্টস্বরে মজিদের ঘূর ভাঙে না। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করবার জন্যেই হয়ত শেষ রাতের দিকে তার গাঢ় ঘূর হয়।

BanglaBook.org



বেয়ারিং চিঠি

জমীর সাহেব অফিস থেকে ফেরা মাত্রই তাঁর বড় মেয়ে মিতু কলল, বাবা আজ তোমার একটা চিঠি এসেছে। বলেই সে মুখের হাসি গোপন করার জন্যে অন্যদিকে তাকাল।

মিতুর বয়স একুশ। এই বয়সের মেয়েদের মুখে অকারণে হাসি আসে। হাসি-তামাশা জমীর সাহেবের একেবারেই পছন্দ নয়। বিশেষ করে মা-বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি। আজকাল অনেক পরিবারেই তিনি এই ব্যাপার দেখেন। মেয়ে বাবার সঙ্গে বসে আজড়া দিচ্ছে — খিলখিল করে হাসছে। এসব কি? তিনি একবার তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই বন্ধুর মেয়ে বাবাকে নিয়ে খুব হাসি-তামাশা করতে লাগল। এক পর্যায়ে বলে ফেলল, বাবা দিন দিন তোমার চেহারা সুন্দর হচ্ছে। রাস্তায় বেব হলে নিশ্চয়ই মেয়েরা তোমার দিকে তাকায়। জমীর সাহেব স্তুষ্টি হয়ে গেলেন। তাঁর নিজের মেয়ে হলে চড় দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিতেন। অন্যের মেয়ে বলে কিছু বলা গেল না। তবে ঐ বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া তিনি ছেড়ে দিলেন।

মিতু চিঠি বাবার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, বেয়ারিং চিঠি বাবা। দুটাকা দিয়ে চিঠি রাখতে হয়েছে। বলে আবার ফিক্ করে হেসে ফেলল।

জমীর সাহেব কঠিন গলায় বললেন, হাসছিস কেন? বেয়ারিং চিঠি এসেছে এর মধ্যে হাসির কি হল? এ রকম ফাঞ্জলামি শিখছিস কোথায়?

মিতু মুখ কালো করে চলে গেল। বাবাকে সে সঙ্গত কারণেই অসম্ভব ভয় পায়। জমীর সাহেব লক্ষ্য করলেন খামের মুখ খোলা। এরা চিঠি পড়েছে। এই বেয়াদবীও সম্ভব করা মুশকিল। একজনের চিঠি অন্যজন পড়বে কেন? খামে তাঁর নাম লেখা দেখা পৰিবে এরা কোন সাহসে চিঠি খুলে? রাগে জমীর সাহেবের গা কাঁপতে লাগল। এই অবস্থায় তিনি চিঠি পড়লেন। একবার, দুবার তিনবার। তাঁর মাথা ঘূরতে লাগল। সুস্মিতা নামের এক মেয়ের চিঠি। তাঁর কাছে লেখা। সম্বোধন হচ্ছে প্রিয়তমেশু। এর মানে কি? সুস্মিতা কে? সুস্মিতা নামের কাউকে তিনি চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না। কিন্তু পড়ার সময় কমলা নামের এক মেয়ের প্রতি খুব দুর্বলতা অনুভব করেছিলেন। তোমের বিয়ে হয়ে ঘৰার পর দুর্বলতা কেটে যায়। এছড়া অন্য কোন মেয়েকে তিনি চেনেন না। জমীর সাহেব কপালের ঘাম মুছে চতুর্থবারের মত চিঠিটি পড়লেন।

প্রিয়তমেষু,

তুমি কেমন আছ? তোমার কথা খুব মনে হয়। তোমার শরীর এত ধৰাপ হয়েছে কেন? শরীরের আবে যত্ন নেবে। আমি দেখেছি তুমি বাসে যাওয়া-আসা কর। তোমাকে অনুরোধ করছি সপ্তাহখানেক বাসে উঠবে না। কাল তোমাকে নিয়ে একটা দৃঢ়স্থপ্ন দেখেছি। দৃঢ়স্থপ্ন হচ্ছে তুমি বাসে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছ। স্থপ্নকে শুরুত দেয়ার কোন মানে হয় না। তবু অনুরোধ করছি — এক সপ্তাহ বাসে উঠবে না।

বিনীতা
তোমার সুস্মিতা

জমীর সাহেব পঞ্চমবাবের মত চিঠি পড়তে শুরু করলেন। মোটা নিবের কলমে গোটা গোটা অক্ষরের চিঠি। তারিখ বা ঠিকানা নেই। হলুদ রঙের কাগজ। কাগজ থেকে হালকা ন্যাপথলিনের গন্ধ আসছে।

‘বাবা তোমার চা।’

মিতু চায়ের কাপ এনে বাবার সামনে রাখল। তার মুখ থমথম করছে। বাবার ধমকের কথা সে এখনো ভুলতে পারেনি। জমীর সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, কে লিখল কিছুই বুঝতে পারছি না। সুস্মিতা নামের কাউকে চিনি না।

মিতু বলল, চিনি হয়েছে কিনা দেখ।

জমীর সাহেব চায়ের চিনির ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখালেন না। শুরুনো গলায় বললেন, তোর মা এই চিঠি পড়েছে?

‘হ্যাঁ।’

‘বলেছে কিছু?’

‘না।’

‘বুঝলি মিতু — সুস্মিতা নামের কাউকেই চিনি না। আর ধর যদি চিনতামও তাইলেও কি এই রকম একটা চিঠি কেউ লিখতে পারে? ছিঃ ছিঃ লজ্জায় আমার মাথা কাটা হচ্ছে।’

মিতু ইতস্তত করে বলল, আমার কি মনে হয় জ্ঞান বাবা? আমার মনে হচ্ছে, এই বাড়িতে জমীর সাহেব বলে আগে কেউ ছিলেন। চিঠিটা তাকেই লেখা।

জমীর সাহেবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই সহজ সমাধান তাঁর মাঝায় কেন আসেনি বুঝতে পারলেন না। মিতু মেয়েটার মাথা তো বেশ ভাল, সাম্যন্তে দেয়া উচিত ছিল। গাধার মত তিনি মেয়েটাকে আটস পড়িয়েছেন।

তিনি চায়ে চূমুক দিয়ে বললেন, খুব ভাল চা হচ্ছে মা। খুব ভাল। তোর মা কোথায়?

‘মা নানুর বাড়ি গেছে।’

‘মা নানুর বাড়ি গেছে’ এই বাক্যটি জমীর সাহেবের খুব অপছন্দের বাক্য। শাহানার মার বাড়ি ঘীরপুর ছ’ নম্বরে। এই বাড়িতে গেলেই শাহানা খাতো থেকে যায়। আজও থেকে যাবে। তবে আজ জমীর সাহেব অন্যদিনের মত খারাপ বেধ করলেন না। শাহানা থাকলে নিশ্চয়ই

চিঠিটা নিয়ে গঙ্গীব গলায় কথা বলত। শাহানুর কথা শুনতেই ইদানীং তাঁর অসহ্য লাগে। বাগী রাগী কথা তো আবো অসহ্য লাগবে।

‘মিতু।’

‘ছি বাবা।’

‘তোর মা বোধহয় থেকে যাবে ও বাড়িতে।’

‘হ্যাঁ।’

‘তোর মা কিছু বলেনি চিঠি পড়ে?’

‘না।’

‘তোর কি মনে হয় বাগ করেছে?’

‘বাগ করেছিল, আমি বুঝিয়ে বলেছি?’

মেয়ের প্রতি ক্রতৃজ্ঞতায় জমীর সাহেবের মন ভরে গেল। মেয়েটাকে সামেন্স পড়ান উচিত ছিল। সামেন্স না পড়িয়ে স্তুল হয়েছে। আর্টস পড়বে গাধা টাইপের মেয়েরা। তাঁর মেয়ে গাধা টাইপ নয়। বুদ্ধি আছে। বাপের প্রতি ফিলিংস আছে।

পরদিন যথারীতি জমীর সাহেব অফিসে রওনা হলেন। একবার মনে হল বাসে না গিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে নেবেন। পর মুহূর্তেই এই চিন্তা মন থেকে খেড়ে ফেললেন। ফালতু একটা চিঠি নিয়ে কিছু ভাবার কোন মানে হয়? এইসব জিনিস প্রশ্নয় দেয়াই উচিত না। বিকাতলার মোড়ে অন্য সব অফিস যাত্রীর মত তিনি একটি টিফিন বক্স এবং ছাতা হাতে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং যথারীতি প্রচণ্ড ভীড়ে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠে পড়লেন। বাস ছেড়ে দিল। সেই মুহূর্তে কিছু-একটা হল তাঁর। মনে হল ছিটকে বাস থেকে পড়ে যাচ্ছেন। তিনি এক সঙ্গে অনেক লোকের চিংকার শুনলেন — থামো, থামে, থামো — এই কুককে, কুককে —

জমীর সাহেব রাস্তায় ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান হল হাসপাতালে। তাঁর বাম পা হাঁটুর নিচে ভেঙেছে। এক জ্বায়গায় না, দু' জ্বায়গায়। মিতু এবং শাহানা মাথার কাছে বসে আছে। দুঃখনই কেন্দ্রে বুক ভাসাচ্ছে। সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, কাঁদছেন কেন? বললাম তো তেমন সিরিয়াস কিছু হয়নি। দিনপ্রস্তুতার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে বাসায় যাবেন। দুটা ফ্র্যাকচার হয়েছে তবে সিরিয়াস কিছু না।

ডাক্তারের কথামত পনেরো দিনের মাঝাতেই জমীর সাহেব বাড়ি ফিরেলেন। তবে পুরোপুরি সৃষ্টি হয়ে নয়। বাঁ পা অচল হয়ে গেল। এদেশে না-কি কিছু কোম্বো স্কট ব না। বিদেশে যদি কিছু হয়। চাকরি শেষ হবার আগেই জমীর সাহেব রিচার্ড ক্ল্যানেন। তিনি এবং তাঁর পরিবারের কেউ গ্রহণ করে না। যেন ক্লানেটি একটা অভিশপ্ত চিঠি। তার কথা তোলা উচিত না। চিঠিটা জমীর সাহেবের শোয়ার ঘরের টেবিলের তিন মন্দির দ্রয়ারে পড়ে রইল। মাঝে মাঝে জমীর সাহেব চিঠিটা বের করে পড়েন এবং তাঁর অচল পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সেই রাতে তাঁর এক ফোটা ঘূম হয় না। কেমন ভয় ভয় লাগতে থাকে।

নতুন বছরের গোড়াতে বিকাতলার বাসা উঠিয়ে উত্তর শাজাহানপুরে সম্মান একটা ফ্ল্যাটে তাঁরা চলে গেলেন। রোজগার কমেছে এখন। টাকা-পয়সা সাবধানে খরচ করতে হবে।

নতুন ফ্ল্যাটে দুটা ঘাত শোবার ঘর। একটিতে জমীর সাহেবে শাহানাকে নিয়ে থাকেন। অন্যটিতে মিত্র আর তার ছোট বোন ইরা থাকে। জমীর সাহেবের বড় ছেলে থাকে বসার ঘরে। একটা ঘাট বসাব ঘরে গাদাগাদি করবে বাখা হয়েছে। এই বাড়িতে যাস তিনেক কঠানোর পর আরেকটি বেয়ারিং চিঠি এল। আগের মত গোটা গোটা হরফে লেখা। ঘোটা কলমের নিচ দিয়ে মেয়েলী অক্ষরে সুস্থিতা লিখেছে।

প্রিয়তমেষ,

তুমি কেমন আছ? এত দুশ্চিন্তা করছ কেন? তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে দেখলে আমার ভাল লাগে না। সংসারে দুঃখ কষ্ট সমস্যা থাকেই। এতে বিচলিত হলে চলে? মনে সাহস রাখ। আচ্ছা একটা কথা — তোমার বড় ছেলেটাকে কিছুদিন ঢাকা শহরের বাইরে রাখতে পার না? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ও কোন বামেলায় পড়ে যাবে। তোমাদের গ্রামের বাড়িতে ওকে কিছুদিনের জন্যে পাঠিয়ে দাও না। ও যেতে চাইবে না। বুঝিয়ে-সুবিয়ে রাজি করাও।

বিনীতা
তোমার সুস্থিতা।

এবার আব সুস্থিতার চিঠি নিয়ে কেউ হাসাহাসি করল না। চিঠি পড়বাব সময় শাহানার হাত থেরথুর করে কাঁপতে লাগল। জমীর সাহেবের অস্বাভাবিক গভীর হয়ে গেলেন। বড় ছেলে সুমনকে গ্রামের বাড়িতে পাঠানোর প্রশ্নই উঠে না। কারণ তার বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। দুটা পেপার হয়ে গেছে। তবু শাহানা বললেন, থাক পরীক্ষা দিতে হবে না। ওকে পাঠিয়ে দাও।

জমীর সাহেব বললেন, দরকার আছে বলে তো মনে হয় না। চিঠি পাওয়ার পরেও তো পনেরো দিন হয়ে গেল।

‘হোক পনেরো দিন, পাঠিয়ে দাও। আমার ভাল লাগছে না।’

‘আচ্ছা বলে দেখ। যদি যেতে রাজি হয় তাহলে যাক।’

সুমন যেতে রাজি হল। শুধু যে রাজি হল তাই না, তৎক্ষণাৎ যেতে রাজি ঢাকা দিলে আচ্ছা রাতের ট্রেনেই রওনা হয়ে যায় এমন অবস্থা। ঠিক হল সে সোমবাৰ অক্ষালের ট্রেনে যাবে। জমীর সাহেবও সঙ্গে যাবেন। পৈতৃক বাড়ি ঠিকঠাক কৰবেন, জমিজমার খোজখবর কৰবেন। সম্ভব হলে কিছু জমি বিক্রি করে আসবেন। ঢাকা—প্রস্তাৱ শুব টানাটানি যাচ্ছে।

তাদের যাবার কথা সোমবাৰ। তার আগের দিন অর্থাৎ প্রস্তাৱ ভোৱ রাতে পুলিশ এসে জমীর সাহেবের বাড়ি ঘেৱাও করে সুমনকে ধৰে নিয়ে গোন। হতভস্ব জমীর সাহেবকে পুলিশ সাৰ-ই-স্পেস্টের আড়ালে ডেকে নিয়ে শিয়ে বললেন—আপনার ছেলেৰ বিকল্পে মার্ডার চার্জ আছে। সাতদিন আগে চারজনে মিলে খুনটা কৰেছে।/কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। আপনার ছেলে এই চারজনের একজন। আপনি বুঝিয়ে-সুবিয়ে ছেলেকে রাজসাকী হতে রাজি কৰান। এতে আপনারও লাভ। আমাদেরও লাভ। না হলে কিন্তু ফাসিটাসি হয়ে যাবে। পলিটিক্যাল প্ৰেসাৱও আছে।

সুমন রাজ্জসাক্ষী হতে রাজি হল ন। দীর্ঘদিন মামলা চলল রায় বেকতে লাগল দু'বছর। তিনজনের সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, একজনের ফাঁসি সেই একজন সুমন। অন্য তিনজন ছেলেটাকে ধরে রেখেছিল। খুন করেছে সুমন। ধারাল শূব্ধ দিয়ে রগ কেটে দিয়েছে।

পাঁচ বছর কেটে গেছে। পরবর্তী বেয়াবিং চিটিটি এল পাঁচ বছর কেটে যাবার পর। এই পাঁচ বছরে জমীর সাহেবের সংসারে বড় রকমের উলটপালট হয়েছে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মিঠুর বিয়ে হয়েছে কৃষি ধারারের এক য্যানেজারের সঙ্গে। সে স্বামীর সঙ্গে গোপালপুরে থাকে। ছেট মেয়ে ইরার নিষ্ঠ হয়েছে ওশুধ কোম্পানীর এক কেমিস্টের সঙ্গে। ত'রা ঢাকা শহরেই থাকে। প্রায়ই বাবা-মাকে দেখতে আসে। বড় মেয়ের কোন ছেলে-পুলে হয়নি। ছেট মেয়ের একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম ফরহাদ। এই ছেলেটি জমীর সাহেবের শুধু ভক্ত। তাঁর কাছে এলেই কোলে উঠে বসে থাকে। কিছুতেই কোল থেকে নামান যায় না।

পাঁচ বছর পর একদিন পিওন এসে বলল, স্যার, আপনার একটা বেয়াবিং চিঠি আছে, রাখবেন? জমীর সাহেব শূন্য দ্রষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সেদিন ইবারা বেড়াতে এসেছে। জমীর সাহেবের কোলে ফরহাদ। তিনি ফরহাদকে ঘাঁটিতে নামিয়ে চিঠি হাতে নিলেন। হাতের লেখা চিনতে তাঁর অসুবিধা হল না। সেই হাতের লেখা। সেই ন্যাপথলিনের গন্ধ।

পিওন বলল, চার টাকা লাগবে।

জমীর সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন, চিঠি রাখব না। তিনি তা বলতে পারলেন না। যত্রের মত পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করলেন। চিঠি পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে দিলেন। কাউকে কিছু বললেন না। তাঁর বমি বমি ভাব হল। মাথা ঘুরতে লাগল।

বাতে তিনি কিছু খেলেন না। ইবাদের আসা উপলক্ষে ভালমদ রান্না হয়েছিল। তিনি কিছুই মুখে দিলেন না।

ইয়া বলল, বাবা তোমার কি হয়েছে?

তিনি ক্ষীণ হয়ে বললেন, কিছু হয়নি। শরীরটা ভাল না।

‘রোজই তুমি বল শরীর ভাল না, অথচ একজন ভাল ডাক্তার দেখাও না। এরজন ভাল ডাক্তার দেখাও বাবা।’

‘দেখাব।’

‘আর মা’কেও একজন ভাল ডাক্তার দেখাও।’

‘আচ্ছ।’

‘আচ্ছা না বাবা। দেখাও।’

মেঝে-জামাই রাত নটার দিকে চলে গেল। ফরহাদ পেরুন। সে নানার সঙ্গে থাকবে।

সারারাত জমীর সাহেবের ঘুম হল না। পরদিন শেষ-শুক্রব গায়ে অৱ এসে গেল। স্তুরের মূল কারণ কাউকে বলতে পারলেন না। কেলা যাই বাড়তে লাগল স্তুরও ততই বাড়তে লাগল। দুপুরের পর ঘাম হতে লাগল। ইয়া হতভম্ব হয়ে বলল, বাবা চল তোমাকে ক্লিনিকে নিয়ে ভর্তি করি। আমার কিছু ভাল লাগছে না। তুমি এরকম ঘামছ কেন? হাতের কোন সমস্যা না তো?

জ্ঞানীর সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, চিঠি পেয়েছি।

‘চিঠি পেয়েছি মানে? কার চিঠি?’

‘বেয়াবিং চিঠি।’

ইরা দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, কি লেখা এবাবের চিঠিতে?

‘চিঠি পড়িনি।’

‘পড়ে দেখ। না পড়েই এরকম করছ কেন? হয়ত এবাব কেন ভাল খবর আছে।’

জ্ঞানীর সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, ভয় লাগছে যে ইরা।

‘ভয়ের কিছু নেই। দাও, আমার কাছে দাও — আমি পড়ি।’

ইরা চিঠি খুলে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। অন্যদের সেই চিঠি দেখাল। যারা দেখল
প্রত্যেকেই গম্ভীর হল। কারণ, চিঠিতে কিছু লেখা নেই। সাদা একটা পাতা। শেষে নাম সই
করা — বিনীতা, তোমার সুস্মিতা। এই সাদা না লেখা অংশে কি বলতে চাচ্ছ সুস্মিতা? কে
সে? কেনই বা সে চিঠি লেখে আবাব আজ কেনই বা লিখল না?



ভালবাসার গল্প

নীলু কঠিন মুখ করে বলল, কাল আমাকে দেখতে আসবে। রঞ্জু নীলুর কথা শুনল বলে মনে হল না। দমকা বাতাস দিচ্ছিল। খুব কায়দা করে তাকে সিগারেট ধরাতে হচ্ছে। কথা শুনবার সময় নেই।

নীলু আবার বলল, আগামী কাল সক্ষ্যায় আমাকে দেখতে আসবে।
কে আসবে?

মাঝে মাঝে রঞ্জুর বোকামিতে নীলুর গা ঝালা করে। এখনো তাই করছে।

রঞ্জু আবার বলল, কে আসবে সক্ষ্যা বেলা?

নীলু থেমে থেমে বলল, আমার বিয়ের কথা হচ্ছে। পাত্ৰ দেখতে আসবে।

রঞ্জুকে এ খবরে বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হল না। সে সিগারেটে লয়া টান দিয়ে বলল, আসুক না।

আসুক না মানে? যদি আমাকে পছন্দ করে ফেলে?

রঞ্জু গঞ্জীর হয়ে বলল, পছন্দ করবে না মানে? তোমাকে যেই দেখবে সেই ট্যারা হয়ে যাবে।

নীলু রেগে গিয়ে বলল, তোমার যত যারা গাধা শুধু তাদের চোখই ট্যারা হবে।

রঞ্জু বাস্তার লোকজনদের সচকিত করে হেসে উঠল। নীলু বলল, আস্তে ইঁট না, দৌড়াচ্ছ কেন?

রঞ্জু এ কথাতেও হেসে উঠল। কি কারণে জানি তার আজ খুব ফুর্তির মুড় দেখা যাচ্ছে। শুনগুন করে গানের কিএকটা সূর ভাঙ্গল। সুচৱাচর এ রকম দেখা যায় না। বাস্তা সে ভারিক্কি চালে হাঁটে।

নীলু সিনেমা দেখবে নাকি একটা?
না।

চল না, যাই।

নীলু চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

কথা বল না যে? দেখবে?

উঁহ। বাড়ীতে বকবে।

কেউ বকবে না। মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা হয় তখন মায়েরা তাদের কিছু বলে না।

কে বলেছে তোমাকে?

আমি জানি। তখন যায়েদের মন খুব খাবাপ থাকে। যেমনে শুশ্রবণাড়ি চল যাবে। এইসব সেটিয়েটের ব্যাপারে তুমি কুমুবে না। চল একটা সিনেমা দেখি।
না।

বেশ তাহলে চল কেন ভাল বেস্টুবেন্টে বসে চা খাওয়া যাক। নীলু সক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, খুব পয়সা হয়েছে দেখি।

রঞ্জু আবার হেসে উঠল, পরক্ষণেই গঞ্জীর হয়ে বলল, কি ভেবেছ তুমি? রোজ তোমার পয়সায় চা খাব? এই দেখ।

রঞ্জু ঘ্যাজিসিয়ানদের মত পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটি চকচকে একশ' টাকার নোট বের করল।

আরো দেখবে? এই দেখ।

এবাব আরো দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট বের হল। নীলু কোন কথা বলল না।

তুমি এত গঞ্জীর কেন নীলু?

তোমার মত শুধু শুধু হাসতে পারি না। বাসায় খাব, এখন চা-টা খাব না।

পীজ নীলু, এ রকম কর কেন তুমি?

বেস্টুবেন্টে চুকতেই বড় বড় ফেঁটায় বটি পড়তে লাগল। রঞ্জু ছেলে-মানুষের মত খুশী হয়ে বলল, বেশ হয়েছে। যতক্ষণ বৃষ্টি না থামবে ততক্ষণ বন্দি। সে এবাব আরাম করে আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীলু বলল, এই নিয়ে ক'টি সিগারেট থেলে?

এটা হচ্ছে ফিফ্থ।

সত্যি?

হ্যাঁ।

গা ছুঁয়ে বল।

আহ কি সব মেয়েলি ব্যাপার। গা ছুঁয়ে বললে কি হয়?

হোক না হোক তুমি বল।

রঞ্জু ইতস্তত করে বলল, আর সিগারেট খাব ন। ওয়ার্ড অব অনার। মরদকা বাত হাতীকা দাঁত।

তাবা বেস্টুবেন্টে থেকে বেকুল সঙ্ক্ষয় ঠিক আগে আগে। বৃষ্টি নেই। কিন্তু আলোয় ভেজা রাস্তা চিকমিক করছে।

রঞ্জু বলল, রিকশা করে একটু ঘূরবে নীলু?

উহঁ।

বেশ। চল রিকশা করে তোমাকে যিকাতলা পর্যন্ত এয়াঝে দুয়ে আসি।

হ্যাঁ, পরে কেউ দেখুক।

সঙ্ক্ষয়বেলা কে আর দেখবে? একটা রিকশা ডাকি?

আচ্ছা ডাক।

রিকশায় উঠতে গিয়ে রঞ্জু দেখল নোলুর চেঁর দিম্বে জল পড়ছে।

সে দাকণ অবাক হয়ে গেল।

কি ব্যাপার নীলু?

খুব খারাপ লাগছে। কাল যদি ওরা আমাকে পছন্দ করে ফেলে ?

রঞ্জু দ্বারা গলায় হেসে উঠল, করুক না পছন্দ, আমবা কোটে বিয়ে করে ফেলব।

তাবপর আমাকে তুলবে কোথায়, খাওয়াবে কি ? দু'টি টিউশনি ছাড়া আর কি আছে তোমর ?

এম.এ. ডিগ্রিটা আছে। সাহস আছে। আব . . .

আর কি ?

আব আছে ভালবাসা।

নীলু এবং রঞ্জু দুজনেই এবার একত্রে হেসে উঠল। রঞ্জু অত্যন্ত উৎফুল্ল ভঙ্গিতে আবেকটি সিগারেট ধৰাল। নীলু মনুষৰে বলল, এই তোমার সিগারেট ছেড়ে দেয়া ? ফেল এক্ষুণি।

এটাই লাস্ট ওয়ান।

উহঁ।

রঞ্জু সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।

পাত্র পক্ষ দেখতে আসবে সন্ধ্যাবেলা কিন্তু তোড়জোড় শুক হল সকাল থেকে। নীলুৰ বড় ভাই এই উপলক্ষে অফিসে গেলেন না। নীলুৰ ছেট বোন বীলুও স্কুলে গেল না। এই বিয়ের যিনি উদ্যোগী — নীলুৰ বড় মামা, তিনিও সাত সকালে এসে হাজিব। নীলু তার এই মামাকে খুব পছন্দ করে কিন্তু আজ যখন তিনি হাসিমুখে বললেন, কি করে নীলু বিবি কি থবৰ ? তখন নীলু শুকনো মুখে বলল, ভাল।

মুখটা এমন হাড়ির মত করে রেখেছিস কেন ? তোর জন্যে একটা শাড়ি এনেছি। দেখ তো পছন্দ হয় কি-না।

শাড়ী কি জন্যে মামা ?

আনলাম একটা ভাল শাড়ী। এই শাড়ী পরে সন্ধ্যাবেলা যখন যাবি ওদের সামনে . . . ।

নীলু নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে এল।

বাস্তায়ের নীলুৰ ভাবী রেহানা মাছ কুটছিল। কলেজ যেদিন ছুটি থাকে সেদিন নীলু বাস্তায় সাহায্য করার নামে বসে বসে গল্প করে। আজ নীলু দেখল রেহানা ভাবীর মুখ গঁজার। নীলু পাশে এসে বসতেই সে বলল, তোমার ভাই কাল রাতে আমাকে একটা চড় মর্জেছে। তোমার বিশ্বাস হয় নীলু ?

নীলু স্তুতি হয়ে গেল। রেহানা বলল, তুমি বিয়ে হয়ে চলে গোলৈ আমার কেমন করে যে দিন কাটবে। নীলু বলল, দাদাটা একটা অমানুষ। অভাবে অভাবে এ রকম হয়েছে ভাব। তুমি কিছু মনে করো না।

না, মনে করব কি ? আমার এত রাগ-টাগ নেই।

দুজনে অনেকক্ষণ চৃপচাপ বসে রইল। স্বেচ্ছায় একসময় বলল, তোমার ভাই পাঁচ টাকা মানত করেছে। তোমাকে যদি ওদের পছন্দ হয় তবে পাঁচ টাকা ফর্কিরকে দিবে।

নীলু কিছু বলল না। রেহানা বলল,

পছন্দ তো হবেই। তোমাকে পছন্দ না করলে কাকে করবে? তুমি কি আর আমার মন্ত? কত মানুষ যে আমাকে দেখল নীলু, কেউ পছন্দ করে না। শেফকালে তোমার ভাই পছন্দ করল। সুন্দর-চুন্দুব তো সে দুঃখে না।

নীলু হেসে উঠল। রেহানা বলল, চা খাবে? নীলু জবাব দিল না।

তোমাকে চা খাওয়ার সুযোগ কি আব হবে? বড়লোকের বট হবে। যামা বলেছিলেন ওদের নাকি দুঁটি গাড়ী। একটা ছেলেরা ব্যবহার করে, একটা বাড়ীর মেয়েরা।

নীলু চুপ করে রইল। রেহানা বলল, ছেলের এক চাচা হাইকোর্টের জজ।

হাইকোর্টের জজ দিয়ে আমি কি করব ভাবী?

তুমি যে কি কথা বল নীলু, হাসি লাগে।

দুপুর থেকে নীলুর দাদা গন্তব্য হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হল। নীলু ভেবে পেল না এই সামান্য ব্যাপারে দাদা এত চিন্তিত হয়ে পড়েছে কেন। একটি ছেলে মোটা মাঝের একটা চাকরি করলে এবং ঢাকা শহরে তার ঘর-বাড়ী থাকলেই এরকম করতে হয় নাকি?

অকাবণে রেহানা নীলুর দাদার কাছে ধর্মক খেতে লাগল।

বললাম একটা ফুলদানীতে ফুল এনে রাখতে।

এই বুঝি ঘর পরিষ্কারের নমুনা?

টেবিল কুখ্যটাও ইস্ত্রি করিয়ে রাখতে পারনি?

নীলুর বড় যামা অনেকবার তাকে বুঝালেন কি করে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে। নম্র ভঙ্গিতে চা এগিয়ে দিতে হবে। কিছু জিঞ্জেস করলে খুব কম কথায় উত্তর দিতে হবে। নীলুর রীতিমত কান্না পেতে লাগল। সাজগোজ করাবার জন্যে যামী এলেন বিকেল বেলা। সন্ধ্যা হবার আগেই নীলু সেজেগুজে বসে রইল। সমস্ত ব্যাপারটি যে রকম ভয়াবহ মনে হয়েছিল সে বকম কিছুই হল না। ছেলের বাবা খুব নরম গলায় বললেন, কি নাম মা তোমার?

নীলাঞ্জনা।

খুব কাব্যিক নাম। কে রেখেছেন?

বাবা।

তিনি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নীলুর মামার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। ছেলে নিজেও এসেছিল। নীলু তার দিকে চোখ কুলি তাকাতেও পারল না। চা পর্ব শেষ হবার পর নীলু যখন চলে আসছে তখন শুনল একজন ভদ্রমহিলা বলছেন,

খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের।

আগস্ট মাসে বিয়ে দিতে আপনাদের কোন অসুবিধা আছে?

নীলুর কান বাঁ বাঁ করতে লাগল। রেহানা রামায়ে ঘসে ছিল। নীলুকে দেখেই বলল, টি-পটটা ভেঙে দুটুকরা হয়েছে। তোমার ভাই কোনোকি করবে ভেবে আমার গলা শকিয়ে যাচ্ছে। কি অলঙ্কুৎ। ওমা কাঁদছ কেন, কি হয়েছে?

নীলু প্রায় দৌড়ে এসে তার ভাবীকে জড়িয়ে ধরে ফুফিয়ে উঠল, ভাবী আমি রঞ্জ ভাইকে বিয়ে করব। আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়। তুমি দাদাকে বল ভাবী।

আমি? আমাৰ সাহস হয় না। হায় রে কি কৰি। চূপ মীলু চূপ। ভাল কৰে সব ভাৰ।
এক্ষণি জ্ঞানাজ্ঞানিৰ কি দৰকাৰ।
আমি ভাৰতে পাৰি না ভাৰী।

মীলু এ ক'দিন কলেজে যায়নি। দিন সাতেক পৱ যখন প্ৰথম শেল ক্লাসেৰ মেয়েৰা
অবাক হয় বলল, বড় বোগা হয়ে গোছিস তুই। অসুখ-বিসুখ নাকি?

সে চূপ কৰে রইল।

কেমন গোলগাল মুখ ছিল তোৱ, এখন কি রকম লম্বাটে হয়ে গেছে। কিন্তু বেশ লাগছে
তোকে ভাই।

ক্লাসে মন টিকল না নীলুৰ। ইতিহাসেৰ অনিল স্যাৰ ঘুমপাড়নো সুৱে যখন গুপ্ত
ডায়ানিস্টি পড়াতে লাগলেন তখন ছাত্ৰীদেৰ স্তৰ্ণিত কৰে মীলু উঠে দাঢ়াল।

স্যাৰ আমাৰ শৰীৰ খুব খাৰাপ লাগছে। বাসায় যাব।

অনিল স্যাৰ অতিৰিক্ত রকম ব্যন্ত হয়ে উঠলেন।

বেশী খাৰাপ? সঙ্গে কোন বক্সকে নিয়ে যাবে?

না স্যাৰ, একাই যাব।

নীলু ক্লাস্ট পায়ে বাইৱে বেৰিয়ে এসে দেখে কলেজ গেটেৰ সামনে রঞ্জ দাঢ়িয়ে আছে।
শুকনো মুখ। হাতে একটা কাগজেৰ ঠোসা।

গত তিনিদিন ধৰে আমি রোজ একবাৰ কৰে আসি তোমাদেৰ কলেজে।

নীলু বলল, এই ক'দিন আসিনি, শৰীৰ ভাল না।

দূজন পাশাপাশি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাটল। তাৰপৰ রঞ্জ হঠাৎ দাঢ়িয়ে থেমে থেমে বলল,
আগস্ট মাসেৰ ৯ তাৰিখে তোমাৰ বিয়ে?

কে বলল?

কাৰ্ড ছাপিয়েছ তোমৰা। রেবাৰ কাছে তোমাৰ বিয়েৰ কাৰ্ড দেখেছি।

নীলু চূপ কৰে রইল। রঞ্জ এত বেশী উজ্জেজ্জিত ছিল যে, সহজভাৱে কোন কথা বলতে
পাৰছিল না। কোনমতে বলল, কাৰ্ড দেখেও আমাৰ বিশ্বাস হয়নি। তুমি নিজেৰ মুখে (কলেজ)
নীলু ঘদুৰে বলল, না সত্যি না। তোমাকেই বিয়ে কৰব আমি।

কৰে?

আজই।

রঞ্জ স্তৰ্ণিত হয়ে বলল, তোমাৰ মাথা ঠিক নেই নীলু।

মাথা ঠিক আছে। কোটে মানুষ কিভাৱে বিয়ে কৰে আমি জানি না।

রঞ্জ বলল, চল আমাৰ মেসে। কি হয়েছে সব কিছু তোমি

সে নীলুৰ হাত ধৰল।

রঞ্জুৰ নয়া পশ্টনেৰ মেসে নীলু আগে অবেক্ষণ এসেছে। দুপুৰেৰ গৱামে বসে অনেক
সময় গল্প কৰে কাটিয়েছে কিন্তু আজকেৰ যত কুকুকুল কৰে ঘামেনি কখনো। রঞ্জ বলল,
তোমাৰ শৰীৰ খাৰাপ হয়েছে নীলু, বড় ঘামছ।

আমার কিছু হয়নি।

চা খাবে? চা দিতে বলব?

উহঁ। পানি খাব;

রঙ্গু পানির গ্লাস নিয়ে এসে দেখে নীলু হাত-পা এলিয়ে বসে আছে। চোখ ঝুঁক রক্তাভ।
পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সে ভাঙা গলায় বলল,

রেবা তোমাকে আমার বিয়ের কার্ড দেখিয়েছে?

ঞ্চ।

আর কি বলেছে সে?

বলেছে, তোমাকে নাকি ফর্সা ঘতন রোগা একটি ছেলের সঙ্গে দেখেছে।

নীলু বলল, ওর নাম জমশেদ। ওর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে আমার।

রঙ্গু কিছু বলল না।

নীলু বলল, এই ছেলেটির সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তুমি কি করবে?

কি করব মানে?

নীলু ভীষণ অবাক হয়ে বলল, কিছু করবে না তুমি?

তোমার শরীর সত্ত্ব খারাপ নীলু। তুমি বাসায় যাও। বিশ্রাম কর।

নীলু বিকশায় উঠে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রঙ্গু বলল, আমি তোমার সঙ্গে আসব? বাসায় পৌছে দেব?

উহঁ।

নীলু বাসায় পৌছে দেখে অনেক লোকজন। হিরণ্পুর থেকে আলারা এসেছেন। বিয়ে উপলক্ষে বাড়ীতে তুমুল হৈছে। নীলু আলগাভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সক্ষ্যায় চা খেতে বসে সেজো খালার হাসির গল্প শুনে উচু গলায় হাসল। কিন্তু রাতের বেলা অন্যরকম হল। সবাই ঘূরিয়ে পড়লে নীলু গিয়ে তার দাদার ঘরে ধাক্কা দিল। রেহানা বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে বলল, কি হয়েছে নীলু?

নীলু ধরা গলায় বলল, বড় কষ্ট হচ্ছে ভাবী।

রেহানা নীলুর হাত ধরল। কোমল স্বরে বলল, ডাকব তোমার দাদাকে? কথা বলেও তার সাথে?

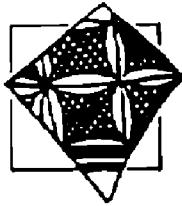
ডাক।

নীলুর দাদা সঙ্গে সঙ্গে ঘূম থেকে উঠে এলেন। অবাক হয়ে বললেন কি রে নীলু কিছু হয়েছে?

নীলু বলল, কিছু হয়নি দাদা। তুমি ঘুমাও।

তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

BanglaBook.org



সৌরভ

আজহার খা ঘর থেকে বেরহবেন, শার্ট গায়ে দিয়েছেন, তখনি লিলি বলল, বাবা আজ
কিন্তু মনে করে আনবে।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। মেয়ে বড় হয়েছে, ইচ্ছে করলেও ধমক
দিতে পারেন না। সেই জন্যেই রাগী চোখে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

লিলি বলল, রোজ রোজ মনে করিয়ে দেই। আজ আনবে কিন্তু।

সামনের মাসে আনব।

না, আজই আনবে।

রাগে মুখ ডেতো হয়ে গোলো আজহার খার। প্রতিটি ছেলেমেয়ে এমন উদ্ধৃত হয়েছে।
বাবার প্রতি কিছুমাত্র মমতা নেই। আর নেই বলেই মাসের ছাবিশ তারিখে দেয়ালে হেলান
দিয়ে দৃঢ় গলায় বলতে পারে, না আজই আনতে হবে।

তিনি নিষ্পদ্ধে শার্ট গায়ে দিলেন। চুল আঁচড়ালেন। ঝুতা পরলেন। ঝুতার ফিতায় কাদা
লেগেছিল, ঘসে ঘসে সাফ করলেন। লিলি সারাক্ষণই বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি
বেরবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই বলল, বাবা আনবে তো?

মেয়েটার গালে প্রচণ্ড একটি চড় কষিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রাপ্তপূর্ণে দমন করে তিনি শান্ত
গলায় বললেন, টাকা নেই, সামনের যাসে আনব।

লিলি নিষ্পদ্ধে উঠে গেল। তিনি ভেবে পেলেন না সবাই বৈরী হয়ে উঠলে কি করে বেঁচে
থাকা যায়। তিনি তো কিছু বলেননি। শুধু শান্ত গলায় বলেছেন, হাতে টাকা নেই। এটা তাকে
বলতে হল কেন? যে মেয়ে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর অভাব বুঝতে না পায়ে সে
কেমন মেয়ে?

তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। ইদানীং অস্পতেই তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। সামান্য সব
কারণে হতাশা বোধ করেন। বেঁচে থাকা অনাবশ্যক বলে মনে হয়।

“হতাশা গুণ নাশনী। হতাশা মানুষের সমস্ত গুণ নষ্ট করে দেয়। তবুও তো ভালবাসার
মত মহসুম সংগৃহণটি আমার এখনো নষ্ট হয়নি। তোমাদের সবাইকে আমি ভালবাসি।
তোমাদের জন্যে সারাক্ষণ আমার বুক টুনটুন করে, আর হিঁজি তুমি তোমার বাবার দিকে
ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাক। মাসের ছাবিশ তারিখে তোমার একটি শখের জিনিস আমি কিনে
আনতে পারি ন। কিন্তু তুমি তো আমারই মেলে তুমি তোমার মাঝের যত অবুঝ হবে
কেন?”

আজহার খাব কাঙ্গা পেতে লাগল। হদিশ সঙ্গ্যা হয়ে আসছে, তাকে এক্ষূণি বাইরে
বেরহতে হবে। তবু তিনি চৌকিতে বসে বাইরের আকাশ দেখতে লাগলেন।

বাবা এই নাও টাকা।

লিলি তিনটি দশ টাকার নেট টেবিলে বিছিয়ে দিল। তিনি অবাক হয়ে বললেন, টাকা কোথায় পেয়েছিস?

আমার টাকা। আমি জমিয়েছি। আনবে তো বাবা?

আনব।

নাম মনে আছে তোমার?

আছে।

লজ্জা ও হতাশার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। বাইরে যিবিবির করে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। সঙ্ক্ষা এখনো যিলায়নি। এর মধ্যেই চারদিকের তবল অঙ্ককার গাঢ় হয়ে এসেছে। পরিচিত পথগাটও অপরিচিত লাগছে।

“দশ বছর ধরে আমি এই শহরে পড়ে আছি। দশ বছর খুব দীর্ঘ সময়। এই দীর্ঘ সময়ে আমি রেজ একই রাস্তায় হাঁটছি। একই ধরনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলছি। এই দীর্ঘ সময়ে কোথাও যাইনি। তোমাদের কথা ভেবেই প্রতিটি পয়সা আমাকে সাবধানে ধরচ করতে হয়েছে। অফিসে টিফিন আওয়ারে সবাই যখন চায়ের সঙ্গে দুঁটি করে বিস্কিট খায় আমি দেখানে এক কাপ চা নিয়ে বসি। সেও তোমাদের কথা ভেবেই। তোমরা তার প্রতিদানে কি দিয়েছ আমাকে? আমাকে লজ্জা দেবার জন্যে লিলি, তুমি তোমার দীর্ঘদিনের জমানো টাকা বের করে আন। তোমার মা তার ভাইদের কাছে টাকা চেয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লেখে।”

তার মনে হল তিনি কুকুরের জীবন ধাপন করছেন। সাধ-আহ্লাদহীন বিবর্তিকর জীবন। তিনি একটি নিঃশ্঵াস ফেললেন।

বৃষ্টিব ছাটে আধন্তেজা হয়ে আজহার খা বাজারে ঢুকলেন। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে বাজার তেমন জমেনি। সঙ্ক্ষ্যাবেলা যেমন জমজমাট থাকে চারদিক সে রকম নয়। কেমন ফাঁকা ফাঁকা। তিনি বড়-সড় দেখে একটি স্টেশনারী দোকানে ঢুকে পড়লেন।

‘ইভিনিং ইন প্যারিস’ সেন্টটা আছে আপনাদের?

না, অন্য সেন্ট আছে। দেখবেন?

উহ্র, এইটাই চাই।

তখন বমবম করে বড় বড় ফৌটায় বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন। তিন-চারটি দোকান ঘূরতেই কাদায় পানিতে মাখামাখি। তার পান্তীবেয়ে পানির ম্রোত বইতে লাগল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, সেন্টের শিশিটি তার এই মৃহৃতেই প্রয়োজন। বৃষ্টি কখন ধরবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে পাবছে সে— এমনি তাড়া। পঞ্চম দোকানে সেতি পাওয়া গেল। দোকানী শিশিটি কাগজে মুছে লেন, ইশ, একেবারে যে ভিজে গেছেন? রিকশা করে চলে যান।

কত দাম?

ছবিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দরদাম কববার শৈর্য নেই আর। টাকার জঙ্গে পকেটে হাত দিয়ে আজহার খা সুস্থিত হয়ে গেলেন। সেখানে দুঁটি এক টাকার নেট আর একটি আশুলী ছাড়া কিছুই নেই।

দোকানী নীরবে শিশিটি আগের জাফগার রেখে দিল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল এ

বকম ঘটনা যেন প্রতিদিন ঘটে। কাস্টমাব জিনিস কিনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে পয়সা নেই। এ যেন খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।

আজহার থাঁ ভাবলেশহীন মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বৃষ্টির ভেতর নেমে গেলেন। দু-ই করে হাওয়া বহুছে। কড় উঠবে কিনা কে জানে। চশমার কাচে বৃষ্টির ফোটা জমে চাবদিক আপসা দেখাচ্ছে। আজহার থাঁ নোরবে হেঁটে চলেছেন। দু' একটি বিকশা তাব ঘাড়ের উপর পড়তে পড়তে সামলে উঠেছে। দ্রুতগামী ট্যাক্সির উজ্জ্বল আলো মাঝে মাঝে তাঁর চোখ খলকে দিচ্ছে। তিনি আচম্ভের মত হাঁটছেন। এই বৃষ্টি, এই শীতল হাওয়া, পায়ের কনুই পর্যন্ত ডুবে যাওয়া ময়লা পানির স্মৃত কিছুই যেন নজরে আসছে না তাঁর।

“আহা, আমার মেয়ে শখ করে একটা জিনিস চেয়েছে। আশা করে বসে আছে ইয়তো। এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমার। বাবার সংসারে কত কষ্ট পাচ্ছে। তার নিজের সংসার হোক, সেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, আমি কসম থেয়ে বলতে পাবি।”

এই জাতীয় অসংলগ্ন ভাবনা ভাবতে ভাবতে তিনি নয়াপাড়া ছাড়িয়ে হাইস্কুল ছাড়িয়ে সেইজখালী পর্যন্ত চলে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন, কি জন্য যাচ্ছেন এসব তাঁব মনে রইল না। এক সময় ইটে ধাক্কা থেয়ে পানিতে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলেন তাঁর পা উলছে;

মাথায় অসন্তুষ্ট যন্ত্রণা। “পাগলের মত ঘুরছি কি জন্যে?” এই ভেবে ফিরে চললেন উল্টো পথে। বাজাবের সীমানা ছাড়িয়ে পোন্ট অফিসের কাছে আসতেই সশ্রদ্ধে বাজ পড়ল কোথাও। রাত কত হয়েছে কে জানে। বাতি-টাতি বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। লোকজন শুয়ে পড়েছে। আজহার থাঁর হঠাত মনে হল রফিকের বাসায় গিয়ে বিশটা টাকা নিয়ে এলে হ্য। কিন্তু দোকান খোলা থাকবে কতক্ষণ? তিনি ডানদিকের গলিতে ভেঙ্গা সেগুল টানতে টানতে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

ঘন অঙ্ককার বাস্তা, বিজ্ঞলীর আলোয় এক-আধবাব সব ফর্সা হয়ে উঠে। পবক্ষণে নিকষ কালো।

রফিকের বাসায় কড়া নাড়তে গিয়ে বুঝলেন তাঁর শরীর সুস্থ নয়। প্রবল জ্বর এসেছে। পিপাসায় গলা বুক শুকিয়ে কাঠ। রফিক আঁৎকে উঠে বলল, কি হয়েছে আজহার ভাই?

না কিছু হয়নি। এক গ্লাস পানি খাওয়াও।

বাসার সবাই ভালো আছে তো? ভাবীর জ্বর কেমন?

সব ভালোই আছে, এক গ্লাস পানি আন আগে।

আজহার থাঁ উদ্ব্রান্ত শৃন্য দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। রফিক তাঁর হাত ধরল, এহ, তোমার ভীষণ জ্বর। কি হয়েছে বল?

টাকা আছে তোমার কাছে?

কত টাকা?

গোটা বিশেক।

দিছি। তুমি একটা শুকনো কাপড় পর। আমার বিকশা আমিয়ে দিই।

আগে একটু পানি দাও।

ঘর বক্স করে দোকানিরা শুয়ে পড়েছিল। আজহার থাঁ হতভয় হয়ে দরজাব সামনে

দাঁড়িয়ে রইলেন। বিকশাওয়ালা বিষ্ট হয়ে বলল, ধাক্কা দেন না স্যাব, ভিতরে লোক আছে।

তিনি প্রাণপণে দরজায় ধা দিলেন। শেওর থেকে শব এল — কে? তিনি ভাঙা গলায় বললেন, আমি। একটু খুলেন ভাই।

কি ব্যাপার?

টাকা নিয়ে এসেছি। সেন্টের শিশির দিন।

খুঁট করে দরজা খুলে গেল। সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দোকানদার তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। তিনি পকেট হাতড়ে টাকা বের করলেন।

দোকানদার বলল, আপনার কি হয়েছে?

কিছু হয়নি।

এত বাতে আসলেন কেন? সকালে আসলেই পারতেন।

রাত কর হয়েছে?

সাড়ে বারো।

ক্রতৃগতিতে বিকশা চলছে। তিনি শক্ত হাতে শুভ চেপে ধরে আছেন। তাঁর সমস্ত শরীর অবস্থা হয়ে আসছে। তাঁর মনে হল তিনি যে কোন সময় ছিটকে পড়ে যাবেন।

বাড়ীর কাছাকাছি সমস্ত অঞ্চলটা অঙ্ককাবে দূবে আছে। একটি লাইটপোস্টেও আলো নেই। অল্প ঝড়—বাদলা হলেই এ দিককার সব বাতি নিতে যায়। রিকশা আজহার খাঁর বাড়ী থেকে একটু দূবে উগরদের বাড়ীর সামনে থামল। তিনি দেখলন হারিকেন জ্বালিয়ে লিলি আর তার মা বারাদায় বসে আছে। রিকশার বাতি দেখে দুঃজনই উঠে দাঁড়িয়েছে। অঙ্ককাবের জন্যে বুঝতে পাবছে না কে এল।

আজহার খাঁ ডাকলেন, লিলি লিলি। জ্বে থাকা পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে মাও মেয়ে দুঃজনেই ক্রতৃ আসছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে রিকশা থেকে নামতে গিয়ে উল্টে পড়লেন। যে জ্বায়গাটায় তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, সেখানটায় অজ্ঞত মিটি সুবাস। তিনি ধরা গলায় বললেন, লিলি তোর শিশির ভেঙে গেছে রে।

লিলি ফোপাতে ফোপাতে বলল, আমার শিশি লাগবে না। তোমার কি হয়েছে (বিষ্ট)

গভীর জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন আজহার খাঁ। রঞ্জ অকাতরে ঘুমজ্জে লিলি আর লিলির মা ভয়কাতর চোখে জেগে বসে আছেন। বাইরে বৃটিস্টাত গভীর ব্যান্ডার্সের ভেতরে হারিকেনের রহস্যময় আলো। জানালা গলে ভিজে হিমেল হাওয়া আসছে।

সেই হাওয়া সেন্টের ভাঙা শিশি থেকে কিছু অপকর্প সৌরভ উড়িয়ে আনল।

BanglaBook.org



জলছবি

ফার্মগেটে বাসে উঠবার সময় জলিল সাহেবের বায় পায়ের জুতার তলাটা খুলে গেল। বাসে উঠবার উন্তেজনায় ব্যাপারটা তিনি ধ্রেয়াল কবলেন না। শুধু মনে হল দাঁড়িয়ে তিনি যেন ঠিক আরাম পাচ্ছেন না। বায় পায়ে তেমন জ্বার নেই।

শাহবাগের কাছে এসে তিনি বসবাব জ্বায়গা পেলেন। অফিস টাইমে বসবাব জ্বায়গা পাওয়া অসম্ভব ভাগ্যের ব্যাপার। নিচয়ই কিছু একটা ঝামেলা আছে। তিনি আড়চোখে পাশে বসা লোকটির দিকে তাকালেন এবং শিউরে উঠলেন। লোকটির ঘাড় থেকে কান পর্যন্ত দগদগে ঘা। লালাভ একরকম রস সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে। জলিল সাহেবের পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল। তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন তার পায়ের দিকে। আর তখনই দেখলেন বায় পায়ের জুতার তলাটা কোনো চিহ্নই নেই। এক বছরও হয়নি। এব মধ্যে এই অবস্থা। পাশে বসা লোকটি বলল, কটা বাজে ?

নটা।

লোকটা রাগী গলায় বলল, আপনার ঘড়িতে তো নটা দশ বাজে। নটা বললেন কেন ?

জলিল সাহেব তাকিয়ে দেখলেন লোকটির হাতেও ঘা। কৃষ্ণ নাকি ? তিনি বাঁ দিকে খানিকটা সরে এলেন। লোকটি পা মেলে যতটুকু জ্বায়গা থালি ছিল সবটুকু ভরাট করে ফেলল।

আপনার জুতার কি হয়েছে ?

জলিল সাহেব জ্বাব দিলেন না।

খুলে পড়ে গেছে নাকি ?

হ্যাঁ।

বাসের অনেকগুলো লোক উকি দিল। যেন দারুণ একটা মজার ব্যুপন। অনেক রকম ছেট ছেট প্রশ্ন হতে লাগল, কোন সময় খুলল ? টের পান নাই ? বলেন কি ?

কোন কোম্পানীর জুতা ? বাটা নাকি ? বাটা জুতার আগের কোম্পানীট এখন আর নেই।

জুতার দোকানে না নিয়ে অর্ডার দিয়ে বানানোই এখন তার হেসে-খেলে চার-পাঁচ বছর যায়।

জলিল সাহেব লক্ষ্য করলেন তাঁর সামনের সিঁড়ি বসা দুটি মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে জুতা দেখতে চাচ্ছে। এই গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যেও তামাঙ্গা দেখা চাই। একটি মেয়ে আবার ফিক করে হেসে ফেলল। এব মধ্যে হাসির ঠিক কি তাছে জলিল সাহেব ভেবে পেলেন না। তাঁর মনে হল মেয়েবা এখন আর আগের মতো নেই। মানুষের সৃংখ-কষ্ট নিয়ে তাবাই সবার আগে

হেসে ওঠে। যেমন তাঁর অফিসের ডেস্পাস সেকশনের মেয়েটি। কি যাষাকাড়া চেহারা, কি খিটি শসি। একদিন লাঞ্ছের সময় এসে ডিপ্রেস করল, বিং লাঞ্ছ অনলেন অজ্জ !

জোনি বললেন, কুটি আব আলু ভাজা।

কয়েকদিন পর আবার ডিপ্রেস করল। সেদিনও তিনি বললেন কুটি আব আলু ভাজা। তারপর একদিন তিনি শুনেন ডেস্পাস সেকশনের সবাই তাঁকে ডাকছে — মিস্টার পটেু ভাঙ্গা।

এইসব তাঁকে বিচলিত করে না। কিন্তু এমন একটা খিটি চেহারার মেয়ে যে এতে সুন্দর করে হাসে সে কি করে মানুষের কষ্ট নিয়ে তামাশা করে ? তাছাড়া তিনি তাব বাবার বয়সী। বিয়ে করলে এত বড় একটা মেয়ে তার নিশ্চয়ই থাকতো।

জলিল সাহেবের গুলিঙ্গানে নামার কথা কিন্তু তিনি প্রেসক্লাবে নেমে পড়লেন। জুতাটা সাবানো যায় কিনা দেখতে হবে। আজ অফিসে দেরি হবেই। গত এক বছরে তিনি একদিন মাত্র দেরি করেছেন। আজকেরটা নিয়ে হবে দু'দিন। দু'দিন দেরি হলে কিছু হবে না।

কিন্তু স্মেকশন অফিসার নজর্মুল হৃদা সাহেব তাঁকে সহ্যই করতে পারেন না। তিনি আসার পর থেকে শুধু খুত ধরাৰ চেষ্টা করছেন। 'একি জলিল সাহেব, চিঠি লিখেছেন ডেট কোথায় ? ডেট ছাড়া চিঠি হয় ? বাইশ বছরে কাজ এই শিখেছেন ? রিপিটিশনের বুঝি এই বানান ? ডিকশনারি দেখতে পাবেন না ? অফিসের খরচে তো ডিকশনারি কেনা হয়। সেটা কি শুধু টেবিলে সজিয়ে রাখবার জন্যে ?'

'ভাউচারগুলো সই করিয়ে রাখতে বলেছিলাম। এখন দেৰি দুটা ভাউচারে কোনো সই নেই। পেয়েছেন কি আপনি ? বাইশ বছরেও সাধান্য কাজটা শিখতে না পারলে কখন পারবেন ?'

'আসলে আপনার এখন অফিসের কাজে মন নেই। মন থাকলে এ বকম হয় না।'

মুচি ছেলেটি গঞ্জীর মুখে টায়ারের রাবার কাটছে। বয়স তেব-চৌদ্দর বেশি হবে না কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফসফস করে সিগারেট টানছে। এক পোচ রাবার কাটে আব গঞ্জীর হয়ে সিগারেটে টান দেয়। ভাবখানা যেন রাবার কাটার মতো জটিল কাজ এ-পৃথিবীতে জোৱা চৰী হয়নি। বশ কষ্টে ছেলেটির গায়ে চড় যাবার ইচ্ছা দমন করে জলিল সাহেব টুল কাট্টির বাক্সের ওপৰ বসে বসে ঘূর্মিতে লাগলেন। এগারোটা সাত মিনিটে জুতা তৈরী হল। জেলিল সাহেব সত্ত্ব সত্ত্ব ঘূর্মিয়ে পড়েছিলেন। ছেলেটি ডেকে তুলল তাঁকে।

না। বয়স হয়ে যাচ্ছে। নয়তো এ বকম অসময়ে কেউ ঘূর্মিয়ে পায় ? নজর্মুল হৃদা সাহেব ঠিকই বলেছিলেন, বয়স হয়ে গেছে এখন অফিস ছেড়ে বাড়িতে বিশ্রাম করেন। অফিসের কাজ আব আপনাকে দিয়ে হবে না।

ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় তিনি অফিসে পৌছলেন। তাঁর মনে হল কিছু একটা হয়েছে। ডেস্পাস সেকশনের আমিন সাহেব ক্ষেত্ৰ অন্তর্ভুক্ত চোখে তাকালেন।

জুতাটা ছিড়ে গিয়েছিল। ঠিক করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

আমিন সাহেব কোন কথা বললেন না।

রাবারের সোল লাগিয়েছি। দশ টাকা লাগল।

আমিন সাহেব শুধু বললেন, ও তাই বুঝি ?

ডেসপাসের এই মেয়েটি হেড ফ্লাকের সঙ্গে হাত মেড়ে কি যেন কলছিল। জলিল
সাহেবকে দেখেই থেমে গেল। এর মানে কি ? জলিল সাহেব কৈফিয়তের স্বীকৃত বললেন,
দ্রুতার শুক্তলিটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।

মেয়েটি শীতল স্বরে বলল, বড় সাহেব আপনাকে খুঁজেছিলেন।

কথন ?

সাড়ে দশটার দিকে।

কি জন্যে ?

তার কাছ থেকেই শুনবেন।

জলিল সাহেব নিঃশব্দে তার টেবিলে গিয়ে বসলেন। টেবিলের উপর ক্লিয়ারেন্সের দুটি
ফাইল ছিল। তার একটিও নেই। তিনি চেয়ারে বসে ঘামতে লাগলেন, পাশের টেবিলের
সুভাস বাবু যদু স্বরে বললেন, কোনোদিন দেরি করেন না। আজকের দিনটাই দেরি করলেন ?

জলিল সাহেব বিড়বিড় করে কি বললেন ঠিক বোঝা গেল না।

আপনার ফাইল দুটো নাঞ্জমূল ছাদা সাহেব নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আমাকে দেখে
দিতে বলেছেন।

জলিল সাহেব কিছু বললেন না।

আপনাকে বড় সাহেব দেখা করতে বলেছেন, যান দেখা করে আসুন।

জলিল সাহেব নড়লেন না। ফ্যানের ঠিক নিচেই তার চেয়ার। তবু তিনি কুলকুল করে
ঘামতে লাগলেন। তার মনে হল নিশ্চয়ই চাকরি চলে গেছে।

আজ সক্ষ্যায় বাড়ি গিয়ে কি বলবেন তিনি ? যার বাড়িতে তিনি মাসে তিনশ' পনেরো
টাকা দিয়ে থাকেন এবং খান সে তার দূর সম্পর্কের ভাস্তু। তব' সে তাকে নিশ্চয় দশ দিনের
মধ্যে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। দশ দিন পর নতুন যাস গুরু হচ্ছে। নতুন যাস থেকে অন্য
একজন কাউকে সে নেবে। না নিলে তার সৎস্নাব চলবে না। তার বৌটি অবশ্যি খুব কষ্ট
পাবে। এই মেয়েটি অন্য মেয়েগুলোর মতো না। এই মেয়েটির মধ্যে দয়ামায়া আছে। বড়
ভালো মেয়ে।

জলিল সাহেব।

স্বী।

বসে আছেন কেন ? যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসুন।

যাই।

জলিল সাহেব উঠলেন না, বসেই রইলেন। তার দাক্তাণ ক্ষেত্র বোধ হল। একটি বেয়ারা
আছে। তাকে বললেই সে পানি এনে দেয়। কিন্তু তাকে একজমি কিছু বললেন না। প্রবল ত্রুণ
নিয়ে ফ্যানের নিচে বসে তিনি ঘামতে লাগলেন।

প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরি চলে গেলে ক্ষেত্র প্রস্তা তেমনি কিছু পাওয়া যাবে না।
প্রতিষ্ঠানে ফান্ডে অল্প যা কিছু ছিল তার প্রায় সবটা নিয়েই বাবার শেষ চিকিৎসা করতে
হল। জ্বানতেন টাকাটা জলে যাচ্ছে তবু দায়িত্ব পালন। বিনা চিকিৎসায় মরতে দেয়া যায় না।

কান্দির, বাঁচার কোনো আশা নেই জেনেও তিনি হাজার টাকা খরচ করে অপারেশন করালেন।

ডাক্তার সাহেব নিজেও নিয়ম করেছিলেন, এই বয়সে অপারেশনের শক সহ্য হবে না। বাড়িতে নিয়ে ঘান, শাস্তিতে ফরতে দিন। অপারেশন সাক্ষেসফুল হলেও লাভ নেই তেমন কিছু। বড়জোর বছর খানেক ধাচবেন।

কিন্তু বাবা ক্ষেপে উঠলেন অপারেশনের জন্যে। রোজ দু'বেলা জিঞ্জেস করেন, অপারেশন কবে? তাড়াতাড়ি করা দরকার। এইসব জিনিস যতো তাড়াতাড়ি হয় ততো ভাল।

প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে মোট পাঁচ হাজার আটশ' টাকা পাওয়া গিয়েছিল। আসলে ছ'হাজার। দুশ' টাকা পান খাওয়ার জন্যে দিতে হয়েছে। তার মধ্যে খরচ হল তিনি হাজার। বাকি টাকাটা ফেরত দিয়ে ফেললেন ভেবেছিলেন, কিন্তু ফেরত দিতে ইচ্ছা করছিল না। এতগুলো টাকা হাতছাড়া করতে মায়া লাগে। সব চকচকে নোট। হাতে নিয়ে বসে থাকতেও আনন্দ। নতুন ভূতা কিনে ফেললেন একজোড়া, একটা মশারি কিনলেন। আগের মশারিটি দিয়ে তিনটি মাবকেল পাওয়া গেল। সদরঘাটের পূরানো কাপড়ের দোকান থেকে ছাঁপানু টাকায় কোটি কিনলেন একটা। এই কোটিটিই তাব কাল হয়েছিল। কোটের পকেট থেকেই বাকি টাকাগুলো পকেটমাব হয়। সব নতুন নোট। তিনি সেদিন অফিসে না গিয়ে রেসকোর্সের মাঠে একটা গাছের নিচে সারা দুপুর বসে ছিলেন। রেসকোর্সের মাঠটাকে গাছ-টাছ লাগিয়ে যে এতো চমৎকার কৰা হয়েছে তা তিনি জানতেন না।

লাক্ষ আওয়ারে বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন।

বড় সাহেবের ঘরে এয়ারকুলার আছে। সেটি বোধহয় কাজ করছে না। জলিল সাহেবের গবম লাগছে। প্রচণ্ড গবম। বড় সাহেবের পাশে নাজমুল হৃদা সাহেব বসে আছেন। চেক চেক শাটের জন্যে তাব বয়স খুব কম লাগছে। কিন্তু শাটের ছাপাটা ভাল না। কেমন যেন চোখে লাগে। জলিল সাহেবের চোখ কড়-কড় করতে লাগল।

জলিল সাহেব।

জী স্যার।

বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

জলিল সাহেব বসলেন।

সকাল বেলার দিকে একবাৰ আপনার খোজ কৰেছিলাম।

জলিল সাহেব ভূতা ছেড়াৰ ব্যাপারটা বলতে চেষ্টা কৰলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না। গলায় কথা আটকে গেল। বড় সাহেব শাস্তি স্বৰে বললেন, হেড অফিস থেকে চিঠি এসেছে। তারা আপনাকে অফিসার্স গ্ৰেডে প্ৰমোট কৰেছে। আপনিৰ সাৰ্ভিসে হেড অফিস খুব স্যাটিসফায়েড।

জলিল সাহেব শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন।

নাজমুল হৃদা সাহেবের পাশের কামৰাটিতে আপনি আপাতত কাজ শুরু কৰুন। জিনিসপত্র কিছু লাগলে রিকুইজিশন স্লিপ দিয়ে স্টোৱ থেকে নিয়ে নেবেন।

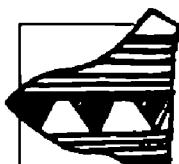
বড় সাহেব হাত বাড়িয়ে বললেন — ‘কন্ট্ৰাকুলেশন’। হাতটি যে হ্যান্ডসেকের জন্যে

বাড়ানো জলিল সাহেব অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন না। যখন পাবলেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি ধৰা গলায় কলালেন, স্যার জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করেনি। একটা পেরেক উচ্চ হয়ে আছে। খুব বাথ লাগছে।

ক্যান্টিমে সবাই বেধহয় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে আসতে দেখে সবাই উঠে দাঢ়িল। ডেসপাস সেকশনের মেয়েটি হাসি মুখে বলল, স্যার আপনার সম্মানে আজ অমরা সবাই দুপুরে একটু দিশেষ খাওয়া-দাওয়া করবো। নজর্মুল হ্বা সাহেবও খাবেন আমাদের সঙ্গে।

কিছু একটা বলা দরকার। সবাই হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। জলিল সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করেনি। একটা পেরেক উচ্চ হয়ে আছে।

কাদের মিয়া বিরিয়ানী এবং একটি করে টিকিয়া আনতে স্টেডিয়ামে গেছে। জলিল সাহেব তাঁর নিজের লাক্ষ বাস্তি হাতে করে চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা করছিল ডেসপাস সেকসনের মেয়েটিকে লাক্ষ বাস্তি খুলে দেখান। কারণ সেখানে কৃটি এবং আলুভাজা ছাড়াও একটা খেজুরগুড়ের সন্দেশ আছে। রোজ-রোজ এক জিনিস খেতে কষ্ট হয় ভেবেই বাড়ি থেকে মেয়েটি দিয়ে দিয়েছে। তিনি খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি শোনেনি। মেয়েজাতটা হচ্ছে মায়াবতীর জাত। শুধু শুধু মায়া দেখায়। জলিল সাহেবের চোখ আবার ভিজে উঠলো। ডেসপাস সেকশনের মেয়েটি বলল, স্যার আপনার কষ্ট হচ্ছে। আপনি বরং জুতাটা খুলে রাখুন।



নন্দিনী

মজিদ বলল, চল তোকে একটা জ্বায়গায় নিয়ে যাই।

বেশ বাত হয়েছে। চাবদিকে ফিলফিলে কুয়াশা। দোকানপাট বঙ্ক। খুঁই করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পাড়াগাঁৰ শহরগুলিতে আগে ভাগে শীত নামে। মজিদ বলল, স্পা চালিয়ে চল। শীত কম লাগবে।

কোথায় যাবি?

চল না দেখি। জরুরী কোন কাজ তো তোর নেই। নাকি আছে?

না নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তা ছেড়ে হঠাৎ বিছানে স্বরূপ রাস্তায় এসে পড়লাম। শহর অনেক বদলে গেছে। আগে এখানে ভালোর কারবারীরা থাস্ত। এখন জ্বায়গাটা ফাঁকা। পিছনেই ছিল কার্তিকের 'মডার্ণ সেলুন'। সেখানে দেখি একটা চায়ের স্টেল। শীতে গুটিশুটি মেরে লোকজন চা খাচ্ছে। আমি বললাম, এক দফা চা খেয়ে নিবি নাকি মজিদ?

উহ, দেরী হয়ে যাবে।

শহীদটা বদলে গেছে একেবারে। মহাবাস্ত্রের চপের দোকানটা এখনো আছে?

আছে।

ঢাক্টে হাঁতে ধনতলা পথন জনে এলাম। পরেও নাই গো ধোসে গিয়ে হাঁড়বল নদী
আমি আর মজিদ গোপনে সিগাবেট টানবার জন্যে কতবাব হাড়িখালের পাড়ে এসে বসেছি।
কিন্তু এখন নদী-টদী কিছু চোখে পড়ছে না।

নদীটা কোথায় রে মজিদ? হাড়িখাল এইদিকেই ছিল না?

ঞ্চো নদী। সাবধানে আয়।

একটা নর্মার যত আছে এখানে। পা পিছলে পড়েই গিয়েছিলাম। সামলে উঠে দেৰি
নদী দেখা ষাষ্ঠে। আমাৰা নদীৰ বাঁধেৰ ওপৰ দাঢ়িয়ে আছি। সকল ফিতেৰ যত নদী অঙ্ককাৰেও
চিকমিক কৰছে। আগে এখানে এৱকম উচু বাঁধ ছিল না। নদীৰ ঢালু পাড়ে সৱধেৰ চাষ হত।
মজিদ চূপচাপ হাঁটছিল।

আমি বললাম, আৰ দূৰ কত?

ও দেখা যাচ্ছে।

কাৰ বাড়ী?

আয় না চূপচাপ। খুব সাৰপ্রাইজড হবি।

একটি পুৱানো ভাঙ্গা দালানেৰ সামনে দুঁজন থমকে দাঁড়ালাম। বাড়ীৰ চাবপাশ
ৰোপখাড়ে অঙ্ককাৰ হয়ে আছে। সামনেৰ অপৰিচ্ছন্ন উঠোনে চার-পাঁচটা বড় বড় কাগজি
লেবুৰ গাছ। লেবুৰ গক্কেৰ সঙ্গে খড় পোড়ানো গৰু এসে মিশেছে। অসংখ্য মশাৰ পিনপিনে
আওয়াজ। মজিদ খট খট কৰে কড়া নাড়তে লাগল। ভেতৰ থেকে মেয়েলী গলায় কেউ
একজন বলল, কে?

মজিদ আৰা জোৱে কড়া নাড়তে লাগল। হারিকেন হাতে একটি লম্বা বোগামত শ্যামলা
মেয়ে দৱজা খুলে দিল। মজিদ বলল, কাকে নিয়ে এসেছি দেখ।

আমি কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মেয়েটি হাসিমুখে বলল, আপনি আমাকে
চিনতে পেৱেছেন তো? আমি নদিনী।

আমি যাথা নাড়লাম।

আপনি কবে দেশে ফিরেছেন?

দুমাস হবে। এতদিন ঢাকায় ছিলাম। এখানে এসেছি গতকাল।

মজিদ বিৰক্ত হয়ে বলল, ভিতবে আয় না। ভিতৰে এসে বস।

ঘৰেৰ ভিতৰটা বেশ গৱম। একটি টেবিলে কাঁচেৰ ফুলদাবাড়েজ পঞ্জৰাজ ফুল সাজানো।
চৌকিতে ধৰথবে সাদা চাদৰ বিছানো। ঘৰেৰ অন্য প্রাণ্টে প্ৰকৃষ্ট একটা ইজি চেয়াৰ। মজিদ
গা এলিয়ে ইজি চেয়াৰে শুয়ে পড়ল। হালকা গলায় বলল, চিন এনেছি। একটু চা বানাও।

নদিনী হারিকেন দুলিয়ে চলে গেল। আমৰা দুজন অৰুকাৰে বসে রইলাম। মজিদ ফস
কৰে বলল, সাৰপ্রাইজড হয়েছিস নাকি?

হ্ল।

কেমন দেখলি নদিনীকে?

ভাল।

www.BanglaBook.org



শুধু ভাল ? ইচ্ছ নট শী ওয়ান্ডাবফুল ?

আমি সে কথার জবাব না দিয়ে বললাম, এই বাড়িতে আব কে থাকে ?

সবাই থাকে ।

সবাই মানে ?

মজিদ কিছুক্ষণ চুপচাপ খেকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুই একবাব নদিনীকে প্রেমপত্র লিখেছিলি না ? অনেক কবিতা-টবিতা ছিল সেখানে । তাই না ?

আমি শুকনো গলায় বললাম, বাদ দে ওসব পূর্বানো কথা ।

মজিদ টেনে টেনে হাসতে লাগল ।

পরের দশ মিনিট দুঃজনেই চুপ করে রইলাম । মজিদ একটির পর একটি সিগারেট তানতে লাগল । মাঝে মাঝে হাসতে লাগল আপন মনে ।

অনেকক্ষণ আপনাদের অঙ্গকণে বসিয়ে বাখলাম । ঘৰে একটা মোটে হারিকেন । কি যে করি !

নদিনী চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল ।

চিনি হয়েছে চায়ে ?

কাপে চুমুক দিয়ে মজিদ বিষম খেয়ে কাশতে লাগল । আমি বললাম, আপনাদের এদিকে খুব হাওয়া তো ।

হঁ নদীর উপরে বাড়ী । হাওয়ার জন্যে কৃপী জ্বালানোই মুশকিল ।

ভেতর থেকে কে একজন ডাকল, বউ ও বউ ।

নদিনী নিঃশব্দে উঠে গেল । আমি বললাম, তুই প্রায়ই আসিস এখানে ?

আসি ।

ব্যাপার কিছু বুঝতে পাবছি না ।

আমি চুপ করে রইলাম । মজিদ বলল, বাত হয়ে যাচ্ছে, এইবাব ফিরব । নদিনীকে কেমন দেখলি বল না শুনি ।

ভাল । আগেব মতই, একটুও বদলায়নি ।

নদিনী আমাদের ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিল । ততক্ষণে চাদ উঠে গেছে । ম্লান জেডওয়ায় চারিদিক কেমন ভূতুড়ে মনে হচ্ছে । মজিদ বলল, যাই নদিনী ।

নদিনী কিছু বলল না । হারিকেন উচু করে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে রইল । আমরা ধর্মতলা পর্যন্ত নিঃশব্দে হাঁটলাম । এক সময় মজিদ বলল, কলেজের ফেস্কুলারেলে নদিনী কোন গানটা গেয়েছিল মনে আছে ?

না মনে নেই ।

আমার আছে ।

মজিদ গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাজ্জি থাকল । হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, জ্ঞানিস, নদিনীকে আমিই এ বাড়তে এনে তুলেছিম্মি ।

তাই নাকি ?

ওর বাবাকে তখন মিলিটারীরা মেরে ফেলেছে ।

সুবেশুর বাবুকে মিলিটারীরা মেরে ফেলেছিল নাকি ?

মারবে না তো কি আদর কববে? তুই কি যে কথা বলিস। মেরে তো সাফ করে ফেলেছে এদিকে।

আমি বললাম, সুবেশুর বাবু একটা পাপা হচ্ছেন। কত নানাদ -- মিলিংবী আসবার আগেই পালান। না পালাবেন না, একটামাত্র মেয়ে সঙ্গে নিয়ে শুস করে চলে যাবে, তা না . . ।

মজিদ একদলা খুখু ফেলে বলল, নদিনী শখন এসে উঠেছে হাফনদের বাসায়। হিন্দু মেয়েদের সে সময় কে জায়গা দেবে বল? কি যে মুসিবত হল। কতজনর বাড়ীতে গিয়ে হাত জোড় করে বলেছি, এই মেয়েটিকে একটু জায়গা দেবেন। এর বড় বিপদ। কেউ রাজ্ঞী হয় না। শেষকালে আজিজ মাস্টার রাজ্ঞী।

আজিজ মাস্টার কে?

এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের ঢিচার।

মজিদ একটি সিগারেট ধরাল। ঘন ঘন ধোয়া টেনে কাশতে লাগল। আমি বললাম, পাচালিয়ে চল, বেশ রাত হয়েছে।

মজিদ ঠণ্ডা সুরে বলল, নদিনী আজিজ মাস্টারের কাছে কিছুতেই থাকতে চায়নি। বারবার বলছে — ‘আপনি তো ইঞ্জিয়া যাবেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। পায়ে পড়ি আপনার।’

আমি ধমক দিয়ে বলেছি, তুমি হিন্দু মেয়ে মুসলমান ছেলের সঙ্গে যাবে, পথেঘাটে গিজগিজ করছে মিলিটারী। নদিনা কি বলেছিল জানিস?

কি?

আন্দাজ করতে পাবিস কিছু?

আমি কথা বলার আগেই মজিদ চাপা গলায় বলল,

নদিনী বলেছে, বেশ, তাহলে আপনার বড় সেজে যাই। না হয় আপনি আমাকে বিয়ে করুন।

মজিদ এক দলা খুখু ফেলল। আমি বললাম, আজিজ খাঁ বুঝি বিয়ে করেছে একে? হ্যা।

আজিজ খাঁ কোথায়? তাঁকে তো দেখলাম না।

ও শালাকে দেখবি কি করে? ও মুক্তি বাহিনীর হাতে মরেছে। দালাল ছিল আলা। হিন্দু মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে বিয়ে করেছে। বুঝতে পারছিস না? আব মার্কুরী কিনা তার বাড়ীতেই ঘাটি কামড়ে পড়ে রইল। হারামজাদী।

আমি চুপ করে বইলাম। মজিদ দাঁড়িয়ে পড়ল। অকারণেই শিলা উচিয়ে বলল, মেয়ে মানুষের মুখে খুখু দেই। তুই হারামজাদী এই বাড়ীতে পড়ে আস্তুম কি জন্যে? কি আছে এই বাড়িতে? জোর করে তোকে বিয়ে করেছে, আব তুই কিমি ছিঃ ছিঃ!

দুঃজনে বাঁধ ছেড়ে শহরের প্রশস্ত পথে উঠে এলুম বড় রাঙ্গাটা বট গাছ পর্যন্ত গিয়ে বেঁকে গেছে ডান দিকে। এদিকেই সুবেশুর বাবুর বাড়ী ছিল। আমি আব মজিদ সেই বাড়ীর সামনে শুধুমাত্র নদিনীকে এক নজর দেখবার জন্যে ঘূর ঘূর করতাম। কোন কোন দিন সুবেশুর বাবু অমায়িক ভঙ্গিতে ডাকতেন, আবে আবে তোমরা যে। এসো, এসো চা থাবে। মজিদ হাতের সিগারেট কায়দা করে লুকিয়ে ফেলে বলতো, আবেক দিন আসব কাকা।

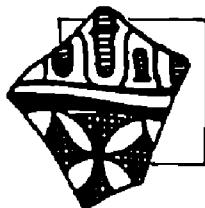
মজিদ নিঃশব্দে ইটছিল। আমি ডাকলাম, এই মজিদ।

কি?

চুপচাপ যে?

শীত করছে।

সে কান পর্যন্ত চাদর তুলে দিয়ে ফিস ফিস করে বলল, জামিস, আমি আর মদিনী
একটা গোটা বাত নৌকায় ছিলাম। রাতের অন্ধকারে আজিজ ধাঁর বাড়ীতে নৌকা করে ওকে
রেখে এসেছিলাম। খুব কাঁদছিল সে। আমি ওর ঘাড়ে একটা চুমু খেয়েছিলাম। মজিদ হঠাৎ
কথা থমিয়ে কাশতে লাগল। আমি চাবদিকের গাঢ় কূয়াশা দেখতে লাগলাম।



সুখ অসুখ

শুটখুট শব্দ হচ্ছে সিডিতে।

সুরমা আসছে। দশটা বেজে গেল নাকি? রহমান সাহেব দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন।
তাকাতে কষ্ট হয়। ঘাড় অনেকখানি বাঁকা করতে হয়। না দশটা বাজেনি, এখনো দশ মিনিট
বাকি আছে। সুরমা আজ সকাল সকাল চলে আসছে কেন? তার সব কাজ তো ঘড়ি ধরা।
রহমান সাহেব বিস্ময় বোধ করলেন।

বাবা, কিছু লাগবে?

রহমান সাহেব উপর দেবার আগে সুরমার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করলেন। কিছু কিছু
মুখ আছে যেখানে মনের কোন ছাপ পড়ে না। রহমান সাহেব সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে
কেনদিনই কিছু বুঝতে পারেননি। আজও পারলেন না। সুরমা দ্বিতীয়বার বলল, কিছু লাগবে
আপনার?

না বৌমা। কিছু লাগবে না।

দুধ খেয়েছেন?

হ্যাঁ।

তোতা মিয়া আপনাকে বাথরুম করিয়ে গেছে?

এই প্রশ্নটি সুরমা প্রতি রাতেই জিজ্ঞেস করে এবং প্রতি রাতেই তিনি দাকণ লঙ্ঘিত
বোধ করেন। আজও হ্যাঁ বলতে গিয়ে গলায় কথা আটকে গেল।

আবার যদি বাথরুমের দরকার হয় তাহলে তোতা মিয়াকে ডাকবেন। কলিং বেলটা
টেপেন।

না দরকার নাই।

বাতি নিভিয়ে দেই?

দাও।

BanglaBook.org

সুরমা বাতি নিভিয়ে দিল। ঘর অবশ্যি অঙ্ককার হল না ; সুরমা জিবো পাওয়ারেব টেবিল ল্যাম্পটি আলাল। এই কাজ দু'টি খণ্ডে বহুমান সাহেব নিষেধ করতে পারেন। তাঁর হাতের কাছে বেড় সুইচ আছে। প্যারালাইটসিস হ্বাব পৰ থেকে শেখ বাঁও নেভানোৰ ভন্টে সুরমা আসছে। তিনি এই বাড়তি যন্ত্ৰটুকু পাচ্ছেন। বড় ভাল মেয়ে।

বাতি নেভাবৰ পৰও সুরমা খানিকক্ষণ দাঢ়িয়ে রইল। সে কি কিছু বলতে চায় ? বহুমান সাহেব উঠে বসাব চেষ্টা কৰলেন, পারলেন না। তিনি যে এখন আৱ ইচ্ছামতো উঠে-বসতে পারেন না, তা মনে থাকে না। তিনি ঘূৰুন্ধৰে বললেন, বৌমা, লিলি কি ঘূৰিয়ে পড়েছে ?

ইয়া। ও নটাৰ সময় ঘূৰুন্ধে যায়।

ভূমি কি কিছু কৰবে ?

না কিছু বলব না। আপনি ঘূৰুন্ধ। যথাৱ পাশেৰ জানালাটা বক্ষ কৰে দেই ? শেষ রাতেৰ দিকে ঠাণ্ডা পড়ে।

দাও।

আপনাৰ পায়েৰ কাছে চাদৰ আছে। ঠাণ্ডা লাগলেই চাদৰ টেনে দেবেন।

ঠিক আছে।

আৱ কোন রকম দৱকাৰ হলেই তোতা মিয়াকে বলবেন আমাকে ডেকে তুলতে।

ঠিক আছে মা, বলব।

সুরমা ঘৰ থেকে বেৱিয়ে দৱজা ভেজিয়ে নিচে নেয়ে গেল। রহমান সাহেব মনে কৰতে চেষ্টা কৰলেন — সুৱমাৰ চোখে-মুখে ঠিক কি পৰিমাণ ঘণ্টা ছিল। ভাল মেয়েদেৰ মধ্যেও ঘণ্টা থাকতে পাৱে এবং থাকে।

বালিশেৰ নিচ থেকে তিনি সিগাৰেটেৰ প্যাকেট বেৱ কৰলেন। হাত দু'টি সচল আছে। সিগাৰেট ধৰাতে কোন অসুবিধা হয় না। ভাগিয়স কোমবেৰ নিচ থেকে প্যাবালাইসিস হয়েছে।

সিগাৰেটে ঢান দিয়ে নিষেব মনে তিনি খানিকক্ষণ হাসলেন। মনে মনে বললেন, আমাৰ খুৰ ভাল এবং খুৰ লক্ষ্মী বৌমাকে আমি পঁঢ়াচে ফেলেছি। আমাকে এই অবস্থায় ফেলে তাৰ কোথাও যাবাৰ উপায় নেই। এইখানেই তাকে থাকতে হবে।

আফজাল নিশ্চয়ই নথ ডাকোটা থেকে প্ৰতি সপ্তাহেই লিখছে — সুৱমা, ~~বৰাকৰ্ট~~ এই অবস্থায় দেশে ফেলে তোমদেৱ আমেৰিকায় আসাৰ প্ৰস্তুই উঠে না। কাজেই ~~তোমৰা~~ আৱ কিছুদিন অপেক্ষা কৰ। বাবাৰ শৰীৰ সুস্থ হোক। বাবাৰ শৰীৰ না সাৱা পৰম্পৰাই নিয়ে আৱ কিছুই কৰা যাবে না . . . ।

রহমান সাহেব অঙ্ককাৰেই হাসলেন, এটা সুস্থ হবাৰ অধিক নান। তিনি খাটোৰ কাছে লাগানো সুইচ টিপলেন। দু'বাৰ টেপাৰ সঙ্গে সঙ্গেই তোতা মিয়া ব্ৰহ্মক মুখে চুকল।

বেড় প্যান দাও। পেসাৰ কৰব।

তোতা মিয়া বাতি আলাল। তাৰ মুখ অঙ্ককাৰ। প্ৰমাণজাদা নবাৰ বেড় প্যান দিতে তাৰ কষ্ট হচ্ছে। মুখ একেবাৱে আঁধাৰ হয়ে গেল।

তোতা মিয়া শুকনো গলায় বলল, সিগাৰেট থাইতে আস্মা নিষেধ কৰছে না ?

চূপ থাক তুই।

আস্মা আমৱাৰে গাইল মদ কৰে।

করলে কুকু। তুই টেবিল ল্যাম্পটা মাথার কাছে দিয়ে যা।

এত বাইতে টেবিল ল্যাম্প দিয়া কি করবেন?

যাই করি। তোকে দিতে বলছি, দে।

তোতা মিয়া টেবিল ল্যাম্প এগিয়ে আন্ত। রাত এগারোঁটাৰ দিকে তিনি চিঠি লিখতে বসলেন। রাতজাগার কাঠিন তাৰ নতুন নয়। সুৱমা বাতি নিভিয়ে দেবাৰ পৰপৰই তিনি বাতি জ্বালেন। প্ৰায় রাতে দেড়টা দুটা পৰ্যন্ত জাগেন। এই বয়সে ঘূৰ কৰমে যায়। শুধু জেগে থাকতে ইচ্ছা কৰে:

রহমান সাহেবের হাতেৰ লেখা পৰিষ্কাৰ। তিনি গোটা গোটা হৰফে লিখলেন — প্ৰিয় আফজাল, আমাৰ শ্ৰীৰ ক্ৰমশঃই খাবাপ হইতেছে। এখন আৰ কিছুই ভাল লাগে না। রাতদিন পাক পৰওয়ারদেগাৰেৰ কাছে প্ৰাৰ্থনা কৰি যাতে তিনি আমাকে তোমাৰ মাৰ কাছে পৌছানোৰ ব্যবস্থা কৰেন। আমাৰ কাৰণে বৌমাৰ যাওয়া সুগতি আছে মনে হইলৈ অত্যন্ত কষ্ট বোধ কৰি। লিলিৰ দিকে তাকাইলৈ চোখে পানি আসে। বাবা, তোমাৰ প্ৰতি আমাৰ আদেশ— তুমি আমাৰ কথা চিন্তা না কৰিয়া বৌমাকে নিজেৰ কাছে নেওয়াৰ ব্যবস্থা কৰো। এইখানে একা একা থাকিতে আমাৰ কোন অসুবিধা হইবে না। ইনশাআল্লাহ। তোতা মিয়া আছে। মনোয়াৱেৰ মা আছে। পাশেৰ বাড়িৰ ডাঙ্গাৰ সাহেব আছেন। তুমি বাবা, আমাৰ জন্যে চিন্তা কৰিবে না। আমাৰ কোনই অসুবিধা নাই . . .।

চিঠিটা প্ৰায় তিন পৃষ্ঠা হল। অসুখেৰ পৰ রহমান সাহেব ছেট চিঠি লিখতে পাৰেন না। চিঠি লয়াই হতে থাকে। শুধু লিখতেই ইচ্ছা কৰে।

তিনি চিঠি শেষ কৰে বাতি নেভালেন। ঘুমঘুম ভাৰ আসছে। ঘণ্টা ধানিকেৰ মধ্যে ঘূম হয়তো এসে যাবে। তিনি ভাৰতে লাগলেন —আফজাল চিঠিৰ জবাবে কি লিখবে? সে নিশ্চয়ই রেগে—মেগে লিখবে — “কি কৰে আপনি ভাৰলেন আপনাৰ বৌমা আপনাকে ফেলে আমাৰ কাছে আসবে? এ বকম চিন্তা কৰাই বাতুলতা। এ নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আমি খুব শিগগিৰই দেশে এসে আপনাকে দেখে যাব।”

রহমান সাহেব আবাৰ কলিং বেল টিপলেন। বৌমা এই বুদ্ধিটি ভাল কৰেছে। খাটোৰ সঙ্গে সুইচ লাগিয়ে দিয়েছে। তোতা মিয়াকে আনবাৰ জন্যে বেশ কয়েকবাৰ সহচৰ্তৃপতে হল। হারামজাদা নবাৰ, বাৰোটা বাজতোই ঘূৰ। তাকে বাখাই হয়েছে কুগী দেখাশোলাৰ জন্যে। রহমান সাহেব গঞ্জীৰ গলায় বললেন, বেড় প্যান দে।

আবাৰ?

হ্যাঁ, আবাৰ।

তোতা মিয়া বেড় প্যান দিল। আবাৰ পানি দিল। টেবিল ল্যাম্প সৱিয়ে রাখল। মাথার কাছেৰ যে জানালাটা বক্ষ কৰা হয়েছিল সেটি খুলল। রহমান সাহেবেৰ ফ্ৰমায়েশ তখনো শেষ হল না। তিনি হঠাৎ বললেন, পান বানিয়ে আন।

পান ঘৰে নাই। এই বাড়িতে পান তো কেউ আপনি নাই।

খায় না কি বে ব্যাটা? আমি খাই না? অফিতো খাই, যা নিয়ে আয়।

কোনথে আনমু?

দোকান থেকে আন।

এই দুপুর রাইতে ?

হ্যা ।

দেকান তো সব বন্ধ ।

চূপ, ব্যটা বেশি কথা বলে । তাকা শহরে বারোটার সময় পানের দেকান বন্ধ হয় ?
আবাব মুখে মুখে কথা ।

অখন গেট খুললে আস্মার ঘূম ভাঙব ।

আব একটি কথা বললে চড় খাবি । পান নিয়ে আসতে বলেছি, নিয়ে আয় ।

তোতা মিয়া পান আনতে যায় এবং ইচ্ছা করেই গেটে ঝনঝন শব্দ কবতে থাকে ।
দোতলা থেকে রহমান সাহেব গেটের ঝনঝনানি শুনতে পান । এবং তার খানিকক্ষণ পর
সিডিতে খুট খুট শব্দ হয় । সুবমা উঠে আসছে । রহমান সাহেব চোখ বন্ধ করে বালিশে মাঝ
এলিয়ে দেন ।

কি হয়েছে বাবা ?

কিছু হয় নাই মা । বমি বমি লাগছে । তোতা মিয়াকে পান আনতে পাঠিয়েছি । বড় খারাপ
লাগছে মা ।

রহমান সাহেব ওয়াক করে বমির একটা ভঙ্গি করেন

আপনি এখনো ঘুমাননি ?

ঘুমিয়েছিলাম । একটা স্বপ্ন দেখে ঘূম ভাঙল । তোমাব শাশ্বতিকে স্বপ্নে দেখলাম ।
পরিষ্কার দেখলাম, হাত ইশারা করে আমাকে ডাকছে । মরা ঘানুষের হাত ইশারা করে
ডাকার স্বপ্ন খুব খারাপ ।

রহমান সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সুবমার দিকে । সুবমাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে
বিশ্বাস করছে । ভাবলেশহীন দৃষ্টি । এই মেয়ে তাঁর বেশির ভাগ কথাই বিশ্বাস করে না ।
রহমান সাহেব মনে মনে একটা কূৎসিত গাল দিলেন । সুবমা বলল, ঘুমুতে চেষ্টা করুন । বাতি নিভিয়ে
দিন ।

পান আনুক । আগে পান খেয়ে নেই ।

সুবমা আব কোন কথা না বলে নিচে নিয়ে গেল । রহমান সাহেব মনে মনে বললেন,
আদরেব বৌমাকে আমি ভাল প্যাচে ফেলেছি । এখন যাও দেখি আমেরিকা^১ সব তো
ঠিকঠাক করা ছিল । বুড়ো শুশ্বব এখানে থেকে বাড়ি পাহারা দিবে । আব তুমিরা মহামুখে
থাকবে আমেরিকা । সেখানে বাড়িটাবিও কেনা হয়েছে । লেকেব পাড়ে আড়ি । উইক এণ্ড
লেকে ঘূরে বেড়ানোর জন্য স্পীড বোট পর্যন্ত কেনা হয়েছে । এখন কোরে দেখি স্পীড বোটে ?
এখন আব বুড়ো বাপের কথা মনে থাকে না ? বুড়ো দেশে থেকে পশুক । কিছুই যাই আসে না ।
ছশ্মাস দশ মাস পরপর একখানা চিঠি ছাড়লেই হবে — মৈয়া তুমি কেমন আছ ? তুমি এক
একা দেশে পড়ে আছ ভাবতেই খুব কষ্ট হয় . . . ।

তোতা মিয়া পান নিয়ে এল ।

রহমান সাহেব এক সঙ্গে দুটো পান মুক্তে দিয়ে হটেচিঞ্জে সিগারেট ধরালেন । ধোয়া
ছাড়তে লাগলেন খুব কায়দা করে । ধশারির ভেতর সিগারেটের ধোয়া মেঘের মত ঝর্মে ঝর্মে
যাচ্ছে । বেশ লাগছে দেখতে ।

তোতা মিয়া কলন, আব কিছু লাগব ?

না।

পেসাৰ কৰবেন আৱেক বাব ?

না।

মুমাইতে যাই।

যা।

বেশ লাগছে তাঁৰ। তবে মূম চটে গেছে। বাকি রাঙ্গটা বোধহয় জেগেই কাটাতে হবে। তিনি মনে মনে আফজালের কাছে দ্বিতীয় একটি চিঠি লিখতে শুরু কৰলেন। এই চিঠিটি তিনি আগামী সপ্তাহে পাঠাবেন। বাবা, শৰীৱেৰ অবস্থা আৰো খৰাপ হইতেছে বাঁচিয়া থাকা বড় কষ্ট। তবে আমাৰ লক্ষ্মী বৌমা বড় যত্ন কৰিতেছে। আমাৰ নিজেৰ মেয়ে থাকিলে সেও এত কষ্ট কৰিত কি-না সন্দেহ। আপ্নাহ তাৰ হায়াত দৰাজ কৰক। আমি আপ্নাহৰ কাছে তাৰ জন্যে খাস দিলে দোয়া কৰিতেছি।

ভাবতে ভাবতে রহমান সাহেব খুকখুক কৰে হাসলেন। ভাল পঁয়াচে আটকে দিয়েছি। প্যারালিসিস-এৰ কুণ্ডী সহজে মৰে না। এৱা শৰূনেৰ মত বেঁচে থাকে। আমিও থাকব। দেখি আমাকে ফেলে বেঁকে তোমৰা যাও কোথায় ?

তাঁব ডান পায়েৰ পাতা চুলকাছে। কোনমতেই চুলকানো সম্ভব নয়। তাঁৰ বড় অস্তি লাগছে। তিনি কলিং বেলেৰ সুইচ টিপলেন। হৱামজাদা তোতা মিয়া আসছে না। ইচ্ছা কৰে আসছে না। জেগে ঘটকা মেৰে পড়ে আছে। রহমান সাহেব টিপতেই থাকলেন।

খুটখুট শব্দ হচ্ছে সিডিতে। সুৱমা উঠে আসছে ন-কি? রহমান সাহেবেৰ পায়েৰ চুলকানি সেৱে গেল।

কি হয়েছে বাবা ?

পায়েৰ পাতা চুলকাঞ্চিল ?

কোন্ পায়েৰ পাতা ?

ডানটা।

সুৱমা মশারি তুলে মাথা ভেতৱে ঢুকল। রহমান সাহেব দেখলেন তাৰ ফৰ্সা হত্তি-পুঁয়ে আসছে পায়েৰ দিকে।

চুলকাতে হবে না। এখন আৱ নাই।

আহ কি ফৰ্সা হাত মেয়েটাৰ।

বাবা, এখন কি আৱাম হয়েছে ?

হ্যা, তৃতীয় যাও মা। আৱ লাগবে না।

সুৱমা গেল না। বিছানাব পাশে বসল। হাত বলিয়ে দিলে লাগল পায়ে। রহমান সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন — বুঝলে বৌমা, তোমাৰ সাথে তোমাৰ পাণ্ডিৰ খুব মিল আছে।

সুৱমা কিছু বলল না।

সেও তোমাৰ মত সুন্দৰ ছিল। তোমাৰ মতহ গায়েৰ রং।

রহমান সাহেবেৰ হয়ত আৱো কিছু বলাৰ ইচ্ছা ছিল কিন্তু সুৱমা উঠে দাঢ়াল। মশারি

গুঁজে দিয়ে হাঙ্কা সুবে বলল, মশারিব ভেতর সিগারেট খাবেন না বাবা। হঠাৎ আগুন-টাঙ্কে
ধৰে যাবে।

আচ্ছা আব খাব না।

সিগারেট খাবার সময় কাউকে ঝাখবেন আশেপাশে। এখন কি আপনার সিগারেট থেতে
ইচ্ছা হচ্ছে? ইচ্ছা হলে একটা খান, আমি বসছি।

তিনি যত্নের মত বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট দের করলেন। সুরমা চেয়ারে
বসল। তার গায়ে হাঙ্কা মীল রঙের একটা শাড়ি। রহমান সাহেব মনে মনে বললেন — বড়
সুন্দর মেয়ে, তবে খুব অহংকারী। এত অহংকার ভাল না।

সুরমা তাকিয়ে আছে ঘড়ির দিকে। সময় দেখছে হযত। দেড়টা বাজে, অনেক রাত।
এক সময় সে মনুষের বলল — বাবা, বাইরের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা সাবধানে বলা উচিত।
কেউ পেটে কথা রাখে না। চারদিকে ছড়ায়।

কাকে আমি কি বললাম মা?

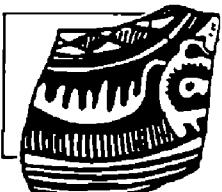
ডাক্তার সাহেবকে আপনি বলেছেন আপনার মনে সন্দেহ কোনদিন না কোনদিন আমি
বিষ-টিষ খাইয়ে আপনাকে মেরে ফেলব। এসব বলা ঠিক না।

ঠাট্টা করে বলেছিলাম মা।

ঠাট্টা করে বলাও ঠিক না। সবাই তো আর ঠাট্টা বুঝতে পারে না। মনে করে সত্তি।

সুরমা বসে আছে শাস্তি ভঙ্গিতে। তার মুখে মনের ছাপ পড়ে না। রহমান সাহেবের ইচ্ছা
হল জ্বলন্ত সিগারেট হাত থেকে বিছানায় ফেলে দেন। আগুন জ্বলে উঠুক। মেয়েটি দেশুক
তাকিয়ে তাকিয়ে। কিন্তু তার সাহস হয় না। তাঁর বড় বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে।

বেঁচে থাকতে তাঁর খুব ভাল লাগে।



গোপন কথা

আজ আমার ঘূম ভাঙ্গল খুব ভোরে।

আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি। এখনো অঙ্ককার গাঢ় হয়ে আছে। আকাশে ক্ষীণ
আলো-অঁধারিতে মন অন্য রকম হয়ে যায়। পৃথিবীর সবাইকে অলিয়াসতে ইচ্ছে করে।

আমি পৃথিবীর সবাইকে ভালবেসে ফেলাম। আমার পাশের চৌকিতে বাকের সাহেব
ঘূমিয়ে। অঙ্ককারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। তবু আমি নিষিদ্ধ জানি তিনি একটি কৃৎসিত
ভঙ্গিতে ঘূমিয়ে আছেন। মুখের লালায় তাঁর বালিশ ঝুঁজে গেছে। লুঙ্গি উঠে গেছে কোমরে।
তাতে কিছু যায় আসে না। আজ আমার চোখে অসুন্দর কিছু পড়বে না, বাকের সাহেবকেও
আমি ভালবাসব।

‘বৎসরের অন্যদিনগুলি আজকের মত হব না কেন?’ — ভাবতে ভাবতে আমি সিগারেট

ধরলাম। হিটার ঝুলিয়ে চায়ের কেতলি বসিয়ে দিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল নিঃশব্দে। তবু বাকের সাহেবের ঘূম ভেঙে গেল। তিনি জড়নো গলায় বললেন, চা হচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ।

আজ্জ এত ভোবে উঠলেন যে, ব্যাপার কি? শরীর খারাপ নাকি?

জ্বি না। চা খাবেন বাকের সাহেব?

দেন এক কাপ।

এই বলেই মাথা বের করে তিনি নাক ঝাড়লেন। নাক মুছলেন মশারীতে — কি কৃৎসিত ছবি। আজ্জ চমৎকার সব ছবি দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি প্রাপপণে ভাবতে চেষ্টা করলাম বাকের সাহেব নামে এ ঘরে কেউ থাকে না এবং এটা যেন—তেন কোন ঘরও নয়। এটা হচ্ছে মহিমগড়ের রাজবাড়ি এবং আমি এসেছি মহিমগড়ের রাজকন্যার অতিথি হয়ে। আর আমি কেন হেজিপেজি লোক নই। আমি একজন কবি। আজ্জ সন্ধ্যায় মহিমগড়ের রাজকন্যাকে আমি কবিতা শুনাবো।

মন্ত্র সাহেব।

জ্বি বলুন।

এ ব্রকম লাগছে কেন আপনাকে? কিছু হয়েছে নাকি?

না, কি হবে?

দেখি, একটা সিগারেট দেন দেখি।

বাকের সাহেব তাঁর সাপের মত কালো ঝোগা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। একটা সিগারেট দিলাম। অথচ আমি নিশ্চিত জানি, বালিশের নিচে তাঁর নিষ্ঠের সিগারেট আছে। বাকের সাহেব নিষ্ঠের সিগারেট কমই খান। আহ, কি সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভাবছি। আজ্জ আমি একজন অতিথি-কবি। আমার চিন্তা-ভাবনা হবে কবির মত। আমি নরম স্বরে ডাকলাম, বাকের সাহেব।

জ্বি।

আজ্জ আমার কেন জানি বড় ভাল লাগছে।

ভাল লাগার কি হল আবার?

বাকের সাহেব বড়ই অবাক হলেন। তাঁর কাছে আজকের দিনটি অন্য সব দিনের মতই। সাধারণ। ক্লাস্তিকর। আমি মনুস্বরে ডাকলাম, বাকের সাহেব।

বলেন।

আজ্জ আমার জন্মদিন।

তাই নাকি?

জ্বি। এগারোই বৈশাখ।

আম-কাঁঠালের সিজনে জন্মেছেন বে ভাই।

এই বলেই বাকের সাহেব চায়ের কাপ নিয়ে আর্থকর্মে মুকে গেলেন। আজ্জ আমি রাগ করবো না। চমৎকার একটি সকালকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। সন্ধ্যাবেলা যাব নৌলুদের বাড়ি। সন্ধ্যা হবার আগে পর্যন্ত শুধু ওর কথাই ভাববো।

বাকের সাহেব বাথরুম থেকে ফিরে এসে বললেন, ‘পাইখানা কষা হয়ে গেছে ভাই।

আমি শুনেও না শোনার ভাব করলাম। আজ আমি অসুন্দর কিছুই শুনব না, আজ আমার জন্মদিন। আজ নীলুদের বাসায় যাব এবং তাকে গোপন কথাটি বলব।

কড় হোক। বৃষ্টি হোক। কিংবা প্রচণ্ড ঝর্নেডো হোক। কিছুই আসে যায় না। আজ সন্ধ্যায় আমি ঠিকই যাব নীলুদের বাসায়। নীলুর বাবা হয়তো বসে থাকবেন বারান্দায়। তিনি আজকাল ক্ষীৰভাগ সময় বারান্দাতেই থাকেন। অপরিচিত কাউকে দেখলে কপালের চামড়ায় ভাজ ফেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। আমার দিকেও তাকাবেন। আমি হাসিমুখে বলব, 'নীলুফার কি বাসায় আছে? ওর সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।' আমি উৎসুকিত অবস্থায় ঠিকমত কথা বলতে পাবি না। কথা গলায় আটকে যায়। কিন্তু আজ আমার কোন অসুবিধা হবে না। আজ কথা বলব অভিনেতাদের মত।

চা শেষ করেই বাকের সাহেব ঘুমুবার আয়োজন করলেন। গলা টেনে টেনে বলেন, 'নটা পর্যন্ত ঘুমাব। তারপর উঠে নাশ্তা খেয়ে আবার ঘুম। ছুটির দিনের ঘুম কাকে বলে দেখবেন। ম্যারাথন ঘুম। হা হা হা।' কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নিঃশ্বাস ভরী হয়ে এল। বারান্দায় এসে দেখি আলো ফুটেছে। আকাশ হালকা নীল। পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। গোপন কথা বলাব জন্যে এবচে' সুন্দর দিন আব হবে না।

সকাল এগারোটায় টেলিফোন করলাম। নীলুকে টেলিফোনে কথনো পাওয়া যায় না। আজ পাওয়া গেল। নীলু কিশোরীদের মত গলায় বলল, কে কথা বলছেন?

আমি মঙ্গু।

ও, মঙ্গু ভাই। আপনি কেমন আছেন?

ভাল। তুমি কেমন আছে নীলু?

আমি ও ভাল।

কি করছিলে?

পড়ছিলাম। আবার কি করব? আমার অনার্স ফাইন্যাল না?

ও তাই তো। আচ্ছা শোন নীলু, তুমি কি আজ সন্ধ্যায় বাসায় থাকবে?

থাবব না কেন?

আমি একটু আসব তোমাদের ওখানে।

বেশ তো আসুন।

একটা কথা বলব তোমাকে।

কি কথা?

গোপন কথা?

আপনার আবার গোপন কথা কি?

নীলু খিল খিল করে হাসতে লাগল। কি সুন্দর সুরেন্দু হাসি। কি অস্তুত লাগছে শুনতে।

হ্যালো নীলু।

বলুন শুনছি।

আজ সন্ধ্যায় আসব।

বেশ তো আসুন। রাখলাম এখন। নাকি আয়ো কিছু বলবেন?

না, এখন আব কিছু বলব না।

BanglaBook.org

নীলু বিসিভার নামিয়ে রাখাব পরও আমি অনেকক্ষণ বিসিভার কানে লাগিয়ে রইলাম।

মাত্র এগৱেটা বাজে। আরো আট ষষ্ঠী কাটাতে হবে। কোথায় যাওয়া যায়? কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। নিউ যাকেটে কিছুক্ষণ ইঁটলাঘ একা একা। এবং একসময় দামী একটা সার্ট কিনে ফেলায়। অন্যদিন হলে সার্টের দাম আমার বুকে বিধে থাকতো। আজ থাকল না। দামের কথা মনেই রইল না।

দশাতি ফাইভ ফাইভ কিনলাঘ এ্যালিফেন্ট রোড থেকে। অন্তত আজকের দিনটিতে দামী সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। নীলুর জন্য কিছু একটা উপহার নিয়ে গেলে হয় না? কি নেয়া যায়? সুন্দর মলাটের একটা কবিতার বই। সেখানে খুব শুচিৰে একটা কিছু লিখতে হবে যেমন, “নীলুকে — দেখা হবে চন্দনের বনে।” বইটি দেয়া হবে ফিরে আসার সময়। নীলু নিষ্কয়ই আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসবে। তখন বলব, ‘নীলু, আজ কিন্তু আমার জন্মদিন’। নীলু বলবে, ওমা আগে বলবেন তো?

আগে বললে কি করতে?

কোন উপহার-টুপহার কিনে রাখতাম।

কি উপহার?

কবিতার বই-টই।

আমি তো কবিতা পড়ি না।

না পড়লেও বই উপহার দেয়া যায়।

ঠিক এই সময় আমি মোড়ক খুলে বইটি হাতে দিয়ে অল্প হাসব। হাসতে হাসতেই বলব, আমি তোমার জন্য একটা কবিতার বই এনেছি নীলু।

সঙ্ক্ষ্যাবেলো আকাশে খুব মেঘ করল। এবং একসময় শৌঁ শৌঁ শব্দে বাতাস বইতে শুরু করল। নীলুদের বারান্দায় পা রাখামাত্র সত্ত্ব সত্ত্ব কড় শুরু হল। কারেন্ট চলে গেল। সমস্ত অঞ্চল দুবে গেল অঙ্ককারে। নীলু আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, ‘এই বড়-বৃষ্টির মধ্যে এসেছেন? ভিজে গোছেন দেখি। আসুন, ভেতরে আসুন। কি যে কাণ্ড করেন? কাল এলেই হতো।

বসার ঘরে মোমবাতি ঝলছে। একজন বুড়োমত ভদ্রলোক বসে আছেন। তার পাশে বিলু। বিলু আমাকে দেখেই হাসিমুখে বলল, স্যার ভূতের গচ্ছ বলছেন। উফ যা ভয়ের। তারপর স্যারের গচ্ছ শুন্ন। প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্রেসেসেন্স বানানো গচ্ছ না।

নীলু বলল, দাঁড়ান স্যার, আমি এসে নেই। চায়ের কথা বলে আসুন।

নীলু চায়ের কথা বলে এল। একটা তোয়ালে আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, যাথা মুছে ফেলুন। তারপর স্যারের গচ্ছ শুন্ন। প্র্যাকটিক্যাল এক্সপ্রেসেসেন্স বানানো গচ্ছ না।

তোমার সংগে আমার একটা কথা ছিল নীলু।

দাঁড়ান গচ্ছ শুনে নেই।

আমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

তাই নাকি?

ক্ষমি ব্যাখকে একটা ঢাকবি হয়েছে। ফিফথ প্রেড অফিসার।

বাহ, বেশ তো। আসুন এখন গচ্ছ শুনুন।

নীলু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল, স্যার ইনি হচ্ছেন আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু। যে ভাই ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে থাকেন তার। নীলুর স্যার বললেন, ‘বসুন’। আমি বসলাম। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। পথ-ঘাট অঙ্কুর। শ্রাবণ মাস। আকাশে খুব দেখ করেছে। আমি অ’র আমার বন্ধু তারাদাস পাশা পশি যাচ্ছি। এমন সময় একটা শব্দ শুনলাম। যেন কেউ একজন ছুটতে ছুটতে আসছে। তারাদাস বলল, ‘কে? কে?’ তখন শব্দটা থেমে গেল।

ভদ্রলোক ভালোই গল্প করতে পারেন। নীলু-বিলু মুগ্ধ হয়ে শুনছে। নীলু একটা শাড়ি পরেছে। পরার ভঙ্গিটির মধ্যে কিছু একটা আছে। তাকে বিলুর চেয়েও কম বয়স্ক লাগছে। যেন সিঙ্গু-সেঙ্গেনে পড়া বালিকা শখ করে শাড়ি জড়িয়েছে।

গল্প শেষ হতে অনেক সময় লাগল। নীলু উঠে শিয়ে চা নিয়ে এল। আমি বললাম, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

নীলু অবাক হয়ে বলল, একবার তো বলেছেন।

কি বললাম?

কৃষি ব্যাংকে চাকবি নিয়ে ময়মনসিংহ যাচ্ছেন।

এ কথা না। অন্য একটা কথা।

ঠিক আছে বলবেন। দাঁড়ান স্যারের কাছ থেকে আরেকটা গল্প শুনি। স্যার আরেকটা গল্প বলুন।

ভদ্রলোক গল্প বলার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দ্বিতীয় গল্প শুরু করলেন। গল্প হতে হতে অনেক রাত হয়ে গেল। বৃষ্টিও কিছুটা কমে এসেছে। নীলু ব্যস্ত হয়ে তাদের ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলল।

আমি স্যারের পাশে বসলাম। নীলু হালকা গলায় বলল, আবার আসবেন মঞ্চ ভাই।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই বিলুর স্যার বললেন, ‘আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন?’ আমি তার জবাব দিলাম না। ভূতে বিশ্বাস করি কি না করি তাতে কিছুই যায় আসে না। আমি পবশু দিন চলে যাব। অনেকদিন আর ঢাকায় আসা হবে না। আর এলেও গোপন কথা বলার ইচ্ছা হবে না হয়তো। বিলুর স্যার বললেন, পথিকীতে অনেক স্টেঞ্চ ঘটনা ঘটে বুঝলেন মঞ্চ সাহেব, নাইনটিন সিঙ্গুটিতে একবার কি হয়েছে শুনেন . . .।

আরেক দিন শুনব। আজ আমার মাথা ধরেছে।

আমাদের এদিকেও বাতি নেই। অঙ্কুর ঘরে বাকের সাহেব ওয়ে আছেন। আমাকে চুক্তে দেখেই ক্লান্ত স্বরে বললেন, শরীরটা খারাপ করেছে ভাই। আমি হয়েছে কয়েকবার। একটু সাবধানে আসেন, পরিষ্কার করা হয় নাই।

সব পরিষ্কার করে ঘূর্ণতে যেতে আমাদের অনেক বোত হল। বাইরে আবার মুষ্টিথারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাকের সাহেব মুদু স্বরে বললেন, ঘূর্ণলেন নাকি ভাই?

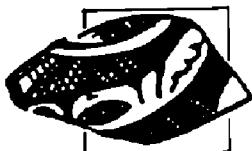
ব্রিন্দি না।

আপনার জন্মদিন উপলক্ষে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছিলাম। গরীব মানুষ কি আর দিব বলেন। বাকের সাহেব অঙ্কুরে এগিয়ে দিলেন সিগারেটের প্যাকেটটি। আমি নীচ স্বরে বললাম, একটা কথা শুনবেন?

কি কথা ?

গোপন কথা। কাউকে বলতে পারবেন না।

বাকের সাহেব বিছানায় উঠে বললেন। বাইবে মুষ্লধারে বৃষ্টি পড়ছে অজ বোধহয় পথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে গোপন কথাটি বলা হয়নি সেটি আমি বলতে শুরু করলাম। আমার ভালোই লাগল।



ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্য

ফজলুল করিম সাহেব গঙ্গার মুখে বললেন, ‘মাঝে মাঝে বড় ধরনের ক্যালামিসির প্রয়োজন আছে। বন্যার খুব দরকার ছিল।’ এই বলেই তিনি পানের পিক ফেলে কড়া করে তাকালেন ইয়াজুদ্দিনের দিকে। ইয়াজুদ্দিন তায়ে কুচকে গেল।

‘পানে কি জর্দা দেয়া ছিল ইয়াজুদ্দিন?’

ইয়াজুদ্দিন হ্যানা কিছুই বলল না। ফজলুল করিম সাহেব দ্বিতীয়বার পানের পিক ফেলে বললেন, ‘তোমরা কোন কাজ ঠিকমত করতে পার না। আমি কি জর্দা খাই?’

‘আরেকটা পান নিয়ে আসি স্যার?’

তিনি জ্ববাব দিলেন না ! তাঁর মাথা ঘুবছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। এই সঙ্গে ক্ষীণ সন্দেহও হচ্ছে যে, ইয়াজুদ্দিন নামের বোকা বোকা ধরনের এই লোকটা ইচ্ছে করে তাঁকে জর্দাভর্তি পান দিয়েছে। এরা কেউ তাঁকে সহ্য করতে পারে না। পদে পদে চেঁটা করে ঝামেলায় ফেলতে। ইয়াজুদ্দিনের উচিত ছিল ছুটে গিয়ে পান নিয়ে আসা। তা না করে সে ক্যাবলার মত জিঞ্জেস করছে — আরেকটা পান নিয়ে আসি স্যাব। হারামজ্জাদা আর কাকে বলে।

তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, ‘রিলিফের মালপত্র সব উঠেছে?’

রোগা লক্ষ্যান্ত এক ছেকরা বলল, ‘ইয়েছ স্যার।’ ছেকরাব চোখে সানগ্লাস সানগ্লাস চোখে দিয়ে একজন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা চূড়ান্ত অভ্যন্তর — এটা কি এই ছেকরা জানে? অবশ্য পুরোপুরি মন্ত্রী তিনি নন, প্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রীদের দলের হরিজন। তিনি যখন কোথাও যান তাঁর সঙ্গে টিভি-ক্যামেরা থাকে না। বক্তৃতা দিলে খবরের কাগজে সম্পত্তিয় সেটা ছাপাও হয় না। কাজেই এই ছেকরা যে সানগ্লাস পরে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। তবু তিনি বললেন, আপনার চোখে সানগ্লাস কেন?’

‘চোখ উঠেছে স্যার।’

ছেকরা সানগ্লাস খুলে ফেলল। তিনি আঁতকে উঠলেন . . . ভয়াবহ অবস্থা। তাঁর ধারণা ছিল চোখ-উঠা রোগ দেশ থেকে বিদেয় হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি বিদেয় হয়নি। এই ছেকরার কাছ থেকে হয়ত তাঁর হবে। এখনি কেমন যেন চোখ কড় কড় করছে। তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, ‘আমরা অপেক্ষা করছি কি অন্যে?’

'সারেং এখনো আসেনি।'

'আসেনি কেন?'

'শুধুতে পারছি না স্যাব। নটাৰ মনয় তো আসাব কথা।'

তিনি ঘড়ি দেখলেন এগারোটা কূড়ি বাজে। তাঁৰ এগারোটাৰ সময় উপস্থিত হবাৰ কথা ছিল। তিনি কাটায় কাটায় এগাবেটায় এসেছেন। অৰ্থ তাঁৰ পি.এ. এসেছে এগারোটা দশে। প্ৰতিমন্ত্ৰী হবাৰ এই যত্ন।

'ডেকে চেয়াৰ আছে স্যাব। ডেকে বসে বিশ্বাস কৰুন। সারেংকে আনতে লোক গেছে।'

তিনি অপ্রসম্ভ মুখে ডেকে রাখা গদিওয়ালা বেতেৰ চেয়াৰে বসলেন। সাধনে আৱো কিছু খালি চেয়াৰ আছে কিন্তু তাঁৰ সঙ্গেৰ কেউ সেই সব চেয়াৰে বসল না। তিনি দৰাঙ্গ গলায় বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। কতক্ষণে লক্ষ ছাড়বে কোন ঠিক নেই। বাংলাদেশ হচ্ছে এমনই একটা দেশ যে সময়মত কিছু হয় না।'

'বন্যাটা অবশ্যি স্যার সময়মত আসে।'

তিনি অপ্রসম্ভ মুখে তাকালেন। কথাটা বলেছে সানগুস পৱা ছোকৱা। কথাৰ পিঠে কথা ভালই বলেছে। তিনি নিজে তা পাৱেন না। চমৎকাৰ কিছু কথা তাঁৰ মনে আসে ঠিকই কিন্তু তা কথাবাৰ্তা শেষ হবাৰ অনেক পৱে। তিনি চশমা পৱা ছোকৱাৰ দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কে? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পাৱছি না।'

'আমাৰ নাম স্যার জামিল। নিউ ভিডিও লাইফে কাজ কৱি। আমি স্যার আগকাৰ্যেৰ ভিডিও কৱব।'

'আমাকে স্যার একদিনেৰ জন্যে ভাড়া কৱা হয়েছে।'

'আপনি নেমে যান।'

'জি স্যার।'

'আপনাকে নেমে যেতে বলছি। আগকাৰ্যেৰ ভিডিও কৱাৰ কোন প্ৰয়োজন নেই।'

'স্যাব হামিদ সাহেব বললেন . . . '

'হামিদ সাহেব বললে তো হবে না। আমি কি বলছি সেটা হচ্ছে কথা। যান, বেঁকে যান।'

জামিল লক্ষেৰ ডেক থেকে নীচে নেমে গেল। ফজলুল কৱিয় সাহেব থাপ্পমে গলায় বললেন, জনগণকে সাহায্য কৱবাৰ জন্যে যাচ্ছি। এটা কোন বিয়েবাড়িৰ দৃশ্যসৰ্বী যে ভিডিও কৱতে হবে। কি বলেন আপনাৰা?

একজন বলল, স্যার ঠিকই বলেছেন। খাজনাৰ চেয়ে বাজনা কোৱ হয়ে যাচ্ছে। সাহায্য যা দেয়া হচ্ছে তাৰ চেয়ে ছবি বেশী তোলা হচ্ছে। তিভি খুললেন্তো দেখা যায় . . .

তিনি তাকে কথা শেষ কৱতে দিলেন না। কড়া গলায় বললেন, লক্ষেৰ সারেং-এৰ ষ্টেজ পাওয়া গেল কি-না দেখুন। আমৱা রওনা হব কৰেন অৱি ফিরবই বা কখন? এত মিস ম্যানেজমেন্ট কেন?

দুপুৰ বারোটা পঞ্চাংশ লক্ষেৰ সারেং-এৰ ষ্টেজ পাওয়া গেল না। তাৰ বাসা কল্যাণপুৰে। পুৱো বাড়ি পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় তাৰ পৰিবাৰ-পৰিজনকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না —

এরকম একটা র্বেব পাওয়া গেল। ফজলুল করিম সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না। এত যিস ম্যানেজমেন্ট কেউ কোন দায়িত্ব পালন করছে না।

লঞ্চ একটা দশ মিনিটে ছাড়ল। অন্য একজন সারেং জোগাড় করা হয়েছে।

ফজলুল করিম সাহেব বলে দিয়েছেন ইনটেরিয়ারের দিকে যেতে হবে। এমন জ্যোগা যেখানে এখনো সাহায্য পৌছেনি। তাঁরা হবেন প্রথম ত্রাণদল।

'প্রথম দিকে এ রকম হচ্ছে — একই লোক তিনি চারবার করে সাহায্য পাচ্ছে, আবার কেউ কেউ এখন পর্যন্ত কিছু পায়নি। তবে অবস্থাটা সাময়িক। কিছুদিনের মধ্যে থবই প্ল্যানড ওয়েতে ত্রাণকার্য শুরু হবে। কি বলেন হামিদ সাহেব ?'

'তা তো ঠিকই স্যার। জ্যোগানো যখন প্রথম রাশিয়া আক্রমণ করল তখন কি রকম কনফিউশন ছিল রাশিয়াতে। টোটেল হচপচ। কে কি করবে, কার দায়িত্ব কি — কিছুই জানে না। এখানেও একই অবস্থা !'

ফজলুল করিম সাহেব কিছুই বললেন না। তাঁর এই পি.এ-র স্বভাব হচ্ছে বড় বড় কথা বলা। বুঝিয়ে দেয়া যে, সে নিজে প্রচুর পড়াশোনা জানা লোক। সে ছাড়া বাকি সবাই মৃৎ।

'স্যার চা খাবেন ? ফ্লারে চা এনেছি।'

'না।'

'খান স্যার, ভাল লাগবে।'

তাঁর চায়ের পিপাসা ছিল কিন্তু তিনি চা খেলেন না। ডেকের খোলা হাওয়ায় আরাম করে চা খেতে খেতে যাওয়ার চিন্তাটাই অস্বস্তিকর। তিনি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, এতো দেখি সমুদ্র।

'সমুদ্র তো বটেই স্যার। বাতাস নেই, আরামে যাচ্ছি। বাতাস দিলে ছয়-সাত ফুট ঢেউ হয়।'

'সে-কি !'

'একটা ত্রাণকার্য দূবে গেল। আর ছোটখাট নৌকা তো কতই দূবছে।'

'বলেন কি ! নতুন সারেং কেমন ?'

'লঞ্চ দুবার ভয় নেই স্যার। স্টিল বড় লঞ্চ। নতুন ইঞ্জিন।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায় ?'

'সেটা তো স্যার এখনো ঠিক হয়নি।'

'কি বলছেন এসব ? চোখ বন্ধ করে চলতে পাকবে নাকি ?'

'ব্যাপার অনেকটা তাই স্যার। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সমস্য দিকেই পানি। এখন কম্পাস ছাড়া গতি নেই।'

'ডেস্টিনেশন তো লাগবে ?'

'অফকোর্স স্যার। আমি সারেংকে বলে দিয়েছি ইন্টে বাণিক নদী ধরে সোজাসুজি যাবে, তানপর কোন-একটা ধূকনো জ্যোগা দেখলে ধূকনো জ্যোগা মানেই আশ্রয় শিবির।'

'আপ্সে দেখতে হবে ওরা সাহায্য পেয়েছেক-না। তেলা বাথায় তেল দেয়ার মানে হয় না।'

'তা তো বটেই স্যার।'

'আগ সামগ্ৰীৰ লিপ্ট কাৰ কাছে ?'

'আমাৰ কাছে।'

'কি নিয়ে যাচ্ছ আমাৰ ?'

হামিদ সাহেব ফাইল খুলে লিপ্ট বেৰ কৰলেন।

'শামাজৰ্তি তাৰু... '

'তাৰু ? তাৰু কি জন্মে ? তাৰু আপনি কি মনে কৰে আনলেন ? এটা মৰড়ুমি নাকি ?'

'মৰড়ুমিৰ দেশ থেকে আসা সাহায্য আমাৰ স্যাৰ কি কৰব বলুন। তাৰু ছাড়াও আৱো জিনিস আছে। এক হাজাৰ কোটা কনসান্ট্ৰেটেড টমেটো ভূস।'

'বলেন কি ? কনসান্ট্ৰেটেড টমেটো ভূস দিয়ে ওৱা কি কৰবে ?'

'ইৱাকেৰ সাহায্য স্যাৰ। গত বছৰে বন্যাৰ জন্মে দিয়েছিল। শুদামে থেকে পচে গেছে বলে মনে হয়। কোটা খুললৈ ভক কৰে একটা গুৰু আসে।'

'আৱ কি আছে ?'

'পাঁচশ' বোতল ডিস্টিল ওয়াটাৰ। এক একটা বোতল দু'লিটাৱে।'

'ডিস্টিল ওয়াটাৰ দিয়ে কি কৰবে ?'

'বুঝতে পাৱছি না স্যাৰ। মনে হচ্ছে মেডিক্যাল সাপ্লাই, বৰিক কটন আছে দুই পেটি।'

'এই সব সাহায্য নিয়ে উপস্থিত হলে তো আমাৰ মনে হয় মাৰ খেতে হবে।'

'তা তো হবেই। বেশ কিছু আগ পাঠি মাৰ খেয়ে ভূত হয়েছে। কাপড়-চোপড় খুলে মেঠো কৰে ছেড়ে দিয়েছে।'

'আপনি আমাৰ সঙ্গে রসিকতা কৰছেন ?'

'জি না স্যাৰ, সত্যি কথা বলছি। একটা পাঠি খুব সন্তুষ্ট শিক্ষক সমিতি — শিশু শিক্ষা বই, খাতা, পিনসিল এইসব নিয়ে পিয়েছিল। তাদেৱ এই অবস্থা হয়েছিল।'

ফজলুল কৱিয় সাহেব খুবই গন্তীৰ হয়ে গেলেন। হামিদ সাহেব বললেন, আমাদেৱ এই ভয় নেই। রাঙ্গা কৱা খাবাৰও তো নিয়ে যাচ্ছি।

'কি খাবাৰ ?'

'খাবাৰ হচ্ছে খিচুড়ি। প্ৰায় তিনশ' লোকেৰ ব্যবস্থা। তাৱপৰ লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি এসবও আছে। ক্যাশ টাকা আছে।'

'ক্যাশ টাকা কত ?'

'প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ।'

'প্ৰায় ? প্ৰায় কি জন্মে ? এগজেষ্ট ফিগাৰ বলুন।'

'পাঁচ হাজাৰ ছিল, তাৱ মধ্যে কিছু খৰচ হয়ে গেল। ভিডিও ক্যামেৰা, তাৱপৰ আপনাৰ নতুন সারেং নিতে হল। এই খৰচা বাদ যাবে।'

'ভিডিও ক্যামেৰা আপনাকে কে নিতে বলল ?'

'এটা তো স্যাৰ বলাৰ অপেক্ষা বাখে না। একসময়ে কৰ্কত থাকতে হবে না ?'

ফজলুল কৱিয় সাহেব আৱ কিছু বললেন না; যিম মেৰে বসে রইলেন। চারিদিকে পানি আৱ পানি। নদী দিয়ে লৌকা চলছে না সমুদ্ৰ পাড়ি দেয়া হচ্ছে বোঝাৰ কোন উপায় নেই। আকাশ কেমন ঘোলাটো। অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে। তাতেই বড় বড় ঢেউ তৈৰী হচ্ছে।

লঞ্চের গায়ে বেশ শব্দ করে ডেউ ভেঙ্গে পড়ছে। এর চেয়ে বড় ডেউ উঠতে শুক্ৰ কৰলে মূল্যায়ন।

দুঃখটা চলার পরও কোন শুকনো জ্বাসগা দেখা গেল না। লঞ্চের সাবেং ঢোক-মুখ কুঁচকে জ্বানাল, নদী-বৰাবর গেলে শুকনো জ্বাসগা ঢোকে পড়বে না। আড়াআড়ি ঘেতে হবে। তবে সে আড়াআড়ি ঘেতে চায় না। লঞ্চ আটকে ঘেতে পাবে। আড়াআড়ি ঘেতে হলে নৌকা নিয়ে যাওয়া উচিত।

ফজলুল করিম সাহেবের বিবিক্তির সীমা রইল না। তিনি বিড় বিড় করে বললেন, মিস ম্যানেজমেন্ট। বিৱাট মিস ম্যানেজমেন্ট। এই ব্যাপারগুলো আগেই দেখা উচিত ছিল।

হামিদ সাহেব হ্যালকা গলায় বললেন — আগে তো স্যার বুকতে পারিনি। আপনি কিছু মুখে দিন, সারাদিন ধাননি। চা আৰ নেনতা বিসিকিট দেই? কলাও আছে। স্যার দিতে বলি?

‘আপনারা কিছু খেয়েছেন? চারটা তো প্রায় বাজে।’

‘খিচুড়ি নিয়ে বসেছিল সবাই। খেতে পারেনি। টক হয়ে গেছে।’

‘টক হয়ে গেছে মানে?’

‘সকাল সাতটাৰ সময় রাঙ্গা হয়েছে, এখন বাজে চারটা — গৱামটাও পড়েছে ভ্যাপসা। এই গৱামে ঘানুষ টক হয়ে যায় আৰ খিচুড়ি।’

লঞ্চ মাঝ—নদী কিংবা মাঝ—সমুদ্রে থেমে আছে। ফজলুল করিম সাহেব বিষর্ষ মুখে নোনতা বিসিকিট এবং চা খাচ্ছেন। এক ফাঁকে লক্ষ্য কৰলেন ভিডিওৰ জাফিল ছোকরা লঞ্চেই আছে, নেমে যায়নি। পানিৰ ছবি তুলছে। হারামজাদাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিতে পারলে একটু ভাল লাগত, তা সম্ভব না।

নদীতে নৌকা, লঞ্চ একবারেই চলাচল কৰছে না। দুপুৰ বেলাব দিকে কিছু কিছু ছিল এখন তাও নেই। হামিদ সাহেব শুকনো গলায় বললেন, কি কৰব স্যার? ফিরে চলে যাব?

ফজলুল করিম সাহেব জবাব দিলেন না। হামিদ সাহেব থেমে থেমে বললেন — সক্ষ্য পর্যন্ত নদীতে থাকা ঠিক হবে না স্যার, ডাকাতেৰ উপদ্রব। খুবই ডাকাতি হচ্ছে। ফিরে যাওয়াই ভাল। দিনেৰ অবস্থা ধাৰাপ। ভাস্তু মাসে ঝড়—বষ্টি হয়।

‘আশ্বিন মাসে ঝড় হয় বলে জ্বানতাম। ভাস্তু মাসেৰ কথা এই প্ৰথম শুনলাম।’

‘আবহাওয়া তো স্যার চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন তাহলে কি বলো হব?’

ফজলুল করিম সাহেব চুপ কৰে রইলেন। বন্যার পানি দেখতে লাগলেন—হামিদ সাহেব বললেন, খিচুড়ি ফেলে দিতে বলেছি। টক খিচুড়ি ফিরিয়ে নিয়ে পিলে তো লাভ নেই। যে খাবে তাৱই পেট নেমে যাবে।’

‘যা ইচ্ছা কৰুন। কানেৰ কাছে বকবক কৰবেন না।’

‘পাঁচ হাজাৰ টাকা ক্যাশ আছে বলেছিলাম না, তাৰ চিকনা। লঞ্চেৰ তেলেৰ খৰচ দিতে হয়েছে। সারেং এবং তাৰ দুই এ্যাসিস্টেন্টেৰ বেতন ভিডিও ভাড়া, চা, নোনতা বিসিকিট এবং কলার জন্যে খৰচ হল চার হাজাৰ সাতাম টাকা ভ্যাপসি পয়সা। সঙ্গে এখন স্যার ক্যাশ আছে সাতামি টাকা তেক্ষণ পয়সা।’

‘আমাৰ কানেৰ কাছে দয়া কৰে ভ্যানভ্যান কৰবেন না।’

লক্ষ ফিরে চলল। পথে কলাগাছের ভেলায় তাসমান একটি পরিবারকে পাওয়া গেল—
তিনি বাচ্চা, বাবা-মা, একটি ছাগল এবং চারোঁ হাঁস। অনেক ডাকাডাকির প্রব তারা লক্ষের
পাশে এনে ভেলা শিঙ্গাণ। ম'তাশি টাকা তেঙ্গোঁ পয়সাব ন'বাঁই তাদেখেকে দেখা ইল। একটা
শাড়ি, একটা লুঙ্গি এবং একটা গামছা দেয়া হল। ফজলুল করিম সাহেব দরাজ গলায় বললেন
— একটা তাঁবু দিয়ে দিন। হামিদ সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, তাঁবু দিয়ে ওৱা কি কৰবে?

‘মা ইচ্ছা কৰুক। আপনাকে দিতে কলাছি দিন।’

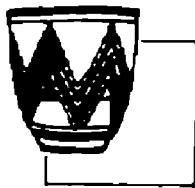
‘তাঁবুর ভাবে ভেলা দুবে যাবে স্যাব।’

‘দুববে না।’

তারা তাঁবু নিতে রাজি হল না। তার বদলে ভেলা থেকে লক্ষে উঠে এল। এগারো-বারো
বছরের একটি মেয়ে আছে সঙ্গে। সে সারাদিনের ধকলের কাবণেই বোধ হয় লক্ষে উঠে
হড়হড় করে বমি করল। ফজলুল করিম সাহেব আঁকে উঠে বললেন, কলেৱা না—কি? কি
সৰ্বনাশ! তাঁর মেজাজ ধুবই খারাপ হয়ে গেল। তিনি বাকি সময়টা কেবিনে দৱজা আটকে
বসে রইলেন। তাঁর গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে গেল।

পরদিনের খবরের কাগজে ফজলুল করিম সাহেবের আগকার্যের একটি বিবরণ ছাপা হয়—
অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় জনশক্তি দণ্ডনের প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজলুল করিম একটি
আগদল পরিচালনা করে বন্যা ঘোকাবেলায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারকেই স্পষ্ট করে
তুলেন। দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পুরো চবিশ ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্ৰম করে তিনি নিজেই
অসুস্থ হয়ে বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। জনশক্তি মন্ত্রী জনাব এখলাস উদ্দিন
হাসপাতালে তাঁকে মাল্যভূষিত করে বলেন— বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের ফজলুল করিম
সাহেবের মত মানুষ দৰকার। পরের জন্যে যাঁরা নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পিছপা নন।
এই প্রসঙ্গে তিনি বৰি ঠাকুৱের একটি কবিতার চৱণও আবেগজড়িত কঢ়ে আৰুত্বি কৱেন—
“কেবা আগে প্রাপ কৱিবেক দান, তার লাগি কাঢ়াকাড়ি।”

BanglaBook.org



সুলেখার বাবা

ঘূর ভেঙ্গেই সুলেখা দেখল গেটের কাছে একটি লোক উন্মু হয়ে বসে আছে। লোকটির চোয়াল ভাঙা, যাথার চুল ছেট ছেট করে কাট, চোখ দুটি ফোলা ফোলা। সে কিছুক্ষণ পৰ
পৰ পিক করে থুথু ফেলছে। কি বিশ্বী স্বভাব। নিজের চারদিকে কেউ এমন থুথু ছিটায়? এই
তো সুলেখা দাঁত মাজছে। মুখ ভর্তি হচ্ছে ফেনায। সে তো থুথু ফেলছে না। বেসিনে গিয়ে
ফেলে আসছে। তাই নিয়ম। মুখে থুথু এলে সেটা ফেলতে হয় বেসিনে কিংবা আশেপাশে
নর্দম্যা থাকলে নর্দমায। থুথু কখনো গিলে ফেলতে নেই। তাদের ফ্লাসের মিস এ্যানি বলে
দিয়েছেন। মিস এ্যানি বিদেশিনী হলেও কি সুন্দর বাংলা বলেন শুনতে যা ভাল লাগে। তবে
তিনি সুলেখা বলতে পারেন না। তিনি কেমন সুন্দর ঠোট গোল করে বলেন — “চুলেকা, দুষ্ট
মেয়ে”। মিস এ্যানির কথাগুলি যেমন সুন্দর চেহারাও তেমনি সুন্দর। যাখো যাখো শাড়ি পরলে
তাকে দেখায় ঠিক পরীর মতন।

সুলেখা ব্রাস ঘসতে ঘসতে ফুলের টবগুলির দিকে এগিয়ে গেল। ঐ লোকটা ফোলা
ফোলা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বাঁ চোখের কোণে এক গাদা ময়লা। দেখলেই বমি
বমি ভাব হয়। সুলেখা চেটো করল লোকটির বাঁ চোখের দিকে না তাকাতে। যে সব দশ্য
কৃৎসিত সে সব দেখতে নেই। কৃৎসিত কিছু দেখলে মন ছেট হয়ে যায়। এই কথাটা বলেন
সুলেখার যা। এবং তিনি সুলেখাকে কৃৎসিত কিছু দেখতে দেন না। একবার তারা গাড়ীতে করে
সোনার গাঁ যাচ্ছিল। হঠাৎ সুলেখার বাবা বললেন — মাই গড! কুকুরটাকে দেখি পিষে
ফেলেছে। নির্ধার কোন ট্রাকের কাণ।

সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে বলল, বাবা আমি দেখব। কিন্ত মা দেখতে দিলেন না। চট করে একটা
হাত দিয়ে তার চোখ ঢেকে গঁজীর গলায় বললেন, কৃৎসিত জিনিস দেখতে নেই সৌন।
সুলেখার অবশ্যি কৃৎসিত জিনিস দেখতে এন্টিতেই ভাল লাগে না। তার শুন্দি ভাল ভাল
জিনিস দেখতে ইচ্ছা করে। দেখাব মত কত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে।

ফেলা ফোলা চোখের ঐ লোকটি এখনো তাক দিকে তাকিয়ে আছে। এই লোকটিরও
বোধহয় সুন্দর জিনিস দেখতে ইচ্ছা করে। সুলেখা তো খুবই সুন্দর। এটা তো তার নিজের
কথা নয়, — সবাই বলে। মিস এ্যানি তাকে ডাকেন — সুইট এন্ড জেল। এন্ডেল মানে পরী।
পরীতো খুবই সুন্দর হয়। মিস এ্যানি ছাড়া অন্য আপারাও তাকে সুন্দর বলেন। নৃতন একজন
আপা সেদিন এলেন। পরিবেশ পরিচিতি পড়াবেন। ফ্লাস চুকেই বললেন — কল তো তোমরা
পরিবেশ কাকে বলে? কেউ কলতে পারল না। শোষণায় তিনি সুলেখার দিকে আঙুল বাড়িয়ে
বললেন, এই যে সুন্দর মেয়ে, তুমি বলতে পার? সুলেখা বলতে পারল না। নতুন আপা
পুরুষদের গলায় বললেন, কখু সুন্দর হলে তো হবে না। পড়াশোনাও করতে হবে। যা রাগ

লেগেছিল সেদিন। কামাও পেয়েছিল। আবেকটু হলে সে কেন্দেই ফেলতো অল্পতেই তার কাষা পায়।

সুলেখা দ্বি-ত মাঞ্জা হ্যে গেছে এখন আব বাং-দার শুধু শুধু দাঙ্গিয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। সে চলেই যেত কিন্তু ঐ লোকটা তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ফিক ফিক করে হাসছে। কি বিশ্বী দাত লোকটার। ইন্দু এবং কালো। এই লোক বোধহয় কোনদিন দাত ঘাস্তে না। আরে কি আশ্চর্য লোকটা হাত ইশারা করে তাকে ডাকছে। সুলেখা এগিয়ে গেল। মিটি রিগরিণে গলায় বলল, ডাকছ কেন?

লোকটি কিছু বলল না। মুখ ভর্তি করে হাসল। সুলেখা বলল, নাম কি তোমার?

আমার নাম নাই গো মা।

সবাবই নাম থাকে।

লোকটা খুব মাথা দুলিয়ে হাসছে। যেন সুলেখার কথায় খুব মজা পাচ্ছে। সুলেখা তো কোন মজার কথা বলেনি।

তুমি হাসছ কেন শুধু শুধু?

এই কথায় লোকটি যেন আরো মজা পেয়ে গেল। অন্তত শব্দ করে হাসল। হঠাৎ কল খুললে যে রকম শব্দ হয় সে রকম শব্দ। হাসিটা আবার চট করে থেমেও গেল। লোকটি পিক করে বেশ অনেকখানি দূরে থুথু ফেলল। সুলেখা কড়া গলায় বলল, চারদিকে থুথু ফেলছ কেন? ঘর ময়লা হয় না বুঝি? লোকটি কোন উত্তর দেবার আগেই সুলেখার মা বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখ অশ্বাভাবিক গঁউর। চোখ দুটি অসম্ভব শুকনো। বাবার সঙ্গে ঝগড়া হলে মার মুখ এরকম হয়ে যায়। কে জানে আজ হয়ত বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। মা বললেন, সুলেখা, তুমি এখানে কি করছ?

কিছু করছি না মা।

যাও, হাত-মুখ ধূয়ে নাশতা খেতে যাও।

মা খুব কড়া গলায় কথা বলছেন। সুলেখার মন খারাপ হয়ে গেল। সে কামা-কামা মুখে বাথরুমের দিকে রওনা হল। মা রাগী রাগী গলায় ঐ লোকটাকে ধমকাচ্ছেন।

কোথায় তুমি ঠিকানা পেয়েছ? তোমাকে বলা হয়েছে না কোনদিন আমাদের (বৃক্ষ) বের করার চেষ্টা করবে না? কি, বলা হয় নি? চূপ করে আছে কেন? জবাব দাও।

মনটা বড় টানে আস্মা। বড় টানে।

কি আজে বাজে কথা বলছ? তোমাকে যথেষ্ট টাকা দেয়া হচ্ছে আতে ঘন না টানে। তোমাব তো আরো ছেলেমেয়ে আছে, আছে না?

জ্ঞি আছে। আরো আছে।

তাহলে এত ঘন টানাটানি কিসের?

লোকটি খুক খুক করে কাশতে লাগল। মা জ্যাম্পটি কি সব বলতে লাগলেন। তার বেশীর ভাগই সুলেখা বুফল না। মা আজ ভীষণ ঝেগেছেন। কোনদিন এ রকম রাগেন না। বাইরের লোকের সঙ্গে তো কখনো না। কি মিটি করে মা কথা বলেন। শুনতে মা ভাল লাগে।

সে নাস্তা খেতে শিয়ে দেখল বাবার মুখও পঁষ্টীর। তাঁর হাতে একটি চাটি বই। সামনে চাহের কাপ। কিন্তু চা খাচ্ছেন না। সুলেখা তাঁর সামনে বসেছে। কিন্তু তিনি একটি কথাও

কললেন না। যেন তাকে দেখতেই পান নি। সুলেখা চুপচাপ বসে বইল। বুয়া এসে তাকে এক বাটি পরিজ্ঞ এবং একটি সিন্ধি ডিম দিয়ে যাবে। তার আগে তো অব কিছু করব নেই সে চামচ দিয়ে টুঁ করে গ্লাসে একটা শব্দ করল। বাবা তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না। অন্য সময় হলে বলতেন — খাবার সময় ফেলতে নেই। খাওয়ার সময় খাওয়া। খেলার সময় খেল।

বুয়া এবং মা ঢুকলেন একই সঙ্গে। বুয়ার হাতে পরিজের বাটি। সে বাটিটি সুলেখার সাথনে রাখল।

সুলেখার মা কললেন, রহিমার মা ঐ লোকটাকে কিছু খাবার-টাবার দাও। ওকে কল গেটের বাইরে গিয়ে বসতে। কেন ভতবে ঢুকল? বাইবে যেতে বল। এক্ষুণি বল।

জ্বি আইছা।

রাতের ভাত তরকারী কিছু আছে? খাকলে ওকে তাই দাও। ভাত দাও। সুলেখার বাবা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কি চায়?

তার নাকি মন টানছে। মেয়েকে দেখতে চায়।

ষত ফালতু কথা। আরো কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টা।

এতো মহা যন্ত্রণা হল। বাসা চিনে গেছে। এখন তো দুর্দিন পরে পরে এসে বসে থাকবে। অস্থির করে মারবে। পুলিশকে দিয়ে একটা ধূমক দেওয়াবো?

সুলেখার মা বিরক্তিতে জ্ব কুঁচকে ফেললেন। বাবা বললেন, ওর বৌটার কি অবস্থা? বৌয়ের মন টানে না? বৌটা তো কখনো আসে না।

জানি না। আমি কি ওর সঙ্গে রসালাপ করতে গিয়েছি নাকি?

একশটা টাকা দিয়ে বিদায় করে দাও। এবং তয় দেখিয়ে দাও যে আরেকবার এলে পুলিশে দেয়া হবে। আর যেন ত্রিসীমানায় ওকে না দেখি।

মা একটা চকচকে একশ' টাকার নেট সুলেখার হাতে দিয়ে বললেন — যাও, ঐ লোকটাকে দিয়ে আস। দিয়েই চলে আসবে। আবার গল্প জুড়ে দিবে না। যাবে আর আসবে।

বাবা বললেন, ওর যাবাব দরকার কি? তুমি গিয়ে দিয়ে আস। মা ক্লান্ত গলায় বললেন, যাক সুলেখাই যাক। মেয়েকে দেখতে এসেছে।

লোকটি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কি রোগা একটা মানুষ। নীল রঙের সেঞ্জি গায়ে। গেঞ্জিটা খুবই পরিষ্কার। কিন্তু লুসীটা অসম্ভব নোংরা।

সুলেখা টাকা হাতে এগিয়ে এল। লোকটি তাকিয়ে আছে একদলে।

সুলেখা বলল, নাও, টাকা নাও। মা দিয়েছেন।

লোকটি টাকা নিল না। বিড়বিড় করে বলল, ভাল আছে তুম্হারা? শহীল বাবা? ইস্কুলে পড়? কোন ইস্কুলে?

সুলেখা কিছু বলল না। লোকটি ফিস ফিস করে বললো, খুব অভাবের মহিয়ে পড়ছিলাম গো। খুবই অভাব। ভাতের কষ্ট হইল। সিঁজা খুব বড় কষ্ট। পেটের জহিন্যে এই কাম করলাম। ওমন কুকাম করলাম।

কি করলে?

লোকটি তার জ্ববাব না দিয়ে বলল, আমি কে কও দেখি?

কি ভাবে বলব ?

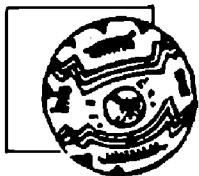
অম্মাবে চিনা চিনা লাগে না দে মা ? শাল কঠিন। দেখ ।

মূলেখা না বাবুদায় দেব থে এশেন। নৃশ গোয় গললেন, টাকা দিয়ে চলে আসতে বললাম না ? কি করছ তুমি ? টাকা দিয়ে দাও ।

সুলেখা বলল, টাকা নাও ।

শোকটি টাকা নিল না। কুঝো হয়ে কেমন অসুস্থ ভঙ্গিতে হাটতে শুরু করল। এবম্বাবও পিছনে ফিরে তাকাল না। সুলেখা বলল, ঐ শোকটা কে মা ? তাকে তুমি বকছ কেন ?

সুলেখাব মা তার জ্বাব দিলেন না।



যত্ন

[গল্পটি এই শতকের নয়। আগামী শতকের শেষের দিকের। এই জাতীয় রচনার একটি বিশেষ নাম আছে, বৈজ্ঞানিক-কল্পকাহিনী। সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীবা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকে ঘোটেই গুরুত্ব দেন না। কেন যে দেন না তা সাহিত্যের ছাত্র নই বলেই হয়ত বুঝি না। আমি নিজে এই জাতীয় রচনা আগ্রহ নিয়ে পড়ি। লেখার সময়ও আগ্রহ নিয়ে লিখি — পাঠকদের এই তথ্যটি খুব বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে গল্প শুরু করছি।]

তিনি নরম গলায় বললেন, ভাই এর কোন সাইড এফেক্ট নেই তো ?

সেলসম্যান জ্বাব দিল না, বিরক্ত চোখে তাকাল। তিনি আবাব বললেন, ভাই এই যত্নটার কোন সাইড এফেক্ট নেই তো ? সেলসম্যানের বিরক্তি চোখ থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। জু কুচকে গেল, মীচের ঠোট টানটান হয়ে গেল। সে শুকনো গলায় বলল সাইড এফেক্ট বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন ?

ঊ মানে নেশা ধরে যায় কিনা। শুনেছি একবার ব্যবহার শুরু করলে নেশা ধরে যায়। রাতদিন যত্ন লাগিয়ে বসে থাকে . . . ।

ঊ আপনার যদি সন্দেহ থাকে তাহলে কিনবেন না। আপনাকে কিনতে হবে এমন তো কোন কথা নেই।

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এতগুলি টাকা দিয়ে মিলে কিনবেন অর্থচ শোকটা তার প্রশ্নের জ্বাব পর্যন্ত দিতে চাচ্ছে না। এমনভাবে তার দিকে জ্বাচ্ছে যেন তিনি...

ঊ আপনি কি যত্নটা কিনবেন না দাড়িয়ে থাকবেন ?

তিনি পকেট থেকে চেক বই বের করলেন। খসখস করে টাকার অংক বসালেন। হাতের লেখাটা ভাল হল না। কারণ এত বড় অংকের চেক তিনি এর আগে কাটেননি। যাত্র আটশ

গ্রাম ওজনের কালো চৌকোশা একটা বৰু। অৰ্থচ কি অসম্ভব নাম। টাকার অংক লিখতে গিয়ে হাত কেঁপে যাচ্ছে।

সেলসম্যান বলল, আপনাৰ কোন ক্রেডিট কাৰ্ড নেই?

ঃ জ্ঞি না।

ঃ আপনাকে তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কৰতে হবে। আমৰা আপনাৰ ব্যাংক একাউট চেক কৰব। কম্পুটাৰটা ট্ৰাবল দিচ্ছে — একটু সময় লাগবে। আপনি ইচ্ছা কৱলে পাশেৰ কুমে বসতে পাৱেন।

ঃ আমি বৰং এখানেই দাঢ়িয়ে থাকি। অবশ্য আপনাৰ যদি কোন অসুবিধা না হয়।

সেলসম্যান জবাব দিল না। তাৰ কাছে মনে হল সেলসম্যানেৰ মুখেৰ বিৱৰণ ভাৰ একটু যেন কমেছে। কমাই উচিত — তিনি তো শেষ পৰ্যন্ত যন্ত্ৰটা কিনেছেন। তাৰ পঞ্চাশ বছৰেৰ জীবনেৰ সঞ্চিত অৰ্থেৰ সবটাই চলে গেছে। এৱ পৱেও কি লোকটা তাৰ সঙ্গে সহজভাৱে দু'একটা কথা বলবে না? তিনি বেশ কিছুক্ষণ ইতন্তত কৰে শেষ পৰ্যন্ত আবাৰ বললেন, ভাই এৱ কোন সাহিত এফেক্ট নেই তো?

এবাৰ জবাব পাওয়া গেল। সেলসম্যান রোবটদেৱ মত ধাতব গলায় বলল, না নেই।

ঃ নেশা হৰ না?

ঃ না — হয় না। তবে আপনি ইচ্ছা কৰে যদি নেশা ধৰান তাহলে তো কৰাৰ কিছু নেই। যন্ত্ৰটিৰ সঙ্গে ইনস্ট্রুকশান য্যানুয়েল আছে। য্যানুয়েল যেনে যদি ব্যবহাৰ কৰেন তাহলে কোন অসুবিধা হবে না। প্ৰতিদিন এক ঘণ্টাৰ বেশী ব্যবহাৰ কৰবেন না। সপ্তাহে অন্তৰ্ভুক্ত একদিন যন্ত্ৰটায় হাত দেবেন না।

তিনি এবাৰ আনন্দেৰ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। লোকটি শেষ পৰ্যন্ত তাৰ সঙ্গে কথা বলছে। তিনি হাসিমুখে বললেন, যন্ত্ৰটা নিয়ে নানান কথাবাৰ্তা হয় তো। তাই . . .

ঃ আমাদেৱ স্বভাৱই হচ্ছে নতুন আবিষ্কাৰ নিয়ে কথা বলা। পি থাটি টু হচ্ছে এই শতাব্দীৰ সবচেয়ে বড় আবিষ্কাৰ। এই বিষয়ে কি আপনাৰ কোন সন্দেহ আছে?

ঃ জ্ঞি না।

ঃ তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন?

ঃ ভয় পাচ্ছি না তো।

ঃ পাশেৰ ঘৰে গিয়ে বসুন। আৱো আধ ঘণ্টাৰ মতো লাগবে।

ঃ জ্ঞি আচ্ছা।

ঃ একটা জিনিস শুধু মনে রাখবেন, এই শতাব্দীৰ সবচে বড় আবিষ্কাৰ পি থাটি টু। বিংশ শতাব্দীৰ সবচেয়ে বড় আবিষ্কাৰ যেমন টেলিভিশন। আপনি কি আমাৰ সঙ্গে একমত?

ঃ জ্ঞি একমত।

তিনি মোটেই একমত না। বিংশ শতাব্দীৰ টেলিভিশন ছাড়াও আৱো অনেক বড় বড় আবিষ্কাৰ হয়েছে। এই শতাব্দীতে দশটি বড় বড় আবিষ্কাৰ হয়ে গেছে। এৱ মধ্যে সবচে বড় আবিষ্কাৰ হচ্ছে “ডেখ হৱমোন”。 ডাক্তাৰ পিতাৰ স্নীয়ান প্ৰমাণ কৰেছেন, একটা নিদিষ্ট বয়সে পিচুইটাৰী গ্ৰান্ড থেকে “ডেখ হৱমোন” শ্ৰীৰাবে চলে আসে। শ্ৰীৰাবে তখন মৃত্যুৰ জন্মে নিজেকে তৈৱী কৰে। শুকু হয় বাধক্য প্ৰক্ৰিয়া। যে হাৱে জীবকোষ মৰে যায় সেই হাৱে তৈৱী

হয় না। জ্বরা শবীরকে গ্রাস করে। ডাঙ্কাব পিটাব স্তীম্যান দেখালেন, সালফার এবং অলিজেন ঘটিত একটি আপাতদণ্ডিতে সচতুর গৌপ্ত অঙ্গ এই কাঙ্গাটি করে। তিনি যোগটি শবীর থেকে বেব করে দেবাব প্রাঞ্জিয়াও বেব করণেন। এই অসম্ভব ব্যবহার প্রাক্কিয়া ব্যবহার করে পৃথিবীর কিছু ভাগ্যবান মানুষ তাদের শরীর থেকে ডেখ হরামোন বেব করে দিয়েছে। জ্বরা আর তাদের স্পর্শ করতে পারছে না।

তিনি পাশের ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। এই ঘরে একটি ‘কফি ডিসপেনসিং’ রোবট আছে। সে তাকে এক পেয়ালা কফি দিয়ে হাসিমুখে বলেছে, আশা করি এক পেয়ালা উক্ফ কফি আপনার হাসয়ের শৈত্য দূর করে দেবে।

তিনি রোবটের কথার কোন জবাব দিলেন না। এদেব তৈরীই করা হয় বুক্সুদীপ্ত কথা বলে মানুষকে চমৎকৃত করার জন্য। এদেব সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললেই মানুষ হিসাবে নিজেকে তুচ্ছ ও শূন্য মনে হয়। তিনি সামনের গোল টেবিলের উপর রাখা চকচকে কিছু ম্যাগাঞ্জিন থেকে একটি তুলে নিলেন। পাতা উল্টিয়ে তাঁর মুখ বিকৃত হল। তুল ম্যাগাঞ্জিন বেছে নিয়েছেন — ‘জ্বেনো-কোড নিউস’। জেনেটিক ইনজিনীয়ারিং বিশ্বে রংগরগে সব খবরে ভর্তি। এইসব খবরের কোনটির প্রতিই তাঁর কোন আগ্রহ নেই। আগীৰ জিনের সঙ্গে উক্সিদের জিন লাগিয়ে কত সব অস্তুত জিনিস তৈরী হচ্ছে তার রংগরগে বর্ণনা — পড়তে তাঁর ভাল লাগে না। টেয়েটো জিনের সঙ্গে গোলাপ গাছে জিন লাগানো হচ্ছে — সাফল্য দোরগোড়ায়। এর শেষ কোথায় কে জানে? মানুষ এবং উক্সিদের এক সংকর প্রজাতি তৈরী হবে? আগামী পৃথিবীতে কারা বাস করবে? মানব-উক্সিদ?

বিশ্ব শতাব্দীর শেষ ভাগে মানুষের সঙ্গে শিশ্পাঞ্জির ফিলনে তৈরী হল নতুন প্রজাতি। তারা মানুষ না, আবার শিশ্পাঞ্জি না। গাঢ়া ও ঘোড়ার সংকর যেমন খচর এ-ও তেমনি। তবে সেই পরীক্ষা হয়েছিল গোপনে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। নতুন প্রজাতি সম্পূর্ণ ধৰ্মস করে বিজ্ঞানীরা জ্ঞানিয়েছিলেন — নতুন প্রজাতি গ্রহণযোগ্য নয়। সেদিন এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানীর সাজা দেয়া হয়েছিল। আজ আর সেই দিন নেই। জেনেটিক ইনজিনীয়াররা আজকের পৃথিবীর সবচে সম্মানিত মানুষ। তাঁদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব রকম সুযোগ এবং অনুমতি দেয়া হচ্ছে। কারণ এই পৃথিবীকে তাঁরা ক্ষমতাপূর্ণ করেছেন। জেনেটিক ইনজিনীয়ারদের কারণে আজকের পৃথিবীতে কোন খাদ্যসম্পূর্ণ করেছেন। উক্সিদের সঙ্গে জীবের জিনের সংযোগে তৈরী করেছেন সুস্বাদু প্রোটিনসর্বস্ব উক্সিদ। জেনেটিক ইনজিনীয়াররা আজকের পৃথিবীর দেবতা।

- ঃ আপনার চেক ওকে হয়েছে। আপনি যন্ত্রটি নিতে পারবেন।
- ঃ আপনাকে ধন্যবাদ।
- ঃ আশাকরি এই যত্নের কল্যাণে আপনার সময় অনন্দময় হবে।
- ঃ শুভ কামনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

তিনি কালো বাঙ্গাটি বুকের কাছে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। রাত বেশী হয়নি, তবু পথঘাট নির্জন। টাউন সার্ভিসের হলুদ বাসগুলি প্রায় ফাকা যাচ্ছে — তার যে কোন একটিতে উঠে

গেলেই হয়। উঠতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ভাল লাগছে। আবহাওয়া চমৎকার, তবে একটু শীত ভাব আছে।

বেশ কিছু সময় হাঁটার পর তিনি একটা ফাঁকা বাসে উঠে পড়লেন। বাসের ড্রাইভার মুখ ঘূরিয়ে বলল, আপনার বৈশ্বভূষণ আনন্দমূল হোক। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। রোবট ড্রাইভার। পৃথিবী রোবটে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এই সব রোবট চমৎকার কথা বলে। এদের প্রোগ্রামিং অসাধারণ।

রোবট ড্রাইভার বলল, আপনি কত দূর যাবেন?

তিনি শুকনো গলায় বললেন, কাছেই।

: আপনি মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী নন।

: না।

: কেন বলুন তো?

তিনি চুপ করে রইলেন। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। এই সব রোবটদের সঙ্গে কথা বলা মানেই হচ্ছে নিজেকে ছেট করা। রোবট গাড়ির গতি বাড়াতে বাড়াতে বলল, আমি রোবট বলেই কি আপনি কথা বলতে চাচ্ছেন না?

: জানি না।

: আমি লক্ষ্য করেছি বেশীরভাগ মানুষ রোবটদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। সারাক্ষণ গজীর হয়ে থাকে। সারাক্ষণ বিষপ্তি হয়ে থাকে যেন তার সমস্যার অন্ত নেই। আমি কি ঠিক বলছি?

: হ্যাঁ।

: আপনারা কি নিয়ে এত চিন্তা করেন?

তিনি জ্বাব দিলেন না। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। গাড়ি রেসিডেনশিয়েল এলাকায় দূরে দূরে রাস্তার দুপাশে আকাশছোঁয়া বাড়ি। কত লক্ষ মানুষই না এইসব বাড়িতে বাস করে। তবু কেন জানি বাড়িগুলিকে প্রাণহীন মনে হয়।

রোবট ড্রাইভার গাড়ির বেগ অনেকখানি কমিয়ে এনেছে। রেসিডেনশিয়েল এলাকায় গাড়ির গতি অনেক কম রাখতে হয়। ফাঁকা রাস্তা — ইচ্ছা করলেই ঝড়ের গতিতে চাল্লানো যায়। রোবট ড্রাইভার কখনো তা করবে না। লালবাতিতে গাড়ি থামল। রোবট বলল, এই শতকে আপনারা — মানুষেরা এত অসুবী হয়ে গেলেন কিভাবে?

: জানি না।

: আপনাদের তো অসুবী হবার কোন কারণ নেই। মানুষ কখন যায় করেছে, রোগ-ব্যাধি জয় করেছে। অমরত্ব তার হাতের মুঠোয়। তবু এত দুঃখ কেন?

তিনি বললেন, সামনের বুকে আমি নামব।

: অবশ্যই। আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনারা মানুষরা এই শতকে সবই পেয়েছেন। হাইড্রোজেন ফুয়েল আসয় গাড়ির সমস্যা মিটেছে, বাসস্থানের সমস্যা মিটেছে। আপনার নিশ্চয়ই নিজস্ব একটি এ্যাপার্টমেন্ট আছে। আছে না?

: হ্যাঁ।

: আপনি নিশ্চয়ই একা থাকেন না। আপনার স্ত্রী আছে।

ঃ ঈ।

ঃ তার পরেও পি থাটি টু কিনে এনেছেন। অনেক টাকা গেল তাই না?

ঃ ঈ।

ঃ আপনি কি ঈ ছাড়া আর কিছুই বলবেন না?

ঃ আমি এখানে নাম্বৰ।

স্টপেজের যাবানানে গাড়ি ধারানোর নিয়ম নেই। রোবট ভাইভার নিয়ম ভঙ্গ করে গাড়ি ধারাল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে উচু পলায় বলল, আপনার পি থাটি টু আনন্দময় হোক।

তিনি রোবটদের মত গলায় বললেন, ধন্যবাদ।

তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে কাজ করেন। আজ তাঁর নাইট ভিউটি। কাঁজেই তিনি এ্যাপার্টমেন্টে নেই। টেলিফোনের কাছে ছোট চিরকুট লিখে রেখে গেছেন — খাবার তৈরী করা আছে। খেয়ে নিও।

তিনি খেয়ে নিলেন। অত্যন্ত স্বাদু খাবার। খাবারের সঙ্গে চর্বকার পানীয়। এই পানীয়টি এই শতকের যাবামাঝি তৈরী করা হয়েছে — বাঁধালো টক ধরনের স্বাদ। কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত ইলিয় অবশ করে দেয় — বড় ভাল লাগে। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তিনি ঘরের চারদিকে তাকালেন, আনন্দের কত উপকরণ চারদিকে ছড়ানো — ত্রিমাত্রিক ছবি দেখার জন্যে একটি হলোরামা, যা চালু করামত অনুষ্ঠানের পাত্র-পাত্রীরা মনে হয় সশরীরে ঘরের ঠিক যাবানানে চলে এসেছে। যেন হাত বাড়ালেই তাদের ছেঁয়া যাবে।

মন্তিক্ষের আনন্দকেন্দ্র উত্তেজিত করবার জন্যে আছে নানান ব্যবস্থা। সুমধুর সংগীত শুবণের আনন্দ থেকে শুক করে নারীসঙ্গের আনন্দের মত তীব্র আনন্দ মন্তিক্ষ উত্তেজিত করেই পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মানুষ কেন আনন্দ পায়, কোথেকে আনন্দ পায় তা জেনেছেন। তাঁরা জানেন বাগানের একটি ফুল দেখার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে পিঠ চুলকানোর আনন্দের বেশ কিছু মিল আছে, আবার অমিলও আছে। ফুল না দেখেও এবং পিঠ না চুলকিয়েও অবিকল সেই আনন্দ মন্তিক্ষের বিশেষ বিশেষ অংশ উত্তেজিত করে পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে সেই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মানুষ তা থেকে আর আনন্দ পাচ্ছে না। মানুষ ঝুঁকেছে পি থাটি টু-এর দিকে। কে জান এক সময় হয়ত এই যন্ত্রটিও তার ভাল লাগবে না।

তিনি তাঁর স্ত্রীকে পি থাটি টু কেনার খবর দেবার জন্যে ফোন করলেন। রোবটদের ভাবলেশহীন গলায় বললেন, আমি আজ একটি পি থাটি টু কিনেছি।

ঃ সে কি সত্যি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বিরাট ভুল করেছ।

ঃ কেন?

ঃ আমাদের মত দম্পত্তিদের সবকার থেকে একটি করে এই যন্ত্র দেয়া হবে বলে কথা হচ্ছে। তুমি কি জানতে না?

ঃ জানতাম।

ঃ তাহলে?

ঃ কবে না কবে দেয় — আগেভাগেই কিনে ফেললাম। তুমি কি রাগ করেছ?

ঃ না । যত্নটা কি ব্যবহার করেছে ?

ঃ এখনো কুরিলি । এখন কসরব ।

ঃ আচ্ছা । তোমার যত্ন তেমার জীবনকে আনন্দময় করে তুলুক । আমাদের মত দম্পত্তিদের যত্নের আনন্দের প্রয়োজন আছে ।

ঃ তোমাকে ধন্যবাদ ।

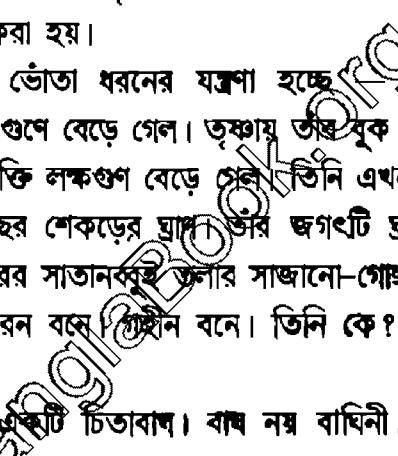
তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন । কাগজের মোড়ক খুলে কালো বক্সটি বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে ঘনে ঘনে বললেন, “আমাদের মত দম্পত্তি” — এই বাক্যটি আমার ভাল লাগে না ।

ভাল না লাগলেও তাঁর স্ত্রী এই বাক্যটি তাঁকে দিনের মধ্যে কয়েকবার বলেন । হয়ত এই নিয়ে তাঁর ঘনে গোপন ক্ষোভ আছে । ক্ষোভ থাকার কোনই কারণ নেই । তাঁদের মত দম্পত্তি পৃথিবীতে অসংখ্য আছে হাঁরা সন্তান জন্মাবার অধিকার পাননি । ঘনব জাতির স্বার্থেই ত করা হচ্ছে । পরিকল্পিতভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে আনার একটি শতই হচ্ছে একদল সন্তানহীন দম্পত্তি ।

ঘানুষ ঘৃতকে যদি সত্যি সত্যি জয় করে ফেলে তাহলে জনসংখ্যা আরো কমাতে হবে । তাঁদের মত দম্পত্তির সংখ্যা আরো বাড়বে ।

তিনি যত্ন হাতে নিয়ে সোফায় এসে বসলেন । ইনস্ট্রোকশান ঘ্যানুয়েল ঘন দিয়ে পড়লেন । যত্নটি ব্যবহার করা খুব সহজ — যত্ন থেকে বের হওয়া ঝণাত্মক ইলেকট্রোড ঘাড়ের ঠিক মাঝামাঝি লাগাতে হয় । ধনাত্মক ইলেকট্রোড থাকবে বা কপালে । স্ট্যাও বাই বোতাম টিপে কারেন্ট ফ্লো এ্যাডজাস্ট করতে হবে যাতে এক মাইক্র এ্যাম্পায়ারেরও কম বিদ্যুৎপ্রবাহ স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে প্রবাহিত হয় । কারেন্ট এ্যাডজাস্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীল আলো ছলে উঠবে । তখন চোখ বক্ষ করে স্টার্ট বাটন টিপতে হবে । সঙ্গে সঙ্গে কিছুই হবে না । মিনিট পাঁচক অপেক্ষা করতে হবে ।

পি থাটি টু যত্নটি বেশ কিছু স্বাপন জন্মের মন্ত্রিস্কের স্মৃতি ধরে রেখেছে । এই স্মৃতি বায়ো কারেন্টের মাধ্যমে মানুষের মাথায় সঞ্চারিত করা হয় ।

তিনি যত্ন চালু করে বসে আছেন । মাথায় ভেঙ্গা ধরনের যত্নশা হচ্ছে  পিপাসাও বোধ হচ্ছে । হঠাৎ সেই পিপাসা হাজারো গুপ্ত বেড়ে গেল । তৎক্ষণাৎ তাঁর পুরুক ফেটে যাচ্ছে — এই তৎক্ষণার কারণেই বোধ হয় তাঁর দ্রাগশক্তি লকগুণ বেড়ে পেল । তিনি এখন সব কিছুর দ্রাগ পাচ্ছেন । মাটির দ্রাগ, ফুলের দ্রাগ, গাছের শেকড়ের দ্রাগ, তাঁর জগৎটি দ্রাগময় হয়ে গেছে । এবং তিনি বুঝতে পারছেন তিনি শহরের সাতানকুর জলার সাজানো-গোছানো কোন এ্যাপার্টমেন্টে বাস করেন না । তিনি বাস করেন বরে গুচ্ছে বনে । তিনি কে ? তিনি কি ...

বোৰা যাচ্ছে, পরিষ্কার বোৰা যাচ্ছে, তিনি পুরুষটি চিতাবাল । বাষ নষ্ঠ বাধিনী । তাঁর তিনটি শিশু শাবক আছে । গত দুদিন এদের জন্ম আগলে রেখেছেন । আজ প্রবল তৎক্ষণাত্ম অস্ত্র হয়ে এদের ছেড়ে পানির সন্ধানে বের হয়েছেন । পানি কোথায় আছে তা তিনি জানেন — পানিরও গুরু আছে । সেই গুরু যাজির গক্ষের মতই তীব্র । পানি আছে, কাছেই আছে । এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি পানির কাছাকাছি শৌচে বেতে পাবেন কিন্তু যেতে পারছেন না । কাছেই

কোথায় যেন পুরুষ বাষ্টা সুব্যূর করছে। এব মতলব ভাল মা। বাজ্ঞাটাকে এ হৃত যেরে
যেসবে। এদেব একা রেখে কোথাও যাওয়া যাবে মা। অধিঃ ত্বক্ষায় শুক ফেটে যাচ্ছে।

আকাশে দিবাট চাদ। গুব আলোম এন-জুন গুলগুল কণাখ। কন-জুন কলে এগাঁথে শান্তেন
বাতাস। বাতাসে কি অসুত শব্দেই না গাছের পাতা নড়ছে। যে সব পাতা নড়ছে তাৱ থেকে
এক ধৰনেৱ পঞ্জ আসছে। আবাস হিয়ে পাতা থেকে অন্য ধৰনেৱ গুল। কি বিচিত্ৰ, কি বিচিত্ৰ
চামপাশেৱ অগৎ। কোন কুৰেই না পৌছে গেছে অনুভূতিৰ তীক্ষ্ণতা।

তাঁৰ শৰীৱ ধৰণৰ কৰে কৰ্পছে। ত্বক্ষায় শুক ফেটে যাচ্ছে — অথচ কি আসলহই মা
তিনি রঞ্জেৱ ভেতৱ অনুভূত কৰছেন। তিনি জলেৱ সংকামে এগুছেন অথচ তাঁৰ সমত ইতিয়
তাঁৰ শাৰকদেৱ দিকে।

তাৱো অনেক পবেৱ কথা।

ডেথ হৰমোন রঞ্জেৱ ভেতৱই ভেঞ্চে ফেলাৱ অতি সহজ পক্ষতি দেৱ হৱেছে। মানুষ
জৱা ঝোখ কৰেছে। মানুষকে এখন অমৰ বলা যেতে পাৱে। বাৰ্ধক্যজনিত কাৱণে তাৱ আৱ
মতৃ হবে না। জীবাণু এবং ভাইৱাসঘাটিত কোন অসুখও পৰিবীতে নেই। মানুষকে এখন কি
তাহলে অঘৱ বলা যাবে? হয়ত বা।

অমৰ মানুষৱা এখন দিনবাত ঘৰেই বসে থাকে। তাদেৱ কাজ কৱাৱ প্ৰয়োজন মেই।
কাজেৱ জন্যে আছে রোবট শ্ৰেণী। চিন্তা-ভাবনাৱও কিছু নেই। অমৰত্বেৱ বেশী আৱ কিছু
তো মানুষেৱ চাইবাৱও নেই। এখনকাৱ মানুষ দিনেৱ পৱ দিন একই জ্বায়গায় একই ভঙ্গিতে
বসে থাকে। পি থার্টি টু ব্ৰহ্ম লাগিয়ে পশুদেৱ জীবনেৱ অংশবিশেষ যাপন কৱতে তাঁদেৱ বড়
ভাল লাগে। এই তাঁদেৱ একমাত্ৰ আনন্দ।